সলামের অর্থব্যবস্থা-২

রিমার্জিত বর্ধিত সংস্করণ

ইসলামের অর্থব্যবস্থা

মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসুম

(পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ)

ইসলামের অর্থব্যবস্থা-২য়

(فقه المعاملات المالية في الإسلام)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

"বইটি আইএফএ কনসালটেন্সি লি. কর্তৃক পরিচালিত 'CIEF (Certificate course in Islamic Economics and Finance)' কোর্সের প্রথম সেমিস্টারের সিলেবাস হিসাবে অনুমোদিত"-*আইএফএ কনসালটেন্সি লি. কর্তৃপক্ষ*

ইসলামের অর্থব্যবস্থা-২য়

(فقه المعاملات المالية في الإسلام)

মাও. আব্দুল্লাহ মাসুম

সহকারী মুফতি, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আইএফএ কনসালটেন্সি

প্রকাশনায়
আইএফএ কনসালটেন্সি লি.

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

- প্রথম প্রকাশ
  অক্টোবর ২০২১
- দ্বিতীয় প্রকাশ
  ডিসেম্বর ২০২২

- গ্রন্থস্বত্ব
  লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

- প্রকাশনা
  আইএফএ কনসালটেন্সি লি.
- পরিবেশনা
  মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক দোকান নং : ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত।
- ই-মেইল
  maktabatulazhar2@gmail.com
- প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
  ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
  ০১৯ ২৪ ০৭ ৬৩ ৬৫
- বাংলাবাজার শাখা-১
  দোকান নং : ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
  মোবাইল : ০১৭১৫ ০২ ৩১ ১৮
- বাংলাবাজার শাখা-২
  কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
  মোবাইল : ০১৬৭৮ ১৮ ৩০ ১২
- প্রচ্ছদ
  হাশেম আলী
- বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা
  মুহারেব মুহাম্মাদ
- বানান ও ভাষারীতি
  মুরশিদুল হাসান শামীম, আব্দুল্লাহ আল মামুন
- মূল্য ৮১০ (আটশত দশ) টাকা মাত্র

Islamic Economics & Finance
By Mufti Abdullah Masum
Volume : 2
Published by : MAKTABATUL AZHAR. Dhaka, Bangladesh
Phone No: 01924 07 63 65

❀ ❀ ❀

সূচি

অধ্যায় : ০৭

কিমার (Gambling) / ২১

১. ১. জাহেলী যুগে প্রচলিত কিমার / ২৪

১. ১. ১. জুয়ার তির / ২৪

১. ১. ২. নিজের ওপর ও পরিবারের ওপর মাইসির করা / ২৫

১. ১. ৩. ঘোড় দৌড় / ২৬

১. ২. কুরআনুল কারীমে কিমার নিষিদ্ধতার ক্রমবিকাশ / ২৬

১. ৩. কিমারের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহতা / ৩০

১. ৩. ১. কুরআনুল কারীম থেকে / ৩০

১. ৩. ২. সহিহ হাদীস থেকে / ৩১

১. ৪. কিমারের পারিভাষিক পরিচিতি / ৩২

১. ৪. ১. ইমাম জাস্‌সাস রহ. কর্তৃক সংজ্ঞা / ৩২

১. ৪. ২. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.কৃত সংজ্ঞা / ৩২

১. ৪. ৩. আল্লামা মাওয়ারদী রহ.কর্তৃক সংজ্ঞা / ৩৩

১. ৪. ৪. মুফতি শফী রহ. কর্তৃক কিমারের পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ পরিচিতি / ৩৩

১. ৪. ৫. বিচারপতি মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক কিমারের পরিচিতি / ৩৪
১. ৫. কিমারের মৌলিক উপাদান / ৩৫
১. ৬. কিমারের প্রকার / ৩৫
১. ৭. কিমারের প্রচলিত কিছু উদাহরণ / ৩৭
১. ৭. ১. কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু আধুনিক লেনদেন / ৩৭
১. ৭. ২. কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু আধুনিক লেনদেন / ৩৮
১. ৭. ৩. কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু আধুনিক লেনদেন / ৪৩
১. ৮. কিমারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে কিমার নয় / ৪৪
১. ৯. জুয়া ও দেশীয় আইন : একটি পর্যালোচনা / ৪৮
১. ১০. কিমারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি / ৫০
১. ১১. এ্যাওফি থেকে কিমার / ৫১

গারার (Uncertainty) / ৫২
২. ১. প্রাথমিক ধারণা / ৫৩
২. ১. ১. শাব্দিক পরিচিতি / ৫৪
২. ১. ২. পারিভাষিক পরিচিতি / ৫৫
২. ১. ৩. এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক গারারের পরিচিতি / ৫৬
২. ২. কুরআন ও হাদীস থেকে গারারের নিষিদ্ধতা / ৫৭
২. ২. ১. কুরআনুল কারীম থেকে : / ৫৭
২. ২. ২. সহিহ হাদীস থেকে : / ৫৮
২. ২. ৩. সাহাবীর ফতোয়া থেকে : / ৫৮
২. ৩. গারার : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে / ৫৯
২. ৪. আর্থিক লেনদেন গারারযুক্ত হয় যেভাবে / ৬০
২. ৪. ১. চুক্তির মূলে গারার / ৬০
২. ৪. ২. পণ্যে গারার / ৬০
২. ৪. ৪. মেয়াদে গারার / ৬২

২. ৫. গারারের আরো কিছু ধরন / ৬৩
২. ৬. গারার ও কিমার / ৬৪
২. ৭. গারার ও জাহালাহ / ৬৫
২. ৭. ১. জাহালাহ : বৈধ/অবৈধতার মানদণ্ড / ৬৭
২. ৭. ২. লেনদেনে গারারের স্তর / ৬৮
২. ৭. ৩. গারারের কারণে লেনদেন ফাসিদ হওয়ার মানদণ্ড / ৭০
২. ৭. ৪. 'গারার' : যুগে যুগে / ৭১
২. ৮. গারারযুক্ত আধুনিক কিছু লেনদেন / ৭২
২. ৮. ১. বীমা / ৭২
২. ৮. ২. ফরেক্স / ৭৩
২. ৮. ৩. এম. এল. এম. বিজনেস পদ্ধতি / ৭৩
২. ৮. ৪. ফিউচার সেল (Future Sale) / ৭৪
২. ৮. ৫. জমি বিক্রয়ে গারার / ৭৫

ঘুষ (Hush Money) : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান / ৭৭
৩. ১. পরিচিতি / ৭৭
৩. ২. পারিভাষিক পরিচিতি / ৮০
৩. ৩. ঘুষের তাৎপর্য / ৮২
৩. ৪. ঘুষের বিধান / ৮২
৩. ৫. ঘুষ হারাম হওয়ার দলিল ও এর ভয়াবহতা / ৮২
৩. ৫. ১. কুরআন মাজীদ থেকে : / ৮২
৩. ৫. ২. হাদীস শরীফ থেকে / ৮৪
৩. ৬. ঘুষের প্রকার ও বিধান / ৮৫
৩. ৬. ১. দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম / ৮৫
৩. ৬. ২. শুধু গ্রহীতার জন্য হারাম / ৮৫
৩. ৬. ৩. ঘুষ ও হাদিয়া / ৮৭
৩. ৬. ৪. পারিশ্রমিক ও ঘুষ / ৯০

৩. ৭. ঘুষের প্রচলিত কিছু উদাহরণ / ৯২
৩. ৮. ঘুষের সাথে সাদৃশ্য, তবে ঘুষ নয় / ১০৩
পরিশিষ্ট / ১০৪
৩. ৯. বাংলাদেশে ঘুষের সংস্কৃতি : একটি পর্যালোচনা / ১০৪

অধ্যায় : ০৮

বিনিয়োগ পদ্ধতি: শিরকাত (অংশীদারত্ব) : পরিচিতি ও বিধান / ১০৯
১. ১. প্রাথমিক কথা / ১০৯
১. ১. ১. মৌলিক কিছু কথা / ১১০
১. ২. 'শিরকাত' পরিচিতি / ১১৩
১. ৩. শিরকাতের দলিল / ১১৪
১. ৩. ১. কুরআন মাজীদ থেকে / ১১৪
১. ৩. ২. শিরকাত : হাদীস থেকে / ১১৬
১. ৩. ৩. ইজমা থেকে / ১১৭
১. ৩. ৪. কিয়াস বা শরঈ যুক্তি / ১১৭
১. ৪. শিরকাতের প্রকারভেদ / ১১৮
১. ৪. ১. শিরকাতুল ইবাহাহ / ১২০
১. ৪. ২. শিরকাতুল মিলক / ১২১
১. ৪. ৩. শিরকাতুল আকদ : পরিচিতি ও বিধান / ১২২
১. ৪. ৪. শিরকাতুল মুফাওয়াযা (সম অংশীদারী কারবার) / ১২৩
১. ৪. ৫. শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারী কারবার) / ১২৪

শিরকাতুল আমাল / ১২৫
২. ১. শিরকাতুল আমাল পরিচিতি / ১২৫
২. ২. তাৎপর্য / ১২৬
২. ৩. শিরকাতুল আ'মালের পুঁজি / ১২৭
২. ৩. ১. কাজ / ১২৭

২. ৩. ৩. মুনাফা / ১২৯
২. ৩. ৪. লোকসান / ১৩০
২. ৪. উদাহরণ / ১৩১
২. ৫. শিরকাতুল আমাল ও বর্তমান সমাজ / ১৩৩
২. ৫. ১. উদাহরণ / ১৩৩
২. ৬. বাহ্যত শিরকাতুল আমাল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা শিরকাতুল আমাল নয় / ১৩৬

শিরকাতুল আমওয়াল / ১৩৯
৩. ১. শিরকাতুল আমওয়ালের পরিচিতি / ১৩৯
৩. ২. তাৎপর্য / ১৪০
৩. ৩. ব্যবসার পুঁজি / ১৪১
৩. ৩. ১. ব্যবসার পুঁজি হিসাবে বস্তু বা দ্রব্য প্রদান / ১৪১
৩. ৩. ২. মূলধন সংমিশ্রিত হওয়া কি আবশ্যক? / ১৪৬
৩. ৪. ব্যবসা / ১৪৮
৩. ৫. গ্যারান্টি ও নিরাপত্তা প্রদান / ১৫০
৩. ৬. মুনাফা বণ্টন নীতিমালা / ১৫১
৩. ৭. মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি / ১৫৫
৩. ৮. মুনাফা বণ্টন না করা / ১৫৮
৩. ৯. লোকসান বহনের নীতিমালা / ১৫৮
৩. ১০. শিরকাত চুক্তি শেষ করা / ১৫৯
৩. ১১. পণ্য বণ্টন / ১৬০
৩. ১২. পণ্য অবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি / ১৬০
৩. ১৩. নির্ধারিত সময়ের আগে চুক্তি রহিত না করার শর্তারোপ / ১৬১
৩. ১৪. পণ্য বা শেয়ার ক্রয় করে নেওয়ার ওয়াদা / ১৬২
৩. ১৫. শিরকাত ফাসেদ হওয়ার বিধান / ১৬২
৩. ১৬. শিরকাতুল আমওয়ালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে শিরকাতুল আমওয়াল নয় / ১৬৩

শিরকাতুল আমাল ও শিরকাতুল আমওয়াল : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা / ১৬৪

শিরকাতুল উজূহ / ১৬৫
৪. ১. শিরকাতুল উজূহের পরিচিতি / ১৬৬
৪. ২. তাৎপর্য / ১৬৭
৪. ৩. চুক্তির বক্তব্য যেমন হবে / ১৬৭
৪. ৪. দায় গ্রহণ / ১৬৭
৪. ৫. মুনাফা / ১৬৮
৪. ৬. লোকসান / ১৬৯
৪. ৭. প্রচলিত কিছু উদাহরণ / ১৬৯
৪. ৮. এ্যাওফি শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড থেকে পার্টনারশিপ চুক্তি / ১৭০

আধুনিক পার্টনারশিপ চুক্তি / ১৭১
৫. ১. জয়েন্ট স্টক কোম্পানি / ১৭১
৫. ১. ১. নন চার্টার্ড কোম্পানি ধারণা / ১৭২
৫. ১. ২. ইস্ট ইন্ডিয়া চার্টাড কোম্পানি / ১৭৪
৫. ২. আধুনিক কোম্পানি গঠনের রূপরেখা / ১৭৭
৫. ৩. কোম্পানি মালিকানা : শরীয়াহ্ দৃষ্টিকোণ / ১৭৮
৫. ৪. কোম্পানির শরঈ বিধান / ১৭৯
৫. ৫. কোম্পানির পুঁজি গঠন ও পরিচালনা : শরীয়াহ্ রূপরেখা / ১৮৫
৫. ৫. ১. সেবা/সার্ভিস প্রদানভিত্তিক কোম্পানি / ১৮৬
৫. ৫. ২. পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক কোম্পানি / ১৮৯
৫. ৫. ৩. পণ্য ও শ্রম মিশ্রণভিত্তিক কোম্পানি / ১৯০
৫. ৫. ৪. দায়ভিত্তিক ব্যবসায়িক কোম্পানি / ১৯০
৫. ৬. কোম্পানী শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া / ১৯১
৫. ৭. কোম্পানির বৈশিষ্ট্য / ১৯২

৫. ৮. দায় সীমিত থাকা / ১৯২
৫. ৯. কোম্পানির দায় লিমিটেড হওয়ার শরঈ দৃষ্টান্ত / ১৯৪
৫. ৯. ১. ইদারাতুল মাবাহিসিল ফিকহিয়্যাহ, ভারত-এর সিদ্ধান্ত / ১৯৭
৫. ১০. কোম্পানির দায় সীমাবদ্ধতা ও বাস্তব অবস্থা / ১৯৮
৫. ১১. আমাদের প্রস্তাবনা / ২০০
৫. ১২. আইনগত সত্তা / ২০১
৫. ১২. ১. আইনগত সত্তার ব্যাখ্যা / ২০১
৫. ১২. ২. বাস্তব সত্তা ও 'আইনগত সত্তা' এর মাঝে মিলের দিক / ২০৩
৫. ১২. ৩. বাস্তব সত্তা ও আইনগত সত্তার মাঝে পার্থক্য / ২০৩
৫. ১২. ৪. আইনগত সত্তার শরঈ ভিত্তি / ২০৪
৫. ১২. ৫. শরীয়াহ কিছু দৃষ্টান্ত ও নজীর / ২০৪
৫. ১৩. কোম্পানিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ নির্দেশনা / ২০৭
৫. ১৪. সাধারণ অংশীদারি চুক্তি ও কোম্পানির মাঝে পার্থক্য / ২০৯

অধ্যায় : ০৯

মুদারাবা : পরিচিতি, প্রকার ও বিধান / ২১১
১. ১. মুদারাবা কী? / ২১২
১. ২. মুদারাবা ও শিরকাত / ২১৪
১. ৩. মুদারাবার ইতিহাস / ২১৫
১. ৪. মুদারাবার দলিল / ২১৭
১. ৪. ১. সাহাবায়ে কেরামের আমল / ২১৭
১. ৪. ২. যুক্তির আলোকে মুদারাবা / ২২০
১. ৫. মুদারাবার পরিভাষাসমূহ / ২২০
১. ৬. মুদারাবা ও শিরকতের মধ্যে পার্থক্য / ২২১
১. ৭. মুদারাবার প্রকার / ২২২
১. ৭. ১. শর্তহীন মুদারাবা / ২২২

১. ৭. ২. শর্তযুক্ত মুদারাবা (Restricted Mudaraba Contract) পরিচিতি / ২২৩
১. ৮. মুদারাবার মৌলিক কিছু নীতিমালা / ২২৪
১. ৯. মুদারাবার বুনিয়াদি বিষয় / ২২৪
১. ৯. ১. মুদারাবা চুক্তি / ২২৫
১. ৯. ২. রব্বুল মাল / ২২৬
১. ৯. ৩. মুদারিব / ২২৭
১. ৯. ৪. মুদারাবায় লাভ-লোকসান বণ্টন নীতিমালা / ২৩০
১. ৯. ৫. পুঁজি / ২৩৬
১. ৯. ৬. ব্যবসায়িক কাজ / ২৪১
১. ১০. মুদারাবার ব্যয় নির্বাহ নীতিমালা / ২৪২
১. ১১. যেসব খরচ মুদারাবা ফান্ড বহন করবে / ২৪৩
১. ১২. যেসব খরচ মুদারিব বহন করবে / ২৪৩
১. ১৩. মুদারিবের পরিতোষণ / ২৪৪
১. ১৪. ফাসিদ (Void) মুদারাবার বিধান / ২৪৬
১. ১৫. মুদারাবা নিঃশেষ করা / ২৪৭
১. ১৫. ১. মুদারাবা নিঃশেষ প্রক্রিয়া / ২৪৮
১. ১৬. মুদারাবার কিছু আধুনিক প্রয়োগ / ২৫০
১. ১৬. ১. মুদারাবা মুনতাহিয়া বিত তামলিক (M. M. T.) / ২৫১
১. ১৬. ২. মুদারাবায় Undertaking / ২৫১
১. ১৭. এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড থেকে মুদারাবা / ২৫২

মুশারাকা / ২৫৩
২. ১. মুশারাকা কী? / ২৫৩
২. ২. মুশারাকার তাৎপর্য / ২৫৪
২. ৩. মুশারাকা ও শিরকাত / ২৫৪
২. ৪. মুশারাকার বৈধতা / ২৫৫

২. ৫. মুশারাকা ও সুদ / ২৫৬
২. ৬. মুশারাকায় মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা / ২৫৭
২. ৭. মুশারাকায় লোকসান বহনের নীতিমালা / ২৫৯
২. ৮. আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মুশারাকার প্রয়োগ / ২৫৯
২. ৮. ১. প্রজেক্ট ফাইন্যান্স (Project Financing) / ২৬০
২. ৮. ৩. মুশারাকা সার্টিফিকেট বনাম বন্ড ও শেয়ার / ২৬১
২. ৮. ৪. এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট বিজনেসে মুশারাকার ব্যবহার / ২৬৩
২. ৮. ৫. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Financing of the working capital) / ২৬৩
২. ৯. মুশারাকার মাধ্যমে Gross Profit-এ অংশীদার / ২৬৬

অধ্যায় : ১০

প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা / ২৬৯

প্রচলিত ভাড়া চুক্তি ও নিয়োগ চুক্তি : প্রাথমিক কিছু কথা / ২৭১
১.১ ইজারা চুক্তি : পরিচিতি ও প্রকার / ২৭২

২. ১. ভাড়া চুক্তির পরিচয় / ২৭৪
২. ৩. ভাড়াচুক্তির প্রকারভেদ / ২৭৫
২. ৪. ভাড়াচুক্তির মূল উপাদান / ২৭৬
২. ৪. ১. মূল ভাড়াচুক্তি / ২৭৬
২. ৪. ২. ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা / ২৮৯
২. ৪. ৩. ভাড়াকৃত বস্তু / ২৯০
২. ৪. ৪. ভাড়া বা বিনিময় / ৩০৪
২. ৪. ৪. ১. সুদমুক্ত সিকিউরিটি মানি/জামানত / ৩০৬
২. ৪. ৪. ২. সুদযুক্ত সিকিউরিটি মানি / ৩১০
২. ৪. ৪. ৩. অগ্রিম ভাড়া বাবদ নেওয়া / ৩১১

২. ৫. ভাড়াচুক্তির ওপর আপতিত বিভিন্ন অবস্থা / ৩১৪
২. ৬. ভাড়াচুক্তি শেষ করা ও নতুন করে পুনরায় চালু করা / ৩১৭
২. ৭. ভাড়া চুক্তি ও আধুনিক কিছু লেনদেন / ৩১৮
২. ৭. ১. পজিশন ক্রয়-বিক্রয় / ৩১৮
২. ৭. ২. পজিশনের সাথে জমিও বিক্রয় / ৩২০
২. ৭. ৩. এডভান্স ও পজিশন মিশ্রিত চুক্তি / ৩২১
২. ৭. ৪. স্থায়ী লীজ চুক্তি / ৩২২
২. ৮. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ভাড়া চুক্তির ব্যবহার ও শরীয়াহ নীতিমালা / ৩২৫
২. ৮. ১. ফাইন্যান্সিয়াল লিজ চুক্তির ব্যাপারে মৌলিক কথা / ৩২৫
২. ৮. ২. প্রচলিত কনভেনশনাল বিনিয়োগ পদ্ধতি ও ইসলামের আধুনিক ভাড়া চুক্তি / ৩২৬
২. ৮. ২. ১. কনভেনশনাল 'হায়ার পারচেজ' (Hire purchase) চুক্তি ও কিস্তি ক্রয় বিক্রয় / ৩২৭
২. ৮. ২. ২. সুদী ঋণ ভিত্তিক ফাইন্যান্স ও এইচপিএসএম / ৩৩১
২. ৮. ২. ৩. সুদী ঋণ ও সেল এন্ড লিজ ব্যাক / ৩৬০
২. ৮. ২. ৪. কনভেনশনাল লিজ চুক্তি ও আইএমবিটি / ৩৬৩
২. ৮. ৩. ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক (IMBT) / ৩৬৪
২. ৮. ৪. সেল এন্ড লিজ ব্যাক ও আইএমবিটি / ৩৬৮
২. ৮. ৫. IMBT পদ্ধতিতে মাঝপথে ভাড়াচুক্তি বাতিল হওয়া / ৩৬৯
২. ৮. ৬. Hire purchase চুক্তি ও ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিকের মাঝে পার্থক্য / ৩৭০
২. ৮. ৭. এইচপিএসএম, আইএমবিটি ও সেল লিজ ব্যাক / ৩৭১

নিয়োগ চুক্তি / ৩৭২
৩. ১. নিয়োগ চুক্তি (Hiring of persons) পরিচয় / ৩৭৩
৩. ২. নিয়োগ চুক্তির বৈধতা / ৩৭৪
৩. ২. ১. মূল নিয়োগ চুক্তি / ৩৭৬

৩. ২. ২. নিয়োগ চুক্তির পূর্বে মাস্টার এগ্রিমেন্ট / ৩৭৭
৩. ৩. নিয়োগ চুক্তির মৌলিক বুনিয়াদি বিষয় / ৩৭৭
৩. ৪. নিয়োগ চুক্তিতে 'হামিশ জিদ্দিয়া' গ্রহণ / ৩৭৭
৩. ৪. ১. গৃহীত হামিশ জিদ্দিয়া ব্যবহার নীতি / ৩৭৮
৩. ৫. নিয়োগদাতা (Employer) ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Employee) / ৩৭৮
৩. ৫. ১. আজিরের (নিয়োগপ্রাপ্ত) প্রকার / ৩৭৯
৩. ৫. ১. ১. আজিরে খাস (Private Employee) : পরিচিতি ও তাৎপর্য / ৩৭৯
৩. ৫. ১. ২. আজিরে খাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ নীতিমালা / ৩৯১
৩. ৫. ১. ৩. আজিরে মুশতারাক (Shared employee) : পরিচিতি ও তাৎপর্য / ৩৯৫
৩. ৫. ১. ৪. আজির মুশতারাক সংক্রান্ত শরীয়াহ মূলনীতি / ৩৯৬

অধ্যায় : ১১

সালাম চুক্তি : পরিচিতি, তাৎপর্য, বিধান ও প্রায়োগিক উদাহরণ / ৪০১
১. ১. সালাম চুক্তি কী? / ৪০২
১. ২. সালাম চুক্তির তাৎপর্য / ৪০২
১. ৩. সালাম চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা / ৪০৩
১. ৪. সালাম চুক্তির বৈধতা / ৪০৪
১. ৫. সালাম কীসে হতে পারে? / ৪০৫
১. ৬. সালাম চুক্তির মৌল উপাদান / ৪০৫
১. ৬. ১. সালামের মূল চুক্তি / ৪০৬
১. ৬. ২. সালাম চুক্তির মূলধন/মূল্য / ৪০৬
১. ৬. ৩. সালাম চুক্তির পণ্য / ৪০৭
১. ৬. ৪. সালাম চুক্তির মেয়াদ / ৪১২

১. ৬. ৫. পণ্য অর্পণের স্থান / ৪১২
১. ৭. প্যারালাল সালাম / ৪১২
১. ৭. ১. সালামের কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ / ৪১৪
১. ৭. ২. ইসলামী ব্যাংকিং-এ সালাম চুক্তি / ৪১৫
১. ৭. ৩. যেভাবে তা করা হয় / ৪১৫
১. ৭. ৪. মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্স ও সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি / ৪১৬

ইস্তিসনা চুক্তি : পরিচিতি, তাৎপর্য, বিধান ও প্রায়োগিক উদাহরণ / ৪১৯
২. ১. পূর্বকথা / ৪১৯
২. ২. ইস্তিসনা চুক্তির বৈধতা / ৪২০
২. ৩. কীসে ইস্তিসনা প্রয়োগ হতে পারে / ৪২১
২. ৪. সালাম ও ইস্তিসনার মধ্যে পার্থক্য / ৪২২
২. ৫. ইজারা ও ইস্তিসনার মধ্যে পার্থক্য / ৪২৩
২. ৬. ইস্তিসনা চুক্তি কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? / ৪২৪
২. ৭. ইস্তিসনা চুক্তি কি অনিবার্য চুক্তি? / ৪২৪
২. ৭. ১. অগ্রগণ্য মতামত / ৪২৫
২. ৭. ২. ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী অনিবার্য কখন হবে? / ৪২৬
২. ৮. ইস্তিসনা লেনদেনে তৈরিকারী/অর্ডার গ্রহণকারীর আমল/কাজ কি শর্ত? / ৪২৭
২. ৮. ১. অগ্রগণ্য বক্তব্য / ৪২৭
২. ৯. ইস্তিসনা চুক্তির শরঈ অবস্থান (Classification) নির্ণয় / ৪২৮
২. ১০. ইস্তিসনা চুক্তির মৌল উপাদান / ৪২৯
২. ১০. ১. ইস্তিসনার মূল চুক্তি / ৪২৯
২. ১০. ২. ইস্তিসনা চুক্তির পণ্য / ৪৩০
২. ১০. ৩. ইস্তিসনা মূল্য / ৪৩৩
২. ১১. প্যারালাল ইস্তিসনা / ৪৩৩

২. ১২. প্রায়োগিক উদাহরণ / ৪৩৪
২. ১৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এ ইস্তিসনা চুক্তি / ৪৩৪

মুরাবাহা : পরিচিতি ও বিধান / ৪৩৬
৩. ১. পারিভাষিক পরিচিতি / ৪৩৯
৩. ২. মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য / ৪৪১
৩. ৩. মুরাবাহার বিধান / ৪৪২
৩. ৪. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফিকহী ফোরামে মুরাবাহা বিষয়ে আলোচনা / ৪৪৪
৩. ৫. মুরাবাহার তাৎপর্য / ৪৪৬
৩. ৬. প্রাচীন মুরাবাহার সাথে অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির পার্থক্য / ৪৪৭
৩. ৭. মুরাবাহাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান / ৪৪৯
৩. ৮. মুরাবাহায় খেয়ানত / ৪৫৪
৩. ৯. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা / ৪৫৪
৩. ১০. ব্যাংকিং মুরাবাহার নাম / ৪৫৫
৩. ১১. ব্যাংকিং মুরাবাহা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা / ৪৫৬
৩. ১২. ব্যাংকিং মুরাবাহার সংজ্ঞা / ৪৫৭
৩. ১৩. মুরাবাহায় Deffered Payment হওয়া কী জরুরি? / ৪৫৭
৩. ১৪. প্রাচীন মুরাবাহা ও ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য / ৪৫৭
৩. ১৫. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার তাৎপর্য / ৪৬১
৩. ১৬. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা সম্বন্ধে ফতোয়ার ইতিহাস / ৪৬২
৩. ১৭. মুরাবাহার বৈধতার ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন / ৪৬৫
৩. ১৮. ব্যংকিং মুরাবাহা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি / ৪৬৯
৩. ১৯. ব্যাংকিং মুরাবাহায় পক্ষসমূহ / ৪৭১
৩. ২০. ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যবহৃত শরীয়াহ চুক্তিসমূহ / ৪৭২
৩. ২১. ব্যাংকিং মুরাবাহা একটি জটিল প্রক্রিয়া / ৪৭২
৩. ২২. Buying agent (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ভিত্তিক মুরাবাহা : একটি শরীয়াহ পর্যালোচনা / ৪৭৩

৩. ২২. ১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শরীয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত / ৪৭৬
৩. ২৩. এক নজরে ব্যাংকিং মুরাবাহা সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের শর্তাবলি / ৪৭৬
৩. ২৪. মূল্য যথাসময়ে আদায় না করলে ব্যাংকের করণীয় / ৪৮০
৩. ২৫. ব্যাংকিং মুরাবাহা বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্বপ্নদ্রষ্টা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের চিন্তা ও বর্তমান কর্মপদ্ধতি / ৪৮১
৩. ২৬. ব্যাংকিং মুরাবাহার বিকল্প একটি কর্মকৌশলের প্রস্তাবনা / ৪৮৪
৩. ২৭. ব্যাংকিং মুরাবাহা সংক্রান্ত ইসলামী ব্যাংকের কাগজপত্র ও সংক্ষিপ্ত শরঈ পর্যালোচনা / ৪৮৭
৩. ২৮. প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা প্রয়োগে সম্ভাব্য নানা শরীয়াহ বিচ্যুতি / ৪৯১
৩. ২৯. ভুলত্রুটি হওয়ার কারণ / ৪৯৫
৩. ৩০. মুরাবাহা সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের উপায় / ৪৯৫
৩. ৩১. প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং থেকে মুরাবাহা বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে যা লক্ষ্য রাখতে হবে / ৪৯৬
৩. ৩২. মুরাবাহা বিনিয়োগ মঞ্জুর করার সময় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে / ৪৯৭

বাইয়ে মুআজ্জাল (Deferred sale) বা বাকি চুক্তি / ৫০০
৪. ১. শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি / ৫০১
৪. ৩. তাৎপর্য / ৫০২
৪. ৪. সাধারণ বাকি বেচাকেনা ও বাই-এ-মুআজ্জালের মাঝে পার্থক্য / ৫০৩
৪. ৫. বাইয়ে মুআজ্জাল ও মুরাবাহা / ৫০৫
৪. ৬. বাই-ই-মুআজ্জাল সঠিক হওয়ার শর্তাবলি / ৫০৫
৪. ৭. মূল্য ও মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণসংক্রান্ত নীতিমালা / ৫০৬
৪. ৮. বাইয়ে মুআজ্জালের প্রকার ও প্রয়োগ / ৫০৭
৪. ৯. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল প্রয়োগ

পদ্ধতি / ৫০৮
৪. ১০. ইসলামী ব্যাংকিং যেসব ক্ষেত্রে বাইয়ে মুআজ্জাল প্রয়োগ করে থাকে / ৫০৯
৪. ১১. ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল বিষয়ক ব্যাংকিং ডকুমেন্টস ও শরীয়াহ পর্যালোচনা / ৫১১

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

যেখানে যা আছে

অধ্যায় : ০৭

- কিমার (Gambling)
- গারার (Uncertainty)
- রিশওয়াহ (Hush Money)

কিমার (Gambling)

শুরু কথা

বর্তমান ফিকহুল মুআমালার একটি আলোচিত বিষয় হলো, 'কিমার'। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লেনদেনে তা পাওয়া যায়। সাধারণত বাংলায় এর তর্জমা করা হয়, 'জুয়া'। জুয়া বলতে সাধারণ মানুষ বুঝে—তাস খেলা। অথচ কিমার বাংলা জুয়া থেকেও ব্যাপক বিষয়। যেমন রিবা সুদ থেকেও ব্যাপক। এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা না হওয়ার কারণে দৈনন্দিন এমন এমন লেনদেনেও মানুষ জড়িয়ে পড়ছে, যার মধ্যে আমাদের অজান্তেই কিমার লুকিয়ে থাকে।

ফিকহুল মুআমালায় কিমার একটি বিস্তৃত বিষয়। শুধু এ বিষয়ে আরবীতে ৫০০ এর অধিক পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণাধর্মী বই লেখা হয়েছে। ড. সুলাইমান ইবনে আহমাদ আল মুলহিম কর্তৃক লিখিত আরবী ভাষায় *'আল কিমার হাকীকাতুহু ওয়া আহকামুহু'*[১] বইটি এ বিষয়ে উঁচুমানের একটি গ্রন্থ।

এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে মোটা দাগের কিছু কথা আরয করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তা উপকারী বানিয়ে দিন।

---

১ প্রকাশক : কুনূয ইশবিলিয়া, প্রকাশনার সময় : ১৪২৯ হি.। ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটির শরীয়াহ অনুষদ অধীনে সম্মানিত লেখক এটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ পত্র হিসেবে প্রস্তুত করেছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৩৪

‘কিমার’

‘কিমার’ শব্দটি আরবী (القمار)। শব্দটির মূল হলো, ‘কামরুন’ (قمر) (ক্বাফ, মীম, রা)। এর মূল অর্থ : يدل على بياض، ثم يفرع منه অর্থাৎ শুভ্রতা যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে বা কমে বাড়ে। এর থেকে চাঁদকে ‘আল কামার’ (القمر) বলা হয় তার শুভ্রতার কারণে। তদ্রূপ এখান থেকেই ‘কিমার’ বলা হয়। কারণ, জুয়াড়ির সম্পদ কখনো এক অবস্থায় থাকে না। কখনো বাড়ে কখনো কমে।[১] এ শব্দটি হাদীসে এসেছে।

‘মাইসির’

‘কিমারের’ পাশাপাশি এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আরেকটি আরবী শব্দ হলো, ‘মাইসির’। শব্দটির মূল অর্থ : التجزئة তথা ভাগ-বণ্টন করা। ভাগ-বণ্টনকারীকে বলা হয়, ‘ইয়াসির’ (الياسر)। আর যে বস্তু বণ্টন করা হয় (জাহেলী প্রথানুযায়ী উট) তাকে বলা হয়, ‘মাইসির’।[২]

‘মাইসির’ (الميسر) শব্দটির উৎস : ইয়ুসরুন (يسر) থেকে। অর্থ : সহজ। জুয়ার মাধ্যমে যেহেতু সহজে সম্পদ অর্জন হয়, তাই একে ‘মাইসির’ বলা হয়।[৩] অথবা ‘ইয়াসার’ (يسار) থেকে।[৪] অর্থ : সহজ। এর মাধ্যমে সহজে (অবৈধ পন্থায়) অর্থ কামাই করা যায়, তাই একে ‘মাইসির’ বলা হয়।

কিমার ও মাইসির

কিমার বলতে যা বোঝায় সবই ‘মাইসির’। অথবা বলুন, মাইসির

---

১ মাকায়িসুল লুগাহ, পৃ. ৭৫০। উল্লেখ্য, ফিকহের কিতাবে লেখা আছে, কিমার শব্দটি ‘আল কামার’ (القمر) বা চন্দ্র থেকে এসেছে। চাঁদ আরবী মাসের শুরুতে বৃদ্ধি হয়। আবার শেষের দিকে হ্রাস পায়। ‘কিমার’কে ‘কিমার’ বলা হয় এ জন্য যে, প্রত্যেক জুয়াড়ির অবস্থা মূলত চাঁদের মতো। কখনো হারে। কখনো জেতে। (রদ্দুল মুহতার, (সাঈদ) খ. ৬, পৃ. ৪০৩)। তবে এ ব্যাখ্যাটি স্বল্প অনুসন্ধানে আরবী ভাষার প্রাচীন উৎসমূলক গ্রন্থসমূহে খুঁজে পাইনি।

২ আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস রহ., খ. ১, পৃ. ৩২৯। ‘মাইসির’ শব্দটি মাসদার ও ইসম দুটিই। (লুগাতুল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩)

৩ আল মুফরাদাত, পৃ. ৫৫২, লুগাতুল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩

৪ আল কাশশাফ, খ. ১, পৃ. ৩৫৯

মানেই কিমার। সালাফ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., মুজাহিদ রহ. প্রমুখ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।[১]

বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ রহ., আতা রহ., তাউস রহ. বলেছেন, كل شيئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز 'কিমার বলতে যা বোঝায় যাবতীয় বিষয় 'মাইসির'। এমনকি বাচ্চারা আখরোট ফল দিয়ে যে হার-জিত খেলা করে সেটাও 'মাইসির'।'[২]

কাতাদাহ রহ. বলেছেন, الميسر فهو القمار كله 'মাইসির হলো যাবতীয় কিমারের নাম।'[৩]

মোটকথা, কিমারের যত সূরত ও পদ্ধতি আছে সবই মাইসিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে সকল সাহাবা ও তাবেঈন একমত।[৪]

অবশ্য সালাফের কেউ কেউ মাইসিরকে ব্যাপক বলেছেন। তাদের মতে 'মাইসির' দু'ভাবে হতে পারে। যথা :

১. অবৈধ খেলা। যেমন, তাস খেলা, দাবা খেলা। এর সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পৃক্ত নয়; বরং কাসেম রহ. বলেছেন—

   كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.

   'প্রত্যেক এমন কাজ—যা আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে গাফেল করে রাখে সেটাই 'মাইসির'।'[৫]

১. কিমারযুক্ত আর্থিক লেনদেন। সেটা খেলায় হতে পারে। অন্য কোনো লেনদেনেও হতে পারে।

---

১ ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী মাসায়েল, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪ সালাফে সালেহীন থেকে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ., মুজাহিদ রহ., সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ., সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ., কাতাদা রহ., হাসান বসরী রহ., তাউস রহ., আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ., ছুদ্দী রহ. ও দাহহাক রহ. প্রমুখ সালাফে সালেহীন 'মাইসির' ও 'কিমার'কে এক মনে করতেন। দেখুন, তাফসীরে তাবারী, খ. ২, পৃ. ৩৫৮

২ তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ১৬১, আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খ. ১, পৃ. ৩২৯, আল কিমার ওয়া আহকামুহু, পৃ. ৮০

৩ তাফসীরে তাবারী, খ. ৪, পৃ. ৩২৪। তাফসীরে রুহুল মাআনী, খ. ২, পৃ. ১১৩

৪ তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ., খ. ১, পৃ. ৫৩২

৫ তাফসীরে তাবারী, ৪/৩২৪, আল কিমার ওয়া আহকামুহু, পৃ. ৮৫

অপরদিকে 'কিমার' বলতে কেবল, কিমারযুক্ত আর্থিক লেনদেনকে বোঝায়। খেলাকে নয়।[1] মোটকথা, এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সব কিমার অবশ্যই মাইসির। তবে সব মাইসির কিমার হওয়া জরুরি নয়।[2]

ইংরেজিতে কিমারের প্রতিশব্দ হলো : Wagering, Gambling, Bet ইত্যাদি।

বাংলা জুয়া ও কিমার

বাংলা ও উর্দুতে এর অক্ষম তর্জমা করা হয়, 'জুয়া'। বাংলা অভিধানে জুয়ার অর্থ করা হয়েছে, 'খেলায় বাজি ধরা'। এর মানে জুয়া খেলার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। এটি শরঈ কিমারের অক্ষম তর্জমা। কারণ, কিমার শুধু খেলায় নয়; বিভিন্ন লেনদেনেও হতে পারে। তাই বলি, প্রচলিত জুয়াই একমাত্র কিমার নয়। জুয়াও কিমার। তদ্রূপ কিমার মানেই জুয়া নয়। মূলত কিমার একটি শরঈ পরিভাষা। এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা খেলায় হতে পারে। অন্য কোনো লেনদেনেও হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিমারকে কিমার বলাই শ্রেয়। জুয়া নয়।

১. ১. জাহেলী যুগে প্রচলিত কিমার

জাহেলী যুগে কিমারের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইসলামে সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে একাধিক স্থানে সেসব কিমারের নিষিদ্ধতার কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে জাহেলী যুগে প্রচলিত কিছু কিমারের আলোচনা করা হলো। এতে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত কিমারের নিষিদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিধান বুঝতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

১. ১. ১. জুয়ার তির

জাহেলী যুগে কিমারের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচলন ছিল 'জুয়ার তীর'। এর পদ্ধতি হলো প্রথমে দশজন যৌথভাবে একটি উট ক্রয় করত। এরপর

---

১ এ ব্যাখ্যাটি ইমাম মালেক রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৫৩

২ আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা, খ. ৩৯, পৃ. ৪০৬

তা যবেহ করা হতো। যবেহের পর প্রত্যেকের অংশ অনুপাতে গোশত বণ্টন না করে বিশেষ পন্থার লটারির মাধ্যমে গোশত বণ্টন করত।

এ জন্য তাদের বিশেষ দশটি তীর ছিল। এগুলো বাইতুল্লাহর খাদেমের নিকট সংরক্ষিত থাকত। দশটি তীরের মধ্যে কেবল ৭টি তিরে গোশতের বিভিন্ন পরিমাণ সাংকেতিকভাবে লেখা থাকত। আর তিনটি তীর ছিল এমন, যাতে কিছু লেখা হতো না।

এরপর দশটি তীর একটি থলিতে রাখা হতো। তারপর একেক শরিকের জন্য একেকটি তীর বের করা হতো। উপর্যুক্ত বিশেষ ৭টি তীর যারা পেত তারা তিরে নির্দেশিত গোশত লাভ করত। পক্ষান্তরে যারা বিশেষ ৩টি তীর পেত, যাতে কিছুই লেখা থাকত না, তারা গোশত লাভ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হতো। শুধু তাই নয়, তাদেরকে তখন পুরো উটের মূল্য দিতে হতো।[১]

উক্ত পদ্ধতিই ছিল আরবের জাহেলী যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাইসির।[২]

১. ১. ২. নিজের ওপর ও পরিবারের ওপর মাইসির করা

আরেকটি পদ্ধতি ছিল, উট বা পশু ছাড়া অন্য কিছুর ওপর। এমনকি কখনো সেটা নিজ নফস, স্ত্রী, সন্তানদের ওপর পর্যন্ত মাইসির করা

---

১ তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ., খ. ৩, পৃ. ২২৬, ৩১। এ পদ্ধতিকেই কুরআনুল কারীমে 'ইসতিকসাম বিল আযলাম' বলা হয়েছে। (সূরা মায়েদা : ০৩)। অন্যত্র শুধু 'আযলাম' বলা হয়েছে। (সূরা মায়েদা : ৯১) 'ইসতিকসাম' শব্দের অর্থ হলো, নিজের ভাগ্যে বা ভাগে কী আছে তা জানা। আর 'আযলাম' শব্দের এক বচন 'যালামুন'। অর্থ : এ কাজের জন্য তৈরি বিশেষ তীর'। এর আরেকটি ব্যাখ্যা এটিও আছে যে, ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য উক্ত তীরগুলো ব্যবহার করা হতো। কেউ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করত বা বিশেষ কোনো কাজের ইচ্ছা করত তখন কাবার খাদেমের কাছে আসত। তাকে তৎকালীন একশ মুদ্রা নাযরানা দিত। এরপর উক্ত তীরগুলো দিয়ে নিজের ভাগ্য যাচাই করে নিত। তীরগুলোতে কোনোটাতে লেখা থাকত 'হ্যাঁ', কোনোটাতে 'না'। যদি 'হ্যাঁ' তীর বের হতো তা হলে কাজটি করত। নতুবা সেই নিয়ত বা ইচ্ছা থেকে ফিরে যেত।—তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ., খ. ৩, পৃ. ৩১, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ২১, বায়ানুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৮

২ মাআলিমুত তানযীল, খ. ১, পৃ. ১৯৩

হতো। যেমন, যে হারবে সে বিজয়ীর গোলাম হয়ে যাবে। অথবা তার স্ত্রী বিজয়ী ব্যক্তির হয়ে যাবে।[১]

১. ১. ৩. ঘোড় দৌড়

আরেকটি রেওয়াজ ছিল, ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা। দুইজন লোক ঘোড়ার রেইস লাগাত। পরস্পরে চুক্তি হত, যার ঘোড়া হারবে সে অপর পক্ষকে এত টাকা দিতে হবে।[২]

এ হলো জাহেলী যুগে প্রচলিত কিমারের কিছু প্রচলন। তৎকালীন সময়ে এসব পদ্ধতির শুধু ব্যাপক প্রচলনই ছিল না; বরং এগুলোকে সম্মান, মর্যাদার প্রতীক মনে করা হতো। এ নিয়ে গর্ব করা হতো। এমনকি যারা উটের কিমারে বিজয়ী হতো, তারা তাদের প্রাপ্ত গোশত নিজেরা না খেয়ে গরিবদেরকে দান করে দিত।[৩]

১. ২. কুরআনুল কারীমে কিমার নিষিদ্ধতার ক্রমবিকাশ

জাহেলী যুগে কিছু কিছু অপরাধ ছিল এমন যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল। এসব অপরাধকে ইসলাম প্রথমেই এক কথায় নিষেধ করে দেয়নি; বরং ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে নিষেধ করা হয়েছে। যেন মানা সহজ হয়।

এটি ইসলামের বিধান আরোপের একটি অতি সুন্দরতম দিক। মদের নিষিদ্ধতায় (কারো মতে রিবার নিষিদ্ধতায়ও এমনটি করা হয়েছে) এ নীতি অনুসৃত হয়েছে। তদ্রূপ কিমারের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। মক্কী জীবনে কিমার নিষিদ্ধ করা হয়নি। এজন্যই দেখা যায়, হিজরতের আগে একটি ঘটনায় হযরত আবু বকর রা. বাজি ধরেছিলেন। ঘটনাটি ছিল—

সূরা রূমের সূচনার আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, বছর

---

১ তাফসীরে তাবারী, খ. ৪, পৃ. ৩২৪, আল কিমার ওয়া আহকামুহু, পৃ. ২২

২ সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন ফিল মুহাল্লিল।

৩ তাফসীরে কাবীর, রাযী, খ. ২, পৃ. ২৩১

কয়েকের মধ্যেই রোমানবাসীরা ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। আর সেদিন মুমিনরা আল্লাহ তাআলার সাহায্য পেয়ে আনন্দিত হবে।

আয়াতটি এমন সময় নাযিল হয়েছিল যখন রোমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের জয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাই মক্কার মুশরিকরা এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে হেসে উড়িয়ে দিল।

এমনকি উবাই ইবনে খালফ নামক এক কাফের নেতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর সাথে বাজি ধরে বসল। আগামী নয় বছরের ভেতর যদি রোমানরা ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে তবে সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে একশত উট দিবে। আর যদি এ সময়ের মধ্যে তারা জয়লাভ করতে না পারে, তবে হযরত আবু বকর রা. তাকে একশ উট দিবে।

এরপর ঠিক সাত বছরের সময় রোমানরা ইরানী বাহিনীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল। আর এ সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছায় তখন একদিকে মুসলমানরা বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের খুশিতে উৎফুল্ল ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল রোমানদের বিজয় সংবাদ, যা কুরআনে অনেক আগেই বলা হয়েছিল। এতে মুসলিমরা দ্বিগুণ আনন্দিত হলো।

আর এদিকে আবু বকর রা.-এর সাথে যে বাজি ধরেছিল উবাই ইবনে খালফ সেও বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। কিন্তু তার ছেলেরা কথা রেখেছিল। বাজির একশ উট তারা হযরত আবু বকর রা.-কে আদায় করে দিয়েছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতেন। তবে তখনো যেহেতু কিমার নিষিদ্ধ করা হয়নি তাই বারণ করেননি। কিন্তু ৭ বছর পর যখন উটগুলো আদায় করা হয় ততদিনে কিমারের নিষিদ্ধতা এসে গেছে, তাই নবীজি সেগুলো সদকা করে দিতে বললেন। হযরত আবু বকর রা. সেগুলো সদকা করে দিলেন।[১]

উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেল, মক্কী জীবনে কিমার নিষিদ্ধ হয়নি। বরং

---

১ অবলম্বনে জামে তিরমিযী, ৩১৯৩। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদীসের সনদ হাসান সহিহ। এ ছাড়া তাওযীহুল কুরআন, সূরা রূম দ্র.।

মাদানী জীবনে নিষেধ হয়েছে। তাও অন্তত দুটি ধাপে। নিম্নে ধাপ দুটি আলোচনা করা হলো।

১. ২. ১. ধাপ ১ : কিমারের মন্দ দিক তুলে ধরা ও বর্জনের পরামর্শ

- প্রথম ধাপে মদ ও কিমারকে সরাসরি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি। কেবল তার মন্দ দিকটি তুলে ধরা হয়। এ ধাপটি নিম্নোক্ত আয়াতে মদিনায় ঘোষিত হয়েছে—

  يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

  'লোকেরা তোমার নিকট মদ ও মাইসির (জুয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, দুটির মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। তবে উপকারের চেয়েও পাপ অধিক।'[১]

  এজন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেকেই মদ্যপান ও কিমার ছেড়ে দিয়েছিল। যদিও স্পষ্টভাবে নিষেধ বা হারাম করা হয়নি, তদুপরি এ দুটির ক্ষতির পরিমাণ তো অধিক।[২]

- এ আয়াতটি হলো মদ ও কিমার বিষয়ক সর্বপ্রথম আয়াত। উক্ত আয়াতে মদ ও কিমারকে সরাসরি 'পাপ' বলা ও নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, এ দুটির মাধ্যমে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। কারণ মদ্যপানে বিবেক বুদ্ধি স্বাভাবিক থাকে না। এতে পাপ করা সহজ হয়ে যায়। কিমার মানুষকে সম্পদের প্রতি লোভ বৃদ্ধি করে দেয়, যা বহু পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

  সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা মদ ও কিমারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেকেই মদ্যপান ও কিমার ছেড়ে দিয়েছিল। যদিও স্পষ্টভাবে তখনো নিষেধ বা হারাম করা হয়নি। আর কতক বলেছিলেন, যেহেতু এখনো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়নি তাই আরো কিছু দিন যথাসম্ভব এর

---

১ সূরা বাকারা : ২১৯

২ বায়ানুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৪২

ক্ষতিকর দিক কমিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।[১]

- উক্ত আয়াতে 'উপকার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উপকার। মদের ব্যবসার আর্থিক ফায়দা। জুয়ার আর্থিক ফায়দা।[২]

১. ২. ২. ধাপ ২ : স্পষ্ট নিষেধ

দ্বিতীয় ধাপে কিমারকে স্পষ্টভাষায় হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

'হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, লটারির তীর এসবই ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমারদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[৩]

- উক্ত আয়াতে মাইসির মানে কিমার। পূর্বে তা বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে।
- 'আনসাব' শব্দটি বহুবচন। একবচন, 'নুসুবুন' (نُصُبٌ)। এমন বস্তু যা পূজার জন্য নির্ধারিত। যেমন, মূর্তি, পাথর, বৃক্ষ ইত্যাদি। জাহেলী যুগে কাবার পাশে পূজার জন্য একটি পাথর রাখা হয়েছিল। জাহেলী যুগে এর পূজা করা হত। এর কাছে পাথরের জন্য বিভিন্ন প্রাণীকে কুরবানি করা হত। একে ইবাদত মনে করা হত। সূরা

---

১ বায়ানুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ১৪২

২ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৫৭

৩ সূরা মায়েদা : ৯০

মায়েদার ৩ নং আয়াতে এসব প্রাণী হারাম করা হয়েছে। আর উক্ত আয়াতে স্বয়ং পূজার বেদীকেই নিষেধ করা হয়েছে।

- 'আযলাম'-এটি জাহেলী যুগে প্রচলিত মাইসিরের একটি বিশেষ প্রকার। 'জুয়ার তির' শিরোনামে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।
- 'রিজসুন' বলা হয় এমন মারাত্মক ঘৃণ্য ও নোংরা বস্তুকে যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। উদ্দেশ্য হলো, এ চারটি বস্তু (মদ, জুয়া, মূর্তির বেদী ও লটারির তির) এমন ঘৃণ্য ও খারাব যে, সামান্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে।
- উক্ত আয়াতে নিষিদ্ধ চারটি বস্তুর মধ্যে মূল উদ্দেশ্য হলো দুটি। যথা—মদ ও মাইসির। এ দুটিকেই চূড়ান্তরূপে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। বাকি দুটির মধ্যে একটি হলো, 'আযলাম' এটি মূলত 'মাইসির'-এর অন্তর্ভুক্ত। মূলত 'মাইসিরের' একটি বিশেষ প্রকার 'আযলাম'। আর সাথে 'আনসাব' উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদ ও মাইসির নিষিদ্ধতার দৃঢ়তা বোঝানো যে, এ দুটি অপরাধ এমন জঘন্য যে, তা ঘৃণ্য পূজা ও এর বেদীর আলোচনার সাথে উল্লেখ করার মত।[১]
- উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাষায় কিমারকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

১. ৩. কিমারের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহতা

১. ৩. ১. কুরআনুল কারীম থেকে

পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আমরা কিমারের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জেনেছি। উক্ত আয়াতে কিমারকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, প্রথমত আয়াতটি শুরু হয়েছে 'ইন্নামা' দ্বারা, যা আরবী ভাষায় বিশেষ গুরুত্ব বোঝায়। দ্বিতীয়ত, একে 'রিজসুন' বা ঘৃণ্য বস্তু বলা

১ বায়ানুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৭১

হয়েছে। তৃতীয়ত, একে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। চতুর্থত, একে মূর্তি পূজার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে—ঘৃণ্য হওয়ার দিক থেকে এগুলো একই কাতারের। সর্বশেষ বলা হয়েছে 'তোমরা তা পরিহার করো।' এখানেই শেষ নয়, এরপর এর দুনিয়াবি ক্ষতির দিকও বলা হয়েছে যে, এটি এমন যা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে।

১. ৩. ২. সহিহ হাদীস থেকে

হাদীসে কিমার পরিহার করাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু কিমারযুক্ত লেনদেনকেই হারাম করা হয়নি; বরং কিমারের শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করাকেই গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১] আর কেউ যদি কাউকে কিমারের দিকে শুধু দাওয়াত দেয়, তবে তাকে আদেশ করা হয়েছে, শুধু এই দাওয়াতের কারণে গুনাহের কাফফারা হিসাবে কিছু সদকা করতে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.

'যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ডেকে বলে, আসো, তোমার সাথে কিমারের মুআমালা করব। তাহলে আহ্বানকারীর উচিত, উক্ত গুনাহের কারণে কিছু সদকা করা।'[২]

মোটকথা, উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে কিমারের নিষিদ্ধতা ও ভয়াবহতা স্পষ্ট। ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. লিখেছেন—

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار.

'জ্ঞানীদের মাঝে কিমার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত নেই।'[৩]

১ ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল, খ. ৩, পৃ. ৩৫৪

২ সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৬০

৩ আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩২৯

১. ৪. কিমারের পারিভাষিক পরিচিতি

ফকীহগণ বিভিন্নভাবে কিমারের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

ইসলামী ফিকহে কিমার বলতে বোঝায়, অনিশ্চিত কোনো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এভাবে টাকা লাগানো যে, হয় তা বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে আসবে। নতুবা ওই টাকা হারাবে। ফকীহগণের নিকট এর প্রসিদ্ধ পরিচিতি হলো—

تعليق التمليك بالخطر و المال من الجانبين.

'কোনো কিছুর মালিক হওয়াকে অনিশ্চিত কিছুর ওপর শর্তযুক্ত করে দেওয়া। আর উভয় পক্ষ আগেই অর্থ প্রদান করা।'

১. ৪. ১. ইমাম জাস্‌সাস রহ. কর্তৃক সংজ্ঞা

তিনি এর পরিচিতি পেশ করেছেন এভাবে,

حقيقته أي الميسر تمليك المال على المخاطرة.

'মাইসিরের মূল কথা হলো, কোনো সম্পদের মালিকানা অর্জনকে অনিশ্চিত কিছুর (Risk) সাথে সম্পৃক্ত করা। যাতে লাভ হতে পারে, নাও হতে পারে।'[১]

'আল মুখাতারাহ' বলা হয়, এমন লেনদেন, যা লাভ-লোকসানের মাঝামাঝিতে থাকে। অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে যে অনেক লাভ হবে, আবার এও সম্ভাবনা আছে যে, পুরোই লস হবে। যেমনটি আজকাল লটারিতে পাওয়া যায়।[২]

১. ৪. ২. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.কৃত সংজ্ঞা

তিনি লিখেছেন—

حاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة اه.

---

১ আহকামুল কুরআন, খ. ২ ,পৃ. ৪৬৫

২ মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ., খ. ১, পৃ. ৫৩২

‘কিমারের সারকথা হলো, লাভ-লোকসানের অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে কোনো কিছুর মালিকানা অর্জন করা।’[১]

১. ৪. ৩. আল্লামা মাওয়ারদী রহ.কর্তৃক সংজ্ঞা

তিনি লিখেছেন—

معنى القمار وهو: الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى اهـ

‘কিমার হলো, যে এতে প্রবেশ করবে সে হয়ত সম্পদ পেয়ে লাভবান হবে, নতুবা সম্পদ অপর পক্ষকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’[২]

১. ৪. ৪. মুফতি শফী রহ. কর্তৃক কিমারের পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ পরিচিতি

বিচারপতি শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ ‘সুপ্রিম কোর্ট অব পাকিস্তানের’ শরীয়াহ্ এফিলিয়েট বেঞ্চের লটারি বিষয়ক এক লিখিত ফায়সালায় বলেছেন, উর্দূ ভাষায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে কিমারের পরিচিতি পেশ করেছেন মুফতি শফী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে*। তিনি তাতে লিখেছেন :

‘যে কোনো লেনদেন বা কারবারে কেউ কোনো কিছুর মালিক হওয়াটাকে এমন শর্তের ওপর কিংবা এমন বিষয়ের ওপর মওকুফ রাখা, যা হওয়া না হওয়া দুটিই বরাবর। আর এরই ভিত্তিতে লেনদেনের উভয়পক্ষ হয় কখনো লাভবান হবে, কিংবা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই লাভ-লসের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ বরাবর। উদাহরণস্বরূপ এরও সম্ভাবনা আছে যে, লস যায়েদ বহন করবে।

আবার এরও সম্ভাবনা আছে যে, অপর পক্ষ তথা খালেদ লস বহন

১ রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৪০৩ (সাঈদ)

২ আল কিমার ওয়া আহকামুহু, পৃ. ১০১, ৬৫। আরো দেখুন, আহকামুল কুরআন, থানবী রহ. খ. ১,পৃ. ৩৯৩

করবে। এর যত প্রকার পূর্ববর্তী যামানায় প্রচলিত ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হবে সবই মাইসির, কিমার ও জুয়া।'[১]

১. ৪. ৫. বিচারপতি মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ কর্তৃক কিমারের পরিচিতি

বিচারপতি মুফতি তাকী উসমানী সাহেব তাঁর পূর্বোক্ত ফায়সালার ১৬ নং ধারায় লিখেছেন, যদি আমরা কিমারের যাবতীয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে আইনের পরিমিত শব্দে এর সংজ্ঞা পেশ করতে চাই তাহলে তা হবে এ রকম—

'কিমার একাধিক লোকদের মধ্যে সংঘটিত এমন একটি লেনদেনের নাম, যাতে প্রত্যেকেই এক অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের সম্পদ (হয় শুরুতেই আদায় করবে অথবা আদায়ের ওয়াদা করবে) এভাবে লাগায় যে, হতে পারে এই সম্পদ কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া অন্যের হয়ে যাবে অথবা অন্যের সম্পদ কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া নিজের হয়ে যাবে।'[২]

সারকথা

ওপরের আলোচনা থেকে যা প্রতিভাত হয় তা হলো,

১. কিমার একটি 'আকদুল মুআওযা' বা বিনিময়মূলক চুক্তি।

২. এতে অংশগ্রহণকারী অন্যের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের সম্পদকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দিবে। এ সম্পদ হয় শুরুতেই দিয়ে দিবে বা পরে দেওয়ার ওয়াদা করবে। (উদাহরণ আসছে)

৩. এতে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ প্রাপ্তির বিষয়টি অনিশ্চিত থাকবে।

৪. এতে অংশগ্রহণকারী হয় বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে বিনিময়হীন অনেক বেশি লাভ করবে, না হয় নিজের সম্পদ পুরোটাই কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া খোয়া যাবে।

---

১ মাআরেফুল কুরআন, ১ : ৫৩২

২ ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮

১. ৫. কিমারের মৌলিক উপাদান

বর্তমান ইসলামী বিশ্বের অন্যতম ইসলামিক স্কলার, আধুনিক ইসলামী অর্থনীতির Pioneer বলে খ্যাত, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের শরীয়াহ আপিলেট বেঞ্চের সাবেক বিচারপতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ, শরীয়াহ এফিলিয়েট বেঞ্চের লটারিবিষয়ক এক লিখিত ফায়সালায়, ধারা ১০-এ লিখেছেন—'কিমারের সকল সংজ্ঞা ও ধরন-প্রকার সামনে রাখলে এটি স্পষ্ট হয় যে, কিমারের মৌলিক উপাদান (Necessary Ingredients) মোট ৪টি। যথা—

১. কিমার মূলত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংগঠিত একটি মুআমালা বা বিনিময়মূলক চুক্তি। (Transaction)

২. উক্ত লেনদেনে একজন অপরজনের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের কিছু সম্পদ অনিশ্চিয়তার মুখে ফেলে দেওয়া।

৩. কিমারের মধ্যে অন্যের যে সম্পদটা হাতিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, সেটা অর্জন হওয়াটা এমন অনিশ্চিত ও নিজ ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যা বাস্তবে হওয়া না হওয়া দুটিই দিকই বরাবর।

৪. উক্ত লেনদেনে যে সম্পদটা রিস্কের ওপর পেশ করা হয়, তা হয়তো কোনো বিনিময় ছাড়া অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। অথবা অন্যের সম্পদ কোনো বিনিময় ছাড়া নিজের হয়ে যাবে।

যেকোনো লেনদেনে উক্ত চার উপাদান পাওয়া গেলে সেটা নিষিদ্ধ কিমার বলে গণ্য হবে এবং হারাম হবে।[1]

১. ৬. কিমারের প্রকার

কিমারের অনেক ধরন ও প্রকার হতে পারে। তবে এর তিনটি প্রকার গুরুত্বপূর্ণ। যথা :

১. কিমারের উল্লেখযোগ্য একটি প্রকার হলো, লেনদেনের প্রারম্ভে কোনো পক্ষ কোনো সম্পদ বা টাকা আদায় করে না; বরং প্রত্যেকেই একে অপরকে দেওয়াটা এমন বিষয়ের ওপর মওকুফ রাখা হয়, যা

---

১ ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী মাসায়েল ৩/৩৫৬; বুহুস ২/১৫৭

হওয়া না হওয়া বরাবর। যেমন, দুই প্রতিযোগী এভাবে চুক্তি করল যে, যে হারবে সে অপরপক্ষকে এত টাকা দেবে। এটি হারাম।

ইমাম মালেক রহ. উক্ত উপাদানের একটি চুক্তির ব্যাপারে বলেছেন, এটি সবচেয়ে বড় কিমার।[1]

তদ্রূপ অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর অর্থ প্রদানের যেসব শর্ত করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যায়েদ উমরকে বলল, অমুক খেলায় কামাল যদি জিতে যায়, তাহলে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। আর যদি রাশেদ জিতে যায়, তাহলে তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দেবে। এটিও উক্ত প্রকার কিমারের অন্তর্ভুক্ত।

মনে রাখতে হবে, অর্থ প্রদানের শর্তারোপ যদি একপক্ষীয় হয়, তবে সেটা কিমার হবে না।

২. লেনদেনের শুরুতে একপক্ষ সম্পদ ব্যয় করাটা নিশ্চিত। তবে অপরপক্ষের সম্পদ ব্যয়টা নির্ভর করে এমন বিষয়ের ওপর—যা ঘটা বা না-ঘটা উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। যে ব্যয় করল, সে আশায় থাকে, হয় তা বিনিময়হীন বহু সম্পদ নিয়ে আসবে। নতুবা গচ্ছা যাবে।

   এর উদাহরণ হলো, Casino জুয়ার ঘর বা ক্লাব। ফি দিয়ে ঢুকতে হয়। তবে এর বিপরীতে সম্পদপ্রাপ্তি অনিশ্চিত। তদ্রূপ লটারির কুপন বিক্রি।

৩. লেনদেনের শুরুতেই উভয় পক্ষ অর্থ ব্যয় করে। এরপর কোনোও একজন সেটা পুরোপুরি পেয়ে যায়। এটিও হারাম।[2]

আশা করি, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে কিমারের মূল বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এবার কিমারের উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেকটির কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

---

১ আল মুদাউওয়ানাতুল কুবরা, ৩/২৫৪

২ ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খ. ৫, পৃ. ৩৭৫

১. ৭. কিমারের প্রচলিত কিছু উদাহরণ

১. ৭. ১. কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু আধুনিক লেনদেন

১. ৭. ১. ১. বাচ্চাদের খেলা

অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা শিশার গুলি দিয়ে খেলা করে। তাদের মাঝে চুক্তি হয় এভাবে যে, খেলায় যে বিজয়ী হবে সে অপরপক্ষ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ গুলি নিয়ে নেবে। আর হারলে উল্টো সে নির্ধারিত পরিমাণ গুলি তাকে দেবে। এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. থেকে আসার উল্লেখ হয়েছে যে, বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও মাইসির।[১]

১. ৭. ১. ২. ঘুড়ি কাটা

গ্রাম ও শহরে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। চুক্তি হয়, একজন অপরজনের ঘুড়ি কাটতে পারলে যারটা কাটা যাবে সে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা যে কাটল তাকে দিয়ে দেবে। এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।[২]

১. ৭. ১. ৩. ভিডিও গেম

বর্তমানে ভিডিও গেম, কেরাম বোর্ড ইত্যাদি খেলায় এ ধরনের চুক্তি পরিলক্ষিত হয় যে, যে হেরে যাবে সে অপরপক্ষকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে। এ শর্তারোপের কারণে এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোথাও এ প্রচলনও আছে যে, মূল চুক্তিটি হয় ভিডিও গেম ব্যবসায়ী বা দোকানদারের সাথে। এটি তিন ভাবে হয়ে থাকে। যথা :

১. যারাই গেম খেলবে চাই সে হেরে যাক বা বিজয়ী হোক, সকলেই দোকানদারকে নির্ধারিত ফি দিতে হবে।

---

১ জাওয়াহিরুল ফিকহ, খ. ৪, পৃ. ৫৬৬

২ প্রাগুক্ত।

২. যে হারবে কেবল সেই উভয়ের নির্ধারিত ফি শোধ করবে।

৩. কখনো দুজন গেম খেলোয়াড়ের মধ্যে চুক্তি হয় যে, যে হারবে সে পুরো ফি শোধ করবে, সাথে সাথে বিজয়ীকেও নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে।

উক্ত তিনটি সুরতের মাঝে প্রথম সুরতটি কিমার নয়। এটি মূলত গেম মেশিন ব্যবহারের ভাড়া প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সুরতটি কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিজয়ীর ফি পরিশোধ করাটা কিমার। তদ্রূপ তৃতীয় সুরতটিও কিমার।[1]

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সুরত কিমার নয়। এর অর্থ এ নয়, এসব খেলা বৈধ। কারণ কিমার না হলেও এসব খেলায় সময় নষ্টের মতো পাপ আছে। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরি।

১. ৭. ১. ৪. ষাঁড়ের লড়াইয়ে বাজি ধরা

এ ধরনের খেলা তো এমনিতেই অবৈধ। এর ওপর এর সাথে যুক্ত হয় মাইসির। আগেই চুক্তি হয় যার ষাড় হারবে সে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিতে হবে।

আবার একে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষও বাজি ধরে। যার কাছে মনে হয় যে ষাড়টি বিজয়ী হবে, সে এর ওপর বাজি ধরে। যেমন, নির্দিষ্ট একটি ষাড়ের ওপর দুই হাজার টাকা বাজি ধরা হলো। যদি এটি জিতে যায় তাহলে বাজির দিগুণ অর্থ তথা চার হাজার টাকা লাভ হবে। আর হেরে গেলে দুই হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে। এটিও কিমারের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

১. ৭. ২. কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু আধুনিক লেনদেন

মূলত বর্তমান সময়ে কিমারের অধিকাংশ সুরতই কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে প্রথমেই এক পক্ষ অর্থ প্রদান করা নিশ্চিত।

---

১ মালি মুআমালাত পর গারার কি আসারাত, ড. ইজায আহমদ সামদানী, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

অপরদিকে অপরপক্ষের অর্থ প্রদান থাকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এর কিছু প্রসিদ্ধ প্র্যাক্টিস নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. ৭. ২. ১. লটারি (Lottery) ও কিমার

'লটারি' একটি বিশেষ স্কীমের নাম, যার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের থেকে কতককে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পুরস্কৃত করা হয়। সাধারণত এতে অংশগ্রহণের জন্য প্রথমে টাকা দিয়ে বিশেষ কুপন বা টিকিট ক্রয় করতে হয়। এরপর লটারির মাধ্যমে কতককে পুরস্কৃত করা হয়। আর বাকিরা বঞ্চিত হয়। Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে মধ্যে এর অর্থ লেখা হয়েছে—

A way of raising money for a government, charity, etc. by selling tickets that have different numbers on them that people have chosen. Nembers are then chosen by chance and the people who have those numbers on there tickets win prizes.

অর্থাৎ 'লটারি' হলো, সরকার, সেবা সংস্থা বা অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এটি হয়ে থাকে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে। টিকিটগুলোতে বিশেষ বিভিন্ন নাম্বার দেওয়া থাকে। লোকজন যেকোনো টিকিট নিতে পারে। ভাগ্যক্রমে যাদের হাতে সেই বিশেষ নাম্বার থাকবে সেই মূলত পুরস্কার লাভ করে থাকে।[১]

সারকথা, লটারিতে মোট তিনটি স্তর হয়ে থাকে। যথা :

১. প্রথমে একটি অনিশ্চিত অর্থ বা পুরস্কার লাভের জন্য কিছু লোক টিকিট বা কুপন ক্রয় করে।

২. প্রতিটি টিকিটে নাম্বার দেওয়া থাকে। এর মধ্যে কিছু নাম্বার থাকে বিশেষ নাম্বার (Winning Numbers), যার ওপর ভিত্তি করে পুরস্কৃত করা হয়।

৩. লটারি বা অন্য কোনো উপায়ে বের করা হয় কারা সেই বিশেষ

---

১ ৮তম সংস্করণ, পৃ. ৯১৫

নাম্বার (Winning Numbers) লাভ করেছে। এরপর শুধু তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। বাকিরা বঞ্চিত হয়। উক্ত লটারির বিভিন্ন ব্যবহার আমাদের সমাজে আছে।

লটারির এসব সুরত কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

তদ্রূপ বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ঘোষণা দেওয়া হয়, যারা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন তাদেরকে লটারির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে। উত্তর পাঠানোর সময় অবশ্যই একটি নির্ধারিত ফি পাঠাতে হবে। এরপর সেই টাকা থেকে কতককে পুরস্কৃত করা হয়। এটিও কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি উত্তরদাতাদের থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ না করা হয়, আয়োজক কর্তৃপক্ষ নিজ থেকে পুরস্কার প্রদান করে, তবে সেটা কিমার হবে না।

তেমনিভাবে যদি শুধু কুপন বা প্রশ্নপত্রের বাস্তবভিত্তিক খরচ নেওয়া হয়, এর অধিক গ্রহণ না করা হয়, উদ্দেশ্য হয় বৈধ জ্ঞানচর্চা, তবে এতেও অসুবিধা নেই। সেক্ষেত্রে পুরস্কার ব্যয় বহন করবে তৃতীয় পক্ষ।

প্রকাশ থাকে যে, লটারি যদি কেবল সম্পদ বণ্টনের জন্য করা হয়, যেমন, একটি জমি দুজনের যৌথ মালিকানাধীন। জমির কোন পাশ কে নিবে সেটা নির্বাচনের জন্য লটারি করা উদ্দেশ্য। এটি বৈধ।

তদ্রূপ আগে যদি অংশগ্রহণকারীদের থেকে কোনোরূপ অর্থ না নেওয়া হয়, বরং উদ্দেশ্য থাকে তাদের কতককে লটারির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা, তবে এটিও বৈধ। তবে সাধারণত লটারি বলতে সেটাই বোঝানো হয় যেখানে অংশগ্রহণকারীদের থেকে আগে টাকা নেওয়া হয়। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ৭. ২. ২. ফরেক্স ও কিমার

'ফরেক্স' শব্দটি ইংরেজি (Forex)। এর পূর্ণরূপ হলো, Foreign currency Exchange। সংক্ষেপে Forex ev FX অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়। শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাপকভাবে যেকোনো বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনই মূলত ফরেক্স।

তবে বর্তমানে ফরেক্স বলতে বিশেষ ধরনের কারেন্সি ব্যবসাকে বোঝানো হয়। এ লেনদেনে কেবল দুটি কারেন্সির মূল্যের উঠানামার

পার্থক্য (মার্জিন) আদান প্রদান হয়। মূল চুক্তি হয় কারেন্সি রেইটের ওপর। কারেন্সির ওপর নয়।

এটি করা হয় সম্পূর্ণ অনলাইনে। এর জন্য রয়েছে বিশেষ অনলাইন ট্রেড টার্মিনাল। শেয়ার বাজারের মতো এখানেও দুটি পক্ষ থাকে। যথা : ব্রোকার ও ট্রেডার বা গ্রাহক।

একজন গ্রাহককে শুরুতেই তার ব্রোকারের নিকট রিয়েল ডলার ডিপোজিট করতে হয়। এরপর বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইন টার্মিনালে প্রদর্শিত বিভিন্ন কারেন্সি পেয়ারের রেইটের ওপর Betting করা হয়। অনলাইনে টার্মিনালে কারেন্সি প্রকাশ হয় পেয়ার আকারে। যেমন : EUR/USD।

প্রতিটি জোড়া মুদ্রার রেইট একে অপরের সাথে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। যেমন, EUR/USD নিয়ে ট্রেড করলে মুদ্রার রেইট ক্রয়-বিক্রয় হবে EUR I USD এর মধ্যে। উক্ত ক্রয়-বিক্রয় কেবলই একটি কম্পিউটার ইনপুট। মূল আকর্ষণ হলো উক্ত কারেন্সি পেয়ারের রেইট বৃদ্ধি ও হ্রাস। আপনি যে রেইটের ওপর বাই (Buy) করলেন, সেটা যদি ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হয় তাহলে ব্রোকার তার কমিশন রেখে ট্রেডারকে মার্জিন প্রদান করবে। পক্ষান্তরে রেইট পড়ে গেলে ট্রেডারের ডিপোজিট থেকে ওই পরিমাণ মার্জিন মাইনাস হবে।

দেখা যাচ্ছে, উক্ত লেনদেনে এক পক্ষের (ট্রেডার) অর্থ প্রদান শুরুতেই নিশ্চিত। এরপর এর ওপর ভিত্তি করে অধিক অর্থপ্রাপ্তি বা লস নির্ভর করে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটি বিষয়ের ওপর। এটিই কিমার। কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

ড. সামীর আব্দুল হামীদ রিদওয়ান, 'ইসলামী অর্থনীতি বিশ্বকোষের' ১১নং ভলিয়মে 'কারেন্সি মার্কেট' প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন, 'লেনদেন ও চুক্তির উদ্দেশ্য যখন হয় কারেন্সির মূল্য উঠানামা থেকে লাভবান হওয়া, তখন সেটা কিমারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, কখনো লাভ হবে, কখনো হবে না।'[১]

---

১ সার সংক্ষেপ, দেখুন, ভলিয়ম ১১, পৃ. ৪৬২

১. ৭. ২. ৩. বীমা ও কিমার

বীমা দু ধরনের হয়ে থাকে। যথা : জীবনবীমা ও সম্পত্তি-বীমা। জীবনবীমার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বক্তব্য অনুযায়ী কিমার আছে। এটিও কিমারের দ্বিতীয় প্রকার।

তদ্রূপ সম্পত্তি বীমায় প্রথম থেকেই নির্ধারিত প্রিমিয়াম আদায় করে যেতে হয়। ভবিষ্যতে কখনো সম্পত্তি ধ্বংস হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থ পাওয়া যাবে। সেটা কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। আবার কখনো কিছুই পাওয়া যাবে না। এটিও কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

১. ৭. ২. ৪. পণ্য ক্রয়ের ওপর পুরস্কার প্রদান

ঈদের সময় বিভিন্ন শপিংমলে পণ্য ক্রয়ের ওপর একটি কুপন দেওয়া হয়। এরপর নির্ধারিত কোনো দিনে ড্র হয়। যারা বিজয়ী হয় তারা বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার পেয়ে থাকে। এমন পুরস্কার গ্রহণ শর্তসাপেক্ষে বৈধ। শর্তগুলো হলো :

১. পণ্য বাজারমূল্যে ক্রয় করা হবে। লটারির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না। অন্যথায় তা কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

২. ক্রেতার উদ্দেশ্য হবে পণ্য। লটারি নয়।[১]

৩. অচল বা নিম্ন মানের পণ্যকে চালিয়ে দেওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।[২]

তদ্রূপ কোনো কোনো পণ্যে গোপন নাম্বার দেওয়া থাকে। সেই গোপন নাম্বারটি যদি কোম্পানির নির্ধারিত নাম্বারের সাথে মিলে যায় তাহলে

---

১ মুফতি ইহসানুল্লাহ শায়েক সাহেব উক্ত শর্তারোপ জরুরি মনে করেন না। মূল লক্ষ্য কুপন অর্জন করা হলেও এক্ষেত্রে তা কিমার বা রিবা কিছুই হবে না বলে মনে করেন। ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া গ্রন্থে এক্ষেত্রে সমাধান দেওয়া হয়েছে এভাবে—যারা এ শর্তকে জরুরি মনে করেন তাদের বক্তব্য সতর্কতামূলক। আর যারা এই শর্তকে জরুরি মনে করেন না, তাদের বক্তব্য রুখসত বা ছাড়ভিত্তিক। (ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৭৫)

২ উপরোক্ত তিনটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরা, উসমানী, (২/১৫৮) গ্রন্থে।

তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই প্রকারটি এক ধরনের লটারির মতোই। কেননা এই পুরস্কার বা বোনাস সবাই পায় না।

লটারির মাধ্যমে যেমন কিছু ক্রেতাকে নির্বাচন করা হয়, তেমনি এইভাবেও নির্বাচন করা হচ্ছে। এটিও উপরোল্লিখিত শর্তগুলো সাপেক্ষে বৈধ।

প্রকাশ থাকে যে, পণ্য বিপণন বা মার্কেটিং এর পন্থা হিসেবে পুরস্কারের ব্যবহার শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। পণ্যের গুণগত মান দ্বারা পণ্যের বিপণন ও চাহিদা সৃষ্টি করাই শরীয়তে কাম্য।

মাছ শিকার : এভাবে চুক্তি করা হল, লেক বা পুকুরে মাছ শিকারের জন্য নির্ধারিত ফি দিতে হবে। এরপর শিকারিদের মাঝে যে নির্ধারিত সাইজের বড় মাছ শিকার করতে সক্ষম হবে, তাকে সকল ফি দিয়ে দেওয়া হবে। অথবা সেই ফি দিয়ে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এটিও কিমারের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।[১]

১. ৭. ৩. কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছু আধুনিক লেনদেন

১. ৭. ৩. ১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিযোগী থেকে শুরুতেই একটি নির্ধারিত হারে চাঁদা ওঠানো হয়। এটিও কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এতে শুরুতেই প্রত্যেকের অর্থ ব্যয় নিশ্চিত।[২]

অবশ্য যদি শুধু ব্যবস্থাপনা-সম্পৃক্ত খরচ নেওয়া হয়, তবে এতে দোষ নেই। সেক্ষেত্রে পুরস্কার ব্যয় বহন করবে কর্তৃপক্ষ।

১. ৭. ৩. ২. খেলায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদান

অনেক সময় দেখা যায়, খেলায় বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। এ

---

১ ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬

২ বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা, খ. ২, পৃ. ১৫৬

পুরস্কার প্রদানের জন্য যারা খেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের সকল থেকে প্রথমেই চাঁদা নেওয়া হয়। এরপর উক্ত টাকা দিয়ে কেবল বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। এটিও কিমারের তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

১. ৮. কিমারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে কিমার নয়

আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু লেনদেন এমন, যা বাহ্যত মনে হয় কিমার, তবে বাস্তবে কিমার নয়। এখানে এমন কিছু লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. সমিতিতে বিশেষ পন্থায় চাঁদা প্রদান। ধরুন, একটি সমিতি। এর সদস্য দশজন। তারা চুক্তি করল, প্রত্যেকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে চাঁদা দেবে। মেয়াদ দশ মাস। প্রতি মাসে লটারি করে একজন পুরো টাকা নিয়ে নেবে। এর পরের মাসে পূর্বের মাসের বিজয়ী লটারিতে অংশগ্রহণ করবে না। তবে চাঁদা নিয়মিত দিয়ে যাবে। এভাবে দশ মাস পর্যন্ত তা চলবে। এরপর তা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে সুদ ও কিমার কোনো কিছুরই সম্পৃক্ততা নেই। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে :

- যে বিজয়ী হবে সে পরবর্তী সময়ে লটারিতে অংশগ্রহণ করবে না।
- পরবর্তী সময়ে নিয়মিত চাঁদা আদায় করতে হবে।
- সবাই বিজয়ী হলে এর সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে।

২. ক্রেডিট কার্ডে রিওয়ার্ডস প্রদান। কোনো কোনো ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী তাদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে। কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা টাকার পরিমাণের ভিত্তিতে সাধারণত এ পুরস্কারগুলো দেওয়া হয়।

ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, এটি বিশেষ কোনো কার্ডধারী নয়; বরং সকলেই পেয়ে থাকে। মূলত কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কার্ডের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য তাদের আয়ের কিছু অংশ কার্ড হোল্ডারদের পুরস্কার প্রদানের খাতে ব্যয় করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত পুরস্কার গ্রহণে বাধা নেই। তবে কার্ড ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য হতে হবে কেনাকাটা, পুরস্কার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাসআলা বলা উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন

ব্যাংকিং কার্ড নিয়ে 'ইসলামের অর্থব্যবস্থা'র তৃতীয় খণ্ডে ইনশাআল্লাহ স্বতন্ত্র আলোচনা হবে।

৩. পরীক্ষার ফি দিয়ে পুরস্কার প্রদান। কোথাও এটি এভাবে হয়ে থাকে যে, ছাত্রদের থেকে পরীক্ষা বাবদ ফি গ্রহণ করা হয়। এরপর এরই একটি অংশ দিয়ে মেধাবী ছাত্রদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এটি বৈধ। কারণ, পরীক্ষার ফি নেওয়া হয় মূলত পরীক্ষাসংক্রান্ত খরচ নির্বাহের জন্য। এটিই মূল। তাই এর মালিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রতিষ্ঠান চাইলে অন্যান্য খরচের মতো এ টাকা দিয়ে মেধাবী ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করতে পারে। এটি কিমার হবে না। এটি আর প্রচলিত কুইজ প্রতিযোগিতা এক নয়। কেননা, কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের থেকে সাধারণত ফর্মের ন্যায্যমূল্যের অতিরিক্ত নেওয়া হয়, যা ঠিক নয়। উক্ত অতিরিক্ত অর্থের মালিক কর্তৃপক্ষ হয় না। তাই এ দিয়ে পুরস্কার প্রদান করা এক ধরনের কিমার।[১] হ্যাঁ, যদি ফর্মের শুধু বাস্তব খরচ নেওয়া হয় এবং পুরস্কার আয়োজক কর্তৃপক্ষ নিজেরা ব্যবস্থা করে তাহলে তা অবৈধ হবে না। তদ্রূপ যদি এমন হয় নির্ধারিত বইয়ের ওপর প্রতিযোগিতা হবে। ওই বই আয়োজকদের কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে। তবে পুরস্কার দেওয়া হবে তৃতীয় কোনো পক্ষ (Sponsor Ship) থেকে। তাহলে এতেও অসুবিধা নেই।

৪. একাধিক লোকের মাঝে কোনো কিছুর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যে জিতবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এই পুরস্কার প্রদান করবে আয়োজক বা তৃতীয় পক্ষ। প্রতিযোগিদের থেকে শর্ত করে আদায়কৃত কোনো অর্থ দিয়ে নয়। এটি বৈধ।[২]

৫. এমন নিয়ম করা হলো যে, যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একজন বা একাধিকজনের কোনো কিছু দিতে হবে না। সে বিজয়ী হলে বাকি দুই পক্ষ থেকে নিধারিত অর্থ গ্রহণ করবে। তবে হেরে গেলে কিছু দিতে হবে না। বাকিদের মাঝে কোনো

---

১ মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল, ১৪

২ বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরা (২/১৫৫-১৫৬)। এক্ষেত্রে পুরস্কার দাতার পক্ষ থেকে হিবা বা তাবাররু বলে বিবেচিত হবে।

এক পক্ষ জিতে গেলে, সে অপর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অর্থ গ্রহণ করবে। এভাবে হয়ে থাকলে, তা বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো, তৃতীয় ব্যক্তি এমন হতে হবে, যার হার-জিত দুটিরই সম্ভাবনা থাকবে। যদি হেরে যাওয়া নিশ্চিত বা প্রায় নিশ্চিত হয়, তাহলে তখন এ পদ্ধতি বৈধ হবে না।

হাদীসে এসেছে,

> «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ»
>
> 'যে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় দুই প্রতিযোগী ঘোড়ার মাঝে তৃতীয় এমন একজন ঘোড়া প্রতিযোগী প্রবেশ করাবে, যে বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত নয়, তাহলে তা কিমার হবে না। তবে ওই তৃতীয় ঘোড়া প্রতিযোগী বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত হলে সেটি কিমার হয়ে যাবে।'[১]

ধরা যাক, যায়েদ, উমর ও রাশেদ দৌড় প্রতিযোগিতা করবে। উমর ও রাশেদ চুক্তি করল, যে হেরে যাবে, সে অপর পক্ষকে ৫০০ টাকা দিতে হবে। এটি বৈধ নয়। কিমারের প্রথম প্রকার। তবে একে বৈধ করার জন্য, তারা যায়েদকে এ শর্তে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিল যে, যায়েদ যদি সবার ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে সে উভয় থেকে ৫০০ টাকা পাবে। তবে হেরে গেলে কিছু দিতে হবে না। যায়েদ যদি এমন হয়, তার হার-জিত দুটিরই সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এমন চুক্তি বৈধ হবে। এটি কিমার হবে না। বরং বলতে পারেন কিমারের প্রথম প্রকারকে বৈধ করার জন্য এটি একটি বৈধ পদ্ধতি। উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি/পক্ষ (যায়েদ) কে ফিকহের ভাষায় 'মুহাল্লিল' (হালালকারী) বলা হয়। কারণ, তার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এ পদ্ধতি হালাল হয়ে যায়।

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, উক্ত পদ্ধতির সম্ভাব্য মোট ৪টি সুরত হতে পারে। যথা—

---

১ সুনানে আবু দাউদ, ২৪৬৯। উক্ত হাদীসের সনদের ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেছেন, قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب (আত তালখিসুল হাবীর, ৪/১৬৩)। আরো দেখুন, মুসনাদে আহমদ, সম্পাদনা, শায়খ শুআইব আরনাউত রহ., খ. ১৬, পৃ. ৩২৭)

ক. তৃতীয় ব্যক্তি বিজয়ী হবে। উক্ত উদাহরণে তখন সে ১০০০ টাকা পেয়ে যাবে।

খ. বাকি দুইজন তথা উমর ও রাশেদ থেকে কেউ বিজয়ী হলে, সে অপর থেকে ৫০০ টাকা পাবে। তৃতীয় ব্যক্তি কিছু দিতে হবে না। কিছু পাবেও না।

গ. উমর ও রাশেদ উভয়ে যায়েদ (তৃতীয় ব্যক্তি) থেকে সমানভাবে বিজয়ী হলে, তারা কিছুই পাবে না।

ঘ. তৃতীয় ব্যক্তি (যায়েদ) ও বাকি দুজনের একজন সমানভাবে বিজয়ী হলে, সেক্ষেত্রে ফকীহগণের মতভেদ আছে। ইবনে আবেদীন শামী রহ. এর মতে সেক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি কিছু পাবে না। কেবল বিজয়ী অপরজন পরাজিত থেকে নির্ধারিত অর্থ পাবে। অপরদিকে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেছেন, এ ক্ষেত্রে উভয় বিজয়ী পরাজিত থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত অর্থ সমান সমান পাবে।[১]

৬. কেউ কাউকে কোনো কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য এভাবে ঘোষণা করল, কাজটি শেষ করতে পারলে তোমাকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে। এটিও বৈধ।

৭. কিস্তিতে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে। বিক্রেতার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রতি কিস্তি আদায় করলে একটি কুপন দেওয়া হবে। সেই কুপনগুলোর ওপর লটারি হবে। যদি লটারিতে নাম আসে তাহলে তার বাকি কিস্তিগুলো আর আদায় করতে হবে না। এটি বৈধ। কারণ, বাকি কিস্তি আদায় না করার অর্থ হলো, প্রথম কিস্তিতে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকার বিনিময়েই পণ্যটি তাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকি টাকাগুলো

১ বাদায়েউস সানায়ে, (৫/৩০৭), মিরকাতুল মাফাতিহ, খ. ৭, পৃ. ৩২০ (মুলতান), রদ্দুল মুহতার (সাঈদ), ৬/৪০৩। প্রকাশ থাকে যে, 'মুহাল্লিল' এর আরেকটি পদ্ধতি হলো, এভাবে চুক্তি করা—মুহাল্লিল বা তৃতীয় ব্যক্তি বিজয়ী হলে কিছু পাবে না। হেরে গেলেও তাকে কিছু দিতে হবে না। তবে বাকি দুজন বা দু পক্ষের কেউ জিতে গেলে অপর পক্ষ নির্ধারিত অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। এটিও বৈধ। বিস্তারিত দেখুন, জাওয়াহিরুল ফিকহ, ২/৩৫৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া, ৫/৪৫৬

তাকে আর দিতে হবে না। এটাকে 'হাত্তু আনিস সামান' বা 'মূল্যহ্রাস' বলা যেতে পারে।[1]

৮. কিছু বোনাস এভাবে ঘোষণা করা হয়ে থাকে, যারা ন্যূনতম ৫ হাজার বা নির্দিষ্ট একটি মূল্যের পণ্য ক্রয় করবে, তাদেরকে নির্ধারিত বোনাস প্রদান করা হবে। এটিও বৈধ। অথবা বলা হলো, তাদের মাঝে সেইদিন কয়েকজনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এটিও শর্ত সাপেক্ষে জায়েয। (পণ্য ক্রয়ের ওপর পুরস্কার প্রদান-বিষয়ক আলোচনা দেখুন)

৯. কখনো কখনো পণ্য কিনলে সাথে কিছু পয়েন্ট দেওয়া হয়। পয়েন্টের একটি স্তর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পণ্য বা সেবা ক্রয় করে নির্ধারিত সংখ্যার পয়েন্ট সংগ্রহ হলে, এর বিপরীতে গিফট প্রদান করা হয়। শরঈ দৃষ্টিতে এটি হিবার অন্তর্ভুক্ত এবং বৈধ।[2]

১০. পত্রিকায় মস্তিষ্ক শানিত করার জন্য কিছু খেলা দেওয়া হয়। যেমন 'শব্দঘর', 'সুডুকো' শব্দ ও সংখ্যা মিলানোর জন্য এ দুটি খেলা বেশ প্রসিদ্ধ। যারা এই ঘরগুলো পূরণ করে কুপনটি পাঠিয়ে দিবে তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত করে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এটি বৈধ। কারণ এতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের থেকে পুরস্কার প্রদানের জন্য অগ্রিম কোনো অর্থ গ্রহণ করা হয় না। যদি এমন নিয়ম থাকে যে, এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হলে ফরম বাবদ বা কুপন বাবদ নির্ধারিত টাকা প্রদান করতে হবে। তাহলে তখন আর বৈধ হবে না। হ্যাঁ, কুপন বা ফরম বাবদ কেবল বাস্তবভিত্তিক ন্যায্য খরচ গ্রহণ করা হলে এতে সমস্যা নেই।

১. ৯. জুয়া ও দেশীয় আইন : একটি পর্যালোচনা

আমাদের এই উপমহাদেশ বৃটিশদের শাসনাধীন থাকাকালে ১৮৬৭ সালে 'প্রকাশ্য জুয়া আইন-১৮৬৭' (Public Gambling Act

---

১ ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল, খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী, দেওবন্দ, কুতুবখানা নাঈমিয়া, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৯ হি. , পৃ. ২৭৬। তবে কিমারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন না করাই শ্রেয়।

২ 'আল মাআয়ীরুশ শারইয়্যাহ'।

of 1867) প্রণীত হয়। আইনটিতে গ্যাম্বলিং বা জুয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—জুয়া নির্ধারিত দিন, নির্ধারিত স্থানে অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত ঘোড়দৌড় ব্যতীত বাজি বা পণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ৯২ নং ধারায় সড়ক বা উন্মুক্ত স্থানে জুয়া খেলার দণ্ডের ব্যাপারে বলা হয়েছে—এরূপ স্থানে কেউ জুয়া খেলার জন্য জড়ো হলে অথবা জুয়া খেলারত অবস্থায় থাকলে তার অনধিক ১০০ টাকা অর্থদণ্ড হবে।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান 'রেসকোর্স' নামে পরিচিত ছিল। সে সময়ে উদ্যানটিতে প্রতি রবিবার ঘোড়দৌড়ের রেস বা জুয়া খেলা অনুষ্ঠিত হত। স্বাধীনতার পর তা নিষেধ করে দেওয়া হয়। সুতরাং ১৮৬৭ সালের আইনে জুয়াভিত্তিক ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ না থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এখানে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে। যথা—

- ঢাকা মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশ কেবল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে এটি অন্যান্য শহরের জন্য প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং সমগ্র দেশে এ আইন প্রয়োগ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কেবল দ্য পাবলিক গ্যাম্বলিং এ্যাক্ট, ১৮৬৭ কার্যকর করা যাবে। এখানে লক্ষণীয় হলো, উভয় আইনে দণ্ড এখনো সেকেলে রয়ে গেছে। ১০০/২০০ টাকার অধিক দণ্ড নেই। যেখানে হাজার নয়; বরং লাখ টাকার জুয়া খেলা হয়, সেখানে এত অল্প দণ্ড মূল্যায়িত হবে না বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে সাজা আরো কঠোর হওয়া কাম্য।
- দেশীয় আইনে শুধু প্রকাশ্য জুয়া খেলাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া তাও সেসব জুয়া, যা ক্রীড়া/খেলার সাথে সম্পৃক্ত। বোঝাই যাচ্ছে, এটি বেশ সীমাবদ্ধ আইন। শরীয়াহ জুয়া আরো ব্যাপক, যা কায়-কারবারেও হতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহের আলোকে বিষয়টি আমরা বিশদভাবে জেনেছি।

  অবশ্য ২০২০ ইং. এর শুরুতে দেশের বিভিন্ন ক্লাবে জুয়া খেলার প্রবণতা বেড়ে গেলে, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং. তারিখে হাইকোর্ট

তার এক রায়ে সব ধরনের জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ করে। পাশাপাশি জুয়ার কোনো উপকরণ পাওয়া গেলে আইন শৃংখলা বাহিনীকে তা জব্দ করার আদেশ দেওয়া হয়।

উক্ত রায়ে জুয়ার ব্যাখ্যায় বলা হয়—'যেসব খেলার ফলাফল দক্ষতার বদলে চান্স বা ভাগ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়, সেগুলোই জুয়া খেলা।'[১]

নিঃসন্দেহে উক্ত ব্যাখ্যা উনিশ শতকের জুয়ার ব্যাখ্যার চেয়ে কিছুটা প্রশস্ত। এতে জুয়া খেলা প্রকাশ্য হতে হবে এমন কিছু বলা হয়নি। তবে পূর্বের মতো 'খেলার' মধ্যেই থেকে গেল জুয়া।

- জুয়া খেলায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি, তৈরি ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ আইন প্রণয়ন করা হয়নি।

মোটকথা, জুয়া বিষয়ে দেশের সংশ্লিষ্ট আইনে বেশ অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে এর উন্নয়ন ও শরীয়াহ সমন্বয় সময়ের দাবি।[২]

১. ১০. কিমারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি

কিমার এমনি একটি বিষয়, যাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা ক্ষতিকর দিক রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

১. ১০. ১. অর্থনৈতিক ক্ষতি

- কিমারের যাবতীয় সুরতের মূল কথা এটিই যে, এতে একজনের সম্পদ ও অর্থপ্রাপ্তি অন্যের ক্ষতির ওপর নির্ভর করে।
- কিমারের মাধ্যমে একটি পক্ষের কাছে সম্পদ একীভূত হয়ে যায়।
- কিমার অর্থের অপচয়ের অন্যতম কারণ।
- কিমার সম্পদের লোভ বাড়িয়ে দেয়। এ পথ ধরেই এক সময় জুয়াড়ি চুরি ডাকাতি করতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

---

১ দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ইং.

২ বিচারপতি ইকতেদার আহমাদ সাহেবের লেখা অবলম্বনে। শিরোনাম : ইসলামে ও আইনে নিষিদ্ধ জুয়া। প্রকাশ : দৈনিক নয়া দিগন্ত। সময় : ৮ অক্টোবর, ২০১৯ ইং.।

১. ১০. ২. সামাজিক ক্ষতি

- মদের ন্যায় জুয়া খেলাও একটি নেশা। এতে পরিবারেও অশান্তি তৈরি হয়।
- জুয়া পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে।
- জুয়া সমাজে চুরি বাড়িয়ে দেয়।
- জুয়া একজন উপার্জনসক্ষম ব্যক্তিকে কর্মক্ষম করে দেয়।

মোটকথা, কিমার ও জুয়ার নানাবিধ ক্ষতিক্ষর দিক শুধু ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পরিবার, সমাজ ও পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

১. ১১. এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড থেকে কিমার

এ্যাওফিতে স্বতন্ত্রভাবে এ বিষয়ে শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড নেই। তবে ৫৫নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের (Competitions and Awards) অধীনে এ বিষয়ে মৌলিক কিছু কথা আছে। তাতে রয়েছে—

ক. বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আর্থিক বিনিময় প্রদানের বিষয়টি উভয়পক্ষ থেকে হবে না; বরং যেকোনো একপক্ষ থেকে হবে অথবা তৃতীয় পক্ষ থেকে হতে হবে।[১]

খ. কোনো বিনিয়োগ-গ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে এর সকল ব্যয় তারা নিজেরা বহন করবে। বিনিয়োগকৃত সম্পদ থেকে নয়।

গ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাইলে সেটি তাদের শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড থেকে অনুমোদিত হতে হবে।

---

১ ধা. ২/৩/২/২

গারার (Uncertainty)

শুরু কথা

বর্তমান সময়ে আর্থিক লেনদেনে শরীয়াহ পরিপালন চরম অবহেলার শিকার। শরীয়াহ পরিপালনকে কেবল নামায, রোযা ইত্যাদিতে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর পাশাপাশি আর্থিক লেনদেনে শরীয়াহ পরিপালন দীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বরং হালাল উপার্জন সকল নেক আমলের 'রূহ' বা মূল।[১]

বলার অপেক্ষা রাখে না, উপার্জন হালাল করতে হলে 'অবৈধ আর্থিক চুক্তি' (Invalid Contract) থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এর পরিমাণ শরীয়তে বেশি নয়। অল্প কিছু পদ্ধতি অবৈধ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম 'আল গারার' (Uncertainty)। আমাদের অনেকেই এ বিষয়ে অবগত নই। অথচ সহিহ হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। শুধু এ বিষয়ে ৭০০-৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী একাধিক গবেষণাপত্র প্রস্তুত হয়ে আছে।

আমার জানা মতে আরবী ভাষায় সর্ব প্রথম এ বিষয়ে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন, সুদানের বিখ্যাত ফকীহ প্রফেসর ড. সিদ্দীক মুহাম্মাদ আমীন আদদারীর রহ. (১৩৩৭-১৪৩৬ হি., ১৮ রমযান)। গ্রন্থের নাম— 'আলগারার ফিল উকূদ ওয়া আসারুহু ফিত তাতবিকাতিল মুআসিরাহ।' এরপর পাকিস্তানের মাওলানা ড. ইজায আহমাদ সামদানী ও মাওলানা

---

১ মুফতি শফী রহ., জাওয়াহিরুল ফিকহ, খ. ৪, পৃ. ৫৫৫

ড. ইসমতুল্লাহ্ উভয়ে এ বিষয়ে উর্দূ ভাষায় স্বতন্ত্র দুটি বই লিখেছেন। দুটি বইই প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণাধর্মী রচনা।

এই 'গারার' যেমন জাহেলী যুগে ছিল, তেমনি বর্তমান যুগেও বিভিন্ন লেনদেনে আছে। বর্তমান যুগের অপশন সেল (Option Sale), ফিউচার সেল (Future Sale), ফরওয়ার্ড সেল (Forward Sale), ডেরিভেটিভস মার্কেট (Derivatives Market) ইত্যাদি লেনদেনে অন্যান্য শরঈ সমস্যার পাশাপাশি 'গারার' সমস্যাও নিহিত। তদ্রূপ প্রচলিত জেনারেল ইন্সুরেন্স, ফরেক্স ট্রেডেও 'গারার' উপাদান বিদ্যমান। এ ছাড়া আমাদের সমাজে বিভিন্ন ছোটখাটো আর্থিক লেনদেনেও গারার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় অনেক সময় আমাদের তা বুঝতে সমস্যা হয়। এতে শরীয়াহ্ পরিপালন বাধাগ্রস্থ হয়।

উক্ত নিষিদ্ধ 'গারার' ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। বেচাকেনাসহ বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে এটি একটি মৌলনীতির মর্যাদা রাখে। ইমাম নববী রহ. লিখেছেন,

> أما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة.
>
> 'গারার নিষিদ্ধকরণ বেচাকেনা অধ্যায়ে অনেক বড় একটি মূলনীতির মর্যাদা রাখে। এর অধীনে বেচাকেনার অগণিত মাসআলা রয়েছে।'[১]

এ বিষয়ে অনেক কিছুই লেখার আছে। তবে অল্প পরিসরে সংক্ষিপ্তাকারে মোটা দাগের কিছু কথা আরয করা হলো। আল্লাহ্ তাআলা তা উপকারী বানিয়ে দিন।

২. ১. প্রাথমিক ধারণা

আমাদের সমাজে এমন কিছু লেনদেনের প্রচলন আছে, যার মূলে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে। পরিণতি অজ্ঞাত থাকে। এতে এক পক্ষের লাভ তো নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু অপর পক্ষের প্রাপ্তি অনিশ্চয়তার মুখে

---

১ শরহে নববী, সংশ্লিষ্ট হাদীস।

থাকে। যেমন, বীমার প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিনিময়ে গ্রাহকের প্রাপ্তি নির্ভর করে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ওপর। যা হতে পারে, নাও হতে পারে। তদ্রূপ পুকুরে কী পরিমাণ মাছ আছে তা হস্তগত করে নিশ্চিতভাবে না জেনেই বিক্রি করে দেওয়া হলো।

এভাবে বিভিন্ন লেনদেনে দেখা যায়, এক পক্ষের প্রাপ্তি থাকে নিশ্চিত, কিন্তু অপর পক্ষের প্রাপ্তি থাকে চরম অনিশ্চয়তায়। সাধারণত এ ধরনের লেনদেনকেই 'গারার' বা Uncertainty বলে। মূল বিষয়টির প্রাথমিক ধারণা লাভের পর এবার এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ তুলে ধরা হলো।

২. ১. ১. শাব্দিক পরিচিতি

'গারার' শব্দটি আরবী الغرر। শব্দটির শব্দমূল হলো, غر (গাইন ও রা)। এর একটি মৌলিক অর্থ : النقصان (আন-নুক্সান) তথা ঘাটতি, হ্রাস, ত্রুটি। আরবীতে বলা হয়— غارت الناقة (গার্রাতিন নাক্বাহ) : উষ্ট্রির দুধ কমে গেল।

উক্ত মৌল অর্থের সাথে মিল রেখে শব্দটি আভিধানিক ভাবে 'ধোঁকা দেয়া' (Cheat), 'মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া' (Lure)-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনুল কারীমে 'ধোঁকা দেওয়া' অর্থে এসেছে এভাবে— يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ. 'হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলেছে?'[১]

তদ্রূপ মৌল অর্থের সাথে মিল রেখে শব্দটি অনিশ্চিত কোনো লেনদেন, যা হবে কি না নিশ্চিত জানা নেই, হতে পারে, নাও হতে পারে (Uncertainty) এমন ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রাচীন উদাহরণে পলাতক দাস বিক্রিকে বলা হয় بيع الغرر (বাইউল গারার) বা গারারযুক্ত বেচাকেনা। মৌল অর্থের সাথে এর মিল হলো, এটি অসম্পূর্ণ বেচাকেনা। আদৌ পূর্ণ হবে কি না জানা নেই। কারণ পলাতক দাস ফিরে পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত।[২]

---

১ সূরা ইনফিতার : ৬

২ মাকায়ীসুল লুগাহ, পৃ. ৬৯৫, লিসানুল আরব, খ. ১০, পৃ. ৪১

২. ১. ২. পারিভাষিক পরিচিতি

ইসলামী আইন বা ফিকহের পরিভাষায় 'গারার' এমন লেনদেনকে বলা হয়, শরীয়ত বর্ণিত পন্থায় যার পরিণতি অজ্ঞাত। অথবা বলুন, যে কারবারের মূল চুক্তি বা পণ্যে কিংবা মূল্যে শরীয়ত বর্ণিত পন্থায় অনিশ্চয়তা থাকে সেটাই গারারযুক্ত লেনদেন।

ফকীহগণ উক্ত বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ফকীহের বিশ্লেষণ পেশ করা হলো।

- **আল্লামা সারাখসী রহ.-এর ভাষ্য**

তিনি বলেছেন, গারার হলো—الغرر ما يكون مستور العاقبة 'এমন লেনদেন যার পরিণতি লুক্কায়িত (অস্পষ্ট)।'[১]

- **আল্লামা কাসানী রহ.-এর ভাষ্য**

তিনি বলেছেন, الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك 'গারার হচ্ছে অনিশ্চয়তাযুক্ত এমন লেনদেন, যাতে হওয়া এবং না হওয়া উভয় দিক বিদ্যমান।'[২]

- **আল্লামা ইবনুল আসীর জাযারী রহ.-এর ভাষ্য**

তিনি বলেছেন, الغرر ما له ظاهر تؤثره و باطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري و باطنه مجهول 'গারার হলো, এমন লেনদেন যার এমন একটি প্রকাশ্য রূপ রয়েছে, যা দ্বারা মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু এর মধ্যে ভেতরগত ভাবে এমন অদৃশ্য বিষয় রয়েছে, যে কারণে তা অস্পষ্ট। অতএব এর প্রকাশ্য রূপ ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে। আর এর ভেতরের রূপ থাকে অজানা।'[৩]

- **মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর সমৃদ্ধ ভাষ্য**

তিনি 'গারার' বিষয়ক উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো উল্লেখের পর লিখেছেন—

الواقع أن الغرر معنى عام يشمل جزئيات كثيرة، والذي يتحصل

১ কিতাবুল মাবসূত ১২/১৯৪

২ বাদায়েউস সানায়ে ৪/৩৬৬

৩ জামেউল উসুল ১/৫২৭

من سبر جزئياته أن الغرر لا يخلو من أحد الأحوال الثلاثة الآتية: ألاول: أن يكون المعقود عليه غير مقدور التسليم، الثاني: أن يشتمل العقد على جهالة في المعقود عليه (مثل المبيع أو الثمن أو الأجرة) أو في الأجل المضروب في العقد، الثالث: أن يكون في معنى تعليق التمليك على الخطر كما في القمار.

'বাস্তবতা এই যে, 'গারার' একটি ব্যাপক বিষয়, যার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। এর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা অনুসন্ধানের পর যে বিষয়টি সামনে আসে, তা হলো, গারারযুক্ত লেনদেনে নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার কোনো একটি থেকে হবে। যথা—

ক. চুক্তিকৃত বিষয় (যেমন, পণ্য) অর্পণে বিক্রেতা অক্ষম হওয়া বা তা হস্তান্তরযোগ্য না হওয়া।

খ. মূল চুক্তিতে চুক্তিকৃত বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা। যেমন, পণ্য, মূল্য বা ভাড়ায় অজ্ঞতা থাকা। অথবা মূল চুক্তিতে মেয়াদের ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকা।

গ. মালিকানা অর্জনের বিষয়টি রিস্কযুক্ত হওয়া অর্থাৎ তা হওয়া না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া। যেমনটি কিমারে হয়ে থাকে।'[১]

২. ১. ৩. এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক গারারের পরিচিতি

এ্যাওফি তাঁদের ৩১ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডে (২/১) গারারের পরিচিতি দিয়েছে এভাবে—

الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مستورة العاقبة (النتيجة)، أو هو: ما تردد أثره بين الوجود والعدم.

'অর্থাৎ গারার হলো, আর্থিক লেনদেনে এক বিশেষ অবস্থার নাম, যা লেনদেনের মৌল বিষয়ের কোনো কিছুর পরিণতি/ফলাফল অজ্ঞাত করে দেয়। অথবা গারার হলো, যার ফলাফল হওয়া না হওয়ার মাঝে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে।'

১ ফিকহুল বুয়ূ, খ. ১, পৃ. ৩৩৯

মোটকথা, 'গারার' হলো :

- আর্থিক চুক্তির (Contract) মৌলিক কোনো অংশে (তথা চুক্তি, পণ্য, মূল্য, মেয়াদ) বড় ধরনের বিশেষ অনিশ্চয়তা (Risk) সৃষ্টি হওয়া, যার পরিণতি অস্পষ্ট/লুক্কায়িত।
- চুক্তির ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে পড়া। হওয়া না হওয়ার মাঝে পড়ে যাওয়া।
- গারার হবে আর্থিক বিনিময়মূলক কোনো চুক্তিতে।

প্রকাশ থাকে যে, 'গারার' বলতে আমরা দেখলাম, ফকীহগণ বলেছেন- এমন আর্থিক লেনদেন যার পরিণতি অস্পষ্ট। তবে এর অর্থ এ নয় যে, যেকোনোভাবে আর্থিক কোনো লেনদেন বা চুক্তির পরিণতি অজ্ঞাত হলেই তা নিষিদ্ধ 'গারার' হয়ে যাবে। যেমন, পার্টনারশীপ ব্যবসায় জানা নেই কতটুকু মুনাফা হবে বা লস হবে। পরিণতি অজ্ঞাত। তবে তা নিষিদ্ধ গারার নয়। বরং এর জন্য সুনির্দিষ্ট শরীয়াহ মানদণ্ড আছে। সামনে তা উল্লেখ হবে।[১]

২. ২. কুরআন ও হাদীস থেকে গারারের নিষিদ্ধতা

২. ২. ১. কুরআনুল কারীম থেকে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

'হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোনো ব্যবসা করা হলে তা জায়েয।'[২]

কুরআনুল কারীমের আরো বিভিন্ন জায়গায়[৩] 'আল আকলু বিল বাতিল'

১ মালি মুআমালাত পর গারার কি আছারাত, ড. মাওলানা ইজায আহমদ সামদানী, পৃ. ২৭

২ সূরা নিসা : ২৯

৩ যেমন দেখুন, সূরা বাকারা : ১৮৮; সূরা নিসা : ১৬১; সূরা তাওবা : ৩৪

(الأكل بالباطل) শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হলো, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা। উক্ত 'অন্যায় ভোগের' মধ্যে তাফসীরবিদগণ 'গারার'কেও উল্লেখ করেছেন। যেমন, ইবনুল আরাবী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

الباطل يعني ما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا لأن الشرع نهى عنه ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما اه.

'উক্ত আয়াতে 'বাতিল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল নয় এমন লেনদেন তথা হারাম লেনদেন। যেমন, রিবা, **গারার** ইত্যাদি।'[১]

২. ২. ২. সহিহ হাদীস থেকে :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে (এর ব্যাখ্যা সামনে আসছে) ও গারারযুক্ত লেনদেন[২] থেকে নিষেধ করেছেন।'

২. ২. ৩. সাহাবীর ফতোয়া থেকে :

বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر.

'তোমরা পানিতে মাছ রেখে বিক্রি করো না। কেননা, তা নিষিদ্ধ গারার।'[৩]

---

১ আহকামুল কুরআন, খ. ১ ,পৃ. ৪৭। আরো দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী খ. ৫, পৃ. ১৫

২ হাদীসের শব্দ হলো—'বাইউল গারার'। এর অর্থ : البيع الذي يكثر فيه غرر 'এমন বেচাকেনা যার মধ্যে অধিক পরিমাণে গারার রয়েছে' (মাওসুফের ইযাফত হয়েছে সিফাতের দিকে)। এক কথায় 'গারারযুক্ত লেনদেন বা বেচাকেনা'।—গারার কী সুরতি, পৃ. ৩৭

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ২২৪৮৩

উপর্যুক্ত আয়াত, হাদীস ও সাহাবীর ফতোয়া থেকে গারারের নিষিদ্ধতা খুবই স্পষ্ট। চার মাযহাবের ইমামগণ, সালাফ ও পরবর্তী সকল ফকীহদের নিকট গারারযুক্ত বেচা-কেনা অবৈধ।[১]

মোটকথা, উল্লিখিত দলিল-প্রমাণের আলোকে এটি স্পষ্ট যে, গারারযুক্ত লেনদেন করা বৈধ নয়। হাদীসে তা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এর থেকে বাঁচতে হলে গারার কি ও কিভাবে লেনদেনে গারার হয়—তা জানতে হবে।

২. ৩. গারার : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

টেকসই অর্থনীতির জন্য একটি মৌলিক শর্ত হলো, সবার ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা। মালিকানা আদান-প্রদানে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

কেউ কোনো কিছু ক্রয় করবে। বিপরীতে বিক্রেতা মূল্য পেয়ে যাবে। কিন্তু ক্রেতা পণ্য পাওয়াটা অনিশ্চিত হবে। অথবা এর বিপরীত হবে—এমনটি হলে তা নিশ্চিতভাবে অর্থনীতির জন্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

'গারার' এমন একটি লেনদেন, যাতে লেনদেনের কোনো এক পক্ষে ভারসাম্য থাকে না। লেনদেনের মধ্য দিয়ে কেউ একজন তার উদ্দেশ্য হাসিল করে নেয়। কিন্তু অপর পক্ষ পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়, অর্থনীতির এমন অবস্থা কখনই কল্যাণকর নয়। ঠিক এ জন্যই অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও গারার নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে।

قال الهيثمي رح. : رجال الموقوف رجال الصحيح اه. (٨٠/٤)، هذا الحديث يروى مرفوعاً أيضا، لكنه ضعيف الإسناد، كما قاله الشيخ شعيب الأرنؤوط رح. في تعليقه على المسند للإمام أحمد رح. ١٩٧/٦، قال السندي يرح . : والحديث صحيح معنى، ضعيف إسنادا اه.

১ প্রকাশ থাকে যে, সালাফ থেকে ইবনে সীরীন রহ., কাযী শুরাইহ রহ. থেকে গারারযুক্ত লেনদেনে সমস্যা না হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১০/৬০৯) ইবনে বাত্তাল রহ.-এর জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, 'সম্ভবত তাদের কাছে গারারের নিষিদ্ধতাসংক্রান্ত হাদীস পৌঁছেনি। সুতরাং যার বক্তব্য সুন্নাহর পরিপন্থী তা গ্রহণযোগ্য হবে না।'–(শরহু সহিহিল বুখারী, ইবনে বাত্তাল, খ. ২, পৃ. ২৭২)

২. ৪. আর্থিক লেনদেন গারারযুক্ত হয় যেভাবে

কোনো আর্থিক লেনদেন বা চুক্তি সাধারণত গারারযুক্ত হয় দুই ভাবে। যথা :

১. চুক্তির মূলে বিশেষ পন্থায় গারার থাকা।
২. অথবা চুক্তির কোনো এক পার্ট বা অংশে গারার থাকা। চুক্তির অংশ তিনটি। যথা : পণ্য, মূল্য ও মেয়াদ।

নিম্নে প্রত্যেকটির ওপর উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো।

২. ৪. ১. চুক্তির মূলে গারার

চুক্তির মূলে গারার থাকার অর্থ—চুক্তির মূলে গারার এভাবে যুক্ত হবে যে, তা ইজাব-কবুলের সাথে জড়িয়ে থাকবে। সরাসরি পণ্যের সাথে নয়।[১]

যেমন কেউ বলল, যদি আমার কাছে অমুকে তার মোবাইল বিক্রি করে, তাহলে আমি আমার ঘড়িটি ১০০০ টাকার বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। লক্ষ করুন, এখানে চুক্তির মূলে Uncertainty রয়েছে।

তদ্রূপ চুক্তি হলো শুক্রবারে বৃষ্টি হলে আমি তোমার নিকট বইটি ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিলাম। বৃষ্টি না হলে দেওয়া হবে না। বিক্রি এখনি হয়ে গেছে। টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে; কিন্তু বইয়ের মালিকানা অর্জনটি একটি অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। একে কিমারও বলা হয়।

তদ্রূপ এভাবে চুক্তি হলো, পণ্যটি নগদে ১ হাজার টাকা। বাকিতে দেড় হাজার টাকা। এরপর কোনো একটি নির্ধারণ না করেই চুক্তি সমাপ্ত হয়েছে।[২]

২. ৪. ২. পণ্যে গারার

পণ্যে ৫ ভাবে গারার থাকতে পারে। যথা—

ক. মূল পণ্যের ব্যাপারে গারার। যেমন, কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু কি বিক্রয় করা হলো, এর জাতীয়তা, প্রকার, গুণাগুণ কিছুই জানা নেই।

---

১ স. ৩১, ধ. ৫/১

২ স. ৩১, ধ. ৫/১/১

খ. পণ্যের প্রকার ও ধরনে গারার। যেমন, গাড়ি বিক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু কোনো মডেলের গাড়ি, গাড়ির গুণাগুণ কি তা বলা হয়নি।

গ. পণ্য অনির্দিষ্ট হওয়া। যেমন, গাড়ির শো রুম বা মেলা থেকে অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি গাড়ি বিক্রয় করা হয়েছে। আবাসন প্রজেক্টের বিশাল জমি থেকে কোনো একটি প্লট অনির্দিষ্টভাবে বিক্রয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে ক্রেতার নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার (خيار التعيين)-ও নেই।

তদ্রূপ গ্রাম দেশে বিভিন্ন গ্রামীণ মেলায় দেখা যায়, চরকিতে অনেকগুলো পণ্য থাকে। একটা নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিয়ে চরকিতে অংশগ্রহণ করা যায়। চরকি ঘুরানোর পর যেই পণ্যে চরকি থামবে সেটাই ক্রেতার হয়ে যাবে। এতে হতে পারে প্রদেয় মূল্যের চেয়ে দামি পণ্য লাভ হবে বা এর কম লাভ হবে।

ঘ. গুণাগুণ জানা নেই। যেমন, পণ্যের গুণাগুণ না বলেই বিক্রয় করে দেওয়া।

ঙ. পণ্যের পরিমাণ জানা নেই। যেমন গ্রামে মাঝে-মধ্যে দেখা যায়, পুকুরে মাছ রেখেই বিক্রি করা হয়। এভাবে মাছ হস্তগত করার আগে পুকুরে রেখেই অনুমান করে বিক্রি করা মূলত গারারযুক্ত বেচাকেনা। এখানে গারারটি হয়েছে পণ্যে। কারণ, মাছ কী পরিমাণ হবে তা অনিশ্চিত। তদ্রূপ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মাছ অর্পণে বিক্রেতা সক্ষম নয়।

তদ্রূপ পণ্যের এক স্তূপ ক্রয় করা। কি পরিমাণ পণ্য আছে তা জানা নেই। তবে গারার যদি হালকা হয়ে যায়, তাহলে সমস্যা হবে না। যেমন, চুক্তির সময় পণ্য দৃশ্যমান, পণ্যের আধিক্য উদ্দেশ্য, পরিমাণ নয় এবং পণ্য এমন যা অনুমান করেই বিক্রয় হয়। এমন হয়ে থাকলে অনুমান করেও বিক্রয় বৈধ হবে।[১]

২. ৪. ৩. মূল্য/বিনিময়ে গারার

মূল্য বা পরিশ্রমিক বা ভাড়ায় নানাভাবে গারার থাকতে পারে। যেমন—

মূল্যের কোনো আলোচনা না করেই পণ্য বিক্রয় করে দেওয়া। অথবা মূল্য নির্ধারণ না করে বিক্রয় করা। বলা হলো, পকেটে যা আছে তা দিয়ে

---

১ স. ৩১, ধ. ৫/২

ক্রয় করা হলো। পকেটে কি পরিমাণ টাকা আছে বিক্রেতার জানা নেই।[১]

জমি চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষকের সাথে জমির মালিক এভাবে চুক্তি করল যে, তুমি আমার জমি চাষ করতে পার। বিনিময়ে আমাকে প্রতি মৌসুমে উক্ত নির্দিষ্ট জমির নির্দিষ্ট অংশ থেকে এক মণ ধান দিতে হবে। এ চুক্তিটি গারারযুক্ত। এখানে গারার হয়েছে মূল্য বা পারিশ্রমিকে। কী পরিমাণ ফসল হবে তা জানা নেই। হতে পারে, সব মিলিয়ে এক মণ হয়েছে বা এর কম হয়েছে। অথবা ওই নির্দিষ্ট অংশে ফসল হয়নি।

তদ্রূপ বন্যার পর পুকুরে অনেক মাছ জমেছে। পুকুর মালিক জেলে নেতার সাথে চুক্তি করল, পুকুর থেকে যা মাছ ধরা হবে, এর এত কেজি তোমাদের বাকিটা আমার। এখানেও পারিশ্রমিকে গারার রয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে বিকল্প হলো, বিনিময় হিসাবে যে পরিমাণ বলা হবে তা ব্যাপক রাখবে। কোনো কিছুর সাথে তা নির্দিষ্ট করে দেবে না। এভাবে বলবে—১ মণ ধান দেওয়া হবে। এই জমি বা জমির কোনো অংশ নির্দিষ্ট করবে না।

তদ্রূপ আপনি চাউল খরিদ করলেন। বিক্রেতা বলল, মার্কেট রেইট অনুযায়ী মূল্য যা আছে তাই দেবেন; কিন্তু আপনি মার্কেট রেইট জানেন না। অথচ এভাবেই লেনদেন সম্পন্ন করে ফেললেন, তাহলে এটিও গারারযুক্ত লেনদেন। এখানে গারার হয়েছে মূল্যে। (অবশ্য মার্কেট রেইট যদি অপরিবর্তনশীল হয়। সকলের জানা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু ক্রেতার না জানার কারণে চুক্তি ফাসিদ হবে না। কিন্তু চাউলের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটি হয় না।)

২. ৪. ৪. মেয়াদে গারার

লেনদেনের মেয়াদেও গারার থাকে। মূল চুক্তির বৈঠকেই যদি মেয়াদের অজ্ঞতা দূর করে দেওয়া হয়, তাহলে চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। যেমন—

একটি গরুর বাচ্চা হবে। গরুটি অসুস্থ। ফার্মেসী থেকে গরুর জন্য ঔষধ নিয়ে আসা হলো; কিন্তু মূল্য দেওয়া হয়নি। চুক্তি হয়েছে, গরুর বাচ্চা

---

১ স. ৩১, ধ. ৫/২/২

প্রসব হওয়ার পর মূল্য প্রদান করা হবে। এটিও গারারযুক্ত লেনদেন। এখানে গারার হয়েছে মূল্য পরিশোধের মেয়াদে। অথবা বলা হলো, যেদিন বৃষ্টি হবে সেদিন মূল্য পরিশোধ করব। অথবা বলল, যেদিন হজে যেতে পারব, সেদিন যাওয়ার আগে মূল্য শোধ করে যাবো ইত্যাদি।

তবে মেয়াদ জ্ঞাত থাকলে সমস্যা নেই। যেমন বলা হলো, শীত কালে মূল্য পরিশোধ করা হবে। ঈদের দিন মূল্য দেওয়া হবে। ফসল কাটার দিন মূল্য শোধ করা হবে। ইত্যাদি।[১]

২. ৫. গারারের আরো কিছু ধরন

এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড গারারের আরো কিছু ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। যথা—

২. ৫. ১. পণ্য অর্পণে অক্ষমতা হেতু গারার

এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, পুকুরে মাছ রেখে বিক্রয় করা। তবে এভাবে আবদ্ধ পানিতে যদি মাছ থাকে, যা সহজেই শিকার করা যায়, তাহলে সমস্যা নেই।

২. ৫. ২. পণ্য না থাকাবস্থায় বিক্রয় করা

যে পণ্যের এখনো মালিকানা অর্জন হয়নি, সেটি বিক্রয় করে দেওয়া। পণ্য ক্রয় করার আগেই তা বিক্রয় করে দেওয়া। ভোজ্য তেলের ব্যাপারে এমন হয়, তেল আমদানি করার আগেই এর সরবরাহ অর্ডার (এসও) বিক্রয় করে দেওয়া হয়। তবে সালাম বা ইস্তেসনা চুক্তিতে হলে সমস্যা নেই। অথবা পণ্য ক্রয়ের আগের অবস্থায় সরাসরি বিক্রয় চুক্তি না করে, ওয়াদা চুক্তি করা যেতে পারে।

২. ৫. ৩. পণ্য হস্তগত (কবয) করার আগেই বিক্রয় করা

পণ্য হস্তগত করার আগেই বিক্রয় করে দেওয়া। এই হস্তগত বাস্তবে হতে পারে অথবা বিধানগতভাবে। অর্থাৎ পণ্যের ঝুঁকি স্থানান্তরিত

---

১ স. ৩১, ধ. ৫/৩/২

হওয়া, পণ্য পৃথক ও সুনির্দিষ্ট হওয়া, পণ্যের মালিকানা বুঝে পাওয়া। এটি উরফ বা প্রচলন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।[1]

২. ৫. ৪. শর্তে গারার

চুক্তিতে এমন কোনো শর্তারোপ করা, যা গারার সৃষ্টি করে। যেমন, কোনো ফ্ল্যাট ক্রয় করা হলো এ শর্তে যে, এর থেকে মাসে অন্তত ৫০ হাজার টাকা ভাড়া উসুল হতে হবে। অথবা বলা হলো, একটি কামরা ব্যতীত বিক্রয় করা হলো। সেই কামরা কোনটি—তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।[2]

তদ্রূপ গাভী ক্রয় করা হলো এ শর্তে যে, এর থেকে নির্ধারিত পরিমাণ দুধ পেতে হবে। এভাবে শর্তে নানাভাবে গারার থাকতে পারে।

২. ৬. গারার ও কিমার

গারার ও কিমারের মাঝে একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে। গারার হলো, যেখানে মূল বিষয়ের অস্তিত্ব সংশয়যুক্ত থাকে। (الشك في وجوده)[3] হতে পারে, নাও হতে পারে। এদিকে কিমারও এমন যেখানে মালিকানা অর্জনের মূল বিষয়টি রিস্কযুক্ত থাকে। (تعليق التمليك على الخطر) হয় লাভবান হবে, নতুবা পুরোপুরি লোকসান হবে।[4] সুতরাং যেটি কিমার সেটি অবশ্যই গারারও বটে। অথবা বলুন, গারারের একাধিক অবস্থার মাঝে একটি অবস্থা ও প্রয়োগ বা শাখা কিমার।[5]

কিন্তু গারার হলে কিমার হওয়া জরুরি নয়। এর অর্থ, গারার কিমারের চেয়েও ব্যাপক প্রয়োগমুখী। এই বিস্তৃত প্রয়োগের মাঝে আছে, পণ্য অর্পণে অক্ষম থাকাবস্থায় বিক্রয় করা (غير مقدور على التسليم), চুক্তিতে এমন শর্তারোপ করা যার অস্তিত্ব সংশয়যুক্ত। যেমন, গরু

---

১ স. ৩১, ধা. ৫/৪-৫/৮

২ স. ৩১, ধা : ০৭

৩ রদ্দুল মুহতার, ফারফুর, ১৪/৫৭৯

৪ হালাল হারাম, মাও. খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, পৃ. ৩৬৫

৫ ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল, খ. ২, পৃ. ১৬৭

বিক্রয় করেছে এ শর্তে—গর্ভবতী হতে হবে,[১] পণ্য হস্তগত করার আগেই বিক্রয় করা, একাধিক পণ্যের মাঝে একটি পণ্য নির্দিষ্ট না করেই বিক্রয় করা ইত্যাদি। এগুলো সবই গারার। এভাবে বেচাকেনা, ইজারা নানা চুক্তিতে গারার পাওয়া যায়। তবে কিমার নয়।

অবশ্য কিমারের বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে, কিমার হবে। যেমন, কঙ্কর নিক্ষেপ করে বিক্রয় চূড়ান্ত করা। (بيع الحصاة) এতে পণ্য বিলকুল না পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। এটি বেচাকেনা, তবে কিমারযুক্ত।[২]

আরো সহজে আমরা এভাবে বুঝতে পারি—কিমারের মাঝে হয় লাভবান হবে, নতুবা পুরোই গচ্ছা যাবে। অপরদিকে গারারে প্রাপ্তির খাতায় প্রত্যাশা পূরণ না হলেও, একেবারে রিক্তহস্ত হতে হয় না। কিছু না কিছু থাকে। সর্বোপরি বিষয় দুটি নির্ণয়ে সংশ্লিষ্ট ফিকহের গভীর বুঝ অর্জনের বিকল্প নেই।

২. ৭. গারার ও জাহালাহ

'জাহালাহ' (الجهالة) মানে অজ্ঞতা (Ignorance)। ফিকহের দৃষ্টিতে এর পরিচয় হলো, ما علم حصوله وجهلت صفته 'যে বিষয়ের মূল বিষয়টি জ্ঞাত থাকে। তবে এর গুণাগুণ নিয়ে অজ্ঞতা থাকে।' যেমন, পকেটে যা আছে তা বিক্রয় করা হলো। এখানে পকেটে কিছু একটা আছে। সেটি সে পাবেই। তবে কতটুকু পাবে, কি পাবে—তা জানা নেই।

অপরদিকে গারার হলো, মূল বিষয়েই অজ্ঞতা। হাসিল হবে কি না—তা জানা নেই। যেমন, উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা। পাখি আদৌ হাসিল হবে কি না—তাই অজ্ঞাত। তাহলে দেখা গেল, জাহালাহ ও গারার—এ উভয় ক্ষেত্রে অজ্ঞতা আছে। তবে মূল বিষয়ের অর্জন নিয়ে অজ্ঞতা থাকলে

---

১ এখানে গরুটি গর্ভবতী কি না তা জানা নেই। হতে পারে এমনিতে পেট ফুলে আছে। তাই এটি গারার। তবে এর জন্য শর্ত হল, উপস্থিত প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ না থাকা। সুতরাং উপস্থিত ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, সত্যিই গরুটি গর্ভবর্তী, তাহলে তখন আর সমস্যা থাকবে না।—বাদায়েউস সানায়ে, ৪/৩৭৭

২ আল গারার ওয়া আসারুহি ফিল উকূদ, ড. সিদ্দীক আদ্ব দ্বরীর, পৃ. ৪১

সেটি গারার। আর গুণাগুণ নিয়ে অজ্ঞতা থাকলে সেটি জাহালাহ।

পাশাপাশি আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, গারার জাহালাহ ছাড়াও হতে পারে। যেমন, পলাতক গোলাম বিক্রয় করা। পলায়নের আগে গোলামের সকল বিষয় জানা আছে। এটি প্রাচীন উদাহরণ। বর্তমান সময়ের আলোকে এর উদাহরণ হতে পারে, গাড়ি ছিনতাই অবস্থায় বিক্রয় করা। গাড়ির সব কিছু জানা আছে। এগুলো গারার। কারণ মূল পণ্যই অর্জন হবে কি না জানা নেই। তবে এতে জাহালাহ নেই। কারণ গাড়ি, গোলাম সবই জ্ঞাত।

কখনো জাহালাহ গারারমুক্ত হতে পারে। এটি স্পষ্ট। যেমন, ক্রেতা পাথর দেখেছে। দেখে ক্রয় করেছে। কিন্তু সেটি কাঁচ না ইয়াকুত জানা নেই। তাহলে এতে জাহালাহ আছে। কারণ পাথরটি কিসের তা জানা নেই। তবে গারার নেই। কারণ পাথর তো পাওয়া যাবে।[১]

শায়খ ড. সিদ্দীক আদ দরীর মন্তব্য করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে গারার মূলত জাহালার চেয়ে ব্যাপক। প্রতিটি জাহালাহ-এ গারার আছে। কিন্তু গারার হলে জাহালাহ হওয়া জরুরি নয়। যেমন, পলাতক দাসের উদাহরণ। তবে জাহালাহ হলে গারার থাকবেই।[২]

শায়খ ড. সিদ্দীক সাহেবের এ মন্তব্যের সমর্থন পূর্ববর্তী কতক আলেমদের ভাষ্য থেকে এবং সমকালীন এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড-এর সংশ্লিষ্ট উপস্থাপন থেকে পাওয়া যায়। তাঁরা গারারের ধরন ও প্রয়োগ হিসাবে জাহালার কিছু পদ্ধতিও উল্লেখ করেছেন। (প্রাগুক্ত)

আলোচনার ফলাফল দাঁড়াল—একটি মত হলো, জাহালাহ গারারমুক্ত হতে পারে। আরেকটি মত হলো, জাহালাহ থাকলে গারার থাকবেই। বস্তুত যারা বলেছেন, জাহালাহ গারারমুক্ত হতে পারে, তারা গারারকে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন। অপরদিকে যারা বলেছেন জাহালাহ মানেই তাতে গারার থাকবে, তারা গারারকে ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন।

---

১ শাস্ত্রীয় ভাষায় এভাবে গারার ও জাহালাহ এর মধ্যকার সম্পর্ককে عموم وخصوص وجهي এর সম্পর্ক বলে। বিস্তারিত দেখুন, আল গারার ওয়া আসারুহি ফিল উকূদ, ড. সিদ্দীক আদ্ব দ্বরীর, পৃ. ৩৭

২ প্রাগুক্ত।

আমাদের দৃষ্টিতে, গারারকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে জাহালার স্বতন্ত্র আবেদন হ্রাস হয়ে যায়। তাই সকল জাহালাহকে গারার বলা সমীচীন বলে মনে হয় না। জাহালাহ তো অল্পতেও বৈধ হয়ে যায়। যেমন, অজ্ঞতা যদি ঝগড়া পর্যন্ত না নিয়ে যায়, তাহলে বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু গারার এমন নয়।

অবশ্য যদি জাহালার বৈধতার ক্ষেত্রকে 'গারারে ইয়াসীর' বা 'স্বল্প গারার' বা 'মধ্যবর্তী গারার' (সামনে আসছে) বলা হয় (যা বৈধ), আর জাহালার অবৈধতার ক্ষেত্রকে 'গারার' এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয় তাহলে এতে সকল মতের মাঝে সমন্বয় হয়ে যায়। এ শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবৈধতার কারণ হবে দুটি—জাহালাহ ও গারার। (আমাদের দৃষ্টিতে জাহালাই মূল) আলহামদুলিল্লাহ।

২. ৭. ১. জাহালাহ : বৈধ/অবৈধতার মানদণ্ড

জাহালাহও ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে এর মধ্যে স্তর রয়েছে। কিছু জাহালাহ আছে অল্প, যা প্রচলন পাওয়ার কারণে ঝগড়া সৃষ্টি হয় না। পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে সরাসরি 'নসও' (শরঈ ভাষ্য) নেই। সেগুলো বৈধ। যেমন, তরমুজ, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ভেতরে কী পরিমাণ আছে, কেমন আছে তা না জেনেই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এতে যে জাহালাহ আছে তা বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তদ্রূপ ভাড়া আলোচনা না করেই লোকাল বাসে উঠা। (তবে ঝগড়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে শুরুতেই ভাড়া ঠিক করে নিতে হবে)

অপরদিকে কিছু জাহালাহ আছে যা অধিক পরিমাণের। ঝগড়া সৃষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। এমন হলে তা বৈধ নয়। যেমন, এক কার্টন আপেল বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু কার্টনে কি পরিমাণ আপেল আছে জানা নেই। এ নিয়ে পরে ঝগড়া হতে পারে। এটি বৈধ নয়। এক্ষেত্রে বৈধ/অবৈধতার সহজ মানদণ্ড হলো—

দেখতে হবে, যে জাহালাহ (চাই তা পণ্যে হোক বা মেয়াদে হোক) আছে, তা ঝগড়া সৃষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে কি না। যদি করে, তাহলে তা অবৈধ হবে। এ কারণে লেনদেন ফাসিদ হয়ে

যাবে। আর এমনটি না হলে, শরীয়াহ্ অন্য কোনো বাধা না থাকলে এতে সমস্যা নেই। এই বিষয়টি নির্ণীত হবে সংশ্লিষ্ট উরফ ও প্রচলন দ্বারা।

সর্বোপরি ভালো করে তা নির্ণয় করতে ফিকহের গভীরতা অর্জন করতে হবে। যা ফিকহের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও প্রকৃত বিজ্ঞ ফকীহগণের দীর্ঘ সান্নিধ্য লাভের পরই অর্জন হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, বৈধ জাহালাহকে অল্প গারার বা মধ্যবর্তী গারারও বলা হয়। (সামনে আসছে) আবার যে জাহালাহ অবৈধ, সেটিকে গারারও বলা হয়। যেমন, আবাসিক জমির প্রজেক্ট থেকে অনির্দিষ্টভাবে কোনো প্লট বিক্রয় করা। এ্যাওফি তাঁদের শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডে এমন শব্দ ব্যবহার করেছে। (প্রাগুক্ত)

২. ৭. ২. লেনদেনে গারারের স্তর

'জাহালাহ' যেমন অল্প হয়, বেশি হয়। তেমনি গারারও কমবেশি হয়। ফকীহগণ লেনদেনে গারারের উপস্থিতি ও স্তরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

২. ৭. ২. ১. অল্প গারার (الغرر اليسير)

'অল্প গারারের' পরিচয় হলো, এটি প্রায় লেনদেনেই পাওয়া যায়। বলতে পারেন, সাধারণত কোনো লেনদেনই এর থেকে মুক্ত থাকে না।

আল্লামা ইবনে রুশদ রহ. বলেছেন—'অল্প গারার হলো, যা থেকে সাধারণত বেচাকেনা মুক্ত থাকে না।'[১]

এর প্রকৃতি হলো, এটি ঝগড়া তৈরি পর্যন্ত নিয়ে যায় না। যেমন, মাস হিসাবে বাড়ি ভাড়া দেওয়া। অথচ মাস কমবেশি হয়ে থাকে। কখনো ৩০ দিনে হয়, কখনো ৩১ দিনে হয়।[২]

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অল্প গারার অবৈধ নয়।

---

১ আল মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত, খ. ২, পৃ. ৭৩

২ এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, ৩১, ধারা : ৪/২/২

২. ৭. ২. ২. অধিক গারার (الغرر الكثير)

অধিক গারার এর পরিচয় হলো, গারার এত বেশি হওয়া যে, মূল চুক্তিকেই গারার বলা যায়।[1]

এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড-এ বলা হয়েছে—

> الغرر الكثير: هو ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به، ومن شأنه أن يؤدي إلى النزاع، وهذا يتأثر باختلاف البيئات والعصور، ومرجعه إلى العرف...
>
> অর্থাৎ, অধিক গারার হলো, লেনদেনে এর উপস্থিতি এতো প্রবল হওয়া যে, মূল লেনদেনটি সরাসরি গারারের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নেয়।
>
> এর প্রকৃতি হলো, এটি ঝগড়া সৃষ্টির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর এটি হয়ে থাকে নানা অবস্থা, সময়কালের ভিত্তিতে। এর মূল ভিত্তি উরফ বা প্রচলন। যেমন ফল প্রকাশ হওয়ার আগেই বিক্রয় করে দেওয়া। অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য কোনো কিছু ভাড়ায় গ্রহণ করা, এমন বিষয়ে 'সালাম' চুক্তি করা, যা নির্ধারিত মেয়াদে পাওয়াটা প্রবল নয়। এ ধরনের গারার লেনদেনে থাকলে লেনদেন ফাসিদ হয়ে যায়।[2]

পূর্বে গারারের যে পরিচিতি ও উপাদান বলা হয়েছে সেটা মূলত এই গারারের। যেমন, পশুর পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়ার আগেই বিক্রি করা।

সাধারণত অল্প-অধিক এটি স্থান-কাল ও উরফ অনুযায়ী নির্ণীত হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারে সুনিদিষ্ট কোনো নীতি বলা মুশকিল। মূলত কোন গারারটি অধিক ও নিষিদ্ধ, আর কোনটি অল্প ও বৈধ, সেটা যুগের ফকীহগণ নির্ণয় করবেন।

২. ৭. ২. ৩. মধ্যবর্তী গারার (الغرر المتوسط)

মধ্যবর্তী গারার (الغرر المتوسط) এর পরিচয় হলো, এমন গারার, যা

---

১ আবুল ওয়ালীদ বাজী রহ., আল মুনতাকা, খ. ৫, পৃ. ৪১, গারার কী সূরতি, পৃ. ৫২

২ স. ৩১, ধারা, ৪/২/১

অধিক নয়, হালকাও নয়। দুটির মাঝামাঝি। এটিও বৈধ। যেমন, এমন কিছু বিক্রয় করা যা না ভাঙ্গলে এর প্রকৃতি ভালো করে জানা যায় না। যেমন, তরমুজ বিক্রয় করা। (একে বৈধ জাহালাহও বলা হয়) তদ্রূপ মুদারাবা ব্যবসায় মুনাফার প্রাপ্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি।[১]

মোটকথা, লেনদেনে গাবারের উপস্থিতি প্রবল বা অধিক হলে কেবল তা নিষিদ্ধ হবে। লেনদেন ফাসিদ হয়ে যাবে। এ ছাড়া অল্প বা মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকলে সমস্যা নেই। আর এই স্তর নির্ণীত হবে গারারের প্রকৃতি ও উরফের মাধ্যমে। নির্ণয় করবেন—যুগের বিজ্ঞ ফকীহগণ।

২. ৭. ৩. গারারের কারণে লেনদেন ফাসিদ হওয়ার মানদণ্ড

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ মানদণ্ড স্পষ্ট হয়ে গেছে। তদুপরি এক নজরে তা উল্লেখ করা হলো—

গারারের কারণে কোনো লেনদেন ফাসিদ হবে, যদি তাতে নিম্নোক্ত চারটি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যথা—

১. গারার হতে হবে আর্থিক কোনো বিনিময়মূলক লেনদেনে। সুতরাং তাবাররু বা দান চুক্তিতে গারার বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না।

২. গারার অধিক হতে হবে। অধিক হওয়ার মানদণ্ড আগে আলোচনা হয়েছে।

৩. গারার সরাসরি বিদ্যমান থাকা। অনুগামী হয়ে নয়। সরাসরি হয়ে তা মূল চুক্তি, পণ্য, মূল্য ও মেয়াদের কোনো একটিতে হতে পারে। অনুগামী হয়ে নয়—এর উদাহরণ হলো, গরুর পেটের বাচ্চাসহ গরু ক্রয় করা। এটি বৈধ। যদিও পেটে বাচ্চা আছে কি না তা নিশ্চিত নয়। কারণ এটি গরুর অনুগামী। তবে স্বতন্ত্রভাবে গরুর পেটের বাচ্চা বিক্রয় বৈধ নয়। এটি গারার।

৪। গারারযুক্ত লেনদেন করতে শরীয়াহসম্মত কোনো প্রয়োজন বিদ্যমান না থাকা। যেমন, ইসলামী তাকাফুল নেই। এ অবস্থায় আইনগতভাবে

---

১ অবলম্বনে স. ৩১, ধারা. ৪/২/৩

বাধ্য হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে সুদী বীমা করা। তবে 'প্রয়োজনটি' শরীয়াহসম্মত প্রয়োজন কি না তা বিজ্ঞ ফকীহ্ কর্তৃক নির্ণীত হতে হবে।[১]

২. ৭. ৪. 'গারার' : যুগে যুগে

গারারযুক্ত আর্থিক লেনদেন নতুন নয়। এ লেনদেনটি বাহ্যিকভাবে বেশ আকর্ষণীয় হওয়ায় সেই প্রাচীন জাহেলী যুগ থেকেই তা চলে আসছে। এখানে প্রাচীন কিছু গারারযুক্ত লেনদেনের উদাহরণ পেশ করা হলো। বর্তমানে নানা সুরতে এগুলোর কমবেশি ব্যবহার রয়েছে। যথা—

- পরস্পর একে অপরের পণ্য স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণতায় পৌঁছা। এর পদ্ধতি হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, প্রত্যেকে একে অপরের কাপড় কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়া স্পর্শ করবে। আর এতেই বেচাকেনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। এখন কে কোন কাপড় স্পর্শ করবে, সেটা ভালো না মন্দ হবে সব কিছুই অজ্ঞাত। পরিভাষায় একে 'বাইউল মুলামাসা' (بيع الملامسة) বলা হয়। 'মুলামাসা' শব্দের অর্থ : প্রত্যেকে একে অপরের স্পর্শ করা।[২]

- পরস্পর একে অপরের কাপড় ছুঁড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণতায় পৌঁছা। এর পদ্ধতি হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, প্রত্যেকে একে অপরের কাপড় একজন অপরজনের দিকে ছুঁড়ে ফেলবে। কেউ কারো কাপড় দেখবে না। শুধু ছুঁড়ে ফেলবে। আর এতেই বেচাকেনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। এখন কে কোন কাপড় পাবে, সেটা ভালো না মন্দ হবে সব কিছুই অজ্ঞাত। পরিভাষায় একে 'বাইউল মুনাবাযা' (بيع المنابذة) বলা হয়। 'মুনাবাযা' শব্দের অর্থ, প্রত্যেকে একে অপরকে নিক্ষেপ করা।[৩]

---

১ স. ৩১, ধ.৪ অবলম্বনে

২ মুলামাছার উক্ত ব্যাখ্যাটি আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, দেখুন, সহিহ মুসলিম, হাদীস : ৩৭৭৯। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মুলামাসার উক্ত ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী, ৪/৩৫৯)

৩ রদ্দুল মুহতার, এইচ.এম.সাঈদ, খ. ৫, পৃ. ৬৫

- কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বেচাকেনা পূর্ণতায় পৌঁছা। এর পদ্ধতি হলো, অনেকগুলো কাপড় একত্রে থাকবে। চুক্তি হবে এভাবে যে, ক্রেতা দূর থেকে কাপড়গুলোর ওপর একটি পাথর নিক্ষেপ করবে। যেই কাপড়ের ওপর পাথর পড়বে সেটাই চূড়ান্ত পণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। এখন কোন কাপড়ের ওপর পড়বে, সেটা ভালো না মন্দ হবে সবই অজ্ঞাত।[1] পরিভাষায় একে 'বাইউল হাসাত' (بيع الحصاة) বলা হয়। 'হাসাত' শব্দের অর্থ, ছোট পাথর বা কঙ্কর।

  উক্ত লেনদেনগুলো অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এসবে পণ্যে গারার বিদ্যমান।

  পরবর্তীতে সাহাবাযুগেও গারারযুক্ত আরো কিছু লেনদেনের নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। এতে অনুমিত হয় লেনদেনগুলো ওই সময় প্রচলিত ছিল। যেমন—

- পশুর স্তনে দুধ রেখেই তা বিক্রি করা।
- হারিয়ে যাওয়া পশু বাহন হারানো অবস্থায় বিক্রি করে দেওয়া।
- পলাতক দাস বিক্রি করা।
- পানিতে মাছ রেখেই তা বিক্রি করে দেওয়া।
- জালের একেক ঝাপটি বিক্রি করা। অর্থাৎ এভাবে চুক্তি হত, একবার জাল ফেলে যা মাছ আসবে তা বিক্রি করা হলো।[2]

মোটকথা, গারারযুক্ত লেনদেন সেই প্রাচীন জাহেলী যুগ থেকেই চলে আসছে। সাহাবা-তাবেঈন যুগেও ছিল। এখনো আছে। মূল বিষয়টি প্রতি যুগেই ছিল অভিন্ন। পার্থক্য হয়েছে শুধু ধরন ও পদ্ধতিতে।

২. ৮. গারারযুক্ত আধুনিক কিছু লেনদেন

২. ৮. ১. বীমা

বীমার সকল প্রকারে উপর্যুক্ত তিন প্রকার গারার বিদ্যমান। যেমন,

---

১ ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৫৫

২ দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ১০, পৃ. ৬০৭, খ. ১১, পৃ. ৩৩৫

গাড়ির বীমা করা হলো। কবে বীমাকারী প্রদত্ত টাকা উসুল হবে জানা নেই। এটি মেয়াদে গারার হলো। কী পরিমাণ মিলবে তাও জানা নেই। এটি পণ্যে গারার হলো। যখন এক্সিডেন্ট হবে তখন বিনিময় দেবে। এটি মূল চুক্তিতে গারার হলো।

তদ্রূপ জীবন বীমায়, কত রিটার্ন পাবে জানা নেই। মেয়াদ পূর্ণ হলে এক রকম পাবে। পূর্ণ না হলে আরেক রকম পাবে। মূল চুক্তি ও পণ্যে গারার।

২. ৮. ২. ফরেক্স

পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, বর্তমানে অনলাইনে প্রচলিত বৈদেশিক কারেন্সির একটি বিশেষ লেনদেনের নাম 'ফরেক্স'। এখানে রিয়েল কারেন্সির লেনদেন হয় না। এটি মুখ্যও থাকে না। এখানে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য হলো, দুটি ফরেন কারেন্সি রেইটের উঠা-নামার মধ্য দিয়ে প্রফিট লাভ করা। যেটা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে মূল্যের তফাত এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বা প্রকাশ পায়। এই মূল্যে তফাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

মূল্য পরিবর্তন হয়ে কারো প্রফিট হবে, কারো লস হবে। যা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লেনদেনের পরিণতি জ্ঞাত নয়। এটিই আল গারার।

২. ৮. ৩. এম. এল. এম. বিজনেস পদ্ধতি

মাল্টিলেভেল মার্কেটিং বা বহু স্তর বিশিষ্ট বিপণন পদ্ধতি একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িক পলিসি। এর সারকথা হলো, এতে একজন ডিস্ট্রিবিউটর (পরিবেশক) যে চুক্তিতে কোম্পানির সাথে যুক্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো, লোকটি তার ডাউন লেভেল থেকে কমিশন লাভ করতে থাকবে।

এ উদ্দেশ্যেই সে পণ্য ক্রয় করে এতে যুক্ত হয়। অথচ তার নিজের বানানো দুজন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট এবং অন্যের কাজের ওপর নির্ভরশীল। যা স্পষ্ট গারার। এক দিকে কোম্পানির প্রাপ্তি তো নিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু গ্রাহকের প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ তার নিম্নের নেটগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অগ্রসর না করালে লোকটি

কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে, যে কমিশনকে কেন্দ্র করে মূলত সে এম.এল.এম. কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে।

এর সারকথা হলো, এতে একজন ডিস্ট্রিবিউটর (পরিবেশক) যে চুক্তিতে কোম্পানির সাথে যুক্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো, লোকটি তার ডাউন লেভেল থেকে কমিশন লাভ করতে থাকবে।

এ উদ্দেশ্যেই সে পণ্য ক্রয় করে এতে যুক্ত হয়। অথচ তার নিজের বানানো দুজন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট এবং অন্যের কাজের ওপর নির্ভরশীল। যা স্পষ্ট গারার। এক দিকে কোম্পানির প্রাপ্তি তো নিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু গ্রাহকের প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ তার নিম্নের নেটগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অগ্রসর না করালে লোকটি কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে, যে কমিশনকে কেন্দ্র করে মূলত সে এম.এল.এম. কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে বিগত ১৪২৫ হিজরি মোতাবেক ২০০৪ সালে ঢাকার সম্মানিত মুফতিবোর্ড সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। তাতে তারা যেসব কারণে একে নাজায়েয বলেছেন, এর মধ্যে অন্যতম হলো গারার।[১]

এ বিষয়ে মুফতি তাকী উসমানী হাফি. লিখেছেন—

> إن الغرر في مثل هذا النظام كثير، وخاصة لأنه يعتمد عادة على شروط معقدة يفحش بها الغرر.
>
> 'এ ধরনের পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে গারার থাকে। বিশেষত এ পদ্ধতি নানা শর্তের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যাতে গারার অধিক পরিমাণে তৈরি হয়।'[২]

২. ৮. ৪. ফিউচার সেল (Future Sale)

'ফিউচার সেলের' খুব একটা প্রচলন আমাদের দেশে নেই। তবে অন্যান্য দেশে রয়েছে। সহজে এর পরিচয় হলো, স্বাভাবিকভাবেই

---

১ বিস্তারিত দেখুন, 'ইসলামী শরীয়তের আলোকে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা', পৃ. ১৭, প্রকাশক বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। প্রকাশকাল ৭/১১/২০১৪ ইং।

২ ফিকহুল বুয়ু, পৃ. ৮১৫

কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে। তবে সেটা কেবল মুখে। না পণ্য অর্পণ করা হয়েছে, না মূল্য। বিক্রেতাও সেই পণ্যের মালিক নয়। কথা হয়েছে ভবিষ্যতের অমুক তারিখে পণ্য দেওয়া হবে। মূল্যও গ্রহণ করা হবে। তবে বাস্তবে ভবিষ্যতের অমুক তারিখে পণ্য দেওয়া-নেওয়া উদ্দেশ্য হয় না। উদ্দেশ্য হয় ওই তারিখে কেবল পণ্যের ওই দিনের মূল্যের মার্জিন আদান-প্রদান করা।

উদাহরণ, যায়েদ ১ জানুয়ারি ২০ কেজি আলু বিক্রি করল। সেটা তার মালিকানায় নেই। দাম : ১০০০ টাকা। অর্পণ করা হবে মার্চের ১ তারিখ। দাম শোধ করা হয়নি। মার্চের ১ তারিখ আসার পর দেখা গেল ২০ কেজি আলুর দাম ১০৫০ টাকা। এতে ক্রেতার লাভ। তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে ৫০ টাকা দিবে। আর যদি দাম হয় ৯৫০ টাকা। তাহলে ক্রেতার লস। সে বিক্রেতাকে উল্টো ৫০ টাকা দিবে।

এখানে আলু দেওয়া-নেওয়া কারো উদ্দেশ্য নয়। আলুকে বুনিয়াদ বানানো হয়েছে মার্জিন ভোগ করার জন্য। কখনো ১ মার্চ আসার আগে কয়েক দফায় ওই আলু ক্রয়-বিক্রয় হয়। প্রত্যেকে তার মুনাফা রেখে বিক্রি করে। এ ধরনের লেনদেন একাধিক কারণে বৈধ নয়। প্রথমত, এতে মালিক নয় এমন বস্তু বিক্রি করা হয়। দ্বিতীয়ত, পণ্য কবয (হস্তগত) করার আগে বিক্রি করা হয়। তৃতীয়ত, গারার। মূল চুক্তি ও মেয়াদে গারার রয়েছে। কারণ জানা নেই, দাম বৃদ্ধি পাবে না হ্রাস পাবে।

২. ৮. ৫. জমি বিক্রয়ে গারার

কিছুদিন আগে এক ভাই আমাকে জানালেন, তিনি তার ৪০ শতাংশ জমি থেকে ১০ শতাংশ বিক্রি করেছেন ৪ লক্ষ টাকা দিয়ে। তিনি পরে বুঝতে পেরেছেন জমিটির মূল্য মূলত আরো বেশি। দেখা গেল, ক্রেতা তার থেকে জমি কিনে আরো অধিক দামে অন্যত্র বিক্রি করছে। তখন ওই ভাই এই পথ অবলম্বন করার চিন্তা করল যে, তার বাকি ৩০ শতাংশ জমি এভাবে বিক্রি করবে যে, ক্রেতাকে বলবে, আমার থেকে ১০ শতাংশ জমি যারা কিনছে, তারা সেটা অন্যত্র যে দামে সেল করবে,

সেই দামে আমি আপনার কাছে বিক্রি করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, এভাবে বিক্রি করা বৈধ হবে কি না?

দেখুন, এখানে মূল্যে স্পষ্ট নিষিদ্ধ গারার রয়েছে।

শেষ কথা, গারার ইসলামে নিষিদ্ধ একটি লেনদেন। এ থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লেনদেনে গারার লুকিয়ে আছে। এ থেকে বাঁচতে হলে জানতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে জানা ও মানার তাওফিক দান করেন। আমীন।

ঘুষ (Hush Money) : পরিচিতি, তাৎপর্য ও বিধান

৩. ১. শুরু কথা

'ঘুষ' আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত একটি বিষয়। ছোট-বড় বহু কাজে ঘুষের অহরহ লেনদেন হয়। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষরূপী অমানুষ পকেট ভারি করছে ঘুষ দিয়ে। বিনষ্ট হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য।

অপরদিকে যারা শরীয়াহ অনুসরণ করে চলতে আগ্রহী, তারা ভয়ে ঘুষ থেকে বিরত থাকেন। তবে কখনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন। কখনো ঘুষ মনে করে অনেক কিছু ত্যাগ করে বসেন। যা না করলেও হয়।

বস্তুত ঘুষকে সমাজ থেকে মূলোৎপাটন করতে এর পার্থিব-অপার্থিব ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে জানা উচিত। এর থেকে বাঁচতে এ ব্যাপারে সচেতনতার বিকল্প নেই। ঘুষ প্রদানে একান্ত বাধ্য হলে কি করণীয়—তাও জানা থাকা উচিত। এসব বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনা করা হলো।

শাব্দিক পরিচিতি

বাংলায় : ঘুষ, উৎকোচ, উপরি, পকেট মানি ইত্যাদি। বাংলা একাডেমী এর অর্থ লিখেছে—অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক।[1]

১ বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।

ইংরেজিতে : Hush| Oxford Advanced Learners' Dictionary এর মধ্যে এর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এভাবে— To stop talking or crying, etc (As verb), A period of silence (As noun)। অর্থাৎ, কথা বলা বা কান্না বন্ধ করানো। নিরবতার মুহূর্ত।[১]

এরপর Hush Money এর অর্থ লেখা হয়েছে—

Hush money : that is paid to sb to prevent them for giving other people information that would be embarrassing or damaging.

অর্থাৎ 'হাশ মানি' বা 'ঘুষ' হলো, অন্য কাউকে বিব্রতকর বা ক্ষতিকর তথ্য প্রদান থেকে বিরত রাখার জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করা।

আরবী : الرشوة : مثلثة الراء (আর রিশ্ওয়াহ)। বহুবচন : 'রুশা' (الرُّشَا) ও 'রিশা'(الرشا) । 'শব্দটির মূল হলো, পাখির ছানা বা মুরগীর বাচ্চা নিজ মাথা মায়ের দিকে এগিয়ে দেয়, যেন মা নিজ ঠোঁট দিয়ে বাচ্চার মুখে খাবার তুলে দিতে পারে।'[২]

কেউ বলেছেন, শব্দটির মূল হলো, 'রিশাউন' (رشاء) তথা বালতির রশি। এমন রশি যার দ্বারা পানি পর্যন্ত পৌঁছা যায়। যেমন, কূপের রশি।[৩]

উপর্যুক্ত আভিধানিক অর্থগুলোর সাথে ঘুষের মূল কথার বেশ মিল রয়েছে। কারণ, এসব অর্থের মূল কথা হলো, কিছু পাওয়ার জন্য কিছু এগিয়ে দেওয়া। যা ঘুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। হাদীসে উক্ত শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআনুল কারীমে ঘুষ বোঝানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো, 'সুহ্ত' (السحت) যেমন—

سَمّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّٰلُونَ لِلسُّحْتِ.

---

১ P.764

২ লিসানুল আরব।

৩ আন নিহায়া।

‘তারা (ইহুদী ধর্মগুরুগণ) অতি আগ্রহের সাথে মিথ্যা শোনে এবং প্রাণভরে হারাম (উৎকোচ) খায়।’[১]

ইমাম জাসসাস রহ. ‘সুহ্‌ত’ শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—

إن اصل السحت الاستيصال ... فسمى الحرام سحتا لأنه لا بركة فيه لأهله ويهلك به صاحبه هلاك الاستيصال.

অর্থাৎ ‘সুহ্‌ত’ শব্দের মূল অর্থ হলো, কোনো কিছু মূল থেকে উপড়ে ফেলা।....শরীয়তে ‘হারাম’কে ‘সুহ্‌ত’ বলা হয় এ কারণে যে, হারাম সম্পদে কোনো বরকত থাকে না। হারাম সম্পদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমূলে ধ্বংস করার মতো ধ্বংস করে দেয়।’[২]

সারকথা

‘সুহত’ হলো কোনো কিছুকে তার শেকড়সহ তুলে নষ্ট করে দেওয়া। শেকড় ছিন্ন করে ধ্বংস করা। উক্ত আয়াতে ‘সুহ্‌ত’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঘুষ। হযরত আলী রা., ইবরাহীম নাখায়ী রহ., হাসান বসরী রহ., মুজাহিদ রহ., কাতাদাহ রহ., দাহহাক রহ. প্রমুখ সালাফে সালেহীন এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[৩]

কুরআন মাজীদে ঘুষকে ‘সুহত’ বলার কারণ হলো, এটি শুধু দাতা-গ্রহীতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। বরং পুরো দেশ ও জাতিকে সমূলে বরবাদ করে ছাড়ে। ঘুষ দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ, ডাক্তারি সার্টিফিকেট গ্রহণ, বিচারক হওয়া ইত্যাদি। এসবের ফলাফল জাতি ও দেশের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ।

আরবী ভাষায় ঘুষদাতাকে বলা হয়, ‘আর রাশী’ (الراشي), ঘুষগ্রহীতাকে বলে, আল মুরতাশী (المرتشي)।

---

১ সূরা মায়েদা : ৪২

২ আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস রহ., খ. ২, পৃ. ৩৩

৩ প্রাগুক্ত।

৩. ২. পারিভাষিক পরিচিতি

ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ থেকে

কুয়েত ওয়াকফ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ *মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়্যা* গ্রন্থে 'ঘুষ' এর পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

> الرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.
>
> 'পরিভাষায় 'রিশওয়া' বলা হয়, নিজের হীন স্বার্থে কারো কোনো হক বাতিল করার জন্য অথবা কোনো বাতিলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাউকে কিছু প্রদান করা।'[১]

পাকিস্তানের মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর পরিচিতি দিয়েছেন এভাবে—

'যে কাজের বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়, তার বিনিময় গ্রহণ করা। যেমন—যে কাজটা করা ব্যক্তির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, যা তার ওপর ফরয—এমন কাজের বিনিময়ে কারো থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই হলো ঘুষ।'[২]

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের গবেষক আলেম আল্লামা ফাতাহ লখনভী রহ.-এর পরিচিতি পেশ করেছেন এভাবে—

'এমন সম্পদ যা নিজের পক্ষে ফায়সালা প্রদানের জন্য অথবা অন্যায় কোনো কাজ নিজের স্বার্থে করানোর জন্য প্রদান করা হয় সেটাই ঘুষ।'[৩]

ইমাম সারাখসী রহ. রিশওয়ার একটি ব্যাখ্যা এভাবেও করেছেন, 'যেখানে অতিরিক্ত সম্পদের দাবি করা যায় না। যেমন, কেউ কারো কোনো দায়ের বিপরীতে কাফিল হয়েছে। তবে শর্ত দিয়েছে, এই দায়িত্বের বিপরীতে তাকে কিছু সম্পদ বা টাকা প্রদান করতে হবে। তিনি বলেছেন এটি রিশওয়াহ। কারণ বলেছেন,

---

১ খ. ২২, পৃ. ২২০

২ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ১৫১

৩ ঈতরে হিদায়া, পৃ. ২৫৩

فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال. فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته.

'কারণ এখানে অর্থের প্রত্যাশী এভাবে কাফালাহ্ চুক্তির কারণে অতিরিক্ত কোনো অর্থের দাবি করতে পারে না। সুতরাং এর বিপরীতে সে কোনো বিনিময় পাবে না।'[1]

বোঝা গেল, কোনো সম্পদের বিনিময় ছাড়া কিছু দাবি করা অথবা যেখানে বিনিময় নেওয়া যায় না, সেখানে বিনিময় চেয়ে বসাও রিশওয়াহ।

সারকথা

ওপরের আলোচনা থেকে রিশওয়াহর তিনটি দিক সামনে এসেছে। যথা—

১. দাতা : নিজের অবৈধ কোনো স্বার্থ উদ্ধার, বাতিলকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা, সত্যকে বাতিল হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য অর্থ ব্যয় করা।

২. গ্রহীতা : নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আরো অতিরিক্ত অর্থ চেয়ে বসা।

৩. বিনিময়হীন : যেখানে বিনিময় নেওয়া যায় না, বিপরীতে কোনো সম্পদ নেই। এমন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা।

মূলত উক্ত তিন দিক থেকে রিশওয়াহ হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথম দুটি দিক আমাদের সমাজে ঘুষ নামে পরিচিত। কিন্তু তৃতীয় দিকটি সেভাবে পরিচিত নয়। অথচ শরীয়তে এটিও ঘুষ বা রিশওয়াহ।

অথবা এভাবে বলুন, প্রচলিত ঘুষ ইসলামে নিষিদ্ধ রিশওয়ার একটি বৃহৎ প্রয়োগ। তবে প্রচলিত ঘুষ মানেই রিশওয়াহ নয়। রিশওয়াহর প্রয়োগ আরো বিস্তৃত। এ জন্য যেমন রিবাকে সুদ না বলে, রিবা বলা উচিত, তেমনি রিশওয়াহকে ঘুষ না বলে, রিশওয়াহ বলা উচিত। অবশ্য সহজে বোঝানোর জন্য ঘুষও বলা যেতে পারে।

---

১ মাবসূত, ২০/৩২

৩. ৩. ঘুষের তাৎপর্য

'ঘুষের' মূল তাৎপর্য হলো, 'আল আকলু বিল বাতিল' বা অন্যায়ভাবে বিনিময় ছাড়া কারো সম্পদ ভক্ষণ করা। এটিই এর মূল কথা। এটি যেমন, প্রচলিত ঘুষের মাঝে পাওয়া যায়, তেমনি বিনিময়হীন প্রাপ্তি হলে, সেটিও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, কোনো সমিতিতে মুদারাবা হিসাবে অর্থ জমা দিতে হলে প্রথমে অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিয়ে সমিতির সদস্য হতে হবে। এখানে অতিরিক্ত অর্থ বিনিময়হীন প্রাপ্তি। এটিও শরঈ দৃষ্টিতে রিশওয়াহ।

ইসলামী অর্থনীতিতে 'আল আকলু বিল বাতিল' কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে— وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।'[১]

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. 'আল আকলু বিল বাতিল' এর মধ্যে 'ঘুষ'-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২]

৩. ৪. ঘুষের বিধান

১. নিশ্চিতভাবে তা হারাম। সকল যুগের সকল ফকীহ ও মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত।[৩]

২. ঘুষে প্রাপ্ত সম্পদে গ্রহণকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৩. দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গুনাহগার, ফাসেক ও অভিশপ্ত।

৩. ৫. ঘুষ হারাম হওয়ার দলিল ও এর ভয়াবহতা

৩. ৫. ১. কুরআন মাজীদ থেকে :

ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا

---

১ সূরা বাকারা : ১৮৮

২ সংশ্লিষ্ট আয়াত, আহকামুল কুরআন, জাসসাস রহ.।

৩ আহকামুল কুরআন, জাসসাস রহ., খ. ২, পৃ. ৩৩

فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

'তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। এবং এই উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোনো অংশ জেনে-শুনে গ্রাস করার গুনাহে লিপ্ত হবে।'[১]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. 'তারা (ইহুদি ধর্মগুরুগণ) অতি আগ্রহের সাথে মিথ্যা শোনে এবং প্রাণভরে হারাম (উৎকোচ) খায়।'[২]

আয়াতটির প্রেক্ষাপট

মদীনায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করলেন। মদীনায় ইহুদিদেরও আবাস ছিল। তারা স্বচক্ষে ইসলামের বাহিরের চিত্তাকর্ষক রূপ প্রত্যক্ষ করল। তারা দেখল, তাদের ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্ম পালনে কঠোরতা নেই। সহজ বিধান দেওয়া হয়।

সময়টা ছিল তখন এমন যে, ইহুদিরা তাওরাতের কঠিন শাস্তিগুলোকে সামান্য উৎকোচের বিনিময়ে পরিবর্তন করে নিত। নবীজি সা. মদীনায় আগমনের পর তারা চিন্তা করল, তাওরাতের বিধান পাল্টানোর চেয়ে সহজ হলো, আমরা নবীর কাছে যাব।

কারণ তিনি সহজ ফায়সালা দেন। তাকে আমরা বিচারক হিসাবে মেনে নিব। যেন তাঁর শরীয়তের সহজ বিধান থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। এতে ঘুষ গ্রহণ করে তাওরাত পরিবর্তনের অপরাধেও আর জড়াতে হবে না।

উক্ত খারাপ কাজের পাশাপাশি তারা আরেকটি কাজও করেছিল। তা হলো, নবীকে হাকাম বা বিচারক বানানোর আগে লোক পাঠিয়ে উদ্দিষ্ট বিষয়ে ফতোয়া জেনে নিত। উক্ত ফতোয়া তাদের অনুকূলে হলে

১ সূরা বাকারা : ১৮৮

২ সূরা মায়েদা : ৪২

এরপরই চূড়ান্তরূপে নবীকে হাকাম বা বিচারক হিসাবে মেনে নিত। আর অনুকূল না হলে বিচারের জন্য আর নবীর কাছে আসত না।

এসব হীন উদ্দেশ্যে তারা নবীজি সা.-এর নিকট আগমন করত। এ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ পাক একদিন নবীর কাছে আসা উক্ত ইহুদি মুনাফিকদের আসল চেহারা উন্মোচিত করে দিলেন। তাদের মনের কথা জানিয়ে দিলেন। আর বললেন, তাদের ফায়সালা করা না করা আপনার ইখতিয়ারাধীন। এরই সাথে ইহুদিদের কিছু খারাপ স্বভাবের কথাও জানিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে সচেতন ও সতর্ক করা। তারা যেন এসব খারাপ স্বভাব গ্রহণ না করে।

যাই হোক, তাদের সেসব খারাপ স্বভাবের একটি ছিল ঘুষ গ্রহণ। ইহুদি ধর্মগুরুগণ উৎকোচ প্রদানের শর্তে তাওরাতের বিধান পরিবর্তন করে দিত।

আমাদের সমাজেও দেখা যায়, কিছু লোক অর্থের লোভে পড়ে শরীয়াহর নানা বিধানের ব্যাপারে সত্য কথা বলে না। সত্যের সামনে মাথা নত করে দেয়। মনে রাখতে হবে শরীয়ত খেলনার বস্তু নয়। দুনিয়া কামানোর জন্য নয়। পালনের বিষয়। মান্যতার বিষয়।

৩. ৫. ২. হাদীস শরীফ থেকে

عن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর লানত করেছেন।'[১]

প্রিয় পাঠক, 'লানত' বা 'অভিশাপ' অত্যন্ত ভয়াবহ জিনিস। 'লানত' বলা হয়, الإبعاد عن رحمة الله তথা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করা। আর এটি করেছেন স্বয়ং নবীজি সা.। ঘুষ গ্রহণ করে কারো অনেক আয় হলো। কিন্তু আল্লাহর রহমত তার সাথে নেই। সে নিরাপদ

১ জামে তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৭। قال الترمذي (١٣٣٧) : حسن صحيح

নয়। যেকোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। (আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। সঠিক বুঝ দান করুন।)

৩. ৬. ঘুষের প্রকার ও বিধান

ঘুষের আদান-প্রদানের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। কখনো দাতা-গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম হয়। কখনো কেবল গ্রহীতার জন্য। নিম্নে সবিস্তারে তা উল্লেখ করা হলো :

৩. ৬. ১. দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম

এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যথা :

১. ঘুষের মাধ্যমে বিচারকের পদ বা অন্য কোনো পদ গ্রহণ।
২. বিচারকের নিকট ঘুষ প্রদান করা। যেন তার পক্ষে ফায়সালা প্রদান করে। চাই ফায়সালা ন্যায় হোক বা অন্যায়।
৩. কারো আর্থিক বা ইজ্জত-আবরু ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য অর্থ আদান-প্রদান করা।
৪. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য অর্থ আদান-প্রদান করা।
৫. চাকরির যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অর্থের বিনিময়ে চাকরি প্রদান ও গ্রহণ।

৩. ৬. ২. শুধু গ্রহীতার জন্য হারাম

তা হলো, জানের ভয় থাকলে অথবা সম্পদের ভয় থাকলে তা দূর করার জন্য প্রদেয় ঘুষ। যেখানে দাতা হকের ওপর থাকে। ঘুষ না দিলে যুলুমের শিকার হবে। এক কথায় :

- যেখানে দাতা হকের ওপর থাকে।
- কোনো হকদারকে বঞ্চিত করা হয় না।
- কোনো বৈধ কাজ উদ্ধারের জন্য কিছু না দিলে যুলুমের শিকার হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকা।

এসব ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানে বাধ্য হলে আশা করা যায় আখেরাতে পাকড়াও হবে না। তবে গ্রহীতা সর্বাবস্থায় পাকড়াও হবে। যেমন, কখনো দেখা যায়, পাসপোর্ট করার সময় পুলিশ ভেরিফিকেশনে দায়িত্বশীল পুলিশকে অর্থ প্রদান না করা হলে ছাড়পত্র প্রদান করে না। এক্ষেত্রে প্রথমে পুলিশকে বোঝাতে হবে, যেন ঘুষ না দিতে হয়। একান্ত দিতে বাধ্য হলে যুলুম থেকে বেঁচে থাকার নিয়তে উৎকোচ দেওয়া যাবে, তবে নেওয়া হারাম।

হাদীসের পূর্বোক্ত ধমকি বাণী এক্ষেত্রে দাতার জন্য প্রযোজ্য নয়। সালাফে সালেহীন থেকে এর প্রমাণ রয়েছে।

জাবির ইবনে যায়েদ ও শা'বী রহ. বলেন, ব্যক্তি নিজের প্রতি বা সম্পদের প্রতি যুলুমের আশংকা করলে অতিরিক্ত কিছু প্রদানে দোষ নেই। আতা রহ. ও ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত, নিজ সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য কিছু প্রদান দূষণীয় নয়। তাবেয়ী মুজাহিদ রহ. চমৎকার কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন,

> اجعل مالك جنة دون مالك ولا تجعل دينك جنة دون مالك.
>
> 'তোমার ন্যায্য সম্পদ রক্ষার জন্য তোমার অন্য সম্পদকে ঢাল বানাতে পার। তবে তোমার দীনকে সম্পদ রক্ষার জন্য ঢাল বানাবে না।'

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. উপর্যুক্ত সালাফে সালেহীনের বক্তব্য উল্লেখের পর লিখেছেন—

> فهذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن نفسه بمايدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك عرضه.
>
> 'এসব বক্তব্যে সালাফে সালেহীন যে অবকাশ দিয়েছেন সেটা হলো, যে যুলুম করতে চায় অথবা ইজ্জত-আবরু ক্ষুণ্ন করতে চায় তাকে কিছু দিয়ে যুলম প্রতিহত করা।'[১]

১ আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খ. ২, পৃ. ৪৩৪

৩. ৬. ২. ১. বিশেষ লক্ষণীয়

তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয় ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য রাখা জরুরি। যথা—

১. আসলে আপনি যুলুমের শিকার, নাকি তা কৃত্রিম তা অবশ্যই একজন মুফতি সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নিন।

২. ঘুষ প্রদান ব্যতীত ভিন্ন বৈধ পথে সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, ঠেকায় পড়ে মল খাওয়া বৈধ হলেও সেটা কিন্তু মলই থেকে যায়। মিষ্টি হয় না। ঘুষ গ্রহণ যেমন অপরাধ, প্রদানও অপরাধ।

৩. কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন এর থেকে আল্লাহ হেফাযত করেন। ভিন্ন পথে সমস্যার সমাধান করে দিন।

৪. ঘুষ নিশ্চিত হারাম। সমাজ ও দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তা মনে রাখতে হবে। তাই ঘুষ গ্রহীতাকে যথাসম্ভব নসিহত করতে হবে। যেন ঘুষ না দিতে হয়।

৫. একান্ত বাধ্য হলে, সরাসরি ঘুষ না দিয়ে কৌশল অবলম্বন করা। যেমন, ভিন্ন কোনো ছোট কাজ করিয়ে বিনিময় হিসাবে টাকা প্রদান করা।

এসব প্রচেষ্টা অবলম্বন করেও কোনো সুরাহা না হলে বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের সাথে পরামর্শ করত ঘুষ প্রদান করা যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, ধারাবাহিকভাবে এসব প্রচেষ্টা অবলম্বন না করে সহজে নিজেকে মাযলুম মনে করে ঘুষ প্রদানের শর্টকাট রাস্তা বের করে নেওয়া কখনই উচিত নয়। এতে সমাজ থেকে কখনোই ঘুষ দূর হবে না। ঘুষ প্রদানও বৈধ থাকবে না। আলেমদেরও উচিত, ঘুষ প্রদানের অনুমোদন দেওয়ার আগে ভালো করে ভেবেচিন্তে দেওয়া।

৩. ৬. ৩. ঘুষ ও হাদিয়া

সাধারণত হাদিয়া হলো, একে অপরের প্রতি মহব্বত বা শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য প্রদেয় সম্পদ বা বস্তু। এর বিপরীতে পার্থিব কোনো অবৈধ স্বার্থ হাসিল করা উদ্দেশ্য থাকে না। কোনো কিছুর বিনিময়েও হয় না।

বিনিময় হলে সেটি হয় পারিশ্রমিক। আর পার্থিব কোনো অবৈধ স্বার্থ হাসিল করার জন্য হলে সেটি হয় ঘুষ।

তবে বাস্তবে কখনো ঘুষ ও হাদিয়ার মাঝে পার্থক্য বুঝতে হিমশিম খেতে হয়। দেখা যায়, হাদিয়া বলে প্রদান করছে, কিন্তু মনের মাঝে সন্দেহ থেকে যায়। ঘুষ হয়ে যাচ্ছে কি না।

এক্ষেত্রে এ্যাওফি তাদের 'কোড অব ইথিকস' (নৈতিকতার শরীয়াহ মানদণ্ড)-এ একটি চমৎকার মানদণ্ড দিয়েছে। এটি অবলম্বন করে খুব সহজেই হাদিয়া ও ঘুষের মাঝে পার্থক্য করা যায়। সংক্ষেপে কিছু ব্যাখ্যাসহ তা তুলে ধরা হলো।

কেউ যখন হাদিয়া নামে কোনো কিছু প্রদান করবে, সেক্ষেত্রে তা বাস্তবেই হাদিয়া, না অন্য কিছু, তা নির্ণয় করতে পর্যায়ক্রমে চারটি মানদণ্ড অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। যথা—

১. অভিপ্রায়/নিয়ত যাচাই (Intention) : প্রথমে দাতার অভিপ্রায় যাচাই করুন। কেন সে হাদিয়া নামে কিছু দিতে চাচ্ছে। যদি এমন হয়, গ্রহীতা উক্ত হাদিয়া গ্রহণের ফলে কোনো কিছু করে দিতে 'বাধ্য হওয়া' অনুভূত হয়। অথবা কোনো সুবিধা হাসিল করতে প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে। সেই সুবিধা হতে পারে আর্থিক কোনো সুবিধা বা অন্য কিছু। হতে পারে বড় কিছু বা ছোট কিছু। তাহলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। যেমন, গ্রীজ পেমেন্ট (Grease payments) গ্রহণ বৈধ নয়। এটি হলো, সরকারী কোনো অফিসারকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা। যেন সে নির্দিষ্ট কাজটি করে দেয়।

২. প্রদত্ত বস্তুর ভ্যালু বা মান নির্ণয় (Value) : অভিপ্রায় নির্ণয়ের মাধ্যমে যদি যাচাই করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে হাদিয়ার নামে প্রদত্ত বস্তুর মান নির্ণয় করা হবে। দেখা হবে, সেটির আর্থিক ভ্যালু কেমন। সেটি কি ভারী কোনো বস্তু, না নাম মাত্র সৌজন্যমূলক কিছু। যদি নামমাত্র সৌজন্যমূলক হয়, যা সবাইকেই দেওয়া হয় এবং এর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা, তাহলে তা গ্রহণে সমস্যা নেই। যেমন, ডাক্তারদেরকে ঔষধ কোম্পানি বিভিন্ন কলম, প্যাড, মগ, ক্যালেন্ডার হাদিয়া দিয়ে থাকে। ওগুলোতে কোম্পানির নাম লেখা

থাকে। গ্রহীতা এগুলো ব্যবহার করা থেকে দাতা কোম্পানির প্রচারণা হয়ে যায়। (অবশ্য যদি গ্রহীতা জানতে পারে, এই কোম্পানির পণ্য বা সেবার মান ভালো নয়; তাহলে সেক্ষেত্রে বিরত থাকবে। যেন কেউ প্রতারিত না হয়।)

৩. সময় নির্ণয় (Timing) : হাদিয়ার নামে প্রদত্ত বস্তু যদি ভারি কিছু হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে কোন মুহূর্তে বা সময়ে তা দেওয়া হচ্ছে। যদি দেখা যায়, বড় কোনো লেনদেন বা চুক্তি বা প্রজেক্টের প্রারম্ভে বা আলোচনাকালীন বা চূড়ান্তকরণের সময় দেওয়া হচ্ছে, তাহলে তা সর্তকতামূলক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

৪। পদ্ধতি (Manner) : ভারী কোনো বস্তু যদি হাদিয়ার নামে দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সর্বশেষ তা প্রদানের পদ্ধতি বা আচরণ যাচাই করতে হবে। যথা—ক. হাদিয়া প্রদানের বিষয়টি গোপন রাখতে হবে না। খ. কোনো প্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করবে না। গ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে লিখিত ছাড়পত্র আছে। এমন হলে তা গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় গ্রহণ করা যাবে না।

পরের পৃষ্ঠায় একটি ছকের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

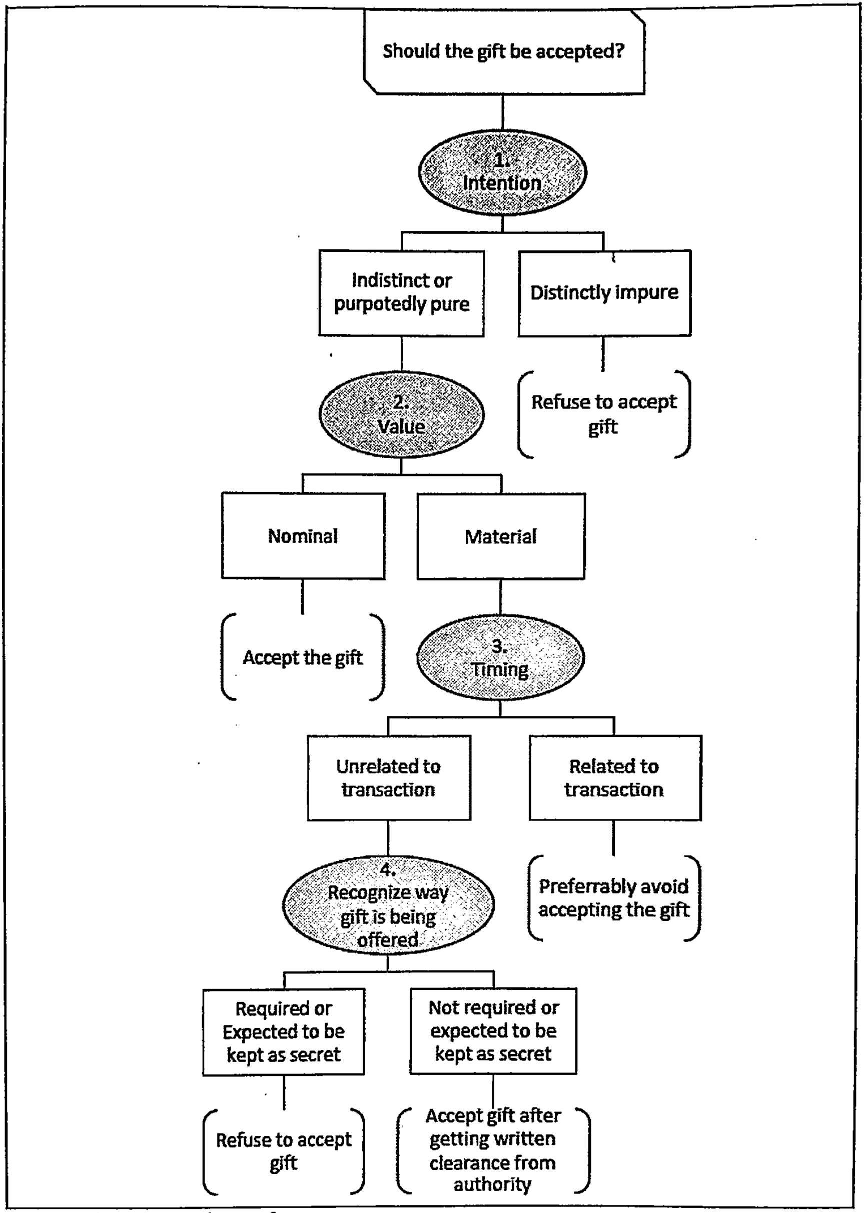

Fig. 11: Bribery disguised as a gift

৩. ৬. ৪. পারিশ্রমিক ও ঘুষ

পারিশ্রমিক আসে কোনো কাজের বিনিময়ে। কারো থেকে কোনো কাজ করিয়ে তাকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু প্রদান করা বৈধ। কখনো দেখা

যায়, পারিশ্রমিক ও ঘুষের মাঝে তফাৎ করতে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে ঘুষ থেকে পারিশ্রমিককে আলাদা করতে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে—

১. গ্রহীতা আপনার কোনো কাজ করে দিবে। সেটি ছোটও কোনো কাজও হতে পারে। যেমন, ডকুমেন্টস-এ কোনো ভুল আছে কি না তা যাচাই করে দিবে। সেটি হতে পারে বানান ভুল চেকিং করার কাজ। অথবা অন্য কিছু। তবে কাজটি এমন হতে হবে, যা মূল্যমান (Valuable) বিশিষ্ট।

২. কাজটি এমন হতে হবে, যা গ্রহীতার ওপর পূর্ব থেকেই করে দেওয়া আবশ্যিক নয়। এটি তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। অতিরিক্ত কাজ হতে হবে।

৩. কাজের পারিশ্রমিক শুরুতেই উভয় পক্ষের জ্ঞাত থাকতে হবে।

উক্ত মানদণ্ডের আলোকে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো—

- অনেকে অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত দালালের মাধ্যমে পাসপোর্ট করিয়ে নেন। কেউ একে ঘুষ মনে করেন। বাস্তবে তা ঘুষ নয়। পারিশ্রমিক।
- দালালের মাধ্যমে ট্রেনের টিকিট বা বাসের টিকিট সংগ্রহ করা। এটিও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বৈধ।
- কোনো অফিসে ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে। অফিসের দারোয়ান বা সহকারী কাউকে দিয়েও কাজটি করিয়ে নিতে পারেন। কাজটি যদি ওই লোকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত না থাকে এবং এতে কারো হক নষ্ট না হয় তাহলে কিছু টাকার বিনিময়ে এ ধরনের কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

এভাবে নানা ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত মানদণ্ডের আলোকে পারিশ্রমিককে আলাদা করে নির্ণয় করতে পারলে সেটি ঘুষ থেকে বের হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে বিষয়টি কখনো জটিল হয়ে যেতে পারে, তাই বিজ্ঞ কোনো মুফতি সাহেবের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে করাই নিরাপদ।

৩. ৭. ঘুষের প্রচলিত কিছু উদাহরণ

আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে ঘুষ প্রদানের রেওয়াজ আছে। সেগুলো থেকে মোটা দাগের প্রচলিত কিছু প্র্যাক্টিস নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো। যেন আমরা সহজে এর থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

৩. ৭. ১. পিয়নকে ঘুষ প্রদান

মালিক বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো বিষয় উত্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষের পিয়ন বা কাছের কাউকে ঘুষ প্রদান। এক্ষেত্রে বিধান হলো, কাজটি বিশেষভাবে করে দেওয়া যদি পিয়ন বা কাছের লোকটির দায়িত্বে না পড়ে, এতে কারো হক নষ্ট না হয় তাহলে এক্ষেত্রে কিছু গ্রহণ করা হারাম নয়।[১]

পক্ষান্তরে কাজটি যদি পিয়নের দায়িত্বে থাকে তবে এর জন্য আলাদা অর্থ আদান-প্রদান করা সম্পূর্ণ ঘুষ বলে বিবেচিত হবে। দাতা-গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম।

অবশ্য কাজের শুরুতে যদি কোনোরূপ চুক্তি না হয়, কাজ শেষ করার পর দাতা স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তবে তা উত্তম বদলা হবে। ঘুষ নয়। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে (যেখানে পূর্বে কোনো চুক্তি বা সমঝোতা থাকে না) ঘুষের নিয়ত না করে উত্তম বদলা প্রদানের নিয়ত করা যেতে পারে। তেমনি সে চাইলে সেটাও হাদিয়ার নিয়তে দিলে আশা করা যায়, ঘুষ থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

৩. ৭. ২. নিজের অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের জন্য ঘুষ গ্রহণ

যে কাজটি করে দেওয়া ব্যক্তির দায়িত্বে পড়ে সে কাজের জন্য অতিরিক্ত গ্রহণ করা ঘুষ। যেমন—সরকারি বিভিন্ন লোকজন ফাইল আটকে রাখে বা দেরি করে। ঘুষ না দিলে কাজ করে না।

৩. ৭. ৩. কন্যা বিয়ে দিয়ে ঘুষ গ্রহণ

মেয়ে বিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা। এটিও ঘুষ। যেমন—

---

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৫৫

বলল, আমাকে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করলে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেব।

৩. ৭. ৪. বিচারকের ঘুষ গ্রহণ

এটি অত্যন্ত মারাত্মক একটি অন্যায়। হযরত উমর রা.-সহ সালাফের অনেকে একে 'সুহত' না বলে কুফুর বলেছেন। এতে বোঝা যায়, তারা একে কতটা মারাত্মক অন্যায় কাজ মনে করতেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে গ্রামের স্থানীয় মুরুব্বী ও বিচারকদের কেউ কেউ উভয়পক্ষ থেকে ঘুষ নিয়ে বিচার করে থাকে।

এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ অত্যন্ত কঠোর। যেমন, ঘুষ নিয়ে কেউ বিচারক হলে তার ফায়সালা কার্যকর হবে না। অর্থাৎ সে বিচারকই হবে না। তেমনি কেউ সঠিক পথে বিচারক হয়েছে; কিন্তু ঘুষ গ্রহণ করে ফায়সালা প্রদান করে, তাহলে তার সেই বিশেষ ফায়সালা কার্যকর হবে না।[১]

৩. ৭. ৫. শিক্ষকের ঘুষ গ্রহণ

পরীক্ষার সময় শিক্ষকের বাসায় ছাত্রের অভিভাবক কর্তৃক হাদিয়া প্রেরণ। এর বিধান হলো, যদি পূর্ব থেকেই হাদিয়া আদান-প্রদানের নিয়ম থাকে তবে এতে দোষের কিছু নেই। এরপরও বিরত থাকা ভালো। আর যদি এমন হয় যে, কেবল পরীক্ষার সময়ই হাদিয়া দেওয়া হচ্ছে তবে সেটা নেওয়া যাবে না।[২]

---

১ আলবাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ৪৩৯

২ অধমের আব্বা স্কুলের শিক্ষক। পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে কিছু কিছু অভিভাবককে দেখতাম তারা বাসায় ঘন ঘন মিষ্টির প্যাকেট পাঠিয়ে দিত। আমার আব্বা সেগুলো ফিরিয়ে দিতেন। কোনটা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব না হলে সযত্নে সেগুলো আমাদেরকে না দিয়ে ফকির-মিসকিনকে বিলিয়ে দিতেন। আর আমাদের জন্য বাজার থেকে নিজে মিষ্টি কিনে নিয়ে আসতেন। অথবা আমাদেরকে বাজারে নিয়ে দোকানে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়াতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

৩. ৭. ৬. ট্রাফিক পুলিশ ও ঘুষ

বর্তমানে কিছু পুলিশ কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত সুবিদিত। তবে এটি সব পুলিশ যে করেন এমন নয়; অনেক ভালো পুলিশও আছেন। কিছু পুলিশ কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চিত দিকটি হলো, ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ। এখানে এর কয়েকটি সুরত হতে পারে। যথা :

১. সব কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও শুধু হয়রানি করার উদ্দেশে উপরি চাওয়া। না দিলে মুসিবতে ফেলে দেবে। চালান করে দেবে। এমন ক্ষেত্রে যুলুম প্রতিহত করার জন্য অর্থ প্রদান করা যাবে।

২. ইচ্ছা করে কাগজ ঠিক না করা। যেমন—অনেকে লাইসেন্স করে না। মনে করা হয়, লাইসেন্স করতে অনেক টাকা ব্যয় হবে। এরচেয়ে ঘুষ দিয়ে চলে যাই। এটি অন্যায়। দুটি অন্যায় একসাথে।

এক. সরকারি বৈধ আইন লঙ্ঘন।

দুই. ঘুষ প্রদানের জঘন্য গুনাহ।

এমন ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান কখনোই বৈধ নয়।

পুলিশ ভাইয়েরা প্রশ্ন করেন, আমাদের তো বেতন অল্প। তা দিয়ে সংসার চলে না। তাই বাধ্য হয়ে ঘুষ গ্রহণ করতে হয়।

মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানভী রহ.-এর জবাব দিয়েছেন এভাবে, 'এটি সঠিক, এত অল্প বেতনে জীবন চালানো কঠিন। তবে এটিও মনে রাখতে হবে, দুনিয়াতেই যদি অন্যায় পথে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য জীবন কাটিয়ে দেন, তাহলে আখেরাতে এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে।'[১]

আসলে আপনার আগেই ভাবা উচিত, যদি মনে করেন পুলিশের চাকরি করে জীবন চলবে না। দুর্নীতি করতে হবে। তাহলে আগেই অন্য চাকরি নির্বাচন করা উচিত।

৩. ৭. ৭. অফিসের বসকে হাদিয়া প্রদান

অফিসের বস বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হাদিয়া প্রদান। যেন সে দাতার

---

১ আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল, খ. ৭, পৃ. ২২০

প্রতি সহনশীল থাকে। এক্ষেত্রে হাদিয়া প্রদানের তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা :

১. অযথা কঠোরতা যেন না করে, নরম থাকে। এটি বৈধ।

২. অন্যায় কাজে যেন সহযোগিতা করে, কিছু না বলে। এটি বৈধ নয়।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কোনো যুলুম প্রতিহত করার জন্য। এটি বৈধ।[১]

৩. ৭. ৮. ডোনেশন প্রদানের শর্তে নিয়োগদান

স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই শিক্ষক নিয়োগের সময় শর্ত করা হলো, এ শর্তে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে যে, মাসে বা বছরে আপনার এত টাকা ডোনেশন করতে হবে। তাহলে এটিও ঘুষ। অবশ্য যোগ্যতার ভিত্তিতে যদি নিয়োগ হয় এবং উক্ত শর্ত মানতে বাধ্য হয় তাহলে দাতা হয়তো বেঁচে যাবে।[২]

৩. ৭. ৯. অফিসের কাজ করতে গিয়ে কমিশন গ্রহণ

অফিসের বিভিন্ন কিছু ক্রয়ের জন্য কাউকে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে অফিস বা কোম্পানি প্রতিনিধিকে যদি বিক্রেতা কোনো কমিশন বা ছাড় প্রদান করে, তবে সেটা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এরপর সে অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে হবে। কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে নিজে তা গ্রহণ করা এবং এ কারণে ওই বিক্রেতা থেকেই পণ্য খরিদ করা রিশওয়াহ বলে গণ্য হবে।[৩]

৩. ৭. ১০. অধীনদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ

কলেজের প্রিন্সিপাল। অফিসের বস। কোম্পানির ডাইরেক্টর। শিক্ষক। তাদের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হয় যে, তাদের অধীনস্ত অনেকে তাদেরকে হাদিয়া প্রদান করে থাকে। এর বিধান কী?

যারা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে, মহব্বতের কারণে হাদিয়া দিয়ে

---

১ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, খ. ১৮, পৃ. ৪৬

২ কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১৬, পৃ. ৫৬৭

৩ প্রাগুক্ত।

থাকে তা বৈধ। আর যারা পদের কারণে দিয়ে থাকে, পদ থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, তাহলে তা না নেওয়া উচিত। এটি বোঝার একটি উপায় হলো, যদি এ পদে আপনি না থাকেন বা না হতেন তাহলে কি তারা হাদিয়া দিত? উত্তর 'না' হলে এর থেকে বিরত থাকেন।

হ্যাঁ, অনেকের সাথে পদে আসার পর পরিচয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে কী করবেন?

আসল কথা হলো, যাচাই করে দেখুন, তা হাদিয়া না ঘুষ। পূর্বোক্ত 'ঘুষ ও হাদিয়া মানদণ্ড' অনুসরণ করা উচিত। সন্দেহ হলে বিরত থাকুন। গ্রহণ করবেন না। ফিরিয়ে দিতে না পারলে সদকা করে দিন।

৩. ৭. ১১. ছাত্র উসতাযকে হাদিয়া প্রদান

এক্ষেত্রে নীতি হলো, পারতপক্ষে ছাত্রদের হাদিয়া গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। বিশেষত কোনো ফায়দা গ্রহণের সন্দেহ হলে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। যেমন—পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এলে হাদিয়া দেওয়া শুরু হয়। এ ছাড়া ছাত্র সাবালক না হলে তার থেকেও হাদিয়া নেওয়া উচিত নয়। অবশ্য সাবালক হলে স্বাভাবিক অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে।

৩. ৭. ১২. চাকরির জন্য ঘুষ প্রদান

বর্তমানে এটি বেশ আলোচিত। সরকারি চাকরিসহ অনেক চাকরিই এখন ঘুষ ছাড়া পাওয়া মুশকিল। এখানে দুটি দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এক. ঘুষের প্রথায় দেখা যায়, কখনো অযোগ্য লোক চাকরি পেয়ে যাচ্ছে।

দুই. যোগ্য লোকও চাকরি পেতে ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রথমত, আমাদের এটি মনে রাখা উচিত, ঘুষ ইসলামে কঠোরভাবে হারাম। যা আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে জেনেছি। দেশ ও জাতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর দুর্নীতি হলো ঘুষ। রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বর্জনের জন্য প্রয়োজন কঠোর আইন। সাথে তাকওয়ার অনুশীলন।

দ্বিতীয়ত, সাময়িকভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু বৈধ হওয়া সামষ্টিক কার্যক্রম বৈধ হওয়া বোঝায় না।

তৃতীয়ত, ঘুষ না দিলে চাকরি পাওয়া যাবে না এমন মনোভাব ত্যাগ করা চাই। আল্লাহর ওয়াদা মনে রাখতে হবে—

> وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
>
> 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন; এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিয্ক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।'[১]

চতুর্থত, গড়ে আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা কম। তাই উলামায়ে কেরাম শরীয়তের সীমায় থেকে ছাড়ের কথা বলেন। আমাদের উচিত, ছাড় নয়; বরং তাকওয়ার ওপর জীবন পরিচালনা করা।

পঞ্চমত, এবার মূল কথায় আসি—

প্রথম দৃশ্য : (ঘুষের মাধ্যমে অযোগ্য লোক চাকরি গ্রহণ) এটি সম্পূর্ণরূপে হারাম। বেতনও হারাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য : (যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া) পূর্বোক্ত কথাগুলো মনে রাখার পর শর্তসাপেক্ষে এক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান বৈধ। তবে গ্রহণ হারাম।

৩. ৭. ১২. ১. শর্তগুলো হলো (ধারাবাহিকভাবে) :

১. প্রথমে ঘুষ ব্যতীত অন্য বৈধ চাকরির তালাশ করা।

২. যথাযথ তালাশ করা সত্ত্বেও না পেলে দেখতে হবে—প্রয়োজন কতটুকু সেটি নিরূপণ করা।

---

১ সূরা তালাক : ২-৩

৩. প্রয়োজন স্বীকৃত ও বাস্তবসম্মত হলে, ঘুষ যেন না দিতে হয় সম্ভাব্য সকল পথে চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে নিরবে চোখের পানি ফেলাও একটি চেষ্টা।

৪. নিয়োগের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো অতিক্রম করা।

৫. নিয়োগ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করা।

৬. অন্য কোনো হকদার বঞ্চিত না হওয়া।

৭. ওপরের সব পালন করা সত্ত্বেও সর্বশেষ শুধু ঘুষ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের মধ্যে দুটি গুণ থাকা শর্ত :

৮. চাকরির যোগ্য হওয়া। এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কারো থেকে নিরপেক্ষ সার্টিফিকেট থাকা।

৯. চাকরি পরবর্তী দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করা।

উপর্যুক্ত যাবতীয় শর্তে ও পূর্বোক্ত ভূমিকাসহ এক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ঘুষ প্রদান করা বৈধ। তবে গ্রহণ করা হারাম।

তদুপরি বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একজন বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের সাথে আলোচনা করে নেওয়া জরুরি।

৩. ৭. ১৩. মেডিকেল টেস্টে ডাক্তারদের কমিশন

বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি ব্যবসা হলো কমিশন বাণিজ্য। ডাক্তারদের সাথে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবগুলোর সাথে আন্তঃযোগাযোগ/চুক্তি থাকে। বিভিন্ন টেস্টের জন্য রোগী প্রেরণ বাবদ ডাক্তারগণ ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো থেকে পেয়ে থাকেন ক্ষেত্রভেদে ৩০%, ৪০%, ৫০% বা তারও বেশি অংকের কমিশন। অর্থাৎ যেখানে একজন রোগী বিভিন্ন টেস্টের জন্য ফি বাবদ ১০০০/- প্রদান করে থাকে সেখানে প্রেরণকারী ডাক্তারের অংশ থাকে ৩০০-৪০০ টাকা। প্রশ্ন হলো, প্যাথলজি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো টেস্টের জন্য ডাক্তারগণ পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী যে কমিশন পেয়ে থাকেন এর বিধান কী?

প্রথমেই জেনে নেই, ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক। মূলত ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক আকদুল ইজারা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একজন রোগী নির্দিষ্ট ফিতে একজন ডাক্তার থেকে ব্যবস্থাপত্র আনতে যাওয়ার অর্থ হলো, এক্ষেত্রে ডাক্তার হলেন আজীর (أجير) তথা অর্থের বিনিময়ে সেবা দান কারী এবং রোগী হলেন মুস্তাজির (مستأجر) তথা সেবাগ্রহণকারী।

রোগীর দায়িত্ব হলো ডাক্তারকে তার অবস্থা জানানো এবং নির্ধারিত ভিজিট প্রদান করা। আর ডাক্তারের দায়িত্ব হলো রোগীর জন্য প্রযোজ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। বাস্তবে হয়েও থাকে তাই।

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসা বিজ্ঞানে নব প্রযুক্তি যোগ হওয়ার পর এখন চিকিৎসকগণ রোগীর ব্যাধি নিরুপণের জন্য বিভিন্ন মেশিনারী ও কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য নিয়ে থাকেন। এ রকম পরীক্ষাকেন্দ্র তথা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তারা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

তৃতীয়ত, ওপরের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেল, মেডিকেল টেস্টগুলো ডাক্তারগণ করিয়ে থাকেন তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব (রোগ নিরূপণ করে সঠিক প্রেসক্রিপশন দেওয়া) যথাযথভাবে আদায়ের সুবিধার্থে। তদ্রূপ কোন ল্যাবে পরীক্ষা করালে ভালো হবে সেটাও বলে দেওয়া ডাক্তারের দায়িত্ব।

মূল জবাব

তিনটি ধাপে উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর এবার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন মেডিকেল টেস্টের চার্জে রোগী প্রেরণকারী ডাক্তারের কমিশন গ্রহণের সুযোগ নেই। কারণ, এক্ষেত্রে কমিশন গ্রহণের অর্থ হলো, ডাক্তার সাহেব নিজ দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যই অন্যের থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে গ্রহণকৃত অর্থ এক প্রকার 'রিশওয়াহ' বা ঘুষের মধ্যে পড়ে যায়।

কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে, ডাক্তার সাহেব তো কমিশন নিচ্ছেন ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে। রোগী থেকে নয়। তিনি উভয়ের মধ্যে

মিডিয়া হিসাবে কাজ করছেন। এটি তার মধ্যস্থতার পারিশ্রমিক।

এর জবাব হলো,

ক. ডাক্তার রোগীকে কোন সেন্টারে প্রেরণ করবেন তা তিনি কমিশন নিয়ে নয়, বরং তার সর্বোচ্চ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে কমিশন লাভের ভিত্তিতে সেন্টার নির্বাচন তার পেশা ও দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

খ. আর একথা কি সত্য যে, ডাক্তারগণ এই কমিশন রোগী থেকে গ্রহণ করেন না? যদিও সরাসরি রোগী থেকে নেওয়া হয় না, বরং ল্যাব থেকে গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রকারান্তরে এ টাকাগুলো যে ভোক্তা তথা রোগীরই তা কি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে!

সারকথা, যে সকল কারণে এ কমিশন প্রথা শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্জনীয় তা নিম্নরূপ—

ক. ডাক্তার তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এমন অনিবার্য কাজের জন্য অতিরিক্ত ফি নিচ্ছেন। এটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

খ. কমিশন ভাগাভাগির কারণে এ দেশের গরিব অসহায় রোগীদের প্রায় দ্বিগুণ অর্থ গুণতে হচ্ছে।

গ. চড়া কমিশন প্রদান করে রোগী পেয়ে যাওয়ার সুবাদে অনেক নিম্নমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার গজিয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। পক্ষান্তরে যদি এই কমিশন প্রথা উঠে যেত তবে সেন্টারগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি হত। সাধারণ মানুষ আরো ভালো সেবা পেত। আর চূড়ান্তরূপে লাভবান হতেন ডাক্তারগণ। কারণ স্বল্প খরচে অনেক রোগী পেয়ে যেতেন।

ঘ. উক্ত কমিশন গ্রহণের কারণে ডাক্তার স্বাধীনভাবে সেন্টার নির্বাচনে বাধাগ্রস্থ হন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করবেন ডাক্তারগণ?

এখন পরিস্থিতি এমন যে, সেন্টারগুলো কমিশন দিবেই। না করলেও পাঠিয়ে দেয়। এর থেকে উত্তরণের উপায় নিম্নরূপ—

ক. টেস্টকারী প্রতিষ্ঠানকে রোগীর বিল থেকে সে টাকা লেস্ করে দেওয়ার কথা বলে দিবেন।

খ. কমিশন বাবদ টাকা রোগীকে রিটার্ন দিয়ে দিবেন। কারণ, এটি মূলত তার হক।

৩. ৭. ১৪. ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ডাক্তার সাহেবদেরকে প্রদেয় উপহার সামগ্রী

বিভিন্ন মেডিসিন প্রস্তুতকারকগণ ডাক্তারদেরকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিয়ে থাকেন। এসব উপহার সামগ্রী বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যথা—

এক. স্টেশনারি সামগ্রী। যেমন, কলম, খাতা, প্যাড, স্ট্যাপলার, স্লিপবক্স ইত্যাদি। এ সকল পণ্যে কোম্পানির বা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ট্রেডমার্ক বা ট্রেডনেম ছাপানো থাকে। এগুলো প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, কোম্পানির প্রচার-প্রসার। এগুলো যে টেবিলেই রাখা হোক তা বিজ্ঞাপনের কাজ দেয়। এমন উপহারের বিধান হলো, উক্ত উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান ও গ্রহণ বৈধ। তবে যদি ডাক্তার জানেন, কোম্পানিটি আসলে ভেজাল; মানুষ প্রতারিত হবে, তবে তাদের প্রচারণা বন্ধ করতে তা গ্রহণ করবেন না।

দুই. প্রি-পেইড মোবাইল রিচার্জ কার্ড, নগদ অর্থ ও আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসবের উদ্দেশ্য হয়, দাতার কোম্পানির ওষুধের নাম লিখার জন্য। এর বিধান হলো, এমন উপহার গ্রহণ অবৈধ। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বিনিময়হীন উৎকোচের শামিল।

আগেই বলা হয়েছে, ডাক্তারগণ রোগীর প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় এনে কোন কোম্পানির কী ওষুধের নাম লিখবেন তা তার পেশাগত দায়িত্বেরই অংশ বিশেষ। এ দায়িত্ব আদায় করে তিনি তৃতীয় পক্ষ থেকে কমিশন বা এ জাতীয় কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। এ কাজের জন্য তো তিনি রোগী থেকেই ভিজিট নিচ্ছেন। সুতরাং এটি পূর্বোক্ত 'আকলুল মাল বিল বাতিল' (অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা—যা সূরা বাকারা ১৮৮নং আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. ৭. ১৫. বিভিন্ন ইসলামী (?) সমিতিতে সূক্ষ্ম ঘুষের প্রচলন

ইসলামের নামে বিভিন্ন সমিতি রয়েছে। তাদের অনেকেরই পুঁজি সংগ্রহের একটি রীতি হলো, পুঁজিদাতা থেকে ফরম এর মূল্য নেওয়া হয়। আবার সদস্য ফি হিসেবেও আরো কিছু অর্থ নেওয়া হয়। এ অর্থগুলোকে ব্যবসার মূলধন হিসেবে ধরা হয় না; বরং মুদারিবের নিজস্ব আয় হিসেবে ধরা হয়। রব্বুল মাল (জমাকারী) থেকে এসব ফি গ্রহণের কোনো বৈধতা নেই। এ ফি ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিতে ঘুষের (রিশওয়াহ) শামিল।

তাছাড়া কোনো কোনো সমিতিতে এ নিয়মও দেখা যায় যে, বার্ষিক বা মাসিক কিস্তি আদায়ে পুঁজিদাতা ব্যর্থ হলে, এভাবে পরপর চার কিস্তি ফেইল করলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। এরপর তা চালু করতে হলে নতুন করে ভর্তি ফি দিয়ে চালু করতে হবে। উক্ত ভর্তি ফি-ও মূলধন হিসেবে ধরা হয় না; বরং সমিতির নিজস্ব আয় হিসেবে ধরা হয়।

এটিও ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে ফরম বাবদ ফি রাখতে চাইলে অর্ধেক খরচ রাখতে পারে। বাকি অর্ধেক মুদারিব বহন করবে।

এক্ষেত্রে করণীয় হলো :

সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া। অথবা পরবর্তী বিনিয়োগে তার মুনাফার হার কমিয়ে দেওয়া। অথবা দানে বাধ্য করা। তবে তা শুরুতেই চুক্তি করে নিতে হবে। একপক্ষীয় দানের ওয়াদা হবে। দানকৃত অংশটি কোম্পানির আয় বলে গণ্য হবে না; বরং সরাসরি দান করে দিতে হবে।

আরো দেখা যায়, কোনো কোনো সমিতির উন্নয়নকর্মী (ব্রোকার) থেকে এক হাজার টাকা বা কমবেশি করে ফি নেওয়া হয়। ফিকহের দৃষ্টিতে এরা 'আজির' বা 'শ্রমিক'। এদের থেকে ফি গ্রহণও রিশওয়াতের শামিল। যদি তাদেরকে সমিতির ব্যাগ বা কলম দেওয়া হয় তাহলে বাস্তব খরচ পরিমাণ নেওয়া যাবে।

৩. ৮. ঘুষের সাথে সাদৃশ্য, তবে ঘুষ নয়

আমাদের সমাজে কিছু লেনদেন এমন আছে, যা বাহ্যত মনে হয় ঘুষ, অথচ তা ঘুষ নয়। এখানে এমন কিছু লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

৩. ৮. ১. ঈদ বখশিস

ঈদের সময় বাসের হেলপার বা অন্য কেউ ঈদ বখশিস চায়। এটি ঘুষ নয়। হাদিয়া। তবে এ কারণে যদি গ্রহীতা নিয়ম বহির্ভূত কোনো সেবা বা কিছু প্রদান করে তবে তা ঘুষ হবে।

৩. ৮. ২. হোটেল বয়কে প্রদেয় টাকা

এটিও ঘুষ নয়। হাদিয়া। তবে এ কারণে যদি গ্রহীতা নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত সেবা বা কিছু প্রদান করে তবে তা ঘুষ হবে।

৩. ৮. ৩. স্বামী ঘুষখোর হলে স্ত্রীর করণীয়

এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় হলো :

প্রথমে মহব্বতের সাথে স্বামীকে ঘুষের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বোঝাবে।

স্বামী না বুঝলে স্পষ্ট বলে দেবে, ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করব তবুও হারাম খাব না। হালাল কম হলেও তাই নিয়ে আসেন। শালীনতার সাথে কঠোরতা করবে। এভাবে কাজ না হলে, স্ত্রীর বৈধ কোনো আয়ের উৎস থাকলে তাই অবলম্বন করবে।

তাও সম্ভব না হলে, যথাসম্ভব চেষ্টা করবে শরঈ সীমায় থেকে নিজে নিজে হালাল কোনো ইনকামের পথ বের করতে।

এটিও সম্ভব না হলে, কেবল প্রয়োজন মাফিক নিতে পারবে। এর বেশি নয়।

৩. ৮. ৪. পিতা ঘুষখোর হলে সন্তানের করণীয়

এ ক্ষেত্রেও স্ত্রীর ন্যায় প্রথমে বাবাকে বোঝাবে। শালীনতার সাথে কঠোর হবে। ৬নং-এ বর্ণিত সকল ধাপ অতিক্রম করেও একান্ত নিতে বাধ্য

হলে বদলা দেওয়ার নিয়তে গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে যখন সামর্থ্যবান হবে তখন ওই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

৩. ৮. ৫. ঘুষ থেকে তাওবা

ঘুষ থেকে তাওবার পদ্ধতি হলো, ঘুষের টাকা বা বস্তু মূল মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া। মূল মালিকের সন্ধান না পেলে তা তার পক্ষে দান করে দেওয়া।

৩. ৮. ৬. জীবনভর ঘুষ নিয়েছে এখন শেষ বয়সে বোধোদয় হয়েছে

এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতি শরঈ পরামর্শ হলো :

ক. সাদা দিলে তাওবা করা।

খ. কৃত গুনাহের কারণে আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাওয়া।

গ. জীবনে কার থেকে কত ঘুষ নিয়েছে এর হিসাব করা। এরপর আল্লাহর সাথে এই অর্থ ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

ঘ. যাদের থেকে ঘুষ নেওয়া হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। ক্ষমা না করলে তা পরিশোধ করা।

ঙ. যাদের নাম ঠিকানা জানা নেই, তাদের টাকা হিসাব করে তাদের পক্ষে দান করে দেওয়া।[১]

পরিশিষ্ট

৩. ৯. বাংলাদেশে ঘুষের সংস্কৃতি : একটি পর্যালোচনা

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টর ঘুষের ভয়াল থাবায় ক্ষতবিক্ষত। দেশে ঘুষের চর্চার হার কেমন– এ ব্যাপারে দেশীয় কোনো জরিপ চোখে পড়েনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি সংস্থার জরিপ রয়েছে। যা বাংলাদেশে ঘুষের সংস্কৃতির চর্চাকে প্রকটভাবে তুলে ধরেছে।

'ট্রেস' (TRACE Anti-Bribery Compliance Solution)। ঘুষবিরোধী একটি বৈশ্বিক সংস্থা। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে। ২০১৪

---

১ আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল, খ. ৭, পৃ. ২৩৭

সাল থেকে সংস্থাটি ঘুষ গ্রহণের সূচক তৈরি করতে শুরু করে।

একটি দেশ কতটুকু ব্যবসাবান্ধব, ঘুষের ঝুঁকির নিরিখে তারা সেটি নির্ণয় করে থাকে। চারটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র ধরে তারা ঝুঁকি নির্ণয় করে তালিকা তৈরি করে আসছে। প্রতিটির জন্য ১০০ করে মার্কস রয়েছে। স্কোর যত বেশি, ঘুষের ঝুঁকির সম্ভাবনাও তত বেশি।

এ তালিকা দেখে একজন বিনিয়োগকারী সহজে অনুমান করতে পারে, তাকে ব্যবসায় করতে গিয়ে কোথায় কোথায় ঘুষের অক্টোপাসে জড়াতে হবে। এর মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারী যে দেশে বিনিয়োগ করবে সেটি কতটা ব্যবসাবান্ধব এ ব্যাপারে ধারণা পেতে পারে।

দুঃখের বিষয় হলো, ট্রেস এর 'ব্রাইবারী রিস্ক ম্যাট্রিক্স ইনডেক্স' ২০১৯ এর তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের মার্কস ৭২। বিশ্বে গড়পড়তা ঘুষ গ্রহণের ঝুঁকির মার্কস তাদের হিসাবে ৫১। সেই হিসাবে ঘুষে আচ্ছন্ন দেশগুলোর চেয়েও ২১ পয়েন্ট বেশি পেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে।

তাদের জরিপ অনুযায়ী, সবচেয়ে কম ঘুষের ঝুঁকির দেশ নিউজল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন। অধিক ঝুঁকিতে আছে ইয়েমেন ও সুদানের মতো যুদ্ধ কবলিত দেশ। আমরা মূলত তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করছি।

সাম্প্রতিক করোনার সময়ে চলতি বছরের (২০২০ ইং.) নভেম্বরে ঘুষ নিয়ে টিআইবি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে গত ১২ মাসে সরকারী সেবাগ্রহণকারীদের ২৪ শতাংশ মানুষকে ঘুষ দিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

তাদের জরিপ অনুযায়ী, ঘুষ প্রদানের তালিকায় এশিয়ায় সবচেয়ে নিম্নে রয়েছে জাপান ও মালদ্বীপ। অপরদিকে সর্বেচ্চ পর্যায়ে আছে ভারত। ভারতে ৩৯ শতাংশ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়েছে। ভারত হলো সমগ্র এশিয়ায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঘুষে জর্জরিত দেশ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ঘুষ লেনদেনে লিঙ্গগত ভিন্নতা আছে। যেমন, শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের চেয়ে বেশি ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে নারীরা বেশি ঘুষের

আশ্রয় নিয়ে থাকে। পুরুষরা ইউটিলিটি সেবায় বেশি ঘুষ দেয়। ইত্যাদি।[১]

দুর্নীতির সূচকেও আমরা এগিয়ে আছি। ২০০১ সালে দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অর্থাৎ সব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ দুর্নীতিপ্রবণ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। এরপর টানা ৫ বছর এ 'গৌরব' (?) ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বর্তমানে প্রথম অবস্থান থেকে সরে আসলেও দুর্নীতি কমে গেছে এ কথা বলার সুযোগ নেই। তালিকায় এক নম্বর থেকে সরে আসার কারণ সম্ভবত কিছু ভঙ্গুর দেশের তালিকাভুক্তি।[২]

পূর্বোক্ত টিআইবি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৭২ শতাংশ মানুষ মনে করেন, সরকারের দুর্নীতিই প্রধান সমস্যা। এ কারণেই সরকারী খাতে ঘুষচর্চা অধিক।

ভাবার বিষয় হলো, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলো ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে তুলনামূলক অনেক দূরে। এদিকে বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিমপ্রধান দেশ ও এক ইউনিট বিশিষ্ট রাষ্ট্র ঘুষ ও দুর্নীতির ফাঁদে আটকে আছে। যে গুণগুলো একসময় ছিল মুসলিমদের, সেগুলো এখন অমুসলিমরা গ্রহণ করতে শুরু করছে। এটি আমাদের চরম অধঃপতন! এ অধঃপতন ঠেকাতে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে নৈতিকতা ও ইসলামের সঠিক শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প নেই।

---

১ দৈনিক যুগান্তর, ২৭/২২/২০২০ ইং., শিরোনাম : 'সরকারী কাজে ঘুষ দিতে হয়েছে ২৪ ভাগ মানুষকে।'

২ বিস্তারিত দেখুন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২১ নভেম্বর, ২০১৯। 'ঘুষের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে' শিরোনাম।

অধ্যায় : ০৮

- বিনিয়োগ পদ্ধতি : শিরকাত (Partnership Business)
- শিরকাতুল মাল (Vocational Partnerships)
- শিরকাতুল আমওয়াল (Goods Partnerships)
- শিরকাতুল ওজূহ (Liability Partnerships)
- আধুনিক পার্টনারশিপ চুক্তি

বিনিয়োগ পদ্ধতি: শিরকাত (অংশীদারিত্ব) : পরিচিতি ও বিধান

১. ১. প্রাথমিক কথা

ব্যবসার জগতে দুটি পদ্ধতি স্বীকৃত। এক. একক ব্যবসা। দুই. যৌথ ব্যবসা। শেষেরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সমাজে বহু ব্যবসা এ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে শরীয়াহ নির্দেশনার চর্চা খুবই কম। এতে এক দিকে যেমন আখেরাত বরবাদ হচ্ছে, তেমনি দুনিয়াও। বহু ঝগড়া ও বিশৃংখলার কারণ এ সংক্রান্ত শরীয়াহ চর্চা না থাকা। তাই যৌথ ব্যবসা করার আগেই সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ নির্দেশনা জেনে নেওয়া জরুরি। এ বিষয়ে বহু স্বতন্ত্র গবেষণা হয়েছে।[১]

যৌথ ব্যবসায়িক পদ্ধতিগুলোর মাঝে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো—

• শিরকাত। • মুদারাবা। • মুশারাকা। এ ছাড়া এর সাথে আছে আধুনিক অংশীদারিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ও সমিতি। অংশীদারিত্বমূলক

---

১ যেমন, ড. ইমরান আশরাফ উসমানী সাহেব পিএইচডি গবেষণা করেছেন এ বিষয়ে। গবেষণা শিরোনাম : শিরকাত আওর মুদারাবা আসরে হাযীর মেঁ। ড. দাহহাম ইবনে কারীম আল ফুযাইলী। গবেষণা শিরেনাম : আশ শারিকাহ, মাফহুমুহা ওয়া তাকঈফুহা। ভাষা : আরবী। ছেপেছে : মাজাল্লাতু শারিয়াহ ওয়াত দিরাসাতুল ইসলামিয়া, সংখ্যা : ১০০। পৃ. ৩৯১। এ ছাড়া আরো গবেষণা ও রচনা আছে।

ব্যবসা চাই তা প্রাচীন পদ্ধতিতে হোক বা আধুনিক পদ্ধতিতে হোক, এসবে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে এ সংক্রান্ত শরীয়াহর মৌলিক নির্দেশনা জেনে নেওয়া একান্ত জরুরি। নতুবা নিজের অজান্তেই হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। সবচেয়ে বেশি যে সমস্যা হয়, মুনাফা, দায় ও লোকসান বিষয়ে শরীয়াহ লঙ্ঘন। এতে উপার্জনে নানাভাবে হারাম ঢুকে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে প্রত্যেক শরিক ও পার্টনারের ব্যবসায়িক সচেতনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ সচেতনতাও জরুরি।

১. ১. ১. মৌলিক কিছু কথা

মূল আলোচনা শুরু করার আগে ভূমিকাস্বরূপ মৌলিক কিছু কথা আরজ করছি—

১. ১. ১. ১. ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত শরীয়াহ জানার গুরুত্ব

বহুদিন যাবৎ রাষ্ট্রিয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই। উম্মাহ ইসলামী রাষ্ট্রের সুফল থেকে বঞ্চিত। এ বঞ্চনা বহু ক্ষতির কারণ। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত শরীয়াহ সচেতনতা হ্রাস হওয়া।

এতে যে ক্ষতি হয়েছে, ব্যবসা ও অর্থ উপার্জনের হালাল পন্থাসমূহ সংকুচিত হয়ে এসেছে। বিপরীতে হারাম ও অবৈধ ইনকামের পথ ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং হালালকে ছড়িয়ে দিতে হলে এবং সহজ করতে হলে এ বিষয়ে সচেতনতা ও জানাশোনার বিকল্প নেই। আপনি সচেতন না হলে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম আরো সংকটে পড়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

১. ১. ১. ২. আসমানি হেদায়েতের ওপর ঈমান

ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় আক্বীদা, যাকে কেন্দ্র করে সকল ইসলামী ভাবধারা গড়ে ওঠে তা হলো, পুরো সৃষ্টিজগত কেবলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্ট এবং তা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন।

সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষ হলো প্রধান। ভূপৃষ্ঠে মানুষকে তিনি বানিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি। যেন তারা আল্লাহ্ তাআলার বিধিবিধান পালন করে। তাঁর ইবাদত করে।

আল্লাহর এ সকল বিধান ও ইবাদতসমূহ কেবল কিছু ধর্মীয় রুসম-রেওয়াজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আমাদের জীবনের সকল অংশজুড়ে আবর্তিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের পূর্ণ নির্দেশনা।

এসব নির্দেশনা দুটি ভাগে বিভক্ত। এক. মৌলিক ইবাদত। এর অংশ কম। দুই. মুবাহ বা সাধারণ বৈধ বিষয়। এটি বেশি। জীবনের অধিকাংশ অংশই মুবাহ সংশ্লিষ্ট। যা শরীয়াহর আলোকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

অর্থনৈতিক কাজকর্ম জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। এরও অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ স্বাধীন। তবে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ নীতিমালা বলে দিয়েছে। যা মানার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কেবল কতক সাধারণ চারিত্রিক শিক্ষা, রসম-রেওয়াজ বা কিছু ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর সাথে নিজেদের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেও শরীয়াহ নির্দেশ পালন আবশ্যক। ইবাদতের ন্যায় এ সংক্রান্ত বিধিবিধানও ওহীভিত্তিক। আসমানি হেদায়েত।

১. ১. ১. ৩. পুঁজিবাদ ও ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে বুনিয়াদি পার্থক্য

ইসলাম ডিমান্ড ও সাপ্লাই তথা মার্কেটের স্বাভাবিক গতিকে অস্বীকার করে না। তদ্রূপ ব্যক্তি মালিকানাকেও পুরাপুরি অস্বীকার করে না। তবে পার্থক্যটা হলো, দীনহীন পুঁজিবাদে ব্যক্তি মালিকানাকে অবাধ লাগামহীন করে দেওয়া হয়েছে। কোনো প্রকার ঐশী শিক্ষা ও নির্দেশনার নিয়ন্ত্রণ তাতে নেই। অপরদিকে ইসলামের অর্থনীতিতে সার্বিক মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করতে কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

এ নিয়ন্ত্রণগুলো কখনো মনে হবে, এটি ব্যক্তি পর্যায়ে কষ্টকর। তবে বাস্তবে এসবে সুদূর প্রসারী কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকে বৈকি। তবে তা মানুষ কর্তৃক। এটি যে কোনো সময় নিজের স্বার্থে পরিবর্তন করা যায়। কালো টাকাকে সাদা বানাতে পারে। সুদের মতো ঘৃণ্য বস্তুকে চালিয়ে দিতে পারে এ ব্যবস্থা। এ ছাড়া আইনের ফাঁক-ফোঁকড় তো থাকেই।

তাছাড়া পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় সাধারণত পুঁজিপতিদের স্বার্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অপরদিকে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় গণ মানুষের স্বার্থ অগ্রগণ্য হয়। তবে নির্ধারিত সীমারেখায় ব্যক্তিস্বার্থও মূল্যায়িত হয়ে থাকে। এমনো হয় যে, তারা বুঝে, এটি জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। তারপরও আইন করে তা বাতিল করা হয় না। কারণ তাতে বিশেষ মহলের স্বার্থ জড়িত থাকে। এমন নযীর কম নয়।

মোটকথা, পুঁজিবাদে গণমানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত। এতে ঐশী স্বার্থহীন নিয়ন্ত্রণ নেই। এহেন মুহূর্তে এ অবস্থায় সৃষ্ট খারাবি থেকে বাঁচার পথ একটাই। তা হলো, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে খোদায়ী অথরিটিকে মেনে নেওয়া। যা নিজ স্বার্থে বা বিশেষ মহলের স্বার্থে পরিবর্তন করা যাবে না। সকলের স্বার্থে প্রযোজ্য হবে।

১. ১. ১. ৪. বস্তু বা দ্রব্যভিত্তিক ফাইন্যান্স

ইসলামী ফাইন্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো, ইসলামী ফাইন্যান্স রিয়েল এ্যাসেটভিত্তিক। এখানে সরাসরি টাকার বিপরীতে টাকার বিনিয়োগ হয় না। বস্তু বা দ্রব্যের ওপর বিনিয়োগ হয়। এতে নগদ দুটি ফায়দা পাওয়া যায়। যথা, ১. রিয়েল এ্যাসেট তৈরি হয়। ২. ইনসাফভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত হয়।

এজন্য ইসলামের যৌথ অংশীদারি কারবার সম্পূর্ণ এ্যাসেটভিত্তিক। এতে টাকার বিপরীতে টাকার কোনো কারবার অনুমোদিত নয়।

১. ১. ১. ৫. পুঁজি ও উদ্যোক্তা

পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হলো, Capital (পুঁজি) ও Entrepreneur (উদ্যোক্তা) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। দুজন দু দৃষ্টিকোণ থেকে উপার্জনকারী। পুঁজির মাধ্যমে সুদ আসে। কোনো রিস্ক বহন করা হয় না। সুদ হলো

বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর নির্ধারিত লাভ। আর উদ্যোক্তা লাভ বা মুনাফা পেয়ে থাকে। এটি অর্জন হয় সুনির্দিষ্ট সুদ প্রদান ও অন্যান্য খরচের পর।

অপরদিকে ইসলামী ফাইন্যান্স মূলধন ও উদ্যোক্তা এ দুটোকে পৃথক পৃথক উপার্জনকারী হিসাবে স্বীকার করে না। তাই যে পুঁজি প্রদান করবে সে লাভের সাথে লোকসানও বহন করবে। যেমন, উদ্যোক্তাও লাভের পাশাপাশি লোকসান বহন করে। এভাবে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। ধন-সম্পদ গুটিকতেক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়বে।

উক্ত মৌলিক কথাগুলো আরয করার পর এবার মূল আলোচনা পেশ করা হলো।

১. ২. 'শিরকাত' পরিচিতি

'শিরকাত' শব্দটি আরবী (الشركة)। এর অর্থ—'কাউকে নিজের কোনো কাজে শরিক করা।'[1] এটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হতে পারে, অন্য কোনো ক্ষেত্রেও হতে পারে।

তবে ব্যবসায়িক আলোচনায় শিরকাত দ্বারা অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায়িক চুক্তিকে বোঝানো হয়। আর এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে শিরকতের বহুল প্রচলিত আন্তর্জাতিক দুটি সংজ্ঞা পেশ করা হলো :

১. *'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'* গ্রন্থের ১৩২৯নং ধারায় অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায়িক চুক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে—

شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال و الربح مشتركا بينهما أو بينهم.

'অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সংগঠিত একটি অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি। তা এভাবে হয় যে, পুঁজি ও মুনাফায় তারা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করবে।'

---

১ আলমিসবাহুল মুনীর, তাবয়ীনুল হাকায়েক খ. ৩.পৃ. ১১২

এখানে ‘পুঁজি’ শব্দটি ব্যাপক। এটি অর্থ ‘দ্বারা’ হতে পারে, তেমনি শ্রম ও দায় গ্রহণের মাধ্যমেও হতে পারে।[১]

১. আন্তর্জাতিক শরীয়াহ মানদণ্ড প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান AAOIFI-এর ১২ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডে অংশীদারিত্ব ব্যবসায়িক চুক্তির সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে—

اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أوعمليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح.

‘মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের সম্পদ অথবা শ্রম অথবা বিশেষ যিম্মাদারি ও দায় মিশ্রণে চুক্তির মাধ্যমে একমত হওয়া।’[২]

প্রকাশ থাকে যে, মুদারাবাও এক প্রকার অংশীদারি ব্যবসা। তবে তা উক্ত সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, মুদারাবা বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হবে। তাছাড়া অনেকের দৃষ্টিতে মুদারাবা স্বতন্ত্র বিনিয়োগ পলিসি। পারিভাষিক শিরকাতুল আকদ (অংশীদারি ব্যবসা)-এর মধ্যে পড়ে না। তাই উসমানী সালতানাতের পূর্বোক্ত বিধিবদ্ধ আইনে মুদারাবাকে শিরকতের অন্তর্ভুক্ত না করে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে সমকালীন ফকীহদের অনেকে মুদারাবাকে শিরকাত চুক্তির মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিস্তারিত সামনে আসছে।

১. ৩. শিরকাতের দলিল

১. ৩. ১. কুরআন মাজীদ থেকে

আসহাবে কাহাফের ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে—

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী রহ., খ. ৪, পৃ. ২৫২

২ আল মাআয়িরুশ শারীয়াহ, মি'আর : ১২, পৃ. ১৮৮, খ. ১ উক্ত সংজ্ঞায় পূর্বোক্ত সংজ্ঞায় প্রদত্ত ‘পুঁজি’র ব্যাখ্যা এসে গেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংজ্ঞাটাই অধিক স্পষ্ট ও অগ্রগণ্য।

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

'নিজেদের কোনো একজনকে তোমাদের রূপার মুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক, কোনো এলাকায় ভালো খাদ্য আছে এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে। সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত হতে না দেয়।'[১]

গুহায় আত্মগোপনকারী যুবকগণ তাদের যেই সাথীকে খাদ্যের জন্য পাঠিয়েছিল, তাঁর নাম ছিল, 'তামলীখা'। সকলের যৌথ টাকায় তিনি খাদ্য কিনতে বাজারে রওয়ানা হন। আয়াতের মূল বক্তব্যে সরাসরি যদিও শিরকতের বিষয়টি আলোচিত হয়নি কিন্তু আয়াতের মধ্যে 'ইশারাতুন নস' তথা ভাষ্যের ইঙ্গিত দ্বারা শিরকতের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, আসহাবে কাহাফগণ নিজেদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচন করে সকলের মুদ্রা তার হাতে অর্পণ করেছিলেন। যেন সে সকলের জন্য খাবার নিয়ে আসতে পারে। লক্ষ্য করে দেখুন, আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মুদ্রা'। এতে স্পষ্ট যে, মুদ্রা যৌথ ছিল।[২]

ইমাম জাস্‌সাস রহ. বলেছেন—

يدل على خلط دراهم الجماعة والشرى بها...

'উক্ত আয়াতটি সকলের টাকা-পয়সা একত্র করে তা দ্বারা যৌথ ভাবে খাবার ক্রয় ও যৌথভাবে খাওয়ার বৈধতার প্রমাণ বহন করে। যদিও এক্ষেত্রে সঙ্গীরা কমবেশি খেয়ে থাকে।'[৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

---

১ সূরা কাহাফ : ১৯

২ আহকামুল কুরআন, ৩/২১৩; তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ. কৃত সংশ্লিষ্ট আয়াত।

৩ আহকামুল কুরআন, ৩/২১৩; তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ. কৃত সংশ্লিষ্ট আয়াত।

'নিশ্চয়ই যাদের মাঝে অংশীদারিত্ব থাকে, তাদের অধিকাংশই একে অন্যের প্রতি জুলুম করে থাকে।'[১]

এ আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, যৌথ কারবার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকার উপেক্ষিত হয়ে থাকে। কখনো এমন হয়, অংশীদাররা তুচ্ছ মনে করে কোনো কাজ করে ফেলে, যা পরিণামে কবীরা গুনাহ হয়ে যায় এবং যার দ্বারা অন্যকেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যৌথ কারবারে সতর্ক থাকা অপরিহার্য।[২]

১. ৩. ২. শিরকাত : হাদীস থেকে

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما.

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন 'আমি দুই অংশীদারের জন্য তৃতীয় অংশীদার হই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কেউ খেয়ানত না করে।'[৩]

উক্ত হাদীসে শুধু যৌথ লেনদেনের বৈধতার কথা বলে শেষ করা হয়নি; বরং এর প্রতি যথেষ্ট অনুপ্রেরণাও দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, যতদিন পর্যন্ত অংশীদারদের মাঝে খেয়ানত হবে না, ততদিন আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে থাকবেন এবং বরকত দানসহ তাদের হেফাযত করবেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম দ্বারাও যৌথ কারবারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যা ইসলামের প্রথম যুগে। অন্য বর্ণনা মতে জাহিলী যুগে।[৫] সায়িব ইবনে আবু সায়িবের সাথে তিনি শরিকী কারবার

---

১ সূরা সোয়াদ : ২৪

২ আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস ও মারেফুল কুরআন, মুফতি শফী রহ. কৃত সংশ্লিষ্ট আয়াত।

৩ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩৮৩

৪ আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১০৫

৫ নাইলুল আওতার, ৫/২৯৭

করতেন। সায়িব ইবনে আবু সায়িব রা. বলেন,

كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري، ولا تماري.

'আপনি আমার ব্যবসায়ে অংশীদার ছিলেন। আপনি কতইনা উত্তম অংশীদার। আপনি ধোঁকা দিতেন না। ঝগড়া-বিবাদও করতেন না।'[১]

এ ছাড়া হাদীসের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই লেনদেন সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস রয়েছে।

১. ৩. ৩. ইজমা থেকে

কুরআন ও সুন্নাহের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে পুরো উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মৌলিকভাবে শিরকাত একটি বৈধ ব্যবসা। ইবনে কুদামা রহ. লিখেছেন,

أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة.

'মৌলিকভাবে শিরকাত ব্যবসায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত।'[২]

১. ৩. ৪. কিয়াস বা শরঈ যুক্তি

অনেক সময় এমন হয়, ব্যবসার জন্য মোটা অংকের মূলধনের প্রয়োজন হয়। কাজও অনেক করতে হয়। এগুলো একার পক্ষে করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বা যৌথ মূলধনী কারবার একটি প্রয়োজন ও বাস্তবতা। এর মাধ্যমে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়।

মোটকথা, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস তথা শরীয়াহর সকল দলিলের আলোকে 'শিরকাত ব্যবসা' মৌলিকভাবে বৈধ।

---

১ আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবুন ফী কারাহাতিল মিরা, মুসতাদরাকে হাকেম, ২/৬১
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبي

২ আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩

১. ৪. শিরকাতের প্রকারভেদ

ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিরকতের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

প্রথম ভাগ

উসমানী সালতানাতের বিধিবদ্ধ আইনে শিরকাতুল আকদকে (অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি) ভাগ করা হয়েছে এভাবে :

শিরকাতুল আকদ প্রথমত দুই প্রকার। যথা—

ক. শিরকাতুল ইনান (Contractual partnership)।

খ. শিরকাতুল মুফাওয়াযা (Contractual partnership in all side)।

এরপর প্রত্যেকটি তিন প্রকার। যথা—

ক. শিরকাতুল আমাল (Vocational partnership)।

খ. শিরকাতুল আমওয়াল (Goods partnership)।

গ. শিরকাতুল উজুহ (Liability partnership)।[১]

দ্বিতীয় ভাগ

শরীয়াহ মানদণ্ড প্রণয়নকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান AAOIFI তাদের ১২নং স্ট্যান্ডার্ডে শিরকাতুল আকদের ভাগ করেছেন এভাবে :

প্রথমত মৌলিকভাবে শিরকাত দু ধরনের। যথা—

ক. ইসলামী ফিকহে বর্ণিত শিরকাত।

খ. আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত শিরকাত।

এরপর ইসলামী ফিকহে বর্ণিত শিরকাত তিন প্রকার। যথা—

ক. শিরকাতুল ইনান।[২]

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী রহ., খ. ৪, পৃ. ২৫২

২ শিরকাতুল আকদের প্রকার একেক মাযহাবে একেকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। উসমানী

খ. শিরকাতুল উজুহ।

গ. শিরকাতুল আমাল।

আর আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত শিরকাত ৫ প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোম্পানি অন্যতম।

তৃতীয় ভাগ

সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকজন গবেষক আলেম শিরকাতকে ব্যাপক অর্থে উপস্থাপন করেছেন। তারা বলেছেন, শিরকাত হলো, একাধিক ব্যক্তি কোনো বস্তুর মালিকানায় অথবা কোনো কারবারে অথবা মুনাফায় যৌথ ভাবে অংশগ্রহণ করা।

এরপর তারা শিরকতের উক্ত ব্যাপক পরিচয়কে ভিত্তি করে শিরকতের বিশদ প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এক নজরে একটি ছকের মাধ্যমে শিরকতের সেই প্রকারগুলো উল্লেখ করা হলো।[১]

সালতানাতের বিধিবদ্ধ আইনে যে প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে সেটা হানাফী মাযহাব অনুসারে। এদিকে হাম্বলী মাযহাবে শিরকতের প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে অন্যভাবে। তারা একে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো—শিরকাতুল ইনান, শিরকাতুল মুফাওয়াযা, শিরকাতুল আবদান, শিরকাতুল উজূহ ও মুদারাবা। এওফির স্ট্যান্ডার্ডে মূলত হাম্বলী ফিকহকে অনুসরণ করে শিরকতের প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যাকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়েছে সেটাই হানাফী মাযহাবে শিরকাতুল আমওয়াল। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৮৭৮)

১ ড. মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আশরাফ উসমানী। পিএইচডি গবেষণা পত্র, 'শিরকাত ও মুদারাবাত আসরে হাযির মেঁ' পৃ. ১৩৯-১৪০। অনুবাদ : ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা।

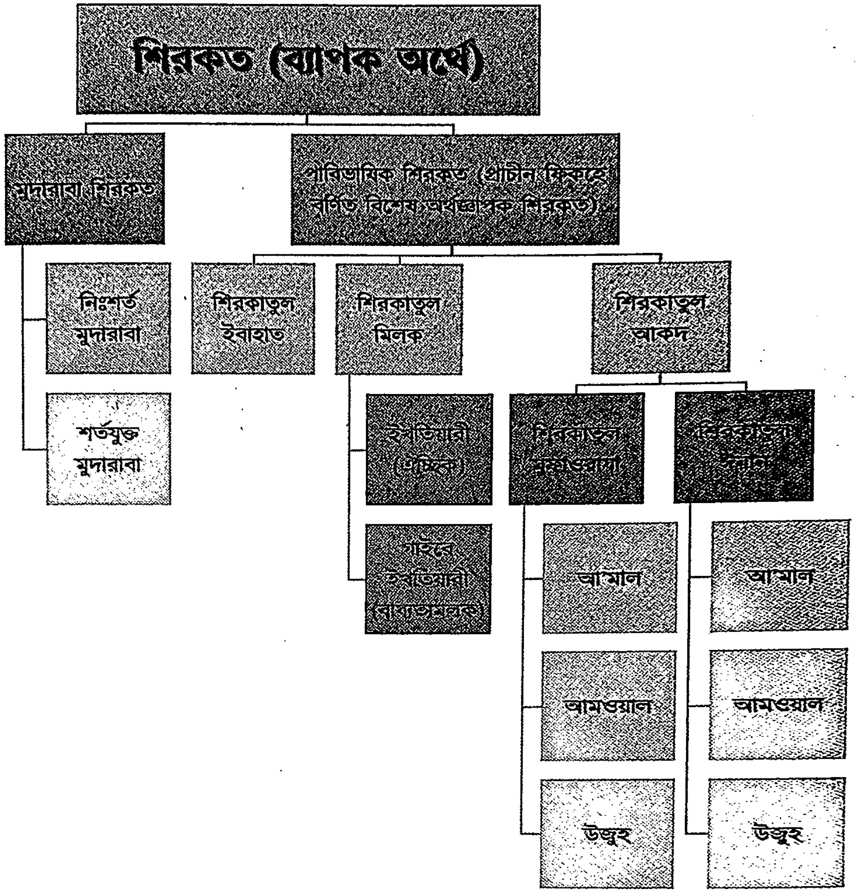

এই বিভাজনটি বেশ সমৃদ্ধ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার শিরকাত এসে গেছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনা উক্ত সমৃদ্ধ বিভাজন অনুযায়ী করা হবে। তবে মৌলিক আলোচনা থাকবে শিরকাতুল আকদ নিয়ে। কারণ, পার্টনারশীপ ব্যবসা বলতে শিরকাতুল আকদকেই (অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি) বোঝানো হয়।

১. ৪. ১. শিরকাতুল ইবাহাহ (شركة الاباحة)

'ইবাহাহ' শব্দের অর্থ, বৈধতা। অর্থাৎ এমন কিছু সম্পদ যা নির্দিষ্টভাবে কারো মালিকানাধীন নয়। সবার জন্য বৈধ। যেমন—নদীর পানি, জঙ্গলের ঘাস, সড়ক, সমুদ্রের মাছ ইত্যাদি। এ ধরনের অংশীদারিত্বকে

সাধারণত রাষ্ট্রীয় আইনের আলোকে সার্বজনীন মালিকানা বলা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ.

'আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকারি হালাল করেছি।'[১]

হাদীসের মধ্যে এসেছে :

الناس شركاء في ثلاثة : الماء و الكلاء والنار.

'তিনটি জিনিসের মধ্যে সকল মানুষই শরিক। তা হলো, পানি, ঘাস ও আগুন।'[২]

বিধান

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা গেল, সার্বজনীন অংশীদারিত্বমূলক বস্তুর ব্যবহারে সকলেই সমান অধিকার রাখে। সুতরাং নদীর পানি, সাগরের পানি ও মাছ সকলেই ভোগ করতে পারে। তবে কেউ যদি এমন বস্তু সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে তাহলে তা কেবল সংগ্রাহকের মালিকানাধীন বলে বিবেচিত হবে।

১. ৪. ২. শিরকাতুল মিলক (شركة الملك)

একে বাংলায় বলে, যৌথ মালিকানাধর্মী অংশীদারিত্ব। ইংরেজিতে বলে, Partnership by joint ownership। আরবীতে শিরকাতুল মিলক। এতে 'মিলক' অর্থ : মালিকানা। পরিভাষায় 'শিরকাতুল মিলক' বলা হয়, কোনো বস্তুতে মালিকানা অর্জনের কোনো সূত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে মালিক হওয়া।[৩] মালিকানা অর্জনের সূত্র হলো, ক্রয়, হেবা, অসিয়ত, মিরাস ইত্যাদি।

এ শিরকাতটি দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা :

---

১ সূরা মায়েদা : ৯৬

২ আবু দাউদ ৩৪৭৭। قال ابن حجر رح في بلوغ المرام من أدلة الأحكام برقم ٩٢٤ : رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُودَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ اهـ

৩ মাজাল্লাতিল আহকামিল আদলিয়্যা, ৪/২৯৯

এক. ইখতিয়ারী বা ঐচ্ছিক। (Optional)

দুই. জাবরী বা বাধ্যতামূলক। (Compulsory)

১. ৪. ২. ১. ঐচ্ছিক শিরকাতুল মিলক

তা হলো, একাধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যৌথভাবে কিছু খরিদ করা। অথবা কেউ একাধিক ব্যক্তিকে যৌথ মালিকানায় কিছু হাদিয়া বা হেবা করা। এরপর তারা তা কবুল করা। ইত্যাদি।

১. ৪. ২. ২. বাধ্যতামূলক শিরকাত

তা হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্পদ এমনভাবে মিশে যাওয়া যে, কোন অংশ কার, তা আলাদা করা অসম্ভব অথবা দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য। যেমন—দুইজন ব্যক্তির চাল তাদের অজান্তে মিশে যাওয়া।

অথবা প্রাকৃতিকভাবে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি হওয়া। যেমন, মিরাস সূত্রে যৌথভাবে কোনো সম্পদের মালিক হওয়া।

১. ৪. ৩. শিরকাতুল আকদ (Partnership by contract) : পরিচিতি ও বিধান

শিরকতের মধ্যে শিরকাতুল আকদই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পার্টনারশীপ ব্যবসা বলতে শিরকাতুল আকদকেই বোঝানো হয়। তাই শিরকাতুল আকদ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হলো।

এর পরিচিতি পূর্বে 'শিরকতের পরিচিতি' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ইজাব-কবুলের মাধ্যমে এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যে, তারা নিজেদের পুঁজি একত্র করে তা দ্বারা ব্যবসা করবে এবং মুনাফা দুজনের মাঝে বণ্টিত হবে।

১. ৪. ৩. ১. শিরকাতুল আকদের প্রকারভেদ

শিরকাতুল আকদ প্রথমত দুই প্রকার। যথা : শিরকাতুল মুফাওয়াযা ও শিরকাতুল ইনান। এরপর প্রত্যেকটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। তা হলো :

১. শিরকাতুতল আমাল
২. শিরকাতুল আমওয়াল
৩. শিরকাতুল উজূহ

১. ৪. ৪. শিরকাতুল মুফাওয়াযা (সম অংশীদারী কারবার)

'মুফাওয়াযা' শব্দটির অর্থ : المساواة। 'একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর সমান বা বরাবর হওয়া।'[১] এক কথায় বাংলায় বলা যায় 'সম অংশীদারি কারবার।'

এর পরিচিতি হলো, দুই বা ততোধিক অংশীদার এভাবে শিরকাত চুক্তি করা যে, নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে তাদের প্রত্যেকের অংশগ্রহণ পূর্ণরূপে বরাবর হবে :

১. মূলধনের পরিমাণ ও মূল্যমানে বরাবর হবে।
২. মুনাফা লাভে বরাবর হবে।
৩. ব্যবসায়িক কার্যক্রমেও সকলে বরাবর হয়ে থাকবে।
৪. ঋণের ক্ষেত্রেও বরাবর হবে। সুতরাং এক শরিক কারো ঋণের স্বীকারোক্তি করলে, সেটা অন্য শরিকের ওপরও বর্তাবে। তদ্রূপ পণ্যমূল্য সকলের ওপর বর্তাবে। এমনকি ব্যক্তিগত কাজে বা নিজ পরিবারের জন্য কোন শরিক কিছু খরীদ করলে সেটার মূল্য অপর শরিকের নিকটও তলব করা যাবে। কারণ, এ শিরকাতে প্রত্যেক শরিক একে অপরের যেমন উকিল, তেমনি কাফিল বা যিম্মাদারও।
৫. ব্যবসায়িক অধিকারে সকলে বরাবর হবে।
৬. লোকসানও সমহারে বহন করা হবে।

মুফাওয়াযা চুক্তি সংগঠিত হওয়ার জন্য, চুক্তির সময় মুফাওয়াযা শব্দ বা মুফাওয়াযার সকল শর্তগুলো স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

উপর্যুক্ত কোনো একটি শর্ত ছুটে গেলে সেটা শিরকাতুল ইনান (সামনে এর পরিচিতি আসছে) হয়ে যাবে।

---

১ আসসিহাহ ফিল লুগাহ, আল ফায়িক ফি গারীবিল হাদীস, যামাখসারী।

বলাবাহুল্য, উপর্যুক্ত শর্ত পালন করে এ যুগে মুফাওয়াযা শিরকাত চুক্তির প্রয়োগ নেই। তাই এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হলো না।[১]

১. ৪. ৫. শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারী কারবার)

'ইনান' শব্দটি আরবী (العنان)। অর্থ : মুখোমুখি দাঁড়ানো। এখান থেকে ঘোড়ার 'লাগাম'কে 'ইনান' বলা হয়। কারণ, লাগামের রশি ঘোড়ার মুখোমুখি হয়। এখানে এ অর্থের প্রাসঙ্গিকতা হলো, প্রত্যেক শরিক অপর শরিকের মতো সম্পদ, আমল বা দায় দ্বারা তার অপর শরিকের মুখামুখি হয়।

বাংলায় বলা যায়, 'অসম অংশীদারিত্ব'। এর পরিচিতি হলো, এটি শিরকাতুল মুফাওয়াযার বিপরীত। অর্থাৎ সাধারণত শিরকাতুল মুফাওয়াযার কোনো শর্ত ছুটে গেলে, তখন সেটি 'শিরকাতুল ইনান' হয়ে যায়। কারণ, এর জন্য শিরকাতুল মুফাওয়াযার মতো সব দিক থেকে সমান বা বরাবর হওয়া জরুরি নয়। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে শিরকাতুল ইনানের ব্যবহারই অধিক।

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৩-২৫৫, ২৮০-২৯২

শিরকাতুল আমাল

(Vocational Partnerships)

প্রাথমিক কথা

আমাদের সমাজে ব্যবসার একটি বড় ক্ষেত্রে হলো সার্ভিস বা সেবা প্রদান করা। যেমন, গাড়ি মেরামত করে দেওয়া, কাপড় সেলাই করে দেওয়া, শিক্ষা প্রদান করা ইত্যাদি। বর্তমানে এটি একটি বৃহৎ পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের সার্ভিসিং বা সেবা প্রদান কখনো একা আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রয়োজন হয়, যৌথভাবে আঞ্জাম দেওয়ার। সেখান থেকেই মূলত 'শিরকাতুল আমাল' বা শ্রমভিত্তিক অংশীদারত্বের সূচনা।

২. ১. শিরকাতুল আমাল পরিচিতি

উসমানী সালতানাতের বিধিবদ্ধ আইন 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহতে' এর পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

> إذا عقدوا الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل يعني على تعهده و التزامه من آخر والكسب الحاصل أي الأجرة يقسم بينهم تكون شركة أعمال، وقال في موضع أخر : شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال.

'শিরকাতুল আমাল এমন একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি, যেখানে

অংশীদারদের পুঁজি হলো, মানুষ থেকে কাজ গ্রহণ করে কাজ করা। এরপর উপার্জিত পারিশ্রমিক তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া।'[১]

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শরীয়াহ মানদণ্ড প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান AAOIFI তাদের ১২ নং স্ট্যান্ডার্ডে শিরকাতুল আ'মালের পরিচিতি পেশ করেছে এভাবে—

شركة الأعمال هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال البدنية أو الفكرية والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة أو الخبرة مع تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق.

'দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, তারা মানুষের শ্রমভিত্তিক অথবা চিন্তামূলক কোনো কাজ করে দেবে। অথবা কোনো কিছু তৈরি করে দেবে কিংবা মানুষকে কোনো সেবা প্রদান করবে অথবা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বিতরণ করবে। এসব কাজ করে যে পারিশ্রমিক বা মুনাফা অর্জন হবে, তা কত হারে তাদের মাঝে বণ্টন হবে সেটা পূর্বেই ঠিক করে নেবে।'[২]

২. ২. তাৎপর্য

ক. অংশীদারি কারবারের চুক্তি হবে অর্ডার গ্রহণ করে কোনো কাজ বা সেবা প্রদানের ওপর।

খ. কোনো প্রকার পণ্য বিক্রয় হবে না। এর জন্য কোনো ইনভেস্টও হবে না।

গ. সেবা প্রদানের জন্য ইনভেস্ট প্রয়োজনে হলে সেটি 'শিরকাতুল মিলক' এর অধীনে হবে।

উল্লেখ্য, শিরকাতুল আমালকে (شركة الأعمال) 'শিরকাতুস সানায়ে' (شركة الصنائع) বা 'পেশাভিত্তিক অংশীদারিত্ব', 'শিরকাতুল আবদান' (شركة الأبدان) বা 'স্বশরীরে অংশগ্রহণভিত্তিক অংশীদারিত্ব',

---

১ মাদ্দাহ : ১৩৩২, ১৩৮৫

২ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, পৃ. ১৯৪

‘শিরকাতুত তাকাব্বুল’(شركة التقبل) বা গ্রাহকের অর্ডার গ্রহণভিত্তিক অংশীদারিত্বও বলে। তবে এসব নামের মধ্যে ‘শিরকাতুল আমাল’ নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

২. ৩. শিরকাতুল আ'মালের পুঁজি

ক. এ শিরকাতে পুঁজি হিসেবে কোনো টাকা বা অর্থ থাকবে না।

খ. এ শিরকাতে মূল পুঁজি হলো, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষ থেকে কোনো কাজ নিয়ে কাজ করে দেওয়া।

গ. কাজের জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হলে সেটা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবে। তাতে ব্যক্তির মালিকানা বহাল থাকবে। অথবা শিরকাতের যৌথ ফান্ড থেকে শিরকাতুল মিলকের ভিত্তিতে নিজেরা ক্রয় করে নেবে। অথবা কোনো এক শরিক তার বস্তুটি অন্যদেরকে ভাড়া হিসেবেও দিতে পারে। এক্ষেত্রে ভাড়ার টাকা শিরকাত ফান্ডের ব্যয় হিসেবে ধরা হবে।[১]

২. ৩. ১. কাজ

ক. উক্ত অংশীদারি কারবারে মূল অংশীদারিত্ব হলো, আমল বা পরিশ্রমে। প্রত্যেকে কাজ করবে। সকলের যৌথ কাজে মূল কাজটি সম্পন্ন হবে, যা তৃতীয় পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে প্রত্যেকের কাজ একই রকম হওয়া জরুরি নয়। একেকজন একেক দিকে কাজ করবে। তদ্রূপ প্রত্যেকের কাজ বা পেশাও এক হওয়া জরুরি নয়। কাজের স্থানও প্রত্যেকের এক হওয়া জরুরি নয়।

সুতরাং দর্জি ও রঙকারক এভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে যে, তারা অর্ডার নিয়ে মানুষের কাজ করে দেবে। এভাবেও শিরকাত বৈধ হবে। দুজন দুই দোকানে বা স্থানে বসতে পারবে। একই দোকানে বা স্থানে বসে কাজ করা জরুরি নয়।

তদ্রূপ একজন গেঞ্জি সেলাই করবে। আরেকজন রঙ করবে। এভাবেও শিরকাতুল আমাল হতে পারে। একজন স্টীলের আলমারির মিস্ত্রি।

---

১ এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, ১২, ধারা নং : ৪/৩/৩

আরেকজন কাঠের আলমারির মিস্ত্রি। তারাও চাইলে শিরকাতুল আমালের ভিত্তিতে অংশীদারী কারবার করতে পারে। এক্ষেত্রে দোকান ও অন্যান্য ম্যাটারিয়াল শিরকাতুল মিলকের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হবে।[১]

খ. যৌথ কাজটি বৈধ হতে হবে। সুতরাং কয়েকজন গায়ক মিলে যদি চুক্তিবদ্ধ হয়, তারা বিভিন্ন জায়গায় গান করবে। এরপর যা উপার্জন হবে তা যৌথভাবে বণ্টন হবে, তাহলে এমন শিরকাত বৈধ হবে না।

গ. এমন কাজে শিরকাত হতে হবে, যে কাজে কাউকে উকিল বা প্রতিনিধি বানানো যায়। সুতরাং ভিক্ষুকদের শিরকাত বৈধ হবে না। তদ্রূপ উন্মুক্ত বিল বা নদী থেকে মাছ শিকার করার মাঝেও শিরকাত বৈধ হবে না। কারণ, মাছ ধরা ও ভিক্ষা করা উন্মুক্ত বিষয়। যে প্রথম মাছ ধরবে বা ভিক্ষা করবে সেই এর মালিক হবে। এতে অন্য কেউ শরিক হবে না।[২]

ঘ. যৌথ কাজটি করা হবে একটি যৌথ চুক্তির আওতায়। সুতরাং শিরকাত বা যৌথ চুক্তি ছাড়া কাজ করা হলে এর পারিশ্রমিক ব্যক্তির একার হবে।

ঙ. শুধু কাজ করা নয়; বরং মানুষ থেকে কাজ নেওয়া ও কাজ করা দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেকে শরিক থাকবে। কাজ ও দায় দুটিতেই অংশীদার হবে। সুতরাং একজন শুধু কাজ করবে, কাজ বা অর্ডার নিতে পারবে না, এমন হলে এ শিরকাত জায়েয হবে না।[৩]

চ. চুক্তিতে এমন কিছু না থাকতে হবে, যাতে কোনো শরিকের শ্রমদান ও অর্ডার গ্রহণের অধিকার খর্ব হয়। এ অধিকার বহাল রেখে এমন করা যায়, একজন কাজ করবে। আর অপরজন কেবল অর্ডার গ্রহণ করবে। তবে যিনি কাজ করবে তার অর্ডার গ্রহণের অধিকার খর্ব করা হবে না।[৪]

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩১০

২ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ২, পৃ. ২৫৭

৩ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, পৃ. ১৯৫, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৬,৩১০

৪ বোঝা গেল, চুক্তিতে উভয়ে কাজ করবে ও অর্ডার গ্রহণ করবে—তা স্পষ্ট উল্লেখ জরুরি নয়; বরং জরুরি হলো, কারো কাজ বা অর্ডার গ্রহণ নিষিদ্ধ না করা। অতএব যদি এভাবে চুক্তি হয়, আমরা কাজ করব; কিন্তু অপর শরীক অর্ডার গ্রহণ করতে পারবে কি না, তা স্পষ্ট বলা হয়নি তদুপরি শিরকাত বৈধ হবে। যদিও বাস্তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এমন

ছ. অংশীদারদের যে কেউ কাজের অর্ডার নিলে, তা আদায়ে প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব হিসেবে তা গণ্য হবে।

জ. শরিকদের যে কেউ একা কাজ করে যা উপার্জন করবে, অপর শরিকদার কাজ না করলেও সে উক্ত উপার্জনে পূর্ব চুক্তিমতে শরিক থাকবে। যেমন, দুজন চুক্তি করল। তারা উভয়ে দর্জির কাজ করবে। তাতে যা উপার্জন হবে তা অর্ধার্ধি হারে বণ্টন হবে বা অন্য কোনো হারে।

এমতাবস্থায় পরবর্তী সময়ে কোনো কারণে অপর শরিক কাজ করুক বা না করুক কিংবা কম করুক বা বেশি করুক সর্বাবস্থায় পূর্ব চুক্তিমতে সকলেই পারিশ্রমিকে শরিক থাকবে।[১]

মোটকথা, চুক্তি হলো। চুক্তিতে সবাই কাজ করবে এটিই মূল কথা। পরবর্তী সময়ে কে কতটুকু কাজ করল—তা এখানে বিবেচ্য নয়। এর কারণ হলো, শিরকাতের মধ্যে প্রত্যেক শরিকদার একে অপরের উকিল হয়। এজন্য তাদের যে কাউকে কাজ দিয়ে অন্যজনের নিকট তা তলব করা যাবে। পারিশ্রমিকও অন্যজনের নিকট দেওয়া যাবে। তদ্রূপ একজন কাজ করলে সেটা অপরজনের পক্ষ থেকেও হয়ে যায়। এ যেন 'দুয়ে মিলে এক দেহ।'

২. ৩. ৩. মুনাফা

ক. শিরকাতুল আ'মালে মুনাফাপ্রাপ্তির মূল ভিত্তি হলো, আমল বা শ্রম। চুক্তিতে প্রত্যেকে শ্রম দেবে তা স্পষ্ট উল্লেখ হতে হবে। শ্রম প্রদানের কারণেই মুনাফা লাভের অধিকার সৃষ্টি হয়।

খ. এখানে কাজ বা শ্রম কমবেশি হওয়া বিবেচ্য নয়। শ্রমদানে সকলে বরাবর হওয়াও জরুরি নয়। সুতরাং কেউ কাজ কম করলেও তার জন্য মুনাফা বেশি নির্ধারণ করা যাবে। কারণ, কাজে দক্ষতা সকলের সমান নয়; কিন্তু কোনো শরিক যদি চুক্তিতে বলে, সে কোনো কাজ করবে না তাহলে সে মুনাফা পাবে না। যদিও সে কাজের সকল সরঞ্জাম যোগান

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এক শরীক কাজ করে। আর অপর শরীক কেবল অর্ডার গ্রহণ করে। তবে এতে সমস্যা হবে না।–(শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩১১)

১ استحقاقه الربح بحكم الشرط في العقد، لا العمل، كذا في شرح المجلة ٣١٥/٤

দিয়ে থাকে।[1]

গ. মুনাফা বণ্টন হবে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌথ কাজ থেকে। যদি এমন হয় যে, কাজ যে করবে সে একাই সেই কাজ ও দায় বহন করবে। এর মজুরি সে একাই পাবে। তবে সেটা শিরকাত নয়।

ঘ. মুনাফার হার যেকোনো রেশিওতে ঠিক করা যাবে। তবে সুনির্দিষ্ট অংকে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না।

ঙ. বিনিয়োগকৃত পুঁজির আনুপাতিক হারেও মুনাফা হার নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, তিন বন্ধু যৌথভাবে ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর দোকান দিল। প্রত্যেকে কাজ করবে। সাথে প্রত্যেকে কিছু পুঁজিও বিনিয়োগ করেছে। ওই পুঁজি দিয়ে ল্যাপটপ সার্ভিসিং দেওয়ার জন্য কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। আর চুক্তি হয়েছে মুনাফা বণ্টন হবে পুঁজি অনুপাতে।

এটি বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি। মুনাফার হার যেমন শ্রমের ভিত্তিতে নির্ধারণ হতে পারে, তেমনি পুঁজির অনুপাতেও হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, শিরকাতুল আমালে মূল হলো, আমালের মধ্যে শিরকাত। সুতরাং কোনো সদস্য কাজ করবে না, এরূপ শর্তারোপ করলে তার অংশে শিরকাতে আমাল প্রতিষ্ঠিত হবে না।

২. ৩. ৪. লোকসান

এখানে লোকসান দু ভাবে হতে পারে। যথা :

ক. একটা সার্ভিস মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। ধরা যাক, একটা কোর্স মানুষকে প্রদানের জন্য প্রচারণা করা হলো; কিন্তু মানুষ তেমন একটা সাড়া দেয়নি। এক্ষেত্রে ব্যয় বাবদ যত খরচ হলো, সেটি সকলে যৌথভাবে বহন করবে।

খ. গ্রাহক থেকে একটি কাজ নেওয়া হয়েছে। কাজটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে। যেমন, কাপড় নেওয়া হয়েছে সেলাই করে দেওয়ার জন্য। সেই কাপড় চুরি হয়ে গেছে। ছিঁড়ে গেছে। পুড়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৭৪

তার দায় অনুপাতে এর ক্ষতিপূরণ বহন করবে। যেমন, একটি দরজির দোকান। চুক্তি হলো, মানুষ থেকে যে অর্ডারগুলো নেওয়া হবে এর দুই তৃতীয়াংশ এক শরিকের দায়িত্বে থাকবে। আর এক তৃতীয়াংশ অপর শরিকের দায়িত্বে থাকবে। আর কোনো ক্ষতি হলে সেটি অর্ধার্ধি হারে বহন করা হবে।

তাহলে এক্ষেত্রে দায় বণ্টন সঠিক। তবে ক্ষতিপূরণ বণ্টন সঠিক হয়নি। ক্ষতিপূরণও দায় অনুপাতে বণ্টন হবে। যিনি দুই তৃতীয়াংশের দায় নিয়েছেন, তিনি ক্ষতিপূরণও দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বহন করবেন। তবে গ্রাহক যে কারো কাছে তার ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবে।[১]

২. ৪. উদাহরণ

২. ৪. ১. রংয়ের কাজ

দুজন ব্যক্তি যৌথভাবে চুক্তি করল, তারা মানুষের বাসায় রংয়ের কাজ করে দেবে। এতে পারিশ্রমিক বাবদ যা আয় হবে, সেটা উভয়ের মাঝে অর্ধাঅর্ধি হারে ভাগ হবে।

২. ৪. ২. সেলাইয়ের কাজ

দুজন ব্যক্তি যৌথ চুক্তি করল, তারা মানুষের কাপড় সেলাই করে দেবে। এতে পারিশ্রমিক বাবদ যা আয় হবে, সেটা উভয়ের মাঝে অর্ধাঅর্ধি হারে ভাগ হবে।

২. ৪. ৩. বাসা পাল্টানোর গ্রুপ

শহরে অনেক মানুষই ভাড়া বাসায় থাকে। মাঝেমধ্যে তাদের বাসা পরিবর্তন করতে হয়। বাসা পরিবর্তন বেশ ঝামেলার একটি কাজ। একদল মানুষ এই ঝামেলাপূর্ণ কাজটি অর্থের বিনিময়ে সহজে করে দেয়। তিনজন/চারজনের গ্রুপ থাকে। তারা ভ্যান বা পিকআপ দিয়ে বাসার আসবাবপত্র স্থানান্তর করে দেয়। তাদের এই কাজটি শিরকাতুল আমালের ভিত্তিতে হতে পারে।

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩১৫-৩১৬, মাদ্দাহ : ১৩৯৩

২. ৪. ৪. কুরবানির কসাই টিম

কুরবানির মৌসুমে দেখা যায়, দল বেঁধে কসাইরা কুরবানির পশুর গোশত বানিয়ে দেয়। এ কাজটিও শিরকাতুল আমালের ভিত্তিতে হতে পারে।

২. ৪. ৫. বাবুর্চি টিম

বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। একজনের পক্ষে এত খাবার পাক করা সম্ভব হয় না। এ কাজটি করা হয় বাবুর্চি টিমের মাধ্যমে। ৪-৫ জনের একটি টিম গঠন হয়। একজন থাকে প্রধান বাবুর্চি। তারা টিম করে মানুষের পাকের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এ কাজটিও শিরকাতুল আমালের ভিত্তিতে হতে পারে।

২. ৪. ৬. যৌথভাবে কোচিং সেন্টার পরিচালনা

ঢাকা শহরের এখন আরেক নাম হয়ে গেছে 'কোচিং শহর'। পাড়ায় পাড়ায় বরং গলিতে গলিতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। কেউ একা, কেউ দল বেঁধে এ পেশায় জড়াচ্ছে। দলবদ্ধভাবে এ কাজটি করা হলে সেটাও শিরকাতুল আমালের ভিত্তিতে হতে পারে।

২. ৪. ৭. সেলুনের কাজ

দুজন ব্যক্তি যৌথভাবে চুক্তি করল, তারা মানুষের চুল কেটে দেবে। এতে পারিশ্রমিক বাবদ যা আয় হবে, সেটা উভয়ের মাঝে আধাআধি হারে ভাগ হবে।

২. ৪. ৮. দোকান

দোকান একজনের। আর কাজের সরঞ্জাম অপর শরিকের। তারা চুক্তি করল, তারা মানুষ থেকে কাজের অর্ডার গ্রহণ করবে। ধরা যাক, মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজ। এভাবে শিরকাতও বৈধ। যদিও কাজের শর্ত করা হয় কেবল সরঞ্জাম যার, তার ওপর। কারণ, অর্ডার গ্রহণও এক প্রকার কাজ। সুতরাং কাজে বা আমলে শিরকাত আছে; কিন্তু যদি এমন হয়, সরঞ্জাম কেবল এক শরিকের। সে কোনো কাজ বা অর্ডার গ্রহণ কিছুই করবে না। কাজ করবে অপর শরিক। তাহলে এ প্রক্রিয়ায়

শিরকাত বৈধ হবে না। কারণ, যার সরঞ্জাম তার পক্ষ থেকে কোনো কাজ নেই, অর্ডার গ্রহণও নেই। তাই যে কাজ করবে প্রাপ্ত মুনাফা কেবল তার হবে। আর সরঞ্জাম যার সে কেবল তার জিনিসপত্রের ন্যায্য ভাড়া পাবে।

২. ৪. ৯. মাছ কাটা

ঢাকার বাজারে দেখা যায়, একদল লোক দা নিয়ে বসে থাকে। টাকার বিনিময়ে মানুষের মাছ কেটে দেয়। সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, তাদের অনেকে কাজটি দল বেঁধে করে থাকে। এক সাথে বসে। এরপর নিজেদের মাঝে এভাবে চুক্তি করে নেয়, সারা দিন তারা মানুষের মাছ কেটে দেবে। এতে যা উপার্জন হবে, দিন শেষে নিজেদের মাঝে সমানহারে বণ্টন করে নেবে।

এভাবে অংশীদারি কারবার করা বৈধ। এখানে প্রত্যেকে নিজের মতো করে মাছ কাটার সরঞ্জাম নিয়ে আসে।

২. ৫. শিরকাতুল আমাল ও বর্তমান সমাজ

প্রাচীন পদ্ধতির শিরকাতুল আমাল ছিল এমন যে, সেখানে কেবল শ্রমের বিনিময়েই মজুরি পাওয়া যেত। এখনো এর কিছু দৃষ্টান্ত আছে। তবে বর্তমান যান্ত্রিক যুগে শিরকাতুল আ'মালে শ্রমের পাশাপাশি পুঁজিও বিনিয়োগ করতে হয়। যেমন, এক সময় কাপড় ধোয়ার কাজটি শুধু কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই সম্পন্ন হতো। এখন এর জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত মেশিন, সাবান, কেমিকেলস, পরিচ্ছন্ন পানি, উপযুক্ত স্থান, প্রয়োজনীয় প্রচারণাসহ আরো অনেক কিছু। এসবের জন্য মোটা অংকের বিনিয়োগও লাগে।

সারকথা, বিনিয়োগহীন শুধু কায়িক পরিশ্রমের ওপর ভিত্তিশীল শিরকাতুল আবদান বা আ'মালের অস্তিত্ব বর্তমানে অনেক কম। এর স্থান দখল করে নিয়েছে শিরকাতুল আ'মালের আধুনিক পদ্ধতি, যার মধ্যে কায়িক শ্রমের পাশাপাশি বেশ অর্থও বিনিয়োগ করতে হয়।

২. ৫. ১. উদাহরণ

ক. জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে আইনী পরামর্শ (Legal Consultancy) প্রদানের জন্য কয়েকজন আইন বিশেষজ্ঞ যৌথভাবে একটি প্রতিষ্ঠান করলেন। সেখান থেকে তারা মানুষকে আইনী পরামর্শ দিয়ে উপার্জিত অর্থ নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেবেন। তাদের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত স্থান, ঘর, ফার্নিচার, সাজসজ্জা, বিজ্ঞপ্তি ও প্রয়োজনীয় আইনের বই সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য বেশ অর্থের প্রয়োজন।

খ. কয়েকজন নির্মাণ প্রকৌশলী একত্রে মিলিত হয়ে বিল্ডিং এর ম্যাপ, প্ল্যান ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ (Consultancy) ইত্যাদি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম'।

এর জন্যও উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো বিষয় সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে। তাই এক্ষেত্রে শ্রমের সাথে সাথে অর্থও বিনিয়োগ করতে হবে।

গ. গাড়ি ও অন্যান্য ইঞ্জিন মেরামত করার জন্য কয়েকজন মেকানিক যৌথভাবে বড় ওয়ার্কসপ বা সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানেও শ্রমের পাশাপাশি অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

ঘ. কয়েকজন ডাক্তার যৌথভাবে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্যোক্তা ডাক্তারগণ নিজেরা চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এর সাথে বিভিন্ন মেশিনারিজ ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগও করেছেন। তারপর সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ তারা নিজেরা বণ্টন করে নেন।

ঙ. একজনের ফটোকপি মেশিন। আরেকজনের দোকান। উভয়ে কাজ করবে। আর পারিশ্রমিক বাবদ যা উপার্জন হবে, তা তাদের মাঝে সমান বা অন্য কোনো নির্ধারিত হারে বণ্টন হবে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগকৃত মেশিন ও দোকান প্রত্যেকের ব্যক্তি মালিকানাধীন। বস্তুতে শিরকাত নেই। কেবল কাজ গ্রহণ ও করার মধ্যে শিরকাত।[১]

---

১ لو ان قصارين اشتركا ولأحدهما اداة القصارين وللآخر بيت على ان يعملا بأداة في هذا البيت على ان الكسب بينهما نصفين جاز. (التاتارخانية : ٥ : ٦٦٩)

চ. সেলুন। সবাই কাজ করবে। আর চুল কাটার মেশিন, চেয়ার ইত্যাদি যৌথ মালিকানায় ক্রয় করা হবে।

লক্ষ করুন, উপর্যুক্ত সবকটি লেনদেন শিরকাতুল আমাল বা সার্ভিসিং বিজনেস, যার মধ্যে শরিকগণ মানুষের কাজ গ্রহণের পাশাপাশি নিজেরাও পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, এর কারণে তা শিরকাতুল আমওয়ালে রূপান্তর হবে না; বরং এ টাকায় যা ক্রয় করা হবে তাতে শরিকদের শিরকাতুল মিলক বা যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে অংশীদারি চুক্তি বৈধ।

২. ৫. ২. শুধু শ্রম দিয়ে অংশীদারিত্ব

শুধু শ্রম প্রদান করে এক অংশীদারিত্ব হয় 'মুদারাবা' পদ্ধতিতে। আরেকটি হয়ে থাকে শিরকাতুল আমাল পদ্ধতিতে। এখানে এমন হতে পারে, এক শরিক পুঁজি ও কাজের সামগ্রীসহ সবকিছুর ব্যবস্থা করবে। সাথে শ্রমও দেবে। আর অপর শরিক কেবল শ্রম দেবে। আর উপার্জন উভয়ের মাঝে সমানহারে বা অন্য কোনো হারে বণ্টন হবে।

ধরুন, কামাল সাহেব দরজির কাজ করেন। কাজের চাপ অনেক। সবার অর্ডারের ডেলিভারি যথাসময়ে দিতে পারেন না। তাই তিনি একজন সহকর্মী নিলেন, যে তার দোকানে বসে কাজ করবে। এতে কামাল সাহেবের কাজের চাপ কিছু কমবে। আর পুরো মাসে যা ইনকাম হবে—তা একটা পূর্ব নির্ধারিত হারে তাদের মাঝে বণ্টন হবে।

এটি মৌলিকভাবে বৈধ। এক্ষেত্রে যিনি কাজের পাশাপাশি সরঞ্জামও দেবেন, তিনি এর বিপরীতে মুনাফা বাড়িয়ে নিতে পারেন। অথবা অপর শরিক নিজেই তার সামানার ব্যবস্থা করবে। অথবা ওই সামগ্রীগুলো অপর শরিকের কাছে ভাড়াও দিতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষণীয়। যথা :

১. কাজ উভয়ে করতে হবে। (অর্ডার নেওয়াও একটি কাজ)

২. মানুষ থেকে কাজ বা অর্ডার গ্রহণের অধিকার উভয়ের থাকবে। সুতরাং যদি এমন হয় যে, অর্ডার কেবল দোকানের মালিক নেবে। আর সহকর্মী কেবল মালিকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাবে। তবে এটি

শিরকাত হবে না; বরং নিয়োগ চুক্তি হবে। তখন পারিশ্রমিক সুনির্দিষ্ট অংকে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৩. একজনকে অপরজনের উকিল বলে ধরা হবে। সুতরাং গ্রাহকগণ যে কারো নিকট পাওনা পরিশোধ করতে পারবে।

৪. কাজের দায়দায়িত্ব উভয়ের ওপর বর্তাবে।

৫. কাজটা হতে হবে এমন, যা মানুষ থেকে অর্ডার নিয়ে নিজেরা করতে হয়। সুতরাং মুদী দোকানে এমন চুক্তি বৈধ হবে না। কারণ, এখানে কোনো আমল নেই। শিরকাতুল আমাল বলাই হয় মানুষের কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করে দেওয়া।[১]

---

১ جاء في المغني ٩/٥ : وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيئ أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعمل بآلة أو في البيت و الأجر بينهما جاز لما ذكرنا اهوراجع أيضا المبسوط للسرخسي ، اواخر باب الشركة الفاسدة ١٥٩/١١

جاء في البحر الرائق (من كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة) : «قال رحمه الله (ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح) وهذا استحسان والقياس أن لا يصح وحق هذه المسألة أن تذكر في كتاب الشركة ، ووجه الاستحسان أن هذه شركة الصنائع وليست بإجارة ؛ لأن تفسير شركة الصنائع أن يكون العمل عليهما وإن كان أحدهما متولي العمل بحذاقته والآخر متولي القبول لوجاهته ، وإذا وجد ما له سبيل إلى الجواز وهو متعارف يوجب القول بصحته فيكون العمل واجبا عليهما والأجر بينهما على ما عرف في موضعه قال الشارح وقول صاحب الهداية هذه شركة الوجوه فيه نوع إشكال فإن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وليس في هذه الشركة بيع وشراء ، وإنما هي شركة صنائع قال في الغياثية شركة التقبيل هي أن يشتركا على أن يتقبل الأعمال وهنا ليس كذلك ، بل هما اشتركا في الحاصل من الأجر وليست شركة صنائع ، وأجبت بأن الشركة في الخارج تقتضي الشركة في التقبيل فثبت فيه اقتضاء إذ ليس في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتقبل والآخر بالعمل وتخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه فأثبتنا الشركة في التقبل اقتضاء ا هـ.

وفي «المحيط البرهاني»٤٢١/١٠ : وقال الصدر الشهيد في شرح كتاب الشركة : طريق الجواز أن يجعل كأنهما اشتركا في التقبل والعمل، ثم يتقبل أحدهما ويعمل الآخر، فعلى هذا القول لو قال صاحب الدكان أنا أتقبل، ولا تتقبل أنت وأطرح عليك لتعمل بالنصف لا يجوز، وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبل المتاع ويلي قطعه، ثم يدفعه إلى الآخر بالنصف يجوز، وكذا في سائر الصناع، قال : ولو تقبل التلميذ جاز، ولو عمل صاحب الدكان جاز أيضاً.اهـ

২.৬. বাহ্যত শিরকাতুল আমাল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা শিরকাতুল আমাল নয়

কিছু উদাহরণ এমন, যা বাহ্যত মনে হবে, শিরকাতুল আমাল, বাস্তবে নয়। যথা—

১. বাড়ি তৈরি করার গ্রুপ।

শহরতলী বা গ্রামে সাধারণত ঘর বা বাড়ি নির্মাণের জন্য কোনো একজন রাজমিস্ত্রির সাথে চুক্তি করা হয়। এরপর সে তার দল বা টিমের সাহায্যে বাড়ি নির্মাণ করে দেয়।

বাহ্যত মনে হবে এটি শিরকাতুল আমাল। তবে বাস্তবে তা নয়। কারণ, চুক্তি করা হয় কেবল দলপ্রধানের সাথে। দলের অন্যদের সাথে বাড়ির মালিকের চুক্তি হয় না; বরং তাদের সাথে দলনেতার আভ্যন্তরীণ ইজারা চুক্তি থাকে। সুতরাং এটি শিরকাতুল আমাল নয়।

২. সমুদ্রে দল বেঁধে একসাথে মাছ শিকার করা।

অনেক সময় দেখা যায়, নদী বা সমুদ্রে দল বেঁধে জেলেরা মাছ শিকার করে। তাদের এই কাজটিও শিরকাতুল আমালের ভিত্তিতে হবে না; বরং যে যে কয়টি মাছ শিকার করবে, সেটা তার একার হবে। এখানে শিরকাত চুক্তি বৈধ নয়।

৩. ফুটপাতে একজনের দোকানের সামনে আরেকজন কোনো কিছু বিক্রয় করা বা সার্ভিস প্রদান করা। যেমন, জুতা ঠিক করে দেওয়া। এটিও বাহ্যত শিরকাতুল আমাল, তবে বাস্তবে নয়। কারণ জুতা সার্ভিসিং এ মূল দোকানী অংশীদার নয়। অতএব শিরকাত যেহেতু হয়নি, তাই প্রাপ্ত পারিশ্রমিক হবে জুতা মেরামতকারীর একার। মূল দোকানী কেবল ন্যায্য ভাড়া পাবে।[১]

৪. একজনের একটি মাছ ধরার বড় জাল আছে। সে এক লোককে বলল, তুমি এ জাল দিয়ে বিল থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসো। যা মাছ ধরা হবে তা আমাদের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে।

এটি ফাসিদ শিরকাত। কারণ মূল কাজে উভয়ের অংশীদারিত্ব নেই।

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৬৬, মাদ্দাহ : ১৩৪৪

অতএব, সকল মাছ হবে মাছ শিকারীর। সে জালের ন্যায্য ভাড়া শোধ করবে। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো, জেলের সাথে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ইজারা চুক্তি করা।

৫. একজনের সেলুনের সরঞ্জামাদি আছে। দোকানও আছে। সে আরেকজনকে বলল, তুমি আমার এসব সরঞ্জাম ব্যবহার করে সেলুনের কাজ করো। যা আয় হবে তা আমাদের মাঝে বণ্টন হবে।

এটিও ফাসিদ। সুতরাং সকল মুনাফা হবে শ্রমিকের। আর সে বস্তুসমূহের ন্যায্য ভাড়া শোধ করবে। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো, দোকানের মালিক তাদের সাথে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ইজারা চুক্তি করে নেওয়া।

৬. একজনের একটি ভ্যানগাড়ি আছে। আরেকজনের রিক্সা। উভয়ে চুক্তি করল তারা তাদের বাহন নিজেদের মতো করে ভাড়ায় খাটাবে। এরপর দিন শেষে যা উপার্জন হবে তা অর্ধার্ধিহারে নিজেদের মাঝে ভাগ হবে। এটিও এভাবে বৈধ হবে না। কারণ এখানে কারো থেকে অর্ডার গ্রহণ করে যৌথভাবে কোনো কাজ করা হচ্ছে না।[1] তাই একে শিরকাতুল আ'মাল বলার সুযোগ নেই।

৭. একজনের ফটোকপি মেশিন। আরেকজনের দোকান। উভয়ে চুক্তি করল তারা তাদের সম্পদ তৃতীয় পক্ষের নিকট ভাড়ায় খাটাবে। এতে যা উপার্জন হবে তা অর্ধার্ধিহারে ভাগ হবে।

এখানেও কোনো কাজে শিরকাত হয়নি। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর ভাড়া বস্তুর মালিকদের একার হবে। প্রাপ্ত ভাড়ায় কোনো শিরকাত হবে না।

১ ফিকহের ভাষায় একে বলে, তাকাব্বুল ও আমাল না থাকা।

শিরকাতুল আমওয়াল

(Goods Partnerships)

প্রাথমিক কথা,

বর্তমানে ব্যবসার একটি বড় ক্ষেত্র হলো—পণ্য বিক্রি করা। সেটা হতে পারে নিজে তৈরি করে অথবা ক্রয় করে বিক্রি করা। হতে পারে দেশ থেকে ক্রয় করা। হতে পারে বিদেশ থেকে এনে বিক্রি করা। এর জন্য প্রয়োজন পুঁজির। প্রয়োজন দক্ষতার। এগুলো কখনো একার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজন হয় অন্যের সাথে যৌথভাবে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করা। বর্তমানে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। মূলত এভাবে পুঁজির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে পণ্য বিক্রি করার নামই পুঁজিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। এ্যাওফি একেই 'শিরকাতুল ইনান' বলেছে।

৩. ১. শিরকাতুল আমওয়ালের পরিচিতি

الأموال শব্দটি المال এর বহুবচন। অর্থ : অর্থ, সম্পদ। আর 'শিরকাত' মানে অংশীদারিত্ব। এক কথায় পুঁজিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। ইংরেজিতে বলে Goods Partnerships।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতে রচিত 'ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন'-এ শিরকাতুল আমওয়ালের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে—

إذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعاً أو كل على حدة او مطلقاً و ما يحصل من الربح يقسم بينهم تكون شركة أموال.

'শিরকাতুল আমওয়াল হলো, অংশীদারগণ এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, তারা নিজ পুঁজিতে ব্যবসা করবে। প্রত্যেকে নির্ধারিত হারে পুঁজি প্রদান করবে। পুঁজি বিনিয়োগের সাথে সাথে প্রতিটি কেনাবেচাতে তারা সকলে অংশগ্রহণ করার শর্ত করতে পারে। অথবা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি করার শর্ত করবে অথবা এ বিষয়টি শর্তমুক্তও রাখতে পারে। আর মুনাফা যা হবে তা তাদের মাঝে বণ্টন হবে।'[1]

AAOIFI-এর ১২নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডে এর পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

شركة العنان هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك بحيث يحق لكل منهما التصرف في مال الشركة، و الربح بينهما بحسب الاتفاق، والخسارة بقدر الحصص في رأس المال.

'শিরকাতুল ইনান বা আমওয়াল হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, তারা প্রত্যেকে নির্ধারিত অর্থ বিনিয়োগ করবে। অংশীদারি সম্পদে প্রত্যেকের তাসাররুফের অধিকার থাকবে। আর মুনাফা বণ্টন হবে পূর্ব নির্ধারিত হারে। তবে লোকসান হলে তা সর্বাবস্থায় প্রত্যেকে তার পুঁজি অনুপাতে বহন করবে।'

৩. ২. তাৎপর্য

ক. মূল অংশীদারিত্ব হবে সম্পদে।
খ. সম্পদ বিনিয়োগ করা হবে সরাসরি তা বিক্রয়ের জন্য।
গ. সম্পদে প্রত্যেকের তাসাররুফ করার অধিকার থাকবে।

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দাহ নং : ১৩৩২, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৫

৩. ৩. ব্যবসার পুঁজি

ক. শিরকাতুল আমওয়ালের মূল হলো বিনিয়োগকৃত পুঁজি। এই পুঁজি সাধারণত নগদ অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

খ. কারেন্ট একাউন্টে যে টাকা থাকবে, সেটাও মূলধন হিসেবে ধরা যাবে। যদিও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে কারেন্ট একাউন্ট করয। তবে যেহেতু তা যখন তখন উত্তোলন করা যায়, তাই এতে সুযোগ আছে। চাই ওই ব্যাংকের সাথেই শিরকাত চুক্তি করা হোক, যার কাছে কারেন্ট একাউন্ট আছে, অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে করা হোক।[১]

গ. সকলের মূলধন সমান হওয়া জরুরি নয়। কমবেশিও হতে পারে। তবে কার অংশ কতটুকু তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

ঘ. মূলধন ভিন্ন দেশের কারেন্সি দিয়েও আদায় করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে যেদিন আদায় হবে, সেদিনের মার্কেট রেইট অনুযায়ী এর মূল্যমান নির্ধারণ করে নিতে হবে। মূল্যমান হলো ব্যবসার মূল কারেন্সির মূল্যমান।

সম্পদভিত্তিক অংশীদারিত্ব ব্যবসার পুঁজিসংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশদ আলোকপাত করা হলো—

৩. ৩. ১. ব্যবসার পুঁজি হিসাবে বস্তু বা দ্রব্য প্রদান

ব্যবসার পুঁজি হিসেবে বস্তুর বিনিয়োগ বৈধ হবে কি না বিষয়টি শুরু থেকেই মতভেদপূর্ণ।

৩. ৩. ১. ১. ইমাম আবু হানিফা রহ.

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে, কোনো পণ্যকে মূলধন হিসাবে বিবেচনা করে শিরকাতুল আকদ প্রতিষ্ঠা শুদ্ধ নয়। চাই তা মিসলি

---

১ অবশ্য অন্য কোম্পানির সাথে শিরকাত চুক্তি করার ক্ষেত্রে কারেন্ট একাউন্টের টাকা মূলধন হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে শাইখ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ একমত হননি। তিনি বলেছেন, এর কী প্রয়োজন। চেক দিয়ে তো শিরকাত করা যায়। সরাসরি কারেন্ট একাউন্টের টাকা মূলধন ধরার প্রয়োজন নেই। (দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৩৮)

(সমজাতীয়) হোক বা কিমতি (যার অনুরূপ কিছু নেই) হোক।[1]

উসমানী সালতানাতে রচিত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইনের ১৩৩৮নং ধারায় উল্লেখ আছে—

كون رأس المال من قبيل النقود شرط.

'শিরকাতুল আমওয়ালে মূলধন মুদ্রাজাতীয় হওয়া শর্ত।'

হানাফী মাযহাবের মূল সিদ্ধান্ত এটিই।

দলিল :

১. শিরকাত বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি যৌথ মূলধন (Pool) গঠন করা জরুরি। মূলধনগুলো পরস্পরে সংমিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। এদিকে মূলধন যদি বস্তু হয়, তাহলে তা সংমিশ্রিত হয় না; বরং পৃথক পৃথক থেকে যায়।

যেমন, খালেদ ও বকর দুটি গাড়ির মাধ্যমে শিরকাত করল। তাহলে গাড়ি দুটির প্রত্যেকটি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানায় থেকে যাবে। কারণ, দুটির সংমিশ্রণ সম্ভব নয়। সুতরাং খালেদের গাড়ি বিক্রি করা হলে এর সকল মুনাফা তার একার হবে। তদ্রূপ লোকসান হলে সেটাও তার একার হবে।

তাহলে বোঝা গেল, উভয়ের মূলধন যতক্ষণ পৃথক পৃথক থেকে যায়, ততক্ষণ শিরকাত হয় না। অপরদিকে মূলধন যদি মুদ্রা হয়। তাহলে দেখা যায়, মূলধনগুলো পরস্পরে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। এতে প্রত্যেকের টাকা পৃথক করা যায় না। ফলে একটি যৌথ মূলধন (Pool) তৈরি হয়। এভাবে যৌথ মূলধনে শিরকাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. ইসলামের একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো, عدم جواز ربح ما لم يملك

---

১ মিসলী বলা হয়, এমন বস্তু যা সাদৃশ্যপূর্ণ। কাছাকাছি গড়নের গণনাযোগ্য। যা নষ্ট করা হলে এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ বাজার থেকে অনুরূপ বস্তু দেওয়া যায়। যেমন, ধান, গম ইত্যাদি। আর ক্বীমতী (শব্দটির উচ্চারণ—ক্বী মো তি, ক্বী ম্ তি নয়) হলো, এমন বস্তু যা সাদৃশ্য পূর্ণ নয়। যা নষ্ট করা হলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ মূল্য দেওয়া হয়। যেমন, গরু, ছাগল ইত্যাদি।

وما لم يضمن অর্থাৎ, যে বস্তু মালিকানায় আসেনি কিংবা যে বস্তুর রিস্ক নিজের ওপর নেই সে বস্তু থেকে মুনাফা কামানো নাজায়েয।

দেখুন, পণ্য দিয়ে যদি শিরকাত হয় তাহলে এমন হতে পারে যে, পণ্য বিক্রয়ের পর একজনের লাভ হবে। আর আরেকজনের লোকসান হবে। তখন যার লাভ হবে সে মূলত অপর শরিক থেকে সেটা নেবে। অথচ অপর শরিকের বস্তু তার মালিকানায়ও নেই, রিস্কেও নেই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বোক্ত উদাহরণে গাড়ি দুটি বিক্রি করার পর দেখা গেল, খালেদের গাড়ির দাম বৃদ্ধি হয়ে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ হয়েছে। তাহলে মুনাফাই হলো, পঞ্চাশ হাজার টাকা।

এখন যদি খালেদকে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তবে বকর মুনাফা থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি খালেদকে এক লক্ষ বা সোয়া এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তবে সে তার প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে। বকর লাভবান হবে। আর তার এই লাভটা হবে খালেদের গাড়ি থেকে, যেটা না তার মালিকানায় আছে, না তার রিস্কে আছে।

অপরদিকে মূলধন যদি নগদ টাকা হয়, তাহলে এর দ্বারা যা ক্রয় করা হবে, তার ক্রয়মূল্য সকলের যিম্মা ও রিস্কে আসবে। অতএব, লাভ হলে সেটা রিস্কহীন লাভ হবে না।

৩. পণ্য দিয়ে যখন মূলধন তৈরি হবে তখন প্রথমে সেটা বিক্রি করতে হবে। তাহলে বিষয়টা দাঁড়াল এই, আমি আমার পণ্য বিক্রি করব এ শর্তে যে, এর মূল্যে আরেকজন শরিক হবে। অথচ এটি বৈধ নয়। অপর দিকে মূলধন যদি নগদ টাকা হয়, তাহলে এটি সম্ভব। এর দ্বারা কোনো পণ্য এ শর্তে ক্রয় করা যাবে যে, তাতে আরেকজন শরিক হতে পারবে।[১]

৩. ৩. ১. ২. ইমাম মালেক রহ.

ইমাম মালেক রহ.-এর মত সম্পূর্ণরূপে প্রথম মতের বিপরীত। তার মতে, নিঃশর্তভাবে তা বৈধ। চাই পণ্যটি মিসলি হোক বা কিমতি হোক। অথবা প্রত্যেকে পণ্য নিয়ে আসুক বা একজন পণ্য ও অপরজন নগদ মুদ্রা

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৬১

নিয়ে আসুক, সর্বাবস্থায় শিরকাত বৈধ। তবে শর্ত হলো, চুক্তির সময় পণ্যের বাজারমূল্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। এরপর ওই বাজারমূল্যটি তার অংশ বলে বিবেচিত হবে।

ধরা যাক, করীম ও জামিল শিরকাতুল আকদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক দুটি গাড়ি নিয়ে এলো।

চুক্তির সময় নির্ধারণ হলো, বাজারমূল্য প্রত্যেকটির এক লক্ষ টাকা। তারা বলল, আমরা এ দুটি গাড়ি দ্বারা যৌথ ব্যবসা করব এবং এগুলো বিক্রি করে আয় করব। তাহলে এ শিরকাত সহিহ হবে। আর ধরা হবে, এখানে প্রত্যেকের পুঁজি এক লক্ষ টাকা। অতএব, পরবর্তী সময়ে যদি এই শিরকতের সমাপ্তি ঘটে আর তখন পর্যন্ত কেবল একটি গাড়ি বিক্রি হয়ে থাকে। তবে ওই একটি গাড়ির মূল্য ব্যবসায় খাটিয়ে যে মুনাফা হয়েছে তা উভয়ে পাবে। কেবল গাড়ি যার সে নয়।[১]

দলিল

তারা মনে করেন, শিরকাতের উদ্দেশ্য হলো, কিছু মানুষ তাদের পুঁজি একত্র করে তা দিয়ে ব্যবসা করা ও মুনাফা অর্জ করা। এটি যেমন মুদ্রা দ্বারা হয়, তেমনি বস্তু দ্বারাও হয়।

৩. ৩. ১. ৩. ইমাম শাফেয়ী রহ.

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে মিছলি বস্তুতে বৈধ। কিমতি বস্তুতে নয়।

দলিল

মূলধন হিসেবে যে বস্তু বা পণ্য বিনিয়োগ করা হয়েছে, তা বিক্রয়ের পর কোনো শরিক চুক্তি রহিত করতে চাইলে, বস্তুটি যদি মিছলি হয়, তবে সেটা বাজার থেকে ক্রয় করে ফেরত দেওয়া সম্ভব; কিন্তু কিমতি হলে সেটা সম্ভব হবে না। তাই মিছলি বস্তু দ্বারাও মূলধন হতে পারে। তবে শর্ত হলো, উভয় দিকে একই ধরনের মিছলি বস্তু হতে হবে। যেমন, উভয়ের মূলধন, ধান; কিন্তু একজনের ধান, অপরজনের তেল, এরূপ হলে হবে না। কারণ, তাতে সংমিশ্রণ সম্ভব নয়।

---

১ আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৫

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতে, (অগ্রগণ্য বক্তব্য অনুযায়ী) হানাফী মাযহাবের মতই নাজায়েয। তবে ইমাম মালেক রহ.-এর মতের অনুরূপও একটি বর্ণনা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে আছে।

৩. ৩. ১. ৪. অগ্রগণ্য মতামত

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এক ফতোয়ায় লিখেছেন, 'পণ্যদ্রব্য দ্বারা শিরকতের ব্যাপারে যদিও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু বর্তমানে এর বিশেষ প্রয়োজন ও ব্যাপক ব্যবহারের কারণে ইমাম মালেক রহ.-এর মতামত অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে। এতে অধুনাকালের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে।'[১]

মোটকথা

শিরকাত প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ অর্থ হওয়া জরুরি নয়। বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যকেও মূলধন করে শিরকাত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তবে শিরকতের আকদ সম্পন্ন করার সময় এসব পণ্যের বাজার দর জেনে সে অনুপাতে শরিকদের অংশ নির্ধারণ করে নিতে হবে।[২]

উদাহরণ

ক. কেউ যদি চলমান কোনো কারখানায় (Industry) অর্থ বিনিয়োগ করে অংশীদার হয় তবে তা বৈধ হবে। ধরা যাক, একজনের কাপড়ের ফ্যাক্টরি আছে। তাতে আরেকজন এক লক্ষ টাকা দিয়ে শরিক হবে। এ অবস্থায় একজনের মূলধন টাকা। আরেকজনের হলো কাপড়। অতএব, কারখানার দাম নির্ধারণ পূর্বক অপরের অংশ ঠিক করে নিতে হবে।

খ. আধুনিক ব্যবসার একটি পরিভাষা হলো Merger (সংযোগ)। এর উদ্দেশ্য হলো, দুই বা ততোধিক কোম্পানি মিলে এক কোম্পানি হয়ে যাওয়া। এটিও বৈধ। এখানেও সকলের মূলধন কেবল নগদ অর্থে হয় না। নগদ অর্থের সাথে পণ্যদ্রব্যও থাকে।

---

১ ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৫

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৩/১/২

গ. কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সময়ে শরিকগণ যদি নগদ অর্থ ছাড়াও নিজেদের স্থাবর সম্পত্তি, বিভিন্ন ব্যবসার পণ্য অথবা বিল্ডিং ইত্যাদি দ্বারাও শরিক হয়, তাহলে এসব পণ্যের বাজার মূল্য হিসাব করে প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ হবে।

৩. ৩. ২. মূলধন সংমিশ্রিত হওয়া কি আবশ্যক?

অংশীদারিত্ব ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন পরস্পর সংমিশ্রিত হওয়া কি জরুরি? যেমন খালেদ ও বকর এরূপ চুক্তি করল যে, আমরা প্রত্যেকে এক হাজার টাকা দিয়ে কাপড়ের যৌথ কারবার করব। অতঃপর তারা তাদের টাকা একত্র না করে প্রত্যেকের টাকা প্রত্যেকের হাতেই রাখল। এমতাবস্থায় যদি খালেদ তার এক হাজার টাকা দিয়ে বস্ত্র খরিদ করে তাহলে এই বস্ত্র কি একা খালেদের বলে গণ্য হবে? অনুরূপ যদি লাভ-লোকসান হয়, তবে তাতে কি উভয়ে শরিক হবে? না শুধু খালেদ?

এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে এটি সঠিক নয়। তবে জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তা সঠিক। একত্র করা শর্ত নয়। তবে মিলানোর পূর্বে কারো টাকা নষ্ট হয়ে গেলে সেটা তার একার হবে। একত্র করার অর্থ এ নয় যে, এক পাত্রে রেখে ডাল-চালের মতো মিশানো; বরং হাতে দিলেই হলো।

উদাহরণ

কয়েকটি কোম্পানি মিলে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো যে, আমরা অমুক শিল্পে যৌথ ব্যবসা করব; কিন্তু ওই শিল্পের মেশিনারিজ আমদানি করার জন্য তারা এখনো মূলধন একত্র করেনি। ইতিমধ্যে কোনো এক কোম্পানি এল.সি. খুলল। উক্ত এল.সি. রপ্তানিকারকের নিকট তার ব্যাংক মারফতে পৌঁছে গেল। রপ্তানিকারকও তলবকৃত সকল মালামাল জাহাজে তুলে দিল। সাথে সাথে 'বিলস অব লেডিং'ও তার ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের ব্যাংকে পাঠিয়ে দিল। এরপর আমদানিকারক কোম্পানিগুলো নিজেদের মূলধন একত্র করে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নিজেদের ব্যাংকে পরিশোধ করল।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, উক্ত পণ্য আমদানিকারকের একার হবে। যৌথ হবে না। অন্যদের মতে, শিরকাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

তদ্রূপ দুই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে শিরকাতুল আমওয়ালের চুক্তি করল। প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করল। চুক্তি সংগঠিত হওয়ার পর উভয়ের মূলধন একত্র করার আগেই তাদের একজন ব্যবসার পণ্য ক্রয় করতে রওয়ানা করেছে। পথিমধ্যে পণ্য ক্রয়ের আগেই তার টাকা হারিয়ে যায়। তাহলে এটি তার ব্যক্তিগত ক্ষতি হিসেবে ধর্তব্য হবে। শিরকাত থেকে নয়। অবশ্য পণ্য ক্রয়ের পর যদি হারায় তাহলে সেটা শিরকাত থেকে ধর্তব্য হবে।

অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে, উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একার বলে গণ্য হবে। যৌথ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, শিরকাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মূলধন একত্র করার শর্ত আরোপ না করার মধ্যে বিশেষ দুটি উপকারিতা রয়েছে। তা হলো—

- মালামাল নষ্ট হয়ে গেলে তাবত ক্ষয়ক্ষতির বোঝা এক কোম্পানির ঘাড়ে চাপবে না; বরং সকল কোম্পানিকেই তা বহন করতে হবে।
- আকদের সূচনালগ্নেই যদি সকল কোম্পানি তাদের মূলধন একত্র করে দেয়, তাহলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের টাকাগুলো অনর্থক পড়ে থাকে। আর যদি পরবর্তী সময়ে মূলধন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকে, তাহলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এই অর্থ অন্য খাতে খাটানো সম্ভব হবে। ফলে পুঁজিটুকু অহেতুক পড়ে থাকবে না।

তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষণীয়

ক. ইনভেস্টের আগে তা অন্যদের সাথে আলাপ করে নেওয়া।

খ. লিখিত চুক্তি হওয়া। যেন ক্ষতি হলে তা সকলে বহন করতে বাধ্য হয়। লাভ হলেও যেন একা ভোগ না করে।

গ. মূলধন বা পুঁজি চুক্তির সময় বা পণ্য ক্রয়ের সময় উপস্থিত থাকতে হবে। সুতরাং অন্যের নিকট পাওনা আছে—এমন টাকাকে মূলধন

হিসেবে নির্ধারণ করা যাবে না।[১] তবে ঋণ যদি মূল না হয়, বরং অনুগত হয়, তাহলে সমস্যা নেই। যেমন, দুটি কোম্পানি একীভূত হবে। শিরকাত চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। প্রত্যেক কোম্পানিরই কিছু পাওনা আছে। তাহলে মূলধনের মাঝে ঋণ ঢুকে গেল। ঋণটি যদি অনুগত হয়, পরিমাণে কম হয়, তাহলে এভাবেও শিরকাত চুক্তি করা যাবে।[২]

৩. ৪. ব্যবসা

• মৌলিকভাবে প্রত্যেক অংশীদারই যৌথ কারবারের মালামাল বিক্রি করতে পারবে। কারণ, তারা একে অপরের উকিল। তাই প্রত্যেক অংশীদার ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার রাখে। তবে কাজের সুবিধার্থে চুক্তি করে নেওয়া যাবে যে, কেউ মালামাল বিক্রি করবে। কেউ অন্য কাজ করবে বা কিছুই করবে না।

• নগদে বা বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে শর্ত হলো, সবই কোম্পানির স্বার্থে হতে হবে।

• সকল শেয়ার হোল্ডার এ ব্যাপারে একমত হতে পারবে, কোম্পানির কতক লোক পরিচালনায় থাকবে। বাকিরা তাদের অনুসরণ করবে।

• পরিচালক হিসাবে অংশীদার বা শেয়ার হোল্ডার নয় এমন কাউকে বাহির থেকে নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে তার বেতন/পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নিতে হবে, যা কোম্পানি থেকে প্রদান করা হবে। তদ্রূপ বেতন নির্ধারণ করে উৎসাহিত করার জন্য প্রফিটের একটি পার্সেন্টও দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া যাবে।

---

১ অগ্রগণ্য বক্তব্য হলো, চুক্তির সময় উপস্থিত না হলেও পণ্য ক্রয়ের সময় যদি উপস্থিত হয় তাহলেও শিরকাত হয়ে যাবে। দেখুন, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৬৩

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৩/১/২/৪
তবে শায়খ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, এটি একটি জটিল বিষয়। এর বৈধতার পক্ষে স্পষ্ট কোনো রেফারেন্স পাওয়া যায়নি। তবে কিছু নযীর পাওয়া যায়। যেমন—গাছে ফল আছে। ফলসহ গাছ বিক্রি করা হবে। কিছু ফল এখনো আসেনি। একে অনুগত ধরে 'অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয়' বৈধ হয়। তদুপরি বিষয়টি আরো গবেষণার দাবি রাখে। যদিও এ্যাওফি বৈধতার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। (দুরুসুল মাআয়িব, পৃ. ২৩৮)

• পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত কোনো পারিশ্রমিক না দেওয়া হয়, কেবল প্রফিটে অংশগ্রহণ করার কথা হয়, তবে সে মুদারিব হিসেবে গণ্য হবে।[১]

• অংশীদারদের কারো জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে না। ব্যবসায়িক কাজের বিপরীতে তারা কেবল মুনাফায় অংশগ্রহণ করবে।

• তবে কোম্পানির এমন কোনো কাজ যদি হয়, যা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আলাদা করে বাহির থেকে লোক নিয়োগ দিতে হয়, সেই কাজটি অংশীদারদের কেউ যদি করে দিতে সম্মত হয়, তাহলে তার জন্য সেই কাজের বিপরীতে আলাদা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো :

ক. ইজারা চুক্তি শিরকাত চুক্তির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হবে।

খ. যেকোনো সময় ইজারা চুক্তি থেকে শরিককে বরখাস্ত করা যাবে। এতে মূল চুক্তি প্রভাবিত হবে না।

গ. ব্যবসায় লাভ না হলেও ইজারা চুক্তি অনুযায়ী বেতন প্রদান অব্যহত থাকবে।[২]

ঘ. ব্যবসার সার্বিক কাজে অংশীদার হিসেবে সক্রিয় থাকা। যেন এটি বোঝা যায়, তিনি ব্যবসার একজন অংশীদারও বটে।[৩]

উপর্যুক্ত শর্ত সাপেক্ষে ইজারা চুক্তিতে বেতন নির্ধারণ করে শরিকদের কাউকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে। যেমন, বর্তমানে বড় কোম্পানি ও ফার্মের ডাইরেক্টরগণ পার্টনার হওয়ার পাশাপাশি আলাদা বেতন-ভাতাও ভোগ করেন।

• শিরকাতের সম্পদ মুদারাবার ভিত্তিতে কারো নিকট দেওয়া। এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে অগ্রগণ্য মত হলো বৈধ। কারণ, যেখানে

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৩/১/৩/৩

২ এ্যাওফি, স. ১২. ধ. ৩/১/৩/৫

৩ শিরকাতুল আমওয়ালে এমন শর্ত করা যায় যে, কোনো এক শরীক কাজ করবে না। তবে সেই শরীক যদি কোম্পানির ইমপ্লোয়ী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ইম্প্লয়মেন্ট ও পার্টনারশিপ এ দুটিকে স্পষ্ট করার জন্য সার্বিকভাবে সে ব্যবসায় সক্রিয় থাকা উচিত। যেমন, বোর্ড মিটিং এ থাকা। ইত্যাদি। এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত।

শ্রমিক রাখা বৈধ, সেখানে এটা তো বৈধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তবে তা সকলের সম্মতিতে হতে হবে।

ফকীহগণ শরিকদের জন্য এমন আরো অনেক হক বা অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—বন্ধক রাখা, আমানত রাখা। ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ব্যবসার কল্যাণের স্বার্থে যা কিছু করতে হয় এবং তা যদি ব্যবসায়ীদের নিকট প্রচলিত বিষয় হয়, তাহলে প্রত্যেক অংশীদার এ ধরনের কাজের অধিকার রাখবে। আর যেসব কাজ ব্যবসার জন্য স্পষ্ট ক্ষতিকর কিংবা ব্যবসায়ীদের নিকট প্রচলন নেই, শরিকের জন্য এমন কাজ করার অধিকার থাকবে না। সেক্ষেত্রে অপর শরিকের অনুমতি নিতে হবে।

৩. ৫. গ্যারান্টি ও নিরাপত্তা প্রদান

• প্রত্যেক অংশীদার আমানতদার। তাদের হাতে থাকা সম্পদ আমানত। তবে দায়যুক্ত নয়। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এর দায় কোনো শরিকের ওপর আরোপিত হবে না।

• শরিকদের কেউ যদি ব্যবসার সম্পদে এমন তাসাররুফ করে, যা সীমালঙ্ঘন কিংবা ত্রুটি হিসেবে প্রমাণিত হয়, অথবা ব্যবসার নীতিমালার বরখেলাপ হয়, এরপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ওই পরিমাণ দায় সংশ্লিষ্ট শরিকের ওপর বর্তাবে।

• শিরকাত চুক্তিতে একজন অপরজনের ওপর এরূপ শর্তারোপ করতে পারবে যে, তাকে তার পক্ষে কোনো কাফিল দেখাতে হবে অথবা বন্ধক হিসেবে কিছু রাখতে হবে। যেন সীমালঙ্ঘন, ত্রুটি বা নীতি পরিপন্থী কোনো কাজ করার কারণে ক্ষতি হলে এর ক্ষতিপূরণ সেখান থেকে নেওয়া যায়। এটি দায় সৃষ্টির আগেই গ্যারন্টি নিশ্চিত করা। যেন দায় সৃষ্টিকালে কোনো সমস্যা না হয়। সার্বিকভাবে এ পদ্ধতি 'কাফালাহ্ বিদ দারকের' সাথে মিলে, যা বৈধ।[১]

• শরিকদের কারো প্রদত্ত পুঁজির গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। এমনটি হলে সেটি সুদ হয়ে যাবে।

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৩/১/৪/২

• তৃতীয় কোনো পক্ষ পুঁজির নিরাপত্তা দিতে পারবে। লোকসান হলে সে তা বহন করবে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া বৈধ। যেমন—কখনো সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। শরঈ দৃষ্টিতে এটি কাফালাহ্ নয়। কারণ, কাফালাহ হয় কোনো দায় বা ঋণের ওপর। যা এখানে অনুপস্থিত। এটি মূলত স্রেফ একটি ওয়াদা। যা কিছু শর্তসাপেক্ষে বৈধ। তা হলো :

ক. উক্ত গ্যারান্টি ও নিরাপত্তা প্রদানের ওয়াদার সাথে অংশীদারি ব্যবসার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারবে না। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে।

খ. উক্ত গ্যারান্টি প্রদানের বিপরীতে কোম্পানি থেকে কোনো বিনিময় নেওয়া যাবে না। যেমনটি বীমা কোম্পানিতে করা হয়ে থাকে।

গ. যে ব্যক্তি বা কোম্পানিকে গ্যারান্টি প্রদান করা হবে, এর ৫০ শতাংশের বেশি অংশের মালিকানা গ্যারান্টিদাতার না হতে হবে।[১]

ঘ. উক্ত প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ একটি স্বেচ্ছাসেবা ও অনুদানমূলক হবে। সুতরাং উক্ত ওয়াদা যদি রক্ষা না হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে কোনো শেয়ার হোল্ডার শিরকাত চুক্তি বাতিলের দাবি করতে পারবে না বা সে তার কাজ করা থেকে বিরতও থাকতে পারবে না। এর অর্থ হলো, উক্ত নিরাপত্তা প্রদানকে কখনোই কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের অলঙ্ঘনীয় কোনো শর্ত হিসেবে দেখা হবে না। এটি কোম্পানির কোনো নীতিমালার অধীন নয়।[২]

৩. ৬. মুনাফা বণ্টন নীতিমালা

শিরকাত সহিহ্ হওয়ার জন্য একটি জরুরি বিষয় হলো, শিরকাতের চুক্তি সম্পাদন কালে কোন নীতির ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টন হবে—তা নিশ্চিত করা। কারণ, শিরকাত চুক্তির মূল বিষয়ই (মা'কুদ আলাই) হলো 'রিবহ' বা মুনাফা অর্জন। তাই এ বিষয়ে অজ্ঞতা থাকলে শিরকাত

১ অবশ্য মুফতি তাকী উসমানী হাফি. লিখেছেন, এটি উরফ ও প্রচলন ভিত্তিক হবে। প্রচলন অনুযায়ী এখন ৪৯ শতাংশ শেয়ার থাকলেও তা অভিন্ন মালিকানা ধরা হয়। আমার মতে এটি ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ হতে পারে। (তাওসিকুদ দুয়ূন, পৃ. ১১৪)

২ এ্যাওফি, ১২, ধা. ৩/১/৪/৩

ফাসিদ বলে গণ্য হবে।[১] সুতরাং মূল চুক্তিতেই মুনাফা বণ্টনের নীতি স্পষ্ট হওয়া জরুরি। কী পন্থায় মুনাফা নির্ধারণ করা হবে, এ বিষয়ে শরীয়াহ নীতিমালা পেশ করা হলো :

১. মুনাফার হার নির্ধারণ করা হবে পার্সেন্ট এর ভিত্তিতে। যেমন, বলা হবে, যা লাভ হবে এর ৪০%, ৫০% ইত্যাদি। অথবা এভাবে বলবে, যা লাভ হবে এর তিন ভাগের দুই ভাগ একজন পাবে। আর অপরজন তিন ভাগের এক ভাগ পাবে।

২. মুনাফার হার সুনির্দিষ্ট অংকে নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন, বলা হলো, প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা মুনাফা বাবদ প্রদান করা হবে। কারণ, হতে পারে মুনাফাই হয়েছে দুই হাজার টাকা। অথবা আদৌ মুনাফা হয়নি। মোটকথা, এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না, যা কোনো শরিকের মুনাফাকে অনিশ্চিত করে ফেলে। এমন শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি এমন শর্তারোপের পর মুনাফা আসার আগেই তা সঠিক করে নেওয়া হয়, তাহলে সঠিকভাবে মুনাফা বণ্টন করা যাবে। পক্ষান্তরে মুনাফা আসার আগে শর্ত ঠিক করা না হলে, প্রাপ্ত মুনাফা বণ্টন হবে পুঁজির আনুপাতিক হারে। পূর্ব শর্তানুযায়ী নয়।[২]

৩. এমন চুক্তি করা যাবে যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক মুনাফা হলে অতিরিক্তটুকু কোনো এক শরিক নিয়ে নেবে। যেমন, চুক্তি হলো, মুনাফা যদি ৫ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে ৫০% হারে মুনাফা বণ্টন হবে। তবে এর অধিক মুনাফা হলে অতিরিক্তটুকু এম.ডি. নিয়ে নেবে। অথবা অন্য কোনো শরিক নেবে।[৩]

মূলত এর মাধ্যমে যে শরিক কাজ করবে, সে উদ্বুদ্ধ হবে।[৪]

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৬০

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৫/৭

৩ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৫/৮

৪ এ্যাওফি একে অনুমোদন করেছে। তবে শায়খ মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ-এর সাথে একমত হননি। তিনি একে সঠিক মনে করেন না। কারণ তাতে শিরকতের লাভে এক ধরনের ‘শিরকাত বিচ্ছিন্নকরণ’ আছে, যা নিষিদ্ধ। (দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৪২) আমাদের দেশের কতিপয় ফকীহর দৃষ্টিতেও এটি আপত্তিকর।

৪. প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনুপাতে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, কেউ ৩০% পুঁজি বিনিয়োগ করেছে। কেউ ৪০%, কেউ ২০% পুঁজি দিয়েছে। তাহলে পুঁজি প্রদানের হারেও মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে। অর্থাৎ, যিনি ৩০% পুঁজি দিয়েছেন তিনি মুনাফাও ৩০% পাবেন। এভাবে বাকিগুলো।

৫. পার্সেন্টটা মুনাফার হবে। বিনিয়োগকৃত পুঁজির নয়। যেমন চুক্তি করা হলো, পুঁজির ১৫% মুনাফা হিসেবে প্রদান করা হবে; বরং এভাবে চুক্তি হবে যে, মুনাফা যা হবে তা থেকে ১৫% প্রদান করা হবে।

৬. এমন সমঝোতা ঠিক নয় যে, যখন লাভ হবে, তখন মুনাফার হার নির্ধারণ করা হবে। এখন কাজ করা যাক; বরং মূল চুক্তির শুরুতেই মুনাফার হার নির্ধারণ করে নিতে হবে। হ্যাঁ, মুনাফা হওয়ার পর পূর্ব নির্ধারিত মুনাফা বণ্টন নীতিমালায় পরিবর্তন আনা যাবে। কেউ চাইলে তার অংশ হ্রাসও করতে পারবে।

৭. মুনাফার হার পুঁজির অনুপাতে নির্ধারণ করা যাবে। অথবা কমবেশিও করা যাবে। তবে শর্ত হলো, মূল চুক্তিতে যিনি কাজ করবেন না বলে শর্ত করেছেন (Sleeping partner)[১] তার মুনাফার হার প্রদত্ত পুঁজির হারের অধিক হতে পারবে না। হ্যাঁ, 'কাজ করবে না' এমন কোনো শর্তারোপ না থাকলে মুনাফার হার অধিক নির্ধারণ করা যাবে। যদিও কাজ না করা হয়।[২]

এর সহজ বিকল্প হলো—পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া ইনসেনটিভ প্রদান করা। যেমন—এভাবে বলা যেতে পারে, প্রফিট আরো বেশি করতে পারলে কোম্পানী বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নেবে। মুনাফা প্রদানে আরো উত্তম বিবেচনা করবে। এটি কোনো শর্ত নয়। এক পক্ষীয় ওয়াদা। কোনো হারও ফিক্সড করা হলো না। লক্ষ্যমাত্রার অধিক প্রফিট হলে কোম্পানী নিজ থেকে প্রফিট হার বাড়িয়ে দেবে। এতে সমস্যা নেই।

১ Sleeping Partner বলতে বোঝায়, চুক্তিতেই যিনি কাজ না করার শর্ত করেছেন; কিন্তু চুক্তিতে যদি কাজ করার কথা থাকে অথবা কাজ করবেন না এমন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবে কাজ না করলেও মুনাফা যেকোনো হারে পেতে পারেন। মূল হলো, চুক্তি। কাজ নয়। প্রকাশ থাকে যে, যিনি কাজ করেন, পরিভাষায় তাকে বলে—Working/Active Partner

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৫/৩

৪. প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনুপাতে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, কেউ ৩০% পুঁজি বিনিয়োগ করেছে। কেউ ৪০%, কেউ ২০% পুঁজি দিয়েছে। তাহলে পুঁজি প্রদানের হারেও মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে। অর্থাৎ, যিনি ৩০% পুঁজি দিয়েছেন তিনি মুনাফাও ৩০% পাবেন। এভাবে বাকিগুলো।

৫. পার্সেন্টটা মুনাফার হবে। বিনিয়োগকৃত পুঁজির নয়। যেমন চুক্তি করা হলো, পুঁজির ১৫% মুনাফা হিসেবে প্রদান করা হবে; বরং এভাবে চুক্তি হবে যে, মুনাফা যা হবে তা থেকে ১৫% প্রদান করা হবে।

৬. এমন সমঝোতা ঠিক নয় যে, যখন লাভ হবে, তখন মুনাফার হার নির্ধারণ করা হবে। এখন কাজ করা যাক; বরং মূল চুক্তির শুরুতেই মুনাফার হার নির্ধারণ করে নিতে হবে। হ্যাঁ, মুনাফা হওয়ার পর পূর্ব নির্ধারিত মুনাফা বণ্টন নীতিমালায় পরিবর্তন আনা যাবে। কেউ চাইলে তার অংশ হ্রাসও করতে পারবে।

৭. মুনাফার হার পুঁজির অনুপাতে নির্ধারণ করা যাবে। অথবা কমবেশিও করা যাবে। তবে শর্ত হলো, মূল চুক্তিতে যিনি কাজ করবেন না বলে শর্ত করেছেন (Sleeping partner)[১] তার মুনাফার হার প্রদত্ত পুঁজির হারের অধিক হতে পারবে না। হ্যাঁ, 'কাজ করবে না' এমন কোনো শর্তারোপ না থাকলে মুনাফার হার অধিক নির্ধারণ করা যাবে। যদিও কাজ না করা হয়।[২]

এর সহজ বিকল্প হলো—পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া ইনসেনটিভ প্রদান করা। যেমন—এভাবে বলা যেতে পারে, প্রফিট আরো বেশি করতে পারলে কোম্পানী বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নেবে। মুনাফা প্রদানে আরো উত্তম বিবেচনা করবে। এটি কোনো শর্ত নয়। এক পক্ষীয় ওয়াদা। কোনো হারও ফিক্সড করা হলো না। লক্ষ্যমাত্রার অধিক প্রফিট হলে কোম্পানী নিজ থেকে প্রফিট হার বাড়িয়ে দেবে। এতে সমস্যা নেই।

১ Sleeping Partner বলতে বোঝায়, চুক্তিতেই যিনি কাজ না করার শর্ত করেছেন; কিন্তু চুক্তিতে যদি কাজ করার কথা থাকে অথবা কাজ করবেন না এমন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবে কাজ না করলেও মুনাফা যেকোনো হারে পেতে পারেন। মূল হলো, চুক্তি। কাজ নয়। প্রকাশ থাকে যে, যিনি কাজ করেন, পরিভাষায় তাকে বলে—Working/Active Partner

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৫/৩

এর কারণ হলো, মুনাফার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, মুনাফা লাভের অধিকার সর্বদা তিনটি কারণের কোনো একটি কারণে হয়ে থাকে। যথা—

ক. আমল বা শ্রম।
খ. পুঁজি।
গ. দায়।

সুতরাং স্লিপিং পার্টনার হলে পুঁজির আনুপাতিক হারের বেশি মুনাফা তার জন্য নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ, ওই অতিরিক্ত অংশটি না কাজের বিনিময়ে, না সম্পদের বিনিময়ে।[১]

৮. চুক্তিতে যে শরিকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সে আবশ্যকীয়ভাবে কাজ করবে, তাকে তার পুঁজির অনুপাতের অপেক্ষা বেশি মুনাফা প্রদান জায়েয। যেমন—এক শরিক ৫০% পুঁজি প্রদান করেছে। তিনি ব্যবসায়িক কাজও করবেন। তার মুনাফার হার ধরা হয়েছে, ৬০%। এটি বৈধ। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা তার কাজের বিপরীতে হবে।

৯. উভয় পক্ষ কাজ করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও মুনাফার অনুপাত মলধনের অনুপাত থেকে যদি ভিন্ন হয়, তাহলেও তা বৈধ। যেমন যায়েদ ও বকর সমান পুঁজিতে যৌথ ব্যবসা শুরু করল এ শর্তে যে, উভয়ে কাজ করবে। তবে মুনাফা বণ্টন হবে এভাবে যে, যায়েদ দুই তৃতীয়াংশ। আর বকর এক তৃতীয়াংশ পাবে। এটিও বৈধ। কারণ, সকলের কাজের মান এক রকম হয় না।

১০. মুনাফা বণ্টনের জন্য সময় নির্ধারণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে সেই সময়ের পূর্বে প্রতি মাসে মুনাফা বাবদ অর্থ প্রদান করা যাবে। সেটা Payment on Account বলে ধর্তব্য হবে। বাংলায় বলে প্রাক্কলিত। এর চূড়ান্ত হিসাব হবে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে। তখন মুনাফা বাস্তবে আরো বেশি হয়ে থাকলে, সেটা প্রদান করা হবে। আর কম হয়ে থাকলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে না নেওয়া হয়, তাহলে এতেও সমস্যা নেই।

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দাহ : ১৩৪৮ প্রকাশ থাকে যে, আমল দ্বারা শিরকাতুল আমাল, মাল দ্বারা শিরকাতুল আমওয়াল ও দায় বা যিম্মা দ্বারা শিরকাতুল উজূহ উদ্দেশ্য। সামনে এর আলোচনা আসছে।

১১. মুনাফার হার সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা যাবে। যেমন—প্রথম বছর এক রকম হবে। দ্বিতীয় বছর আরেক রকম হবে।

১২. একেক সময়ের জন্য শরিকদের মুনাফার হার একেক রকম হতে পারে। যেমন, ব্যবসার প্রথম পিরিয়তে 'ক' পাবে ৪০ %, 'খ' পাবে ৬০%। দ্বিতীয় পিরিয়ডে এটি উল্টে যাবে। তদ্রূপ উক্ত হার নির্ধারিত মুনাফা পর্যন্তও করা যাবে। যেমন—মুনাফা ৫ লক্ষ টাকা হলে 'ক' পাবে ৪০ %, 'খ' পাবে ৬০%। এর বেশি হলে 'খ' পাবে ৪০ %, 'ক' পাবে ৬০%।[১]

৩. ৭. মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি

১. মুনাফা বণ্টন হবে সকল ব্যয়, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায়ের পর।

২. মুনাফা বণ্টন দুভাবে করা যায়। যথা :

এক. Actual valuation। তা হলো সকল পণ্য ও এ্যাসেটের বিক্রয় শেষে প্রাপ্ত মুনাফার ভিত্তিতে বণ্টন। যেমন, দুজন শরিক হয়ে একটি দোকান দিয়েছিল। শিরকাত মেয়াদ শেষ; কিন্তু দোকানের পণ্য সব বিক্রয় শেষ হয়নি। তাহলে সব বিক্রয় করে এরপর প্রকৃত মুনাফা বণ্টন করা হবে। এটি বেশ দুর্লভ। সাধারণত এভাবে সব বিক্রয় করে মুনাফা বণ্টন করা হয় না।

দুই. Constructive valuation। তা হলো :

- বিদ্যমান সকল পণ্য এ্যাসেটের ন্যায্য মূল্য (Fair value) ধরা হবে।[২]

---

১ এ্যাওফি, স. ১২. ধা. ৩/১/৫/৫
এই পয়েন্টে শায়খ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, মূলনীতিগতভাবে এটি ঠিক আছে। তবে সরাসরি হাওয়ালা পাইনি। তবে শিয়া যায়দিয়্যা ফেরকার এক কিতাব 'আল বাহরুয যাখার ফি মাযাহিবি ফুকাহায়িল আমসার' গ্রন্থে এর স্পষ্ট হাওয়ালা আছে।—দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৪৩

২ কোম্পানির এ্যাসেটের মুদ্রায়ন তিন ভাবে হতে পারে। যথা—
১. Book / Historical value, তা হলো, ক্রয় মূল্য। আরবীতে বলে 'আল কিমাতুত তারিখিয়্যা/দাফতারিয়্যা'
২. Breakup/Depreciatede value, এটি একাউন্টিং পদ্ধতিতে ঠিক করা হয়।

• যেসব পাওনা/ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলোর নগদ ক্যাশ ধরা হবে।[1]

• যে ঋণ/পাওনার প্রাপ্তি নিশ্চিত নয়, সেগুলো ধরা হবে না।

• ঋণের ওপর ইন্টারেস্ট থাকলে সেটা ধরা হবে না।

• কোনো পাওনা যদি এমন হয়, যা দ্রুত পরিশোধ করা হলে ডিসকাউন্ট বা ছাড় দেওয়া হবে, এমন ছাড়ও ধরা হবে না।

• নগদ ক্যাশ যা আছে, তা সেভাবেই ধরা হবে। এভাবে হিসাব করার পর সকল ব্যয় বাদ দিয়ে যা থাকবে তা বণ্টন করে নেওয়া হবে।[2]

এ পদ্ধতিতে সরাসরি পণ্য বা এ্যাসেট বিক্রি করার প্রয়োজন নেই। বিক্রি না করেও বণ্টন করা যাবে। প্রাপ্ত লাভে কোনো শরিক নগদ ক্যাশ নেবে, কেউ পণ্য নিয়ে নেবে, কেউ এ্যাসেট নেবে।

প্রতি বছর একটি পণ্যে বছরে এর ভ্যালু কী পরিমাণ হ্রাস হয়, সেটি নির্ণয় করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

ধরা যাক, ১০% ভ্যালু হ্রাস হয়েছে, তাহলে বুক ভ্যালু থেকে এই ১০% হ্রাস হবে। পণ্যের বাজার মূল্যের সাথে এর তফাৎ হয়ে থাকে। সব সময় বাজার মূল্য জানা সম্ভব হয় না, তাই ব্যবসায়ীরা ব্রেকআপ ভ্যালু ধরে মূল্যায়ণ করে নেয়। যদিও শরঈ দৃষ্টিতে মার্কেট ভ্যালু ধরাই উচিত ছিল। তদুপরি প্রয়োজনে এটিও করা যাবে। আরবীতে একে বলে 'আল কিমাতুস-সাফিয়া'।

৩. Market value, তা হলো, বাজারে ওই পণ্যের বর্তমান মূল্য। (দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৪৩)

১ এখানে লক্ষণীয় হলো—

ক. ঋণ বা অন্যের কাছে পাওনা টাকা অনুগত হয়ে মূলধন হতে পারে। পূর্বে তা আলোচনা করা হয়েছে।

খ. তদ্রূপ ঋণদাতা ছাড়া তৃতীয় কারো কাছে ঋণ বা দায় বিক্রি করা যায় না। যদিও তা সমমূল্যে হয়। তবে অনুগত হতে পারে। যেমন—একটি কোম্পানির কিছু ঋণ বা দায় পাওনা আছে। এখন তা পুরোপুরি বিক্রি করা হবে। তাহলে এই বিক্রয়ের মাঝে ঋণও বিক্রি হয়ে যাবে। শর্ত হলো, ঋণ অনুগত হতে হবে এবং যে মূল্য ধরা হবে, সেটি ঋণের চেয়ে অধিক হতে হবে। এই দুটি কথা মেনে নিয়েই এই তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে যে, যেসব পাওনা আছে, সেগুলোও মুদ্রায়ণ ধরা হবে। এর অর্থ এগুলো বিক্রি হয়ে যাবে। এটি যেহেতু অনুগত তাই বৈধ হবে। (দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৪৩)

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৫/৯

তদ্রূপ উক্ত পন্থায় প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার তার শেয়ারের দামও জানতে পারবে। তেমনি ওই শেয়ার অন্য শরিকের কাছে বিক্রয় করাও সহজ হবে। বর্তমান কোম্পানিগুলোতে ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

• ভবিষ্যতে মুনাফা আসতে পারে, এমন সম্ভাবনার ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টন করা যাবে না; বরং পূর্বোক্ত পন্থায় অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে। যেমন—সামনে রোজার মৌসুমে খেজুর বিক্রি করে এই পরিমাণ লাভ হতে পারে। সেই লাভও হিসাব করে বণ্টন করা হলো। এটি করা যাবে না।

• মুনাফার হার নির্ধারণ হতে হবে উরফ তথা প্রচলন ও প্রথানুযায়ী ইনসাফের সাথে। কোনো প্রকার সুদী অপকৌশলের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। যেমন—সুদের রেইট হলো, এক লাখে ৫% তথা ৫ হাজার টাকা। কেউ সুদের ভিত্তিতে এক লক্ষ টাকা ধার নিলে, সুদ হিসেবে অতিরিক্ত ৫ হাজার টাকা প্রদান করবে। এই হিসাব অনুযায়ী, কারো থেকে শিরকাত ব্যবসায় এক লক্ষ টাকা মূলধন বাবদ গ্রহণ করা হলো। তার ক্ষেত্রেও সুদের উক্ত হার বজায় রাখার জন্য এভাবে মুনাফার হার নির্ধারণ করা হলো যে, ৫% এর ৯৯% মূলধনদাতাকে দেওয়া হবে। মাত্র ১% অপর শরিক পাবে। আর এর অধিক প্রফিট হলে গ্রহীতা শরিক পাবে ৯৯%। দাতা পাবে মাত্র ১%। এটি একটি সুদী অপকৌশল। এটি না করা চাই।[১]

• কোনো পণ্য যদি এমন হয়, যা সরাসরি বিক্রি করা হয় না; বরং ভাড়ায় প্রদান করা হয়। তাহলে ভাড়াপ্রাপ্তির পূর্বে ও ভাড়াচুক্তি শেষ হওয়ার পূর্বে মুনাফার যে বণ্টন হবে, সেটিও সাময়িক বণ্টন বলে বিবেচিত হবে।[২]

• মুনাফা বণ্টনকালে সকলের ঐকমত্যে মুনাফার একটি অংশ সি.এস. আর. (Corporate social responsibility) ফান্ডেও রাখা যাবে।

---

১ দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৪১

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৫/১৩

৩. ৮. মুনাফা বণ্টন না করা

• অংশীদারি কারবারের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী অথবা পরবর্তী সময়ে সকলে একমত হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে যে, প্রাপ্ত মুনাফা বণ্টন করা হবে না। কেবল জমা করা হবে।

• অথবা ব্যবসাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কিংবা মূলধনকে সংরক্ষণ করতে প্রতিবার প্রাপ্ত মুনাফা থেকে কিছু অংশ রিজার্ভ ফান্ড হিসেবেও রাখা যাবে।

• অথবা সকলের প্রাপ্তি যেন সমান হয়, এ লক্ষ্যেও রিজার্ভ ফান্ড করা যাবে। এ সবই বৈধ।

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, কোম্পানির মাঝে শেয়ার হোল্ডারগণ আসা যাওয়া করেন। আজ একজন আসছেন, কিছুদিন পর তিনি চলে যাচ্ছেন। তার মুনাফা তিনি নিয়ে গেছেন; কিন্তু মুনাফার একটি অংশ রিজার্ভ ফান্ডে থেকে গেছে। এটি কীভাবে বৈধ হয়? সে তো আর কোম্পানিতে থাকছে না। এর জবাব দেওয়া হয়েছে, এটি কোম্পানির নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এ নীতি জেনেই কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। সুতরাং যারা অংশগ্রহণ করবে, এতে তাদের সম্মতি আছে যে, তার মুনাফার একটি অংশ পরবর্তীদের জন্য থেকে যাবে।[১]

৩. ৯. লোকসান বহনের নীতিমালা

• এক্ষেত্রে পরিষ্কার কথা হলো, লোকসান সর্বদা পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করা হবে। এখানে ভিন্ন কোনো চুক্তি করা যাবে না। সুতরাং মুনাফা যে হারেই নির্ধারিত হোক, লোকসান সর্বদা পুঁজির আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে। হাদীসে স্পষ্ট এসেছে—

الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه.

‘লোকসান হলে তা পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করা হবে। আর মুনাফা যেকোনো হারে পরস্পরের ঐকমত্যে নির্ধারণ করা যাবে।’[২]

---

১ দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৪৫

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস, ৪০৬

• কোম্পানি নিজে লোকসান বহন করবে, এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না।

• পূর্ব কোনো শর্ত বা চুক্তি ছাড়া শরিকদের যে কেউ স্বেচ্ছায় লোকসান বহন করতে পারবে। এতে অসুবিধা নেই।

৩. ১০. শিরকাত চুক্তি শেষ করা

• শিরকাত চুক্তি তিনভাবে বাতিল বা শেষ করা যায়। যথা :

ক. শিরকাতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাওয়া।

যে উদ্দেশ্যে শিরকাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা হাসিল হয়ে যাওয়া। যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র খরিদ করে তা বিক্রি করার চুক্তি হয়েছিল। সেটা বিক্রয় হয়ে গেলে শিরকাত চুক্তি অটোমেটিক বাতিল হয়ে যাবে।

খ. শরিকগণ কর্তৃক শিরকাত বাতিল করা।

প্রত্যেক শরিকের অধিকার আছে, যেকোনো সময় ইচ্ছা করলে শিরকাত বাতিল করে দিতে পারবে। তবে তা আগেই অবহিত করতে হবে। অতঃপর যৌথসম্পদ বণ্টন করে নেবে। পণ্য সামগ্রী থাকলে তা বিক্রি করে পূর্বোক্ত চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করবে। অথবা পণ্যও ভাগ করে নিতে পারবে।

এটা তখনি হবে যখন শরিক বলতে কেবল দুই ব্যক্তিই থাকবে। পক্ষান্তরে এর অধিক হলে এক শরিকের চলে যাওয়াটা অন্যদের শিরকাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। অন্যদেরকে সে কেবল অবহিত করবে। এরপর তার প্রাপ্তি বুঝে নেবে। অবহিতকরণ ও প্রাপ্তি বুঝে পাওয়ার মাধ্যমে তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অপরদিকে অন্যদের শিরকাত আপন অবস্থায় বহাল থাকবে।

মোটকথা, একজন শরিক চলে যাওয়ার দ্বারা বাকিদের শিরকাত প্রভাবিত হবে না; বরং তার অংশ অপর পার্টনারের নিকট বিক্রি করে দেবে কিংবা অন্য কারো নিকট বিক্রি করবে।

গ. অনিবার্য কারণবশত শিরকাত বাতিল হওয়া। যেমন, কোনো শরিক মারা যাওয়া। পাগল হওয়া। তদ্রূপ একজনের পুঁজি অপরজনের সাথে

মিশ্রণের আগেই এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কিছু ক্রয় করার আগেই কোনো শরিকের পুঁজি ধ্বংস হয়ে গেলে, তার অংশে শিরকাত বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য কোনো শরিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সাবালক ওয়ারিশরা চাইলে বহাল রাখতে পারবে।

তবে মিশ্রণের পর (এমন মিশ্রণ যে পৃথক করা সম্ভব নয়), যদিও তা বাণিজ্য শুরু করার আগেই হোক না কেন অংশবিশেষ ধ্বংস হয়ে গেলে, শিরকাত বাতিল হবে না। এক্ষেত্রে মিরাস চালু হবে।

• শিরকাত চুক্তি যখন শেষ করা হবে, তখন প্রথমে সকল দায় আদায় করা হবে। এরপর মূলধন ও মুনাফা (যদি থাকে) বণ্টন করা হবে। মুনাফা যদি না থাকে, বরং মূলধনও পুরোপুরি উত্তোলন না হয়, তাহলে প্রত্যেকে তার পুঁজির আনুপাতিক হারে লস বহন করবে।

৩. ১১. পণ্য বণ্টন

শিরকাত চুক্তি সম্মিলিতভাবে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর, সম্পদ মুদ্রা আকারে থাকলে সেটাই বণ্টন করে নেওয়া হবে। আর যদি দ্রব্য আকারে থাকে, তাহলে চাইলে সেই দ্রব্যই বণ্টন করা যাবে। অথবা তা মুদ্রায় রূপান্তর করেও বণ্টন করা যাবে।

যদি মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কেউ বলে পণ্য নেবে। কেউ বলে মুদ্রা নেবে। তাহলে পণ্য অবস্থায় বণ্টন সম্ভব হলে তাই করবে। কারণ, পণ্যে উভয়ের অধিকার আছে। আর তা বণ্টন সম্ভব না হলে মুদ্রায় রূপান্তর করবে।

৩. ১২. পণ্য অবস্থায় বণ্টন পদ্ধতি

পণ্য অবস্থায় বণ্টন করতে হলে এর পদ্ধতি হলো, প্রথমে বাজারদর হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করবে। যদি মূল্য উভয়ের বিনিয়োগকৃত মুলধনের চেয়ে বেশি হয়, তবে বেশিটুকু মুনাফা হবে। এরপর সেটা পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা হিসেবে বণ্টন হবে। বাকিগুলো তাদের পুঁজি অনুপাতে বণ্টন হবে।

উদাহরণ : যায়েদ ৪০ হাজার ও বকর ৬০ হাজার টাকা দিয়ে শিরকাত শুরু করল। কিছুদিন ব্যবসা করার পর এখন তারা তা বাতিল করতে চায়। সব পণ্য আকারে আছে।

বাজারদর হিসেবে পণ্যগুলোর মূল্য দাঁড়ায় ১ লাখ বিশ হাজার টাকা। তাহলে বিশ হাজার মুনাফা হিসেবে বণ্টন হবে।

সুতরাং বিশ হাজার টাকার সমপরিমাণ পণ্য মুনাফা হিসেবে প্রথমেই বণ্টন হয়ে যাবে। এরপর অবশিষ্ট পণ্যমূল্য প্রত্যেকের মূলধনের আনুপাতিক হারে বণ্টন হবে। অর্থাৎ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য যায়েদকে প্রদান করা হবে। আর ৬০ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য বকরকে প্রদান করা হবে।

পণ্য নির্ধারণ শরিকদের পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে হয়ে গেলে ভালো। অন্যথায় পণ্যগুলোকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে লটারির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতিকেই Constructive valuation বলে।

৩. ১৩. নির্ধারিত সময়ের আগে চুক্তি রহিত না করার শর্তারোপ

• এরূপ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া যাবে যে, নির্ধরিত সময়ের আগে কেউ তার চুক্তি রহিত করতে পারবে না। সাধারণত কোম্পানির টাকা বড় কোনো প্রজেক্টে বিনিয়োগ হয়। যখন তখন টাকা তুলে নিলে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য সমকালীন উলামায়ে কেরাম একে অনুমোদন করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

> المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
>
> 'মুসলমানগণের শর্তসমূহ গ্রহণযোগ্য। তবে এমন শর্ত নয় যা হালালকে হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে।'[১]

উপর্যুক্ত শর্তারোপে যেহেতু বিশেষ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তাই তা করা যাবে। এরূপ শর্তারোপ করা হলে এবং তা মেনে শিরকাত চুক্তিতে আবদ্ধ হলে সেটি বহাল রাখা আবশ্যক।

---

১ জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৫২। قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

• নির্ধারিত সময়ের পূর্বে চুক্তি রহিত করা যাবে না, এ শর্ত ও চুক্তি মেনে শিরকাত চুক্তিতে অংশগ্রহণ করার পরও কেউ সময়ের আগে তার চুক্তি রহিত করে দিলে অথবা সমুদয় পুঁজি তুলে নিলে, ওই পর্যন্ত মুনাফায় তার প্রাপ্ত অংশ যথারীতি প্রদান করতে হবে।

এক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের আগে যেন কোনো শরিক তার চুক্তি রহিত না করে, এজন্য এ পন্থা গ্রহণ করা যাবে যে, এক পক্ষীয় 'আবশ্যক দানচুক্তি' থাকবে। আর কোনো শরিক নির্ধারিত সময়ের আগে চলে গেলে সে তার পুঁজির একটি অংশ কিংবা প্রফিটের একটি অংশ কোম্পানির সি.এস. আর. ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে।

তবে সে তার প্রফিট পাবে না, কিংবা আংশিক পাবে কিংবা সমুদয় পুঁজি পাবে না এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না।

৩. ১৪. পণ্য বা শেয়ার ক্রয় করে নেওয়ার ওয়াদা

কোম্পানি বা শরিকদের কেউ এমন আবশ্যকীয় ওয়াদা দিতে পারবে যে, যখন ব্যবসা শেষ হবে অথবা যখন শেষ করে দেওয়া হবে, তখন বিদ্যমান সকল এ্যাসেট বা পণ্য বা শেয়ার সে তৎকালীন বাজার মূল্যে অথবা তখন আলোচনা করে যে মূল্য ধার্য হবে সে মূল্যে কিনে নেবে। তবে ফেইস ভ্যালুতে ক্রয়ের ওয়াদা দেওয়া যাবে না।[১]

৩. ১৫. শিরকাত ফাসেদ হওয়ার বিধান

শিরকাতুল আমওয়াল ফাসেদ হওয়ার একটি বড় কারণ হলো, মুনাফা সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া। সুনির্দিষ্ট অংকে মুনাফা নির্ধারণ করা হলে শিরকাত চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিধান হলো, চুক্তি সঠিকভাবে নবায়ন করে নেওয়া। নবায়ন করার আগেই মুনাফা এসে গেল সেটা প্রত্যেকের পুঁজির আনুপাতিক হারে বণ্টন হবে। ধার্যকৃত অংকে নয়।[২]

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৩/১/৬/২

২ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৬০

৩. ১৬. শিরকাতুল আমওয়ালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে শিরকাতুল আমওয়াল নয়

১. একজনের একটি নৌকা আছে। সে অপর তিন জনের সাথে চুক্তি করল, তারা তার নৌকা ভাড়ায় খাটাবে। দিন শেষে যা উপার্জন হবে তা ৪ ভাগে ভাগ হবে। ৪র্থ ভাগটি হবে নৌকার মালিকের।

২. একজনের গাড়ি আছে। সে আরেকজনকে বলল, তা ভাড়ায় খাটাও। যা উপার্জন হবে তা সমানহারে ভাগ করে নিব।

বিশ্লেষণঃ

উপরোল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে শিরকাত বৈধ নয়। কারণ, এখানে না সম্পদে শিরকাত আছে, না কাজে। বরং এক দিকে আছে পণ্য বা বস্তু। আর অপর দিকে আছে ‘মানফাআত’ (Benefit)। অতএব শিরকাত যেহেতু হয়নি, তাই প্রাপ্ত মুনাফা সব নৌকা ও গাড়ির মালিকের হবে। বাকিরা ন্যায্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। তাই এক্ষেত্রে সঠিক হলো, নৌকা ও গাড়ির মালিক অপর পক্ষদের সাথে ইজারা চুক্তি করে নেওয়া।

শিরকাতুল আমাল ও শিরকাতুল আমওয়াল : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

শিরকাতুল আমাল ও আমওয়ালের মাঝে অমিলের দিক

১. শিরকাতুল আমালে মুনাফা যেকোনো হারেই হতে পারে। এখানে স্লিপিং পার্টনারের ধারণা নেই।

অপরদিকে শিরকাতুল আমওয়ালে স্লিপিং পার্টনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই মুনাফার হার নির্ধারণে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

২. শিরকাতুল আ'মালে মূল হলো শ্রম। সম্পদ গৌণ। অপরদিকে শিরকাতুল আমওয়ালে সম্পদ মূল। শ্রম গৌণ।

শিরকাতুল আমাল ও আমওয়ালের মাঝে মিলের দিক

১. দুটিরই বিকল্প হলো ইজারা। এ কথাটির ব্যাখ্যা হলো, শিরকাতুল আ'মালে যদি শুধু বস্তু দেওয়া হয়, কাজ না করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে সেটা বস্তুর ইজারা হবে।

আর শিরকাতুল আমওয়ালে যদি পুঁজি বিনিয়োগ না করে কেবল শ্রম দেওয়া হয় তবে সেটা হবে ব্যক্তির ইজারা।

এক্ষেত্রে শুরু থেকেই ব্যক্তির সাথে ইজারা চুক্তি করে নেবে। তা না করা হলে শেষে মূল মুনাফা পাবে মূল পুঁজি বিনিয়োগকারী। আর অপরজন কেবল ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে।

২. ফাসিদ হলে অপর শরিক ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়। (বস্তু/ব্যক্তি)

শিরকাতুল উজূহ

(Liability Partnerships)

প্রাথমিক পরিচয়

সমাজে কিছু মানুষ এমন থাকে, যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। ব্যবসা করার মতো পুঁজি নেই। দরিদ্র শ্রেণি। তবে বিশ্বস্ত। তারা বিশ্বস্ততা, ব্যবসায়িক খ্যাতি ও সুনামের ভিত্তিতে অন্যদের থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করে। এরপর তা অন্যদের নিকট নগদ বা বাকিতে বিক্রি করে। অথবা গ্রাহকদের থেকে অর্ডার নিয়ে বাকিতে পণ্য ক্রয় করবে। এরপর পেমেন্ট পেয়ে মূল্য শোধ করবে। ব্যবসার এই ধরনটিও আমাদের সমাজে এখন বেশ প্রচলিত। বিশেষ করে অনলাইন ট্রেডিং-এ এর প্রচলন অনেক। এই ব্যবসাটি যদি যৌথভাবে করা হয়, তবে সেটাই 'শিরকাতুল উজূহ' বা সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলে বিবেচিত হবে।

শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়

'উজূহ' (اَلْوُجُوْهُ) শব্দটি اَلْوَجْهُ এর বহুবচন। অর্থ : চেহারা (Face)। এখানে শব্দটি খ্যাতি, প্রসিদ্ধি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয় Partnerships of Credit Worthiness or Reputation (Liability Partnership)।

৪. ১. শিরকাতুল উজূহের পরিচিতি

কিছু মানুষ এমন আছে যারা বিশ্বস্ততা, ব্যবসায়িক খ্যাতি ও সুনামের ভিত্তিতে অন্যদের থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করে। এরপর তা অন্যদের নিকট নগদ বা বাকিতে বিক্রি করে। উক্ত কারবারটি যৌথভাবে একটি অংশীদারি চুক্তির আওতায় করা হলে সেটাই হলো শিরকাতুল উজূহ। একে 'শিরকাতুল মাফালিসও' বলে।

মূল বিষয়টি বোঝার পর এবার আমরা এর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা পেশ করছি :

ত্রয়োদশ শতাব্দিতে উসমানী সালতানাতে রচিত 'ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন'এর ১৩৩২ নং ধারায় এর পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

> إذا لم يكن لجماعة رأس مال و عقدوا الشركة على شراء سلع التجارة نسيئة وتقسيم ما يحصل بعد بيعها من الربح بينهم تكون شركة وجوه.
>
> 'কিছু লোক এমন যাদের ব্যবসা করার মতো পুঁজি নেই। তারা এ মর্মে পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, অপর ব্যবসায়ীদের থেকে তারা বাকিতে পণ্য ক্রয় করবে। এরপর তা বিক্রয়ের পর যা লাভ হবে তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। এমন অংশীদারি চুক্তিকে 'শিরকাতুল ওজূহ' বলা হয়।'

AAOIFI-এর ১২নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, ধারা ২/৩-তে 'শিরকাতুল উজূহের' পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে :

'শিরকাতুল উজুহ বা (Partnership Liability) হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এ ব্যাপারে একমত হওয়া যে, তারা বাকিতে পণ্য ক্রয় করবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত হারে সেই পণ্যের মূল্য আদায় করতে বাধ্য থাকবে। আর প্রত্যেকে যেই হারে পণ্যের মূল্য আদায়ের দায় গ্রহণ করবে সেই হারে মুনাফা লাভ করবে অথবা মুনাফার হার দায় থেকে ভিন্ন হবে।' (বিস্তারিত 'মুনাফা' শিরোনামে আসছে)

এমন পার্টনারশিপ ব্যবসা অতীতে যেহেতু সাধারণত দরিদ্র শ্রেণির

লোকেরাই করত, তাই একে ‘শিরকাতুল মাফালিস’ (شركة المفاليس) বলে।

যা বোঝা গেল :

৪. ২. তাৎপর্য

১. উক্ত শিরকাতে পূর্বদৃশ্যমান কোনো পুঁজি নেই।

২. একমাত্র পুঁজি ‘বিশ্বস্ততা’, ‘সুনাম’ ও পরিচয়।

৩. বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের পর মূল্য আদায় করে যা বাকি থাকবে সেটিই মুনাফা।

৪. বকেয়া মূল্য আদায়ের দায় ভাগ করে নেওয়া যাবে। অথবা যৌথ ভাবে থাকবে।

৪. ৩. চুক্তির বক্তব্য যেমন হবে

চুক্তির মূল বক্তব্যটি হবে, ‘আমরা এ বিষয়ে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় একমত হলাম যে, আমরা মানুষ থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করব। এরপর নগদে বিক্রি করব। এরপর দুটি মূল্যের তফাতের মধ্য দিয়ে যে প্রফিট হবে সেটা আমাদের মাঝে যৌথভাবে বণ্টন হবে।’[১]

৪. ৪. দায় গ্রহণ

• শিরকাতুল উজূহের মধ্যে মূলধন হিসেবে কোনো টাকা থাকবে না; বরং মূলধন হলো, বাকিতে পণ্য ক্রয় করে এর মূল্য আদায়ের দায় গ্রহণ। ইংরেজিতে বলে liability।

সুতরাং কোনো শরিক যদি টাকা বা মুদ্রা ইনভেস্ট করে তবে সেটা শিরকাতুল উজুহের মধ্যে পড়বে না। অবশ্য গ্রাহকের নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনো কিছু ক্রয়ের প্রয়োজন হলে সেটা শিরকাতুল মিলকের ভিত্তিতে ক্রয় করা হবে। কিংবা একজনে ক্রয় করে সেটা ভাড়া

১ আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৮৮৬

প্রদান করবে। সেই ভাড়া বা রেন্ট শিরকাতুল উজূহের খরচ হিসেবে ব্যয় হবে।

• liability বা যিম্মা প্রত্যেকের সমান হওয়া জরুরি নয়। এমন হতে পারে যে, একজন তিন ভাগের দুই ভাগ দায় গ্রহণ করবে। আর অপর শরিক এক ভাগ দায় গ্রহণ করবে।

• বকেয়া মূল্য পরিশোধের উক্ত দায় যৌথভাবে সকল শরিকদের ওপর থাকবে। তবে কে কত শতাংশ দায় আদায় করবে, সেটি শুরুতেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। যেমন—এক শরিক ৪০ শতাংশ দায় নেবে। অপর শরিক ৬০ শতাংশ দায় নেবে। কিংবা প্রত্যেকে ৫০ শতাংশ করে দায় নেবে।

৪. ৫. মুনাফা

• শিরকাতুল উজূহের মধ্যে মুনাফা লাভের মূল ভিত্তি হলো, liability সুতরাং কোনো শরিক যদি liability না নেয়, তবে সে মুনাফার হকদার হবে না।

• উক্ত শিরকাতে প্রত্যেক শরিক যেই হারে দায় (liability) গ্রহণ করবে ঠিক সেই হারেই মুনাফা পাবে। উদাহরণস্বরূপ, দায় যদি ৩ ভাগের ২ ও ৩ ভাগের ১, এই হারে বণ্টন হয়, তবে মুনাফাও সেই হারে বণ্টন হবে।

তদ্রূপ চুক্তি যদি হয় ক্রয়কৃত বস্তুসমূহের মূল্য আদায়ের দায় অর্ধার্ধি হারে হবে, তাহলে মুনাফাও অর্ধার্ধি হারে বণ্টন হবে। এক্ষেত্রে যদি মুনাফা ৩ ভাগের ২ ও ৩ ভাগের ১, এই হারে নির্ধারণ করা হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মুনাফা অর্ধার্ধি হারেই বণ্টন হবে।

উল্লেখ্য, উসমানী সালতানাতে রচিত 'ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন'-এর ১৪০২নং ধারায় এরূপ সিদ্ধান্তই প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে AAOIFI-এর ১২নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা : ৩/২/৩-তে বলা হয়েছে, يتم توزيع الربح بحسب الاتفاق 'অংশীদারদের সম্মতিক্রমে (যেকোনো হারে) মুনাফা বণ্টন হবে।'

উক্ত দুটি বিধিবদ্ধ আইনে সংঘর্ষের কারণ হলো, উসমানী সালতানাতের

বিধিবদ্ধ আইনটি অধিকাংশক্ষেত্রে হানাফী ফিকহকে সামনে রেখে রচনা করা হয়েছে। কারণ, তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে হানাফী ফিকহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর হানাফী ফিকহের সিদ্ধান্ত হলো, দায় অনুযায়ী মুনাফা বণ্টন করা।

অপরদিকে এ্যাওফির স্ট্যান্ডার্ডগুলো যদিও নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবকে সামনে রেখে রচনা করা হয়নি তদুপরি তাতে ফিকহে হাম্বলীর প্রাধান্য অধিক পরিলক্ষিত হয়।

কারণ, আরববিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় হাম্বলী ফিকহের প্রাধান্য অধিক। আর হাম্বলী ফিকহের অগ্রগণ্য বক্তব্য হলো, শিরকাতুল আমওয়ালের মতো শিরকাতুল উজূহের মধ্যেও শরিকদের সম্মতিক্রমে মুনাফা যেকোনো হারে নির্ধারণ করা যাবে।

৪. ৬. লোকসান

লোকসান সর্বদা দায় অনুপাতে বহন করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া মূল্য পরিশোধের যে যতটুকু অংশ বহনের দায় গ্রহণ করবে, লোকসান ওই হারে বহন করবে। যদিও প্রতিটি ক্রয়ে প্রত্যেক শরিকের অংশগ্রহণ না থাকে। কারণ, শিরকাত চুক্তির কারণে প্রতিটি একক ক্রয়কেও যৌথ ধরা হয়। লোকসান বহনের উক্ত নীতিতে সকলেই একমত।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে লোকসান হলো বকেয়া মূল্য পরিশোধ করতে না পারা। হতে পারে পণ্য বিক্রয় হয়নি। অথবা লস দিয়ে বিক্রি করতে হয়েছে।

৪. ৭. প্রচলিত কিছু উদাহরণ

১. গ্রাম বাংলায় দেখা যায়, ফেরি করে অনেকে বাচ্চাদের খেলনা, নারীদের সাজ-সজ্জার বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করে। কখনো দেখা যায়, এক সাথে দুজন ফেরিওয়ালা থাকে। এখানে এটি সম্ভব যে, তারা শিরকাতুল উজূহের ভিত্তিতে বাকিতে পণ্য এনে নগদে বা বাকিতে বিক্রি করে প্রাপ্ত মুনাফা নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেবে।

২. আধুনিক যুগে বিভিন্ন Supply organization শিরকাতুল উজূহের ভিত্তিতে কোনো এক কোম্পানি থেকে মাল বাকিতে এনে তৃতীয় পক্ষের নিকট নগদে বিক্রি করতে পারে। নিজেরা কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করবে না। অবশ্য গ্রাহকদের নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনো কিছু ক্রয় করার প্রয়োজন হলে নিজেরা যৌথভাবে তা ক্রয় করে নিতে পারে। এতে ক্রয়কৃত বস্তুসমূহে শিরকাতুল মিলক প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমনটি শিরকাতুল আমালের সাথে পুঁজি বিনিয়োগের প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

৩. সামাজিক গণমাধ্যম ফেইসবুকের মাধ্যমে অনেকে পণ্য বিক্রি করেন। একটি পেইজ খোলা হয় অথবা স্বতন্ত্র একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়। তাতে বিভিন্ন কোম্পানির পণ্যের ব্যাপারে তথ্য দেওয়া হয়। এরপর কোনো গ্রাহক তাদের নিকট অর্ডার করলে তারা সেই পণ্যটি বাকিতে ক্রয় করে এনে নগদে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয়। এ কাজটি যৌথভাবে করলে সেটা শিরকাতুল উজূহ হবে।

৪. ৮. এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড থেকে পার্টনারশিপ চুক্তি

পার্টনারশিপ বিষয়ে এ্যাওফি তাদের ১২নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড রচনা করেছে। নাম : Sharika (Musharaka) and Modern Corporations. আমাদের উক্ত আলোচনায় এই স্ট্যান্ডার্ড সামনে ছিল। এ ছাড়া উক্ত স্ট্যান্ডার্ডে আধুনিক কোম্পানি ও তার বিধান নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সামনে 'আধুনিক পার্টনারশিপ চুক্তি'-এর অধীনে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক পার্টনারশিপ চুক্তি

প্রাথমিক কথা,

শিরকাত বা অংশীদারিত্ব চুক্তি একটি প্রাচীন চুক্তি। যুগে যুগে এর ব্যবহার ছিল। তবে বর্তমান সময়ে প্রচলিত আধুনিক অংশীদারিত্ব বা পার্টনারশিপ চুক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলোর শরঈ বিধানও আমাদের জানা দরকার। যদিও এসবের কিছু আলোচনা পূর্বোক্ত উদাহরণগুলোতে এসে গেছে। তদুপরি আলাদা করে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

৫. ১. জয়েন্ট স্টক কোম্পানি

জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (Joint-stock company) বা যৌথ মূলধনী ব্যবসা হলো, একটি আধুনিক যৌথ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা। সহজ ভাষায় যাকে 'কোম্পানি' বলে। এর যে ধরন ও পদ্ধতি, সেটা আগে ছিল না।

ব্যবসায় যৌথ উদ্যোগ একটি প্রাচীন বিষয়। ইসলামপূর্ব আরবেও এর রীতি ছিল। সেখানে গোত্র ব্যবসা ছিল। গোত্রের সকলে পুঁজি বিনিয়োগ করত। এরপর ব্যবসায়িক কাফেলা ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতো। সকলের যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা হতো। আজকের যুগে যাকে Business caravan বলে।

রোমান আইনেও এই যৌথ উদ্যোগের ধারণা পাওয়া যায়। আধুনিক

যৌথ মূলধনী ব্যবসা বা কোম্পানির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রথমেই উঠে আসে মধ্যযুগীয় ইউরোপের গিল্ড ধারণা।

আনুমানিক নবম শতকে ইউরোপে বিশেষত ফ্রান্সে বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো 'গিল্ড' (Guild) বা বণিক সংঘ। মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করার সাথে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তিও জন্ম নেয়। মূলত সেসব বাধা দূর করার লক্ষ্যেই গিল্ড বণিক সংঘ উদ্ভব হয়। যেমন, একটি বাধা ছিলো, মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুরা বণিকদের থেকে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করত। নানা কর চাপিয়ে দেওয়া হতো। এতে বণিকরা বিপাকে পড়ত। এই সমস্যার সমাধান কল্পে গিল্ড ধারণার উদ্ভব হয়। গিল্ড ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর স্বাধীনতা প্রদান করত। মূলত ইউরোপীয় মধ্যযুগে সমাজের প্রায় সকলেই কোনো না কোনো গিল্ডের সদস্য ছিল। সে অনুযায়ী তাদের কর্তব্য ও কাজ নির্ধারিত হত।[১]

পরবর্তীতে লন্ডন, জার্মান, স্পেন প্রভৃতি দেশে গিল্ড ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। এই গিল্ড ধারণা থেকেই পরবর্তীতে ইংল্যাণ্ডে চার্টার্ড কোম্পানির ধারণা উদ্ভব হয়। ইংল্যান্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যেই বর্তমান কোম্পানির উৎস নিহিত।

ইংল্যান্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য ধারাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- **গিল্ড ধারণা।**
- **চার্টার্ড কোম্পানি ধারণা।**

৫. ১. ১. নন চার্টার্ড কোম্পানি ধারণা

খ্রিস্ট্রীয় একাদশ শতকে ইংল্যান্ডে গিল্ড ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে। তখন শুধু বণিকরাই নয়; অধিকার আদায়ে ও যুলুম থেকে বাঁচতে

---

১ ড্যানিয়েল রোল্যান্ড ফাসফেল্ড রচিত অর্থনৈতিক চিন্তা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'The Age of the Economist'। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন, আখতার আলিম বাপু। অনুবাদের নাম : অর্থনীতিবিদদের যুগ। প্রকাশক : অর্থনীতি প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা। পৃ. ৪০

সাধারণ জনগণও গিল্ডের সাথে সম্পৃক্ত হতো। তাদের প্রভাব এতটাই ছিল যে, মধ্যযুগে ইউরোপে গিল্ডগুলিকে শহর প্রশাসনের একটি অংশ মনে করা হতো।

বর্তমান বাণিজ্যিক বিভিন্ন সংস্থা ও সমিতির উৎস মূলত এই গিল্ড ধারণায় নিহিত। গিল্ডগুলো তাদের বাণিজ্যিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আইন ও সংবিধান রচনা করতো। এই সংবিধান ব্যবসায়ীদেরকে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করতো। তাদের এই সংবিধানকে আইনের মর্যাদা দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয় সরকারি লাইসেন্স বা চার্টার।

ইংল্যান্ডে সাধারণ আইন বা কমন ল' অনুযায়ী রাজার অধিকার ছিল এই ধরনের সনদ বা চার্টার প্রদান করার। ধীরে ধীরে রাজকীয় চার্টার ব্যাপকতা লাভ করে।

ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। আগে স্থানীয়ভাবে ব্যবসা করা হতো। ষোড়শ শতকে দূরে অন্য দেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা হয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় ব্যবসায়িক স্বাধীনতা। রাজকীয় চার্টার কর্তৃক এই স্বাধীনতা প্রদান করা হতো।

১৫০৫ সালে বেলজিয়ামে ব্যবসার জন্য প্রতিষ্ঠা হয় 'দি কোম্পানি অফ মার্চেন্ট এ্যাডভেঞ্চারার্স।' প্রচুর পরিমাণে একচেটিয়া স্বাধীনতা পেতো এসব কোম্পানি। এ শতাব্দীতে বহু সংস্থাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের সনদ প্রদান করা হয়। সনদের আইন-কানুন পূর্ব গিল্ড আইন-কানুনের মতো করেই লিখা হতো। গিল্ডের মতো এই সব চার্টারও একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার লাভ করত।

প্রথমদিকে ইংল্যান্ডের এইসব কোম্পানির মালিকরা সকল ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হতো।[1] সীমিত দায় ধারণা ছিল না। এটি আরো পরে যুক্ত হয়। সামনে তা উল্লেখ হবে।

---

১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, মূল বই : The East India Company: The world's most powerful corporaton, By Allen Lane। অনুবাদক : তীর্থংকর রায়। অনুবাদ প্রকাশক : আনন্দ প্রকাশক, কলকাতা। পৃ. ১১

৫. ১. ২. ইস্ট ইন্ডিয়া চার্টার্ড কোম্পানি

তৎকালীন সময়ে যেসব চার্টার্ড (Chartered) কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তন্মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত, ক্ষমতাধর, প্রভাবশালী কোম্পানি হলো ইস্ট ইন্ডিয়া চার্টার্ড কোম্পানি। এটি ১৬০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল তথা ২০০ বছর পর্যন্ত ইংল্যান্ডের দাপুটে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাত। এই দুশো বছরে কোম্পানি বৃটেনে এশিয়ার বৃহত্তম বাজার তৈরি করেছে। এই কোম্পানির মাধ্যমেই এক সময় ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

এ কোম্পানির দাপট যেমন এশিয়ায় ছিল, তেমন বৃটেনেও। এই সময়ে লন্ডনে ব্যবসায়ী জগতের প্রধান ব্যক্তিদের এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি এই কোম্পানির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

ভারত নিয়ে ইংরেজদের কৌতূহলের শুরু প্রায় মধ্যযুগ থেকে। তবে ভারতে বাণিজ্যিক জাহাজ পাঠানোর উদ্যোগ শুরু হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে। ঐতিহাসিক তথ্যমতে, সর্বপ্রথম ১৫৮৩ সালে একদল ইংরেজ ফলমুথ থেকে টাইগার নামক এক জাহাজে চেপে এশিয়ার অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বণিক রাল্ফ ফিচ-ই ভারতে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে এই ব্যবসায়িক যাত্রাকে আরো সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে লন্ডনের ব্যবসায়ীরা এক জোট হয়ে ভারতে বাণিজ্যিক কাফেলা পাঠানোর চিন্তা করে। এর জন্য প্রয়োজন বিরাট অংকের মূলধন। এক দল বণিক ও নাবিক।

এ লক্ষ্যে ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, মাতব্বর ও জাহাজি নাগরিকদের একটি অংশ সিটি অফ লন্ডনের ফাউন্ডার্স হলে জমায়েত হয়। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে তারা উপস্থিতদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এ বাণিজ্যিক কাফেলায় মূলধন বিনিয়োগ অধিক লাভের কারণ হবে।

পরের কয়েকদিনেই তৎকালীন ৭০ হাজার পাউন্ড উঠে আসে। টাকা

জমা হওয়ার পর এবার চার্টার বা রাজকীয় সনদ দরকার। এ লক্ষ্যে তারা ২১৫ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আরজি রাণী বরবর পেশ করে। বিভিন্ন আলোচনার পর ১৬০০ সালের শেষ দিনে রানি আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনকারীদেরকে চার্টার প্রদান করেন। এর মাধ্যমে সূচিত হলো ইতিহাসের সবচেয়ে সমালোচিত, একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী, লুটেরা, স্বার্থবাদী, অত্যাচারী এক চার্টার্ড কোম্পানির যাত্রা।

প্রথম দিকে আবেদনকারী এই গোষ্ঠীর নাম ছিল—'সোসাইটি ফর অ্যাডভেঞ্চারার্স টু দি ইস্ট ইন্ডিজ।' সরকারি লাইসেন্স পেয়ে ব্যবসা শুরু করার সময় এদের পোশাকি নাম হলো, 'দি কোম্পানি অফ মার্চেন্টস অফ লন্ডন ট্রেডিং টু দি ইস্ট ইন্ডিজ। ডাক নাম—'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'।[১]

রাজকীয় চার্টার্ড তাদেরকে এনে দিল সীমাহীন একচেটিয়া অধিকার। তাদের অধিকার এতটাই সুদৃঢ় ছিল যে, ইংল্যান্ডের অন্য কারো জন্য ভারতে ব্যবসার অনুমোদন ছিল না। ব্যবসা করতে হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমোদন লাগবে। এ যেন এক সরকারের অধীনে আরেক একচেটিয়া সরকারের উৎপত্তি।

এভাবে একচেটিয়া ক্ষমতাধর বহু চার্টার্ড কোম্পানি জেগে উঠে। এগুলোর শীর্ষে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সরকার এসব চার্টার্ডে আগ্রহী ছিল, কারণ এখানে বসে বসে সরকার মোটা অংকের একটি মুনাফা পেয়ে যেত। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। বাজার মেনুপুলেট করা হতো। প্রতিযোগিতা ছিল না। সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবসায়। এজন্য সচেতন নাগরিকরা শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিলেন।[২]

তাছাড়া বিদেশী পণ্য এতো বেশি আমদানি করা হতো, দেশীয় পণ্য ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ইংরেজ তাঁতীরা কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কারণ এটিই ছিল।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সামনে নিজস্ব পরিমণ্ডলে ব্যবসা করার স্কোপ বেড়ে যায়। ইংল্যান্ডের

---

১ পৃ. ৩০। প্রাগুক্ত।

২ পৃ. ৩০। প্রাগুক্ত।

৩ পৃ. ৭৫

মানুষ এখন আর ভারতের কাপড় চায় না। নিজেদের মিলে তৈরি কাপড়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু একচেটিয়া চার্টার্ড কোম্পানি ছিল এর জন্য বড় বাধা। এ সময় এসে একচেটিয়া চার্টার্ড কোম্পানির বিরোধিতা তুঙ্গে উঠে।

১৭৭৬ সনে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০ ইং.) একচেটিয়ার প্রতি বিদ্বেষবশত রীতিমতো বই লিখেন। যার নাম, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations। সংক্ষেপে যা 'ওয়েলথ অব নেশসনস' নামে পরিচিত। বইটি পুঁজিবাদের ম্যানিফেস্টো বা আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। এ বইটি প্রকাশের পর অনেকেই চার্টার্ড কোম্পানিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

তিনি তার উক্ত বইয়ে একচেটিয়া চার্টার্ড কোম্পানির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মেনুপুলেট করে এমন যে কেউ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষত যদি তাদের হাতে থাকে রাজ্য শাসনের দায়িত্বও। স্মিথ দেখিয়েছেন, কীভাবে একচেটিয়া চার্টার্ডের কারণে কম প্রয়োজনীয় দ্রব্য চড়া দামে ইংল্যান্ডের বাজারকে প্রভাবিত করছে।

সবশেষে ১৮১৩ সালে একচেটিয়া চার্টার্ড কোম্পানির অবসান ঘটে। এরপর ব্যক্তিগত পর্যায়েও ইউরোপিয়ানরা ভারতে ব্যবসা করতে আসে। আর তখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হয়ে উঠে একটি পূর্ণ রাজনৈতিক কার্যক্রম। ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশবাদ গড়াই যাদের একমাত্র লক্ষ্য।

দুইশ বছরের অধিক কাল পর্যন্ত এক চেটিয়া চার্টার্ড কোম্পানি বহাল ছিল। শুরু থেকেই সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও এত দীর্ঘ সময় টিকে থাকার কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বিরোধিতা বিক্ষিপ্ত ছিল। একজোটে করা হয়নি। এডাম স্মিথের বইয়ের পর এর বিরোধিতা একজোট হয়ে শুরু হয়।[১]

সারাংশ

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপীয় অঞ্চলে বাণিজ্য ধারায় প্রথমে গিল্ড ছিল। এরপর চার্টার্ড কোম্পানি। সবশেষে নন চার্টার্ড কোম্পানি।

১ পৃ. ১১-১২

আজকে যে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি রয়েছে, এর মূল নিহিত সেই চার্টার্ড কোম্পানিতে। উভয়ের মাঝে মিলের একটি দিক হলো তখন যেমন, এখনও আধুনিক যুগে কোম্পানি করতে হলে সরকারের অনুমোদন নিতে হয়।[১]

৫. ২. আধুনিক কোম্পানি গঠনের রূপরেখা

আধুনিক কোম্পানি গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো—

- প্রথমে কয়েকজন উদ্যোক্তা মিলে কোম্পানি গঠনের জন্য একমত হয়ে কী ধরনের কোম্পানি গঠন করা হবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এক্ষেত্রে কমপক্ষে দুজন উদ্যোক্তার প্রয়োজন।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবসার ধরন নির্বাচন করতে হবে। পণ্য বিক্রয় করা হবে, না কি সার্ভিসিং সেল করা হবে।
- তৃতীয় পর্যায়ে একটা এড্রেস ঠিক করতে হবে। যা কোম্পানির অফিস হিসাবে দেখানো হবে।
- এরপর কোম্পানির একটি নাম ঠিক করতে হবে। নাম এমন হতে হবে, যা আগে কেউ গ্রহণ করেনি। এই নাম নিবন্ধন করতে হবে।
- নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফিসহ আবেদন করতে হবে 'যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর' (Registrar of Joint Stock Companies And Firms (RJSC)) বরাবর। আর.জে.এস.সি. যদি নামের মাঝে আইনী কোনো সমস্যা না পায় তাহলে ৫-১০ দিনের মধ্যে নামের ছাড়পত্র দিয়ে দিবে। নতুবা নতুন নাম দিয়ে পুনরায় আবেদন করতে হবে।
- নাম ছাড়পত্র (Name Clearance Certificate) পাওয়ার পর এবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, কোম্পানির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা ডকুমেন্টস তৈরি করতে হবে। এক. মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন। দুই. আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন।

---

১ তবে পার্থক্যও আছে। চার্টার্ড কোম্পানী হতো একচেটিয়া। শাসন ক্ষমতাও ছিল। যা আধুনিক কর্পোরেশন বা কোম্পানিতে নেই।

মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন বা সংঘ স্মারক-এ থাকবে—কোম্পানির লক্ষ্য, কার্যাবলী, ব্যবসার নাম, ধরন, অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ইত্যাদি।

আর আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন বা সংঘ বিধিতে থাকবে—কোম্পানি পরিচালক পর্ষদ কীভাবে নির্বাচিত হবে, কোম্পানির পক্ষে ব্যাংক সাইন কে করবে, সাধারণ মিটিং কখন হবে, কীভাবে নতুন সদস্য নেওয়া হবে, কোনো সদস্যকে কীভাবে বহিষ্কার করা হবে, কীভাবে লভ্যাংশ বণ্টন হবে ইত্যাদি আইন কানুন।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল কোম্পানি আইন বিষয়ক অভিজ্ঞ একজন আইনজীবির মাধ্যমে প্রস্তুত করাতে হয়।

- এরপর আর.জে.এস.সি.-এর ওয়েব সাইট থেকে নিবন্ধন ফর্ম ডাউনলোড করে তা পূরণ করে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্রসহ কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য আর.জে.এস.সি. বরাবর আবেদন করতে হয়।
- উক্ত আবেদনের পর কাগজপত্র যাচাই বাছাই করার পর সব ঠিক থাকলে, নির্ধারিত লাইসেন্স ফি নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে আর.জে.এস.সি.-এর কাছে জমা দিতে হবে।
- সবশেষে আর.জে.এস.সি. সব কিছু বিবেচনা করে কোম্পানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। এর মধ্য দিয়ে কোম্পানি মালিকানা সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির যৌথ মালিক বলে গণ্য হন।

৫. ৩. কোম্পানি মালিকানা : শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ

কোম্পানি নিবন্ধন করতে সাধারণত ৫০-৬০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে আর.জে.এস.সি. ফি, আইনজীবী ফি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই টাকা উদ্যোক্তাগণ প্রদান করে থাকেন। উদ্যোক্তাদের উক্ত বিনিয়োগটি কোম্পানিতে উদ্যোক্তাদের শিরকাতুল মিলক বা যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করে। এরপর কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার বৃদ্ধি হলে, কোম্পানির অন্যান্য এ্যাসেটের মতো কোম্পানি স্বত্বেও তাদের মালিকানা সৃষ্টি হয়।

৫. ৪. কোম্পানির শরঈ বিধান

কোম্পানি একটি যৌথ মূলধনী কারবার। এ ধরনের কারবার ইসলামী ফিকহে 'শিরকাত' বা 'অংশীদারি ব্যবসা' নামে পরিচিত।[1] তবে ইসলামী ফিকহে শিরকতের যে প্রকার ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এর সাথে কোম্পানির বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলোই কোম্পানির শরঈ বিশ্লেষণকে গুরুত্ববহ করে তুলেছে। (এ আলোচনাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য ইসলামী আইনের শিরকাত সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকতে হবে।) নিম্নে সংক্ষেপে এক নজরে সেই পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো—

১. শিরকাতে প্রত্যেক অংশীদারের সত্তাই পৃথক পৃথকভাবে মূল। অপরদিকে কোম্পানি বলতে একটি আইনগতব্যক্তি কিংবা আইনগত অস্তিত্বের অধিকারী কিছু বোঝানো হয়, যা এর সদস্যদের থেকে আলাদা। এমনকি সদস্য ছাড়াই নিজে পৃথকভাবে টিকে থাকতে পারে।

২. শিরকাতে প্রত্যেক অংশীদার যৌথসম্পদে সমানভাবে মালিক থাকে। তবে কোম্পানিতে সেই মালিকানার রূপ ভিন্ন। এখানে কোম্পানি বিলোপ হওয়ার আগে আইন শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয় না। এ কারণে কোনো শেয়ারহোল্ডার যদি ঋণগ্রস্ত হয় এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় তাহলে তার হাতে যে শেয়ার আছে সেগুলো বাজেয়াপ্ত হবে, কিন্তু তার শেয়ার অনুপাতে কোম্পানির সম্পত্তিতে সে যে অংশ পাবে সেটা বাজেয়াপ্ত হবে না। কারণ আইনগতভাবে কোম্পানির সম্পত্তির ওপর তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

৩. অংশীদারত্বের মধ্যে কারবারের পক্ষ থেকে কারো ওপর অভিযোগ করা হলে সব অংশীদার অভিযুক্ত হবে। কিন্তু কোম্পানি নিজেই একটি আইনসম্মত সত্তা। সুতরাং কোম্পানি নিজেই অভিযুক্ত হবে।

---

১ মূলত মালিকানার বিচারে ব্যবসা ও কারবার তিন প্রকার। যথা, ক. ব্যক্তিগত ব্যবসা (Private Proprietorship)।
খ. শিরকাত (Partnarship) ও গ. কোম্পানী (Join stock company)। প্রথম দুটি পুরাতন। অতীতকালেও ছিল। তৃতীয়টি অতীতের ফকীহগণের সময়ে ছিল না। তবে দ্বিতীয়টির সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। (বিশেষত শিরকাতুল ইনান)

শেয়ারহোল্ডাররা অভিযুক্ত হবে না। আদালতে এই আইনসম্মত সত্তার প্রতিনিধিত্ব করবে ব্যবস্থাপনা পরিষদের কোনো লোক।

৪. অংশীদারত্বের পৃথক কোনো আইনগত অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু কোম্পানির পৃথক আইনগত অস্তিত্ব থাকে। যাকে বলা হয় 'আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা।'

৫. অংশীদারি কারবারের মধ্যে কোনো অংশীদার অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করে নিজের মূলধন ফেরত নিতে চাইলে নিতে পারবে, কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে নিজের মূলধন ফেরত নেওয়া যায় না। তবে শেয়ার বিক্রি করা যেতে পারে।

৬. অংশীদারত্বের মধ্যে সাধারণত দায়দায়িত্ব কারবারের সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব হয় সীমিত।

উপরোল্লিখিত পার্থক্যগুলো থেকে এটি স্পষ্ট যে, কোম্পানি ইসলামী ফিকহে আলোচিত কোনো শিরকতের মধ্যে সরাসরি পড়ে না। তাই কোম্পানির শরীয়াহ নিয়ে মোট তিনটি মতামত তৈরি হয়েছে। যথা—

১. বৈধ নয়। এটি একটি বিচ্ছিন্ন মতামত। এর প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রবক্তা হলেন শায়খ তাক্বী উদ্দীন নাবহানী,[১] ডক্টর ঈসা আব্দাহ,[২] ড. আলী আব্দুল আল[৩] প্রমুখ গুটিকতক আলেম। তাঁরা মনে করেন, ফিকহের গ্রন্থে বর্ণিত ৫/৬ প্রকার শিরকতের বাহিরে অন্য কোনো শিরকাত শরীয়তে স্বীকৃত নয়। কোম্পানি এসবের কোনো প্রকারের মধ্যে পড়ে না। এটি বরং পুঁজিবাদের সৃষ্ট একটি বিশেষ কারবার। সুতরাং একে ইসলামী কোনো শিরকতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বৈধ বলার সুযোগ নেই।

ড. ঈসা আব্দাহ বলেছেন, لا علم لنا بأن الفقه الإسلامي يعترف بهذا

---

১ النظام الإقتصادي في الإسلام، للشيخ تقي الدين النبهاني، ص١٣٠، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد بن محمد الخليل ص١٢٤، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان شبير، ص٢٠٣، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة للدكتور مبارك بن سليمان ص ١٢٩

২ العقود الشرعية ص ١٨-١٩' الأسهم و السندات- السابق ذكره- ص١٢٤

৩ প্রাগুক্ত।

النوع من الشركات 'ইসলামী ফিকহ্ এ ধরনের শিরকাতে স্বীকৃতি দিতে পারে বলে আমার জানা নেই।'

তাদের কিছু যুক্তি হলো,

ক. শিরকাত একটি আকদ বা চুক্তি। দুজন শরিকের মাঝে তা ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। সাধারণ শিরকাত চুক্তিগুলোর মধ্যে তাই হয়ে থাকে। কিন্তু কোম্পানির মাঝে যে শরিক হতে চায় সে নিজ ইচ্ছায় শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে শরিক হয়ে যায়। চাই অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের সন্তুষ্টি থাক বা না থাক।[১]

জবাব : একথাটি সঠিক নয়। কারণ যে প্রথম উদ্যোক্তা হয়, সে আরেকজনের সাথে চুক্তি করেই কোম্পানি গঠন করে। এরপর আইপিওতে যে অংশগ্রহণ করে সেখানেও ইজাব-কবুল পাওয়া যায়। সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে যে শেয়ার ক্রয় করে, সেখানেও ইজাব-কাবুল পাওয়া যায়।

খ. তাছাড়া ট্রাডিশনাল শিরকতের মাঝে প্রত্যেক শরিকের কাজ করার অধিকার থাকে। কিন্তু কোম্পানিতে ব্যবসায়িক কাজে শেয়ার হোল্ডারদের তেমন কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। এখানে শুধু ইনভেষ্ট আদান-প্রদান করা হয়।

জবাব : এটিও সঠিক নয়। কারণ কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড মূলত সকল শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে উকিল হয়ে কাজ করে।

গ. তাঁরা আরো বলেন ট্রাডিশনাল শিরকতের মাঝে শরিকদের পক্ষ থেকে ব্যবসায়িক কাজের জন্য একজন বাস্তব ব্যক্তি থাকে। অপরদিকে কোম্পানির মধ্যে আইনগত সত্তা থাকে।[২]

জবাব : এটিও কোম্পানি হারাম হওয়ার কোনো কারণ নয়। কারণ,

---

১ ফতোয়া দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাচীন ফতোয়া থেকেও বোঝা যায়, মুফতি আযীযুর রহমান রহ.-এর নিকট প্রচলিত কোম্পানি বৈধ নয়। দেখুন, ১৩/৮৪-৮৬। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, এটি প্রাচীন মতামত। এ অনুযায়ী বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ ফতোয়া প্রদান করে না।

২ الشركات في الفقه الإسلامي، النبهاني، ص١٣٤، شركت و مضاربت عصر حاضر مين، ص٣١٦

আইনগত সত্তার নিষিদ্ধতা নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এর শরঈ নযীর রয়েছে। সামনে তা বিশদাকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পূর্ববর্তী ফকীহগণ তাদের সময়ের আলোকে শিরকতের প্রকারভেদ করেছেন। তখন কোম্পানির কোনো চিত্র তাদের সামনে ছিল না। তাদের প্রকারে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় না—শুধু এতটুকু কারণে একে নাজায়েয বলা যায় না। কারণ এ ৫/৬ প্রকার 'মানসূস আলাইহি' তথা সরাসরি শরীয়াহ ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তাঁরা তাদের যুগের প্রচলন অনুযায়ী এ প্রকারগুলো করেছেন। এ ছাড়া ফকীহগণ এ কথাও বলেননি যে, এর বাইরে কোনো প্রকার শিরকাত বৈধ হবে না। সুতরাং কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শিরকাতের শরীয়াহ নীতিমালার সাথে এর কোনো সংঘর্ষ আছে কি না। যদি না থাকে তবে তা বৈধ হবে।[১]

এটি বর্তমান অধিকাংশ ফকীহগণের সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরামগুলোর সিদ্ধান্তও অভিন্ন। তাঁরা মনে করেন, কোম্পানি ট্রাডিশনাল শিরকতের কোনো প্রকারে না ঢুকলেও যেহেতু তা শিরকাতসংক্রান্ত শরীয়াহ মানসূস কোনো নীতির পরিপন্থী নয়, তাই বৈধ।

৩. কোম্পানির মূল বিষয়ের দিকে তাকালে এটি অনুমিত হয় যে, মূলগতভাবে কোম্পানি শিরকতুল ইনানের অন্তর্ভুক্ত। এটি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বিশিষ্ট ফকীহ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন (আমাদের জানামতে)।[২] কারণ শিরকতুল ইনানের মূল কথা হলো, প্রত্যেকের পুঁজি, কাজ, দায়িত্ব ও মুনাফার হার সমান হওয়া জরুরি

---

১ বুহুস ফি কাযায়া, খ. ২, পৃ. ১৭৭, মাওলানা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ।

২ ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪। তবে প্রচলিত কোম্পানি ও প্রাচীন শিরকাতুল ইনানের মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। পূর্বে এসব পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। একটি পার্থক্য এটিও যে, শিরকাতুল ইনানে সবাই একে অপরের উকিল হয়। কোম্পানিতে বিষয়টি একটু ভিন্ন। এখানে সবার পক্ষে পরিচালনা পর্ষদ উকিল হিসাবে কাজ করে। বাকি সবাই প্রাণহীন জড় বস্তুতে রূপ নেয়। তবে এতটুকু বলা যায়, প্রাচীন শিরকাতগুলোর মধ্যে কোম্পানির তুলনামূলক অধিক মিল শিরকাতুল ইনানের সাথে। তাই এর বিধান প্রযোজ্য হবে। সব মিলিয়ে এক্ষেত্রে এ কথাই অধিক মুনাসিব যে, প্রচলিত কোম্পানি একটি নতুন ধাচের শিরকাত। প্রাচীন কোনো শিরকতের সাথে এর মিল হতে হবে এমনটি জরুরি নয়। হ্যাঁ, শরীয়াহ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলেই হলো।

নয়। কোম্পানিতে তাই হয়ে থাকে। উক্ত মতামতটি আরব বিশ্বের ড. আব্দুল আযীয খাইয়্যাত, উস্তায আলী আল খাফীফ প্রমুখ মনীষীবৃন্দেরও। কার্যত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতামতের মাঝে কোনো তফাৎ নেই।

মোটকথা, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এভাবে ব্যবসায় শরিক হওয়া যে, প্রত্যেকের পুঁজি, শ্রম, অধিকার ও মুনাফা বরবার হওয়া জরুরি নয়। এটিই শিরকতুল ইনানের মূল কথা। কোম্পানিতেও তাই হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, হাম্বলী ফিকহে শিরকাতুল আমওয়ালকেই শিরকাতুল ইনান বলা হয়। AAOIFI এর ১২ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা : ৩/১/-এর মধ্যে শিরকাতুল আমওয়ালকেই ইনান বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ইনানের ব্যবহারই অধিক।

বর্তমানে উক্ত অভিমতটিই ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে এ্যাওফির ১২ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা: ৪/১/১/১ এর ভাষ্যটি প্রণিধানযোগ্য। এতেও 'শিরকাতুল ইনান' হিসাবে প্রচলিত কোম্পানিকে বৈধ বলা হয়েছে। নিম্নে এর আরবি ও ইংরেজি ভাষ্য পেশ করা হলো—

> شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلي أسهم متساوية قابلة للتداول . ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا إلا بمقدار حصته في رأس المال وهي من شركات الأموال و لها أحكام شركة العنان لا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء و امتناع الفسخ من أحد الشركاء . المعيار الشرعي: ١,٢١/١/١/٤.

> A stock company is a company of which the capital is partitioned into equal units of tradable shares and each shareholder's (co-owener's) liability is limited to his share in the capital. It is a from of financing partnership. the rules of shirkat al-`Inan apply to this company except on the issue of the limited liability of the shareholders and the fact that this type

of company connot be unilaterally terminated by one party or a minority of its shareholders. (shari'ah standard no. 12 . 4/1/1/1)[১]

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ কোম্পানির প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, এটি মুদারাবার একটি বিশেষ সুরত। এখানে এক পক্ষের পুঁজি থাকে। আরেক পক্ষ শ্রম প্রদান করে। এটিই মুদারাবা।

কিন্তু এ মতটি অগ্রগণ্য নয়। কারণ কোম্পানির শরঈ প্রকৃতি হলো, প্রথমত, কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করেন। ধরা যাক, দশ জন লোক উদ্যোগী হয়ে কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থাবর সম্পত্তি যেমন বিল্ডিং, অন্যান্য আসবাব যেমন ফার্নিচার, ডেকোরেশন ইত্যাদি বাবদ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করল। এটি তাদের ইনভেষ্ট। এখন তারা যদি এক হাজার টাকাকে একটি শেয়ার হিসেবে গণ্য করে। তবে প্রত্যেকে একশ শেয়ারের মালিক বলে বিবেচিত হবে। (১০০০x১০০=১,০০,০০০)

এসব সম্পত্তিতে উদ্যোক্তাদের শিরকাত হলো শিরকাতুল মিলক। কিন্তু এখানে উদ্যোক্তাগণ নগদ অর্থের মাধ্যমে অংশীদার হয়নি। বরং সামগ্রীর মাধ্যমে অংশীদার হয়েছে।

এ প্রক্রিয়াটি হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব মতে বৈধ। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ.সহ অনেকের মত হলো, 'বর্তমানে মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও সহজতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এক্ষেত্রে হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে।' সুতরাং উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত, আইপিওর মাধ্যমে জনগণ থেকে শেয়ার গ্রহণ করা হলো। জনগণ সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে শেয়ার হোল্ডার হয়েছে। সুতরাং উদ্যোক্তা ও জনগণ সকলেই কোম্পানির Share holders।

উক্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী সকলেই শরিক। কেউ মুদারিব কেউ রব্বুল মাল—এমন নয়।

---

১ আরবী ভাষ্য, খ. ১, পৃ. ৩৩৭, ইংরেজি ভাষ্য, পৃ. ৩৩৮

তৃতীয়ত, কোম্পানির উক্ত সকল অংশীদারদের সঙ্গবদ্ধ সত্তাকে আইনের দৃষ্টিতে আইনগত সত্তা (Juristic Person) বলা হয়। কোম্পানি বলতে এই আইনগত সত্তাকেই বোঝানো হয়। সেই সকলের পক্ষে কাজ করে। মূল যিম্মাদার সেই।

চতুর্থত, ব্যবসায়িক কাজকর্ম সবাই করবে না। কখনো শেয়ার হোল্ডার হাজার ছাড়িয়ে যায়। সবাই কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। সবাই আগ্রহীও নয়। তাই প্রয়োজন হয় সকলের পক্ষ থেকে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠনের। এ বোর্ড সকল অংশীদারের প্রতিনিধির (উকিল) মতো কাজ করে। এরপর উক্ত বোর্ড থেকে নির্বাচন করে একজনকে পরিচালক (Managing Director-MD) নির্বাচন করা হয়। সেই সকল কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সকল অংশীদারের প্রতিনিধি হিসেবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়, যারা আইনগত সত্তার পাশাপাশি[1] সকল শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধি। কাজেই কোম্পানির সকল কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রেও সকল অংশীদারের অংশীদারিত্ব বিদ্যমান। অতএব সর্ব বিবেচনায় এটি শিরকাতুল ইনান, মুদারাবা নয়।

মোটকথা, মৌলিকভাবে কোম্পানি শিরকাতসংক্রান্ত শরীয়াহ মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতানুযায়ী কোম্পানি মৌলিকভাবে বৈধ। তবে এর শাখাগত বিষয়ে শরীয়াহ বেশ কিছু ইস্যু আছে। যা সামনে কিছুটা আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. ৫. কোম্পানির পুঁজি গঠন ও পরিচালনা : শরীয়াহ রূপরেখা

কোম্পানী গঠনের পর প্রয়োজন হয়, ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলধন বা পুঁজি যোগান দেওয়া। বস্তুত আর.জে.এস.সি. যখন কোম্পানির অনুমোদন প্রদান করে, তখন উক্ত কোম্পানি সর্বোচ্চ কী পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে পারবে তা নির্ধারণ করে দেয়। একে Authorised Capital বা অনুমোদিত মূলধন বলে। এটি শেয়ারে

১ কোম্পানির এমডি কোম্পানির আইনগত সত্তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে।–বুহুস, খ. ২, পৃ. ১৬৬

বিভক্ত থাকে। যেমন, ৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন। দুই হাজার শেয়ারে বিভক্ত হবে। প্রতি শেয়ার মূল্য ২৫০ টাকা। সাধারণত উক্ত অনুমোদিত মূলধনের একটি অংশ উদ্যোক্তারাই আদায় করে থাকেন। পরিভাষায় একে Sponsors Capital বলে।

মূলধন কী পরিমাণ, কী উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হবে, সেটি নির্ভর করে কোম্পানির কর্ম কৌশল, লক্ষ্য ও ব্যবসায় নীতির ওপর। এ বিবেচনায় কোম্পানির কার্যক্রম চার ভাবে বিভক্ত হতে পারে। যথা—

৫. ৫. ১. সেবা/সার্ভিস প্রদানভিত্তিক কোম্পানি

কোম্পানির লক্ষ্য সার্ভিস বা সেবা প্রদান করা। যেমন, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, চিকিৎসা সেবা প্রদান করা, কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করা ইত্যাদি। তাহলে মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য হবে—বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করা। যেমন, শিক্ষা প্রদানের জন্য চেয়ার-টেবিল ক্রয় করা। বাড়ি ভাড়া নেওয়া ইত্যাদি।

এসব সামগ্রীতে সকলের যৌথ মালিকানা (শিরকাতুল মিলক) প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর উদ্যোক্তাগণ নিজেরাই কাজ করবে। এটি হবে শিরকাতুল আমাল বা শ্রমভিত্তিক অংশীদারত্বের ভিত্তিতে।

৫. ৫. ১. ১. নতুন পার্টনার গ্রহণ

উক্ত কাজ যদি তৃতীয় কাউকে দিয়ে করানো হয়, তাহলে এটি দুটি পদ্ধতিতে হতে পারে। যথা—

ক. কর্মচারী বা ইম্প্লয়ী হিসাবে। এক্ষেত্রে তার সাথে কোম্পানির ‘নিয়োগ চুক্তি’ সম্পন্ন হবে।

খ. শেয়ার হোল্ডার হিসাবে। এক্ষেত্রে সে কোম্পানির কিছু শেয়ারের মালিক হবে। এই মালিকানা লাভের দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—

৫. ৫. ১. ১. ১. হিবা বা গিফট :

কোম্পানির উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের শেয়ারের একটি অংশ তাকে গিফট করে দিবে। ধরা যাক, মোট শেয়ার ১০০০। দুজন

মূল উদ্যোক্তার প্রত্যেকের শেয়ার ৫০০ করে। তারা আলোচনা করে প্রত্যেকে তার ৫০ শেয়ার মোট ১০০ শেয়ার তৃতীয় নতুন পার্টনারকে দিয়ে দিল।

৫. ৫. ১. ১. ২. বিক্রয় :

কোম্পানীর উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের শেয়ারের একটি অংশ তার কাছে বিক্রয় করে দিবে। ধরা যাক, মোট শেয়ার ১০০০। দুজন মূল উদ্যোক্তার প্রত্যেকের শেয়ার ৫০০ করে। তারা আলোচনা করে প্রত্যেকে তার ৫০ শেয়ার মোট ১০০ শেয়ার তৃতীয় নতুন পার্টনারের নিকট বিক্রয় করে দিল। এই বিক্রয়-মূল্য ধার্য হবে কোম্পানির তৎকালীন যাবতীয় এ্যাসেটের ভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে।

এভাবে তৃতীয় পার্টনার আনুপাতিক হারে কোম্পানির একজন মালিক ও শেয়ার হোল্ডার বলে গণ্য হবে।

৫. ৫. ১. ২. কোম্পানীর মুনাফা বণ্টন

শিরকাতু আ'মাল বা যৌথ শ্রমভিত্তিক অংশীদারত্বে মুনাফা বণ্টন হার আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যায়। এখানে সবাই কাজ করবে। আলোচনা করে একেকজনের কাজের অনুপাতে মুনাফার যেকোনো হার নির্ধারণ করা যায়।

৫. ৫. ১. ৩. শ্রমভিত্তিক অংশীদারত্বে কর্মহীন অংশীদার (Sleeping partner)

কখনো এমন হয়, স্থায়ী সম্পদ ও সরঞ্জাম ক্রয় করতে মোটা অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়। সেটা মূল উদ্যোক্তাদের পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তৃতীয় কারো থেকে শুধু বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় পক্ষ/ব্যক্তি কোনো কাজ করবে না। শুধু বিনিয়োগ করবে। সেই টাকা দিয়ে মূল উদ্যেক্তাগণ ব্যবসার প্রয়োজন পূরণ করবেন। কোম্পানির অধীন এ ধরনের শ্রমভিত্তিক অংশীদারত্বের শরীয়াহ বিশ্লেষণ কী হবে?

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাচীন অংশীদারিত্ব ব্যবসা ও

আধুনিক কোম্পানি ফরমেটে অংশীদারি ব্যবসায় বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। যেমন, আইনগত সত্তা, সীমাবদ্ধ দায়, পার্টনারদের আইনগত বিভিন্ন অধিকার ইত্যাদি। এসব প্রাচীন শিরকাত বা অংশীদারিত্ব ব্যবসায় ছিল না।

দ্বিতীয়ত, শিরকাতুল আমালে পার্টনারদের সকলেই কাজ করার অর্থ এ নয় যে, সরাসরি কাজ করা। বরং দায় বা দায়িত্ব গ্রহণও কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কারো দোকান আছে। আর অপর পার্টনার সে দোকানে কাজ করবে। দোকান মালিক কোনো কাজ করবে না। তদুপরি শিরকাতুল আমাল সঠিক। কারণ দোকান মালিক অংশীদারি চুক্তির অধীনে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করছে।[১]

তেমনিভাবে বর্তমান কোম্পানির অধীন যেকোনো অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায়, শেয়ার হোল্ডার বা শরিক সে দায় গ্রহণ করতে বাধ্য। তার শেয়ার অনুপাতে দায় তার ওপর বর্তায়।

সুতরাং কোম্পানির অধীন যে পার্টনারশীপ চুক্তিই হবে, তাতে কাজ আছে। এতটুকু দায় গ্রহণই যথেষ্ট। এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী শুধু বিনিয়োগকারীও মূলত কর্মী বলে গণ্য হবে। কনভেনশনাল ফিন্যান্সে সে 'স্লিপিং পার্টনার' হলেও এক্ষেত্রে সে ইসলামিক ফিন্যান্সে স্লিপিং পার্টনার নয়।

৫. ৫. ১. ৪. লোকসান বণ্টন

প্রাচীন শিরকাতুল আমালের নীতি হলো, কাজ ও দায় গ্রহণের অনুপাতে লোকসান বহন করা হবে। ধরা যাক, দুজন পার্টনার একমত হলো, যা কাজ গ্রহণ করা হবে, এর ৪০% কাজ ও দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে একজন শরিক। বাকি ৬০% কাজ ও দায় গ্রহণ করবে অপর শরিক। তাহলে লোকসান হলে সেটাও ৪০%/৬০% অনুপাতে বহন করা হবে।[২]

আধুনিক কোম্পানির অধীন শিরকাত চুক্তিতে, মূলত দায় নির্ধারিত

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৩৩২, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৬, ৩১৬

২ মাজাল্লাহ, ধারা : ১৩৯৩, শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩১৬

হয় শেয়ারের আনুপাতিক হারে। শেয়ার বা মালিকানা গ্রহণের অর্থই হলো, এই পরিমাণ দায়ও তার ওপর বর্তাবে। সুতরাং এখানে শেয়ারের আনুপাতিক হারে দায় বর্তাবে।

মনে রাখতে হবে, অংশীদারত্বের মৌলিক শরীয়াহ আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি প্রয়োগ হবে। আধুনিক কোম্পানি ও শিরকাতে এর ব্যত্যয় ঘটবে না। হ্যাঁ, প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

৫. ৫. ২. পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক কোম্পানি

কোম্পানির ব্যবসায় নীতি, পণ্য ক্রয় করে, তা বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের জন্য মূলধন প্রয়োজন। এই মূলধনেরও একটি অংশ উদ্যোক্তাগণ প্রদান করে থাকে। যেমন, বিদেশ থেকে পণ্য এনে দেশে বিক্রয় করা হয়। অথবা দেশেই পণ্য তৈরি করে বিক্রয় করা হয়।

এ ধরনের ব্যবসায় পদ্ধতি মূলত শিরকাতুল আমওয়াল বা পুঁজিভিত্তিক অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বাহির থেকে যদি মূলধন সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে সেটা পুঁজিবাজারে লিস্টেড হয়েও সংগ্রহ করা যাবে। অথবা ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতেও গ্রহণ করা যাবে।

এক্ষেত্রেও পূর্বের মতো যিনি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হবেন, তিনি আনুপাতিকহারে কোম্পানির মালিকানা লাভ করবেন। শেয়ারের মূল্য পূর্বের মতো নির্ধারণ করা হবে।

কোম্পানির মুনাফা বণ্টন হার নির্ধারণ হবে আলোচনা সাপেক্ষে। চুক্তি অনুযায়ী পার্টনার বা শেয়ার হোল্ডারদের যারা কাজ করবে না, শুধু বিনিয়োগ করবে, তারা 'স্লিপিং পার্টনার' বলে বিবেচিত হবে। তাদের মুনাফার হার তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতের অধিক হতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'কাজ' দ্বারা উদ্দেশ্য সরাসরি ব্যবসায় কাজ করা। শুধু দায়, কাজ নয়। ব্যবসায় লোকসান হলে সেটি প্রত্যেকের বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনুপাতে বহন করা হবে। এসব ক্ষেত্রে প্রাচীন শিরকাতুল আমওয়ালের নীতিই প্রযোজ্য হবে।

৫. ৫. ৩. পণ্য ও শ্রম মিশ্রণভিত্তিক কোম্পানি

অনেক সময় এমন হয়, কোম্পানি দু ধরনের কাজই করে। পণ্য বিক্রয় করে। সেবাও প্রদান করে। যেমন, শিক্ষা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বই, খাতা, কলম ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণও বিক্রয় করে ব্যবসা করা হয়।

এক্ষেত্রে মূল কথা আগের মতোই। কোম্পানির মূল স্বত্ব মালিকানা ও অন্যান্য ফিক্সড এ্যাসেটে শেয়ার হোল্ডারদের আনুপাতিক মালিকানা স্বীকৃত হবে। মুনাফা বণ্টন হবে আলোচনা করে যেকোনো হারে। তবে এতটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে, পণ্য বিক্রয় অধিক হলে, সেক্ষেত্রে যিনি স্লিপিং পার্টনার হবেন, তার প্রদেয় পুঁজির আনুপাতিক হারের অধিক মুনাফা তার জন্য ধার্য করা যাবে না।

পক্ষান্তরে শ্রম বা শিরকাতুল আমাল প্রবল হলে, পূর্ব আলোচনা অনুযায়ী তার দায়িত্ব গ্রহণই যেহেতু শ্রম, তাই সেক্ষেত্রে আলোচনা করে যে কোনো হারে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে।

৫. ৫. ৪. দায়ভিত্তিক ব্যবসায়িক কোম্পানি

উদ্যোক্তাগণ যদি মানুষ থেকে বাকিতে পণ্য নিয়ে বিক্রয়ের ব্যবসা করেন, তবে সেটা হবে শিরকাতুল ওজূহ বা দায়ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। যেমন, চায়না বা অন্য কোনো দেশ থেকে বাকিতে পণ্য এনে দেশে বিক্রয় করা।

এক্ষেত্রেও মূল কোম্পানির মালিকানা থাকবে উদ্যেক্তা শেয়ার হোল্ডারদের। এখানে আলাদা কোনো পুঁজির বিনিয়োগ নেই। সনাতন শিরকাতুল ওজূহ এর মধ্যে যাই থাকুক, এখানে দায় নির্ধারণ হবে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের শেয়ার অনুপাতে।

এক্ষেত্রে তৃতীয় কারো থেকে যদি বিনিয়োগ গ্রহণ করা হয়, তবে এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—

১. মুদারাবাভিত্তিক। অর্থাৎ বিনিয়োগদাতা মুদারাবা হিসাবে তাদেরকে মূলধন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে মুদারাবা মূলনীতি প্রয়োগ হবে।

২. শেয়ার হোল্ডার হিসাবে। এর অর্থ হলো, তৃতীয় পক্ষ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করবেন। এক্ষেত্রে তিনি যথারীতি পূর্বের আলোচনার মতো শেয়ারের আনুপাতিক হারে কোম্পানির মালিকানা লাভ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্যদের মতোই কোম্পানির অংশীদার হয়ে যাবেন। মালিকানার আনুপাতিক হারে দায় আবর্তিত হবে।

৫. ৫. ৪. ১. মুনাফা বণ্টন

সনাতন শিরকাতুল ওজূহের মধ্যে দায় অনুপাতেও মুনাফার হার নির্ধারণ করা যেত। কিন্তু কোম্পানি ফরমেটে সেটা সম্ভব নয়। এখানে শেয়ার মালিকানা অনুপাতে দায় আবর্তিত হবে।

সারকথা

কোম্পানী একটি আধুনিক পার্টনারশীপ মডিউল। এর মৌল শরীয়াহগুলো যদিও সনাতন পার্টনারশীপ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ণীত হবে, তবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কিছু ভিন্নতা তৈরি হবে। যেমনটি পূর্বোক্ত আলোচনায় উঠে এসেছে।

৫. ৬. কোম্পানী শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া

কোম্পানির দুটি ফরমেট আছে। এক. পাবলিক কোম্পানি। এর অর্থ হলো, সেটি শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হবে। এর জন্য প্রথমে কোম্পানিকে স্টক এক্সচেঞ্জে নির্ধারিত ফি প্রদান করে লিস্টেড হতে হবে। এরপর পুঁজিবাজারের নীতিমালা অনুযায়ী তাকে শেয়ার ছাড়তে হবে। যেমন, কোম্পানির প্রসপেক্টাস ইস্যু করতে হবে, আই.পি.ও. ফর্ম ছাপাতে হবে, বিভিন্ন ব্যাংককে প্রতিনিধি করতে হবে আই.পি.ও. পেমেন্ট গ্রহণ করার জন্য ইত্যাদি।

মৌলিকভাবে এভাবে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া বৈধ। তবে এরপর সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আলাদা শরীয়াহ নীতিমালা রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। (এ ব্যাপারে অধমের শেয়ার বাজারবিষয়ক বিশদ গবেষণা দ্র.)

৫. ৭. কোম্পানির বৈশিষ্ট্য

কোম্পানি একটি বিশেষ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা। এর মৌলিক ৭টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

- কোম্পানীর মূলধন সম শেয়ারে বিভক্ত থাকবে। প্রতিটি শেয়ারের ভলিয়ম সমান হবে।
- শেয়ারগুলো খুব সহজে বিনিময়যোগ্য হবে। ভেতরে বাহিরে যে কারো সাথে বিনিময় করা যাবে।
- দায় সীমিত থাকবে। প্রত্যেক শরিক তার বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত দায় বহন করবে।
- কোম্পানির একটি আইনগত সত্তা থাকবে।
- শরিক বা অংশীদারের ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ও কোম্পানিতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের মালিকানায় তফাৎ থাকবে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন মালিকানা। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করবে না।
- কোম্পানির সত্তা ও শরিকদের সত্তা পৃথক পৃথক গণ্য করা হবে।
- কোম্পানিতে কোনো শরিক তার চুক্তি রহিত করতে পারে না। তবে তার অংশ বিক্রয় করতে পারে।

উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের মাঝে দায় সীমিত থাকা ও আইনগত সত্তা এ দুটি বৈশিষ্ট্য প্রধান। নিম্নে এ দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।

৫. ৮. দায় সীমিত থাকা

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, ষোড়শ শতাব্দীতে বৃটিশ রাণীর রাজকীয় সনদ ছাড়া কোনো কোম্পানি গঠিত হতে পারত না। এটি ছিল জনগণের জন্য একটি কঠিন আইন। রাজকীয় সনদ লাভ সহজ ব্যাপার ছিল না। অথচ মানুষ কোম্পানি গঠনে ছিল বেশ আগ্রহী। এর অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দাঁড়ায়, অনিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রতারণাপূর্ণ কোম্পানি সৃষ্টি হয়।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে এসব প্রতারণাপূর্ণ ভুয়া কোম্পানি গঠনের প্রবণতা রোধ করতে ১৭২০ সালে পুনরায় সেই আইনের ওপর আরো জোর দেওয়া হয় তথা রাজকীয় সনদ ছাড়া কোনো কোম্পানি বা কর্পোরেশন গঠন করা যাবে না। কিন্তু এতে কোনো ফল হয়নি।

ফলে ১৮২৫ এর পর বাধ্য হয়ে বৃটিশ রাজা বা রাণীকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, তারা এ মর্মে সনদ প্রদান করতে পারবে যে, অমুক কোম্পানির প্রত্যেক সদস্য আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠানের ওই পরিমাণ দেনার জন্য দায়ী থাকবে যা রাজা বা রাণী উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবেন।

মূলত এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম কোম্পানির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ দায় নীতি প্রবর্তিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষকে যে কোনো দুর্বল কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

পরবর্তীতে বৃটিশ কোম্পানি আইন পাস হয়। সর্বপ্রথম ১৮৪৪ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে কোম্পানি আইন পাশ করা হয়। তবে তাতে সীমাবদ্ধ দায়ের বিধান ছিল না। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালে কোম্পানি আইন ১৮৮৫ পাস হয়। তাতে এ বিষয়টি প্রথমবার স্থান পায়।[1]

ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, বৃটিশ সভ্যতার উষাকালে বৃটিশ আইনের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধা থেকে এটি সৃষ্টি হয়েছিল। সীমাবদ্ধ দায়ের প্রবর্তন ছিল একটি প্রয়োজন। মানুষকে প্রতারণা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু পরবর্তীতে একেই স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে আইনের মাধ্যমে। চাই প্রয়োজন থাক বা না থাক। যে চাইবে সেই কোম্পানিকে সীমিত দায়বিশিষ্ট করতে পারবে। বর্তমান আধুনিক যুগেও এই স্বাধীনতাটা কতটুকু যৌক্তিক, সীমিত কিছু মানুষের স্বার্থে অগণিত মানুষের সম্পদকে ঝুঁকিতে ফেলা কতটুকু সমর্থনযোগ্য তা পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। কারণ, এখন অবস্থা অনেকটা উল্টো। মানুষকে প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য যে আইন করা হয়েছিল, সেটিই এখন প্রতারণার হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছে!!

---

১ কোম্পানি আইন, প্রাগুক্ত।

৫. ৯. কোম্পানির দায় লিমিটেড হওয়ার শরঈ দৃষ্টান্ত

কোম্পানির দায় সীমিত হওয়ার ধারণা মৌলিকভাবে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম অনুমোদন করেছেন। এর শরীয়াহ দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে।

আমাদের জানা মতে, অন্তত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম এর শরঈ নযীর পেশ করেছেন আল্লামা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনভী রহ.। (মৃত্যু : ১৩২৭ হি./প্রায় ১৯০৫ ইং.) অর্থাৎ, কোম্পানি লিমিটেড হওয়ার বিষয়টি আইনিভাবে প্রতিষ্ঠার প্রায় ৩০ বছরের মধ্যেই এর শরঈ নযীর পেশ করা হয়েছে। আল্লামা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনভী রহ. ছিলেন উপমহাদেশের একজন যুগ সচেতন অর্থনীতিবিদ বিদগ্ধ আলেমে দীন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'যদি কোম্পানির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা প্রদান করা হয় যে, কোম্পানির পার্টনারগণ কোম্পানির ঋণ বা লোকসানের দায় ব্যক্তিগতভাবে বহন করবে না। তবে এ শর্ত গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন, ব্যবসার জন্য অনুমোদিত গোলামের ঋণ ও লোকসানের দায় গোলাম পর্যন্ত থাকে। তেমনি কোম্পানির দায়ও তার সম্পদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।'[১]

পরবর্তীতে মুফতি রফী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ আল্লামা ফাতাহ লাখনভী রহ.-এর মত 'অনুমোদিত গোলাম' দ্বারা এর শরঈ নযীর পেশ করেছেন।[২]

তাছাড়া যে কেউ কারো থেকে ঋণ নেওয়ার সময় এমন বলতে পারে, আপনার ঋণ আমার দোকান থেকে আদায় হবে। অন্য কোনো উৎস থেকে নয়। ঋণদাতা যদি তা স্বীকার করে ঋণ প্রদান করে তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। মোটকথা মৌলিকভাবে তা বৈধ।

পরবর্তীতে ১৪১২হি./১৯৯২ ইং. সনে ওআইসির অধীন ইসলামী ফিকাহ একাডেমী, জেদ্দা তাদের ৬৫/১/৭ নং রেজুলেশনের ১২ নং ধারায় এ বিষয়টি অনুমোদন করে। মূল ভাষ্য হলো—

لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২১৯

২ ফাতাওয়া দারুল উলূম করাচী, মুকাদ্দামা, পৃ. ৬১

برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاقدين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة، كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المهساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام.

'শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যে, এমন কোনো কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হবে, যার দায় তার মূলধন পর্যন্ত সীমিত থাকবে। কারণ এটি কোম্পানির সাথে লেনদেনকারীদের কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়। জ্ঞাত হওয়ার কারণে কোম্পানির সাথে লেনদেন করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'[১]

তদ্রূপ ২০১৫ ইং. সনে এ্যাওফি তাদের ১২ নং স্ট্যান্ডার্ড, ধারা ৪/১/১/২-এও বিষয়টি অনুমোদন করেছে।[২]

পর্যালোচনা

'অনুমোদিত গোলামের' নজীর দ্বারা ঋণের দায় সীমিত হওয়ার বিষয়টি প্রাচীন ফিকহে প্রমাণিত। তবে একে ভিত্তি করে কোম্পানির সকল প্রকার ও পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে দায় সীমিত হওয়ার কথা বলা বর্তমান সময়ে নতুন করে বিবেচনার দাবি রাখে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ, 'অনুমোদিত গোলাম' একটি প্রয়োজন। লেনদেনকারী গোলাম নিজেই একটি পণ্য।

অপরদিকে কোম্পানি হওয়ার জন্য কোনো প্রকার এ্যাসেটের প্রয়োজন হয় না। এমন অনেক কোম্পানি আছে, যা শুধু নাম সর্বস্ব। অফিস, এ্যাসেট কিছুই নেই। কোম্পানি নিজে কোনো পণ্য নয়। এ অবস্থায়ও পার্টনার নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তার দায় সীমিত হয়ে থাকে। যা 'অনুমোদিত গোলাম'-এর নজীরের সাথে পুরোপুরি যায় না।

তদ্রূপ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঋণ সীমিত হওয়াও স্বতন্ত্র বিষয়। এতে প্রতারণা নেই। ব্যক্তি জেনে বুঝে দায় সীমিত করে ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু কোম্পানির

---

১ ক্বারারাতুল মাজামে, পৃ. ২৯, শিরোনাম : আল আসওয়াকুল মালিয়্যা'।

২ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৩৭

ক্ষেত্রে প্রতারণার সম্ভাবনা অধিক। যদিও সে জেনেই ডিপোজিট রাখছে, তবে এখানে এ সুযোগে প্রতারণা ও দুর্নীতির সুযোগ বেড়ে যায়।

তাছাড়া গ্রাহক বিষয়টি জেনে-বুঝে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে করছে, বিষয়টি এমনও বলে মনে হয় না। বরং অন্য অর্থে সে বাধ্য। তার সামনে তো দায়মুক্ত কোনো অপশন নেই। ব্যাংকের কথাই ধরুন, এখানে প্রকারান্তরে সে ব্যাংকে টাকা রাখতে বাধ্য। আইনিভাবে তাকে এই সীমিত দায় মেনে টাকা রাখতে বাধ্য করা হচ্ছে।

আরো একটি বিষয় হলো, 'অনুমোদিত গোলাম' একটি ব্যক্তিগত বিষয়। একটি প্রয়োজনও বটে। গোলাম বা দাস ব্যবসা করবে, এটি তার প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে এর বিনিময়ে মুক্তিনামা গ্রহণ করবে। অনেকটা সে বাধ্য এভাবে সীমিত দায় দিয়ে ব্যবসা করতে।

অপরদিকে কোম্পানির ক্ষেত্রে এমন প্রয়োজন নেই। এখানে বরং ইচ্ছা করে দায় সীমিত থাকার বিষয়টি ঘোষণা করা হচ্ছে। কোম্পানি উদ্যোক্তাদের অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা এই ঘোষণা দিচ্ছে। এসব বিবেচনায় আমাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত পুরোপুরি খাপ খায় না বলেই মনে হয়।

এজন্যই মুফতি রফী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, এতে সতর্কতা কাম্য। ব্যাপকভাবে এর দায় সীমিত হওয়ার ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এর গলদ ব্যবহার হতে পারে। আহলে ফতোয়ার সাথে মশওয়ারা করে ফতোয়া দিতে হবে।[১]

মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড হওয়ার বিষয়টি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর। এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করার সুযোগ বের করতে পারে। আর পার্টনারশীপ ব্যবসায় তো এর কোনো সুযোগই নেই। বাকি থাকল শুধু পাবলিক কোম্পানি। শুধু এক্ষেত্রে দায় সীমিত হতে পারে।'[২]

---

১ ফাতাওয়া দারুল উলূম করাচি, ভূমিকা, পৃ. ৬১ (ঈষৎ পরিবর্তনসহ)

২ দুরুসুল মাআয়িির, পৃ. ২৪৭

এ ছাড়া প্রসিদ্ধ স্কলার মুফতি ইবরাহীম দিসাঈ সাহেব এক ফতোয়ায় স্পষ্ট একে অবৈধ বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

The concept of limited liability is foreign to Shariah and is not recognised.[১]

অর্থাৎ, দায় সীমিত হওয়ার ধারণাটি শরীয়াহ অনুমোদিত নয়।

উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. ও আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. বহু আগেই বিষয়টি সমর্থন করেননি। আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. লিখিত ও হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. কর্তৃক সত্যায়িত এক ফতোয়ায় উল্লেখ হয়েছে,

'শুধু ঘোষণার ভিত্তিতে পাওনাদারদের পাওনা আল্লাহর নিকট রহিত হবে না। সেটি যথারীতি আদায় করতে হবে।'[২]

এর সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত শরীয়াহ নীতি থেকেও।

الدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء.

> 'ঋণ আদায় করা বা এর থেকে মুক্ত করা ব্যতীত ঋণ আদায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।'[৩]

৫. ৯. ১. ইদারাতুল মাবাহিসিল ফিকহিয়্যাহ, ভারত-এর সিদ্ধান্ত

গত ১৩-১৫ মুহাররম ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১২-১৪ আগস্ট ২০২২ ইং. তারিখে ভারতের বেঙ্গালুর, কর্ণাটক এ জমঈয়্যাতে উলামায়ে হিন্দ পরিচালিত ফিকহ বোর্ড। 'ইদারাতুল মাবাহিসিল ফিকহিয়্যার' ১৭ তম ফিকহ মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কোম্পানির 'সীমিত দায়' তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ শরীয়াহ পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়,

---

১ www.daruliftaa.net (ফতোয়ার মূল কপি সংরক্ষিত।)

২ ইমদাদুল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৪৫৩

৩ মাজাল্লাহ, ধারা : ৬৩১

'লিমিটেড কোম্পানি যদি লোকসানের শিকার হয়, তাহলে কোম্পানির পরিচালকদের ওপর দায়িত্ব হলো, কোম্পানির যাবতীয় স্থানান্তরযোগ্য ও অ-স্থানান্তরযোগ্য যাবতীয় এ্যাসেট বিক্রয় করে ঋণ/দায় পরিশোধ করা জরুরি। এরপরও কোম্পানির ওপর কোনো দায় থেকে গেলে এ লোকসানের পেছনে পরিচালকদের অবহেলা ও সীমালঙ্ঘন থাকলে এসব দায় পরিচালকদেরকে ব্যক্তিগতভাবেও আদায় করা শরঈ দৃষ্টিতে আবশ্যক হবে। হ্যাঁ, এ লোকসানের পেছনে তাদের কোনো ত্রুটি না থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত দায় পরিশোধের দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে না।[১]

বোঝা গেল বিষয়টি একেবারে চূড়ান্ত নয়। তাই সতর্কতা কাম্য। আমাদের দৃষ্টিতে, ব্যাপকভাবে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের সময়ই অটোমেটিক যে কোনো কোম্পানির দায় সীমাবদ্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়। সাধারণ ঋণগ্রহীতার মতো কোম্পানি কর্তৃপক্ষদের দায়ও সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

এভাবে দায় সীমাবদ্ধ করার কারণে বহু আমানতদাতা তাদের টাকা ও আমানত হারিয়েছেন। এ সুযোগে কিছু অসাধু উদ্যোক্তাগণ অর্থ হাতিয়ে নেন। যেহেতু দায় সীমিত, তাই কোম্পানি অবসায়ন হলে তাদের পাহাড়সম ব্যক্তিগত সম্পদে হাত দেওয়া যায় না। ফলে বঞ্চিত হয় অগণিত সাধারণ মানুষ। এ রকম উদাহরণ পত্র-পত্রিকায় অভাব নেই।

মোটকথা, এটি স্পষ্ট একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ইসলামে তা কোনো ভাবেই স্বীকৃত হতে পারে না। আমরা যদি ইতিহাস দেখি, সেখানেও দেখা যায়, কোম্পানির শুরু যুগে 'দায় সীমিত' থাকার ধারণা ছিল না। পরবর্তীতে একটি সাময়িক অবস্থার কারণে তা অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদীরা একেই পরে স্থায়ী করে নেয়। এরপর দুঃখজনকভাবে একে বৈধ বলার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা শুরু হয়।

৫. ১০. কোম্পানির দায় সীমাবদ্ধতা ও বাস্তব অবস্থা

আইন অনুযায়ী কোম্পানির যাবতীয় দায় তার শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ। তবে বাস্তবে কোনো ব্যাংক যখন কোনো কোম্পানিকে

---

১ تجاوز ادارة المباحث الفقهية

লোন বা বিনিয়োগ প্রদান করে, তখন গ্রাহক থেকে পার্সোনাল এগ্রিমেন্ট ও সাইন নিয়ে নেয় যে, যদি কোম্পানি ঋণ/পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তার পার্সোনাল সম্পদ থেকে তা আদায় করবে। এ মর্মে গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।

এভাবে সাম্প্রতিক কু-ঋণ উদ্ধার সম্পৃক্ত আইন 'বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট কর্পোরেশন আইন, ২০২০' এর ধারা ২৮/৬ এ কর্পোরেশনকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত সম্পদ দিয়ে ঋণ উসুল না হলে প্রচলিত বিধি-বিধানের আলেকে ঋণ গ্রহীতাদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকেও ঋণ উসুল করতে পারবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানির সাথে তৃতীয় পক্ষ যারাই লেনদেন করে, তারা কোম্পানির লিমিটেড ধারণা স্বীকার করে না। বাস্তবে এক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নেই।

মজার ব্যাপার হলো, ব্যাংক নিজে 'লিমিডেট কনসেপ্ট' ধারণ করে। তার ডিপোজিটরদের সাথে এই আইন প্রয়োগ করে। কিন্তু বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সাথে এই আইন প্রয়োগ করে না। যদিও এটি গ্রাহকদের স্বার্থেই করা হয়। কিন্তু ব্যাংক পরিচালকরা যদি নিজেরাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, দুর্নীতি করে বসে, তাহলে শেষ পর্যন্ত পুরো খেসারত দিতে হয় অসহায় গ্রাহকদেরকে। এক সময় 'লিমিডেট কনসেপ্ট' গলার ফাঁস হয়ে দৃশ্যমান হয় সাধারণ ডিপোজিটরদের জন্য।

সাম্প্রতিক বেসিক ব্যাংক ও কিছু নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান এর অন্যতম উদাহরণ। এক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ গ্রাহক গণ। অপরদিকে উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির বাহিরে নিজস্ব সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেন।

অতএব দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার ধারণা ব্যাপকভাবে কোনোভাবেই যৌক্তিক ও কল্যাণকর হতে পারে না। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে দায় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। তাই আমরা বাস্তবতা, অর্থনীতি ও শরঈ সকল বিবেচনায় 'দায় সীমাবদ্ধকরণ' আইনটি অর্থনীতি ও শরঈ উভয় দিক থেকে পুনর্বিবেচনা করার আহবান জানাচ্ছি।

৫. ১১. আমাদের প্রস্তাবনা

এক্ষেত্রে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা হলো—

১. ব্যাপকভাবে যেকোনো কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করা মাত্রই অটো 'সীমাবদ্ধ দায়ে' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার রীতি বন্ধ করতে হবে। কেউ চাইলে তাদের দায় সীমাবদ্ধ না করার সুযোগও রাখা উচিত।

২. শুধু পাবলিক কোম্পানি—যারা শেয়ার বাজারে প্রবেশ করবে- তাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে 'সীমাবদ্ধ দায়'-এর অনুমোদন দেওয়া যাবে। শর্তগুলোর মাঝে অন্যতম কয়েকটি হলো, কোম্পানি পরিচালক/উদ্যোক্তাদের পূর্ব আর্থিক কোনো নেতিবাচক রিপোর্ট না থাকা, ব্যাংক খেলাপি না হওয়া; অনুমোদনকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকার অনুমোদিত সংস্থা কোম্পানির আর্থিক বিষয় নিয়মিত তদারকি/অবজারভেশন করবে। যেন তারা 'সীমাবদ্ধ দায়ের' আশ্রয় নিয়ে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক দুর্নীতি করার সুযোগ না পায়, সর্বোচ্চ মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। যেন কোনো কারণে কোম্পানির দায় তার সম্পদকে অতিক্রম করতে না পারে ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন নীতিমালা ও শর্তসাপেক্ষে এ অনুমোদন সীমিত পর্যায়ে দেওয়া যেতে পারে।

৩. যারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে, তাদের থেকে কোম্পানির 'সীমাবদ্ধ দায়' থাকবে এ মর্মে আলাদা পেপারে সম্মতিমূলক সাইন নেওয়া। কারণ, এটি না করার কারণে অনেকে বিষয়টি বুঝতেই পারে না। এতে সম্মতি প্রমাণিত হয় না।

৪. প্রতিটি কোম্পানি অনুমোদন দেওয়ার সময়ই তাদের শরীয়াহ বোর্ড থাকতে হবে—এমন শর্তারোপ করা। শরীয়াহ বোর্ড গঠন করেই কোম্পানি করার অনুমোদন পাবে। এটি আর্থিক দুর্নীতি হ্রাসে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

৫. উপরোল্লিখিত সকল কিছু অনুসরণ করার পরও কখনো কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং এর পেছনে কোম্পানি পরিচালকদের ত্রুটি, অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন থাকলে উক্ত দায়

ব্যক্তিগতভাবেও তারা শোধ করতে বাধ্য থাকবে। এ ব্যাপারে সুদৃঢ় আইন তৈরি করা জরুরি। হ্যাঁ, তাদের কোনো অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত না হলে ক্ষেত্রে যথাসম্ভব দায় পরিশোধে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৫. ১২. আইনগত সত্তা

কোম্পানির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর আইনগত সত্তা। সাধারণ মানুষের মতোই এর সত্তা থাকবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলায় ইংল্যান্ডের কতিপয় বণিক দ্বারা সর্বপ্রথম 'কোম্পানি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এসব কোম্পানি ছিল বাণিজ্যিক কোম্পানি। ক্রমান্বয়ে ১৭৫০-১৮৫০ সনে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution)-এর পর কোম্পানির যাত্রা বৃহৎ আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। তখন কোম্পানির 'আইনগত সত্তা'র বিষয়টি সামনে আসে।

তবে ধারণা করা হয়, এটি প্রাচীন রোমের আইনেও ছিল।[১] পরবর্তীতে ১৮৪৪ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানি আইন পাশ করে, যা সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন ও আধুনিক কোম্পানি আইনের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচিত। মূলত এ আইন থেকেই 'আইনগত সত্তা'র বিষয়টি আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে।[২]

৫. ১২. ১. আইনগত সত্তার ব্যাখ্যা

'আইনগত সত্তা' মানে এমন একটি সত্তা যা আইন দ্বারা সৃষ্ট। ইংরেজিতে বলে Legal Person বা Juristic Person। আরবিতে বলে الشخص المعنوي أو القانوني أو الاعتباري। শায়খ মারযুকী 'আইনগত সত্তা'-র পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

---

১ https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_person, John Dewey, "The Historic Background of Corporate Legal Personality," Yale Law Journal, Vol. XXXV, April 1926, pages 655-673

২ কোম্পানি আইন ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক আইন, অধ্যাপক একে এম মনিরুজ্জামান, পৃ. ২

الوصف القائم بالشيء بحيث يكون له وجود حكمي مستقل وذمة تؤهله لأن يكون له حقوق وعليه واجبات.

''আইনগত সত্তা' হলো কোনো বস্তুর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা, যা তার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিধানগত অস্তিত্বের জন্ম দেয়, যে অস্তিত্বের একটি এমন যিম্মাহ ও দায় থাকে, যা এর উপযুক্ত হয় যে তার কিছু অধিকার থাকবে, তেমনি তার বিরুদ্ধে কিছু অধিকার ও বিধান বর্তাবে।'[১]

শায়খ মুস্তফা যারকা রহ. লিখেছেন,

الشخص الاعتباري هو شخص يتكون من عناصر أشخاص أو أموال يقدر له التشريع كيانا (قانونا) مستمدا منها مستقلا عنها (قابلا للإلزام والالتزام).

''আইনগত সত্তা' বলতে বোঝানো হয় এমন একটি সত্তাকে, যা কিছু বাস্তব ব্যক্তি ও সম্পদের সাহায্যে গঠিত হয়, আইনগত দিক থেকে তার জন্য স্বতন্ত্র বিধান জারি হয় ও সে এর উপযুক্ত হয়ে উঠে যে, তার ওপর কোনো বিষয় অনিবার্য করা হবে, তদ্রূপ সে নিজেও কোনো কিছু অনিবার্য করে নিতে পারে।'

সারকথা

আইনগত সত্তা হলো—

১. কোন বস্তুর বিশেষ একটা অবস্থা ও গুণ।

২. যে গুণটা তার জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠা করে।

৩. ব্যক্তিসত্তাটি আইন দ্বারা স্বীকৃত হবে।

৪. ব্যক্তিসত্তাটি বাহিরে দৃশ্যমান ও স্পর্শ করা যায় এমন হবে না।

৫. কেবল কিছু আলামত বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা তা নিরূপণ করা যাবে।

---

১ শারিকাতুল মুছাহামা ফি নিয়ামি আস-সয়ুদী, পৃ. ১৯৬, ইসলাম কা নেযামে আওকাফ, পৃ. ১৪৩

৬. এ ব্যক্তিসত্তাটি সর্বদা কিছু উদ্যোক্তা ও সম্পদের অনুগত হয়ে সৃষ্ট হবে।

৭. ব্যক্তিসত্তাটির স্বার্থকথা এই যে, বাস্তব ব্যক্তির মতো তার ওপরও দায় আবর্তিত হবে, অন্যের ওপর দায় আবর্তিত করতে পারবে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, কোনো ফান্ড বা কোম্পানির আইনগতসত্তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একটি অন্যতম শর্ত হলো, সেটা আইন অনুযায়ী আইনগত সত্তা হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে।

৫. ১২. ২. বাস্তব সত্তা ও 'আইনগত সত্তা' এর মাঝে মিলের দিক

১. দুটিই দায় গ্রহণ করতে পারে।

২. অন্যের ওপর দায় আরোপ করতে পারে।

৩. নিজ নামে মামলা দায়ের করা যায়। তার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যায়।

৫. ১২. ৩. বাস্তব সত্তা ও আইনগত সত্তার মাঝে পার্থক্য

বাস্তব সত্তা ও 'আইনগত সত্তা'-র মাঝে মোট তিনটি দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান। যথা—

১. 'আইনগত সত্তা'র অস্তিত্ব কেবল ধরে নেওয়া ও অদৃশ্যমান। অপরদিকে বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য।

২. 'আইনগত সত্তা' সর্বদা কিছু মানুষ, সম্পদ ও আইনের অনুগত হয়। এ দুটি ছাড়া এর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অপরদিকে বাস্তব ব্যক্তিসত্তা নিজ অস্তিত্বে সদা স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজের অস্তিত্ব প্রমাণে কারো অনুসারী নয়।

৩. 'আইনগত সত্তা' প্রমাণিত হওয়ার জন্য আইন অনুযায়ী 'আইনগত সত্তা' মর্যাদা দিয়ে তা নিবন্ধিত হওয়া জরুরি। অপরদিকে বাস্তব সত্তা নিবন্ধন ছাড়াই তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়।

উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট 'আইনগত সত্তা' কোম্পানির মধ্যে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এমন 'আইনগত সত্তা'র শরঈ ভিত্তি কি?

৫. ১২. ৪. আইনগত সত্তার শরঈ ভিত্তি

মৌলিকভাবে আইনগত সত্তা বৈধ। সমকালীন ফকীহগণ একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড প্রণেতা প্রতিষ্ঠান এ্যাওফি (AAOIFI) একে সমর্থন করে লিখেছে—

> شركة المساهمة تثبت لها الشخصية الاعتبارية من خلال الإشهار القانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معها ويترتب علي ذلك استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء المساهمين (أصحاب حقوق الملكية) وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها الحاجة المنظمة قانونا - بصرف النظر عن أهلية الشركاء- ويكون لها حق التقاضي من خلال من يمثلها وتكون العبرة في الاختصاص القضائي بموطن تسجيل الشركة.
>
> অর্থাৎ, আইনি প্রক্রিয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির আইনগত সত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। এর শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানার চেয়ে এর নিজস্ব স্বতন্ত্র মালিকানা থাকবে। আর্থিক দায় সরাসরি তার ওপর বর্তাবে। আইন অনুযায়ী মালিকপক্ষের সত্তার বাহিরে কোম্পানির সত্তার সীমারেখা নির্ধারিত হবে। তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কোম্পানি তার বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবে। যে দেশে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে, সেখানকার আদালতের সীমারেখার মাঝে তা করা যাবে।[১]

৫. ১২. ৫. শরীয়াহ কিছু দৃষ্টান্ত ও নজীর

শরঈ দৃষ্টিতে কোম্পানির আইনগত সত্তাকে সমর্থন করার পেছনে শরীয়াহ কিছু দৃষ্টান্ত ও নজীর রয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো—

---

১ স. ১২, ধা. ৪/১/১/২

ক. ওয়াকফ :

কোনো সম্পদ নিজ মালিকানা থেকে বের করে এর মূল অক্ষুণ্ণ রেখে, এর থেকে উপকার ভোগ করার জন্য মানুষকে অনুমোদন দেওয়ার নাম 'ওয়াকফ'। যে সম্পদ ওয়াকফ করা হয়, এর স্বতন্ত্র একটি সত্তা তৈরি হয়। সে নিজে মালিক হয়। যেমন, মসজিদে কেউ টাকা দিলে এর মালিক মসজিদ হয়। তেমনিভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ঋণদাতাও হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি ওয়াকফের জমি ভাড়ায় গ্রহণ করল।

এরপর যথা সময়ে ভাড়া শোধ না করা হলে তাতে ওয়াকফ সম্পত্তির কাছে দায় তৈরি হয়। এমনকি আদালতে মামলা হলে ওয়াকফ বাদী বা বিবাদীও হতে পারে। এক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি তার প্রতিনিধিত্ব করবে। মালিক হওয়া, ঋণদাতা হওয়া, ঋণী হওয়া, বিবাদী হওয়া এসব ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য ও আলামত। বোঝা গেল, ওয়াকফের একটি আইনগত সত্তা রয়েছে। এটি যেহেতু শরীয়তে স্বীকৃত, সেহেতু কোম্পানিরও আইনগত সত্তা থাকতে পারে। এটিও স্বীকৃত হতে পারে।

খ. বাইতুল মাল (State treasury) :

বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার মূলত একটি আইনগত সত্তা। এর সম্পদের মালিক সে নিজেই। এটিও ওয়াকফের মতো ঋণদাতা হয়, ঋণগ্রহীতা হয়। ফকীহগণের মতে, বাইতুল মালের প্রতিটি বিভাগে স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা বিদ্যমান। যেমন, সাদাকাহ ফান্ড ও খারাজ বা ট্যাক্স ফান্ড। সুতরাং কোনো ফান্ডের প্রয়োজন হলে, অপর ফান্ড থেকে ঋণ নিতে পারে। এমতাবস্থায় যে ফান্ড ঋণ নিল সে হলো ঋণী। আর যে ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া হলো সে হলো ঋণদাতা। এগুলো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

গ. পুরোপুরি ঋণে জর্জরিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি :

কোনো মৃতের সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পদ ঋণের দায়ে দায়গ্রস্থ হলে মৃত ব্যক্তি ঋণদাতাদের কাছে ঋণী নয়। কারণ মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয় না। আবার উত্তরাধিকারীরাও ঋণগ্রস্ত নয়। কারণ, তারা সম্পত্তিই পায়নি। সুতরাং এখানে ঋণগ্রস্ত হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যা আইনগত সত্তা।

ঘ. যৌথ মালিকানা সম্পত্তি :

যাকাতের সম্পত্তি কয়েক ব্যক্তির মধ্যে যৌথ মালিকানায় থাকলে যাকাত ব্যক্তিগত অংশের ওপর নয়, বরং সমষ্টির ওপর ফরয হয়। (এটি শাফেয়ী ফিক্‌হ অনুযায়ী) এতে বোঝা যায়, সমষ্টি এক আইনগত সত্তা।

উল্লেখ্য, 'আইনগত সত্তা' প্রতিষ্ঠার জন্য তা আইনের আলোকে যথারীতি রেজিস্টার্ড হওয়া শর্ত। এ বিষয়টি ওয়াকফ ও বাইতুল মাল দৃষ্টান্তদ্বয়ে স্পষ্ট হলেও 'পুরোপুরি ঋণে জর্জরিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি' ও 'যৌথ মালিকানা সম্পত্তি' দুটি দৃষ্টান্তে স্পষ্ট নয়।[১]

যা বোঝা গেল

এসব নজীর ও দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, আইনগত সত্তার মৌলিকভাবে কোনো নাজায়েয ধারণা নয়। ইসলামী ফিকাহের জন্যও কোনো অপরিচিত ধারণা নয়। তবে এ পরিভাষা অবশ্যই নতুন। মূল বিষয় যেহেতু প্রাচীন ও শরীয়াহ সমর্থিত, তাই নাম ও পরিভাষা নতুন হওয়া আপত্তি নয়।

পর্যালোচনা

কোম্পানির আইনগত সত্তা ধারণার সাথে আলোচিত দৃষ্টান্তগুলোর কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একটি বড় পার্থক্য হলো, পেশকৃত দৃষ্টান্তগুলোতে প্রতারণার সম্ভাবনা কম। কিন্তু কোম্পানির আইনগত সত্ত্বায় প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমন হতে পারে, কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ এর ব্যক্তি সত্তার নামে ঋণ করে দায় কোম্পানির ওপর চাপিয়ে দিল। এরপর উদ্যোক্তাগণ উধাও। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। পূর্ব আলোচিত 'দায় সীমিত' হওয়ার ধারণা মূলত কোম্পানির আইনগত সত্তার অস্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে। যদি দায় সীমিত না করা হয়, তাহলে শুধু আইনগত সত্তা মেনে নেওয়ায় তেমন কোনো ক্ষতি নেই। তাই দায় সীমিত হওয়ার ধারণায় যে

---

১ সম্ভবত এ কারণেই মুফতি তাকী উসমানী হাফি. 'ফিকহুল বুয়ূ' গ্রন্থে এ দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেননি।

সতর্কতা ও প্রস্তাবনা বলা হয়েছে তা অনুসৃত হলে আইনগত সত্তা ধারণা থাকতে পারে।

৫. ১৩. কোম্পানিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ নির্দেশনা

- কোম্পানির চুক্তি চলমান থাকে। যে কেউ তা রহিত করতে পারে না। প্রাচীন শিরকাত বা পার্টনারশিপ ব্যবসায় যেকোনো শরিক বা পার্টনার পার্টনারশিপ চুক্তি রহিত করতে পারে। কিন্তু কোম্পানি এমন একটি আধুনিক পার্টনারশিপ চুক্তি, যা এককভাবে রহিত করা যায় না। রহিত করার দাবিও করা যায় না। তবে যে কেউ চাইলে তার শেয়ার বা অংশ বিক্রয় করে চলে যেতে পারে। কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারে। অবশ্য সকলে একমত হয়ে পুরো কোম্পানি বিক্রয় করে দিতে পারে।
- কোম্পানী যখন আইপিও ইস্যু করবে, তখন প্রতি শেয়ার বাবদ কোম্পানি রেজি. বাবদ খরচ, শেয়ার ইস্যু বাবদ খরচ ইত্যাদি বাস্তব খরচও যোগ করতে পারবে। যেমন, প্রতি শেয়ার দশ টাকা। সাথে এক টাকা যুক্ত করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক খরচ বাবদ। শর্ত হলো, খরচ বাস্তবসম্মত হতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত অতিরিক্ত চার্জকে ইংরেজিতে Issue charges বলে।[১]
- কোম্পানী তার মূলধন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ধাপে নতুন করে শেয়ার ইস্যু করতে পারে। এক্ষেত্রে এর পদ্ধতি তিনটি হতে পারে। যথা—

  ১. পুরাতন শেয়ারের মূল্য ধরে নতুন শেয়ার ইস্যু করা হবে।

  ২. পুরাতন শেয়ারের মূল্যের চেয়ে কিছুটা অধিক মূল ধার্য করা হবে।

  ৩. পুরাতন শেয়ারের মূল্যের চেয়ে কিছুটা কম মূল্য ধার্য করা হবে।

  সাধারণ আইন অনুযায়ী উক্ত যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। তবে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে করণীয় হলো, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে কোম্পানির যাবতীয় এ্যাসেটের ভারসাম্যপূর্ণ যে

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৪/১/২/৩

মূল্য বের হবে, সেটি ধরে নতুন শেয়ারের মূল্য ঘোষণা করা হবে।

- আন্ডার রাইটিং (Under writing) ইস্যু করা মৌলিকভাবে বৈধ। তা হলো, কোনো প্রতিষ্ঠান কোম্পানির সাথে এভাবে চুক্তি করবে যে, ঘোষিত শেয়ার সবগুলো বিক্রয় না হলে, বাকিগুলো ওই প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে নিবে। এই দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। এর বিপরীতে কোম্পানি ওই প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি প্রদান করে।
- শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এই দায় গ্রহণ করা 'কাফালাহ' নয়। কারণ এখানে কোনো দায় নেই। এটি কেবল ওয়াদা। আর কোনো ওয়াদার বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ করা যায় না।
- তবে ওই প্রতিষ্ঠান যদি কোম্পানির পক্ষে অন্য কোনো কাজ করে দেয়। যেমন, শেয়ার বাজারজাত করণের জন্য মার্কেটিং করা, স্টাডি করা ইত্যাদি। এগুলোর বিনিময়ে আলাদা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে।[১]
- শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্রোকার বা অন্য কারো থেকে সুদভিত্তিক লোন গ্রহণ করা যাবে না।
- যে শেয়ার এখনো ক্রয় করা হয়নি, মালিকানা আসেনি, সেটি বিক্রয় করা যাবে না।
- এমন কোনো শেয়ার ইস্যু করা যাবে না, যার গ্রাহক মুনাফা বণ্টনকালে নির্ধারিত মুনাফা পাবে। পরিভাষায় একে Preference share বলে।[২] এটি রিবা।
- এমন কোনো শেয়ার ইস্যু করা যাবে না, শুধু মুনাফা গ্রহণ করবে। কোনো লোকসান নিবে না। আর এভাবে যখন মূলধন উঠে যাবে, তখন অটো তার শেয়ার নিঃশেষ হয়ে যাবে। পরিভাষায় একে Bond interest বলে। এটিও বৈধ নয়।[৩] প্রকাশ থাকে যে, পুঁজিবাজার থেকে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিষয়ে বিস্তারিত শরীয়াহ

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৪/১/২/৪

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৪/১/২/১৪

৩ এ্যাওফি, স. ১২, ধা. ৪/১/২/১৫

গাইডলাইন আছে। সুতরাং পুঁজিবাজার থেকে কোনো শেয়ার ক্রয়ের আগে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। ইনশাআল্লাহ 'ইসলামের অর্থব্যবস্থার তৃতীয় খণ্ডে' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৫. ১৪. সাধারণ অংশীদারি চুক্তি ও কোম্পানির মাঝে পার্থক্য

বিভিন্ন দিক থেকে সাধারণ অংশীদারি চুক্তি ও কোম্পানির মাঝে মিল রয়েছে। তবে কিছু মৌলিক পার্থক্যও আছে। যথা—

- কোম্পানির আইনগত্ সত্তা আছে। যা সাধারণ পার্টনারশিপ চুক্তিতে নেই।
- কোম্পানির দায় সীমিত থাকে। তবে সাধারণ পার্টনারশিপ চুক্তিতে তা নেই।
- কোম্পানি থেকে যে কোনো পার্টনার এককভাবে তা রহিত করতে পারে না। তবে সাধারণ পার্টনারশিপ চুক্তিতে তা এককভাবেও রহিত করা যায়।

অধ্যায় : ০৯

- মুদারাবা (Venture Capital) : পরিচিতি, প্রকার ও বিধান
- মুদারাবা লেনদেনের মৌলিক নীতিমালা
- মুশারাকা : পরিচিতি ও তাৎপর্য
- মুশারাকা : মৌলিক নীতিমালা, লাভ-লোকসান বণ্টননীতি ও প্রচলিত অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব

মুদারাবা : পরিচিতি, প্রকার ও বিধান

Introduction to Mudarabah Contract (Venture Capital) and its Types

প্রাথমিক কথা

'মুদারাবা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ পলিসি। পুরো বিশ্বে এর ব্যবহার হচ্ছে। এ বিষয়ে অনেক কিছুই শেখার আছে। বর্তমান ইসলামিক ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিপোজিট গ্রহণের একমাত্র মডিউল 'মুদারাবা'। তবে ইনভেস্ট সেক্টরে এর ব্যবহার মোটেও সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১ ইং. (অক্টোবর-ডিসেম্বর) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে এর ব্যবহার মাত্র ০.২৫%। অর্থাৎ অর্ধ শতাংশও নয়। তবে আদর্শিক ইসলামিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ সেক্টরে এর ব্যবহার বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আর এর জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের চর্চা। এ বিষয়ে এ্যাওফি একটি স্বতন্ত্র শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড রচনা করেছে। স্ট্যান্ডার্ড নং ১৩। ইসলামী ফিন্যান্সে মুদারাবা বেশ আলোচিত। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।[1]

১ **মুদারাবা বিষয়ক কিছু গবেষণা :** ড. বুরহান আশ-শায়ের হাফিযাহুল্লাহ কৃত লেখা 'মুদারাবার নীতিমালা ও ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রয়োগ'। ভাষা আরবী। সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার গবেষণামূলক গ্রন্থ। ড. ইমরান আশরাফ উসমানী হাফিযাহুল্লাহ কৃত 'আধুনিক যুগে শিরকাত ও মুদারাবার প্রয়োগ'। ভাষা : উর্দু। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার গবেষণাপত্র। এটি ছিল তার ডক্টরেট ডিগ্রির গবেষণাপত্র। এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড : ১৩, মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ১৪০৪-১৪৩১ ধারাসমূহ। ড. যায়েদ মুহাম্মাদ আর রুম্মানী।

১. ১. মুদারাবা কী?

আমাদের সমাজে ব্যবসায়িক জগতে দু ধরনের মানুষ আছে।

এক. যাদের হাতে অর্থ আছে। তবে ব্যবসার করার মতো সময় বা অভিজ্ঞতা নেই।

দুই. যারা ব্যবসা বুঝে। ব্যবসার করার মতো সময় ও অভিজ্ঞতা দুটিই আছে। তবে হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

যার টাকা ও অর্থ আছে, সে যে ব্যবসা বুঝে সেখানে অর্থ বিনিয়োগ করবে। যা লাভ হবে তা উভয়ের মাঝে আলোচিত হারে বণ্টন হবে। আর ব্যবসার স্বাভাবিক গতিতে কোনো লোকসান হয়ে থাকলে সেটা পুঁজিদাতা বহন করবে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হলো তার শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটিই 'মুদারাবা'। যার মাধ্যমে সমাজের উক্ত দু শ্রেণির মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সেতু বন্ধন তৈরি হয়।

শাব্দিক পরিচিতি

'মুদারাবা' শব্দটি আরবী المضاربة (আল-মুদারাবা)। এর শব্দমূল ض، ر، ب (ضَرْب) অর্থ : কষ্ট দেওয়া, আঘাত করা, আক্রমণ করা। উক্ত মূল অর্থের সাথে সাদৃশ্য রেখে ব্যবসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠে সফর বা বিচরণ করাকেও 'ضَرْب' (দ্বরবুন) বলা হয়। কারণ প্রাচীন আরবে এই ধরনের ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফর করে বেড়াতো। এখনো তা অব্যাহত। তাই এ পদ্ধতির ব্যবসাকে 'মুদারাবা' বলা হয়।

এ অর্থে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا.

গবেষণা শিরোনাম : 'আকুদুল মুদারাবা ফিল ফিকহিল ইসলামী ওয়া মাদা তাতবিকু আহকামিহি ফিল মাসারিফ'। ভাষা : আরবী। ছেপেছে : মাজাল্লাতু শারিয়াহ্ ওয়াত দিরাসাতিল ইসলামিয়া, সংখ্যা : ৩৭। পৃ. ২০৭

'তোমরা যখন যমীনে *বিচরণ* কর এবং তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেরগণ তোমাদেরকে পেরেশান করবে তখন সালাত কসর করলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।'[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله.

'তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমন থাকবে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য (ব্যবসা বা আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে) পৃথিবীতে সফর করবে।'[২]

আমাদের আলোচিত 'মুদারাবা'র মধ্যে উক্ত অর্থ তথা 'সফর' করাই নিহিত। কারণ, সাধারণত মুদারিব বা ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করে থাকে। বিশেষত আরব জাতি আমদানি নির্ভর দেশ ছিল। তাই তাদের প্রায়ই ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করার প্রয়োজন হত। সূরা কুরাইশে স্পষ্ট ইরশাদ হয়েছে, আরবরা শীতকালে শামে ও গ্রীষ্মকালে ইয়েমেনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সফর করত।

মুদারাবার আরেকটি নাম, 'মুকারাযাহ' (المقارضة) বা 'ক্বিরায' (القراض)। এর শাব্দিক অর্থ, পৃথক করা, বিচ্ছিন্ন করা।

যেহেতু পুঁজিদাতা তার সম্পদের একটি অংশ ব্যবসায়ীর জন্য পৃথক করে প্রদান করে, তাই একে 'মুকারাযা' বা 'কিরায' বলা হয়।[৩] তবে এ নামটির বর্তমানে তেমন প্রচলন নেই।

পারিভাষিক পরিচিতি

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উসমানি সালতানাতের অধীনে রচিত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-এর ১৪০৪ নং ধারায় মুদারাবার পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

---

১ সূরা নিসা : ১০১। মাকায়িছুল লুগাহ, ইবনে ফারেসকৃত, ضَرْب মাদ্দাহ।

২ সূরা মুযযাম্মিল : ২০

৩ আল মিসবাহুল মুনীর, পৃ. ৪৯৭; যওয়াবিতুল মুদারাবা ওয়া তাতবিকাতুহু ফিল মাসারিফিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৩৭, ড. বুরহান আশ শায়ের।

المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي والعمل من طرف آخر، ويقال لصاحب رأس المال رب المال، وللعامل المضارب.

'মুদারাবা এক প্রকার অংশীদারি ব্যবসা।[১] এতে চুক্তি হয়, এক পক্ষ মূলধন যোগান দিবে। আর অপর পক্ষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে শ্রম দিবে। মূলধন যোগানদাতাকে 'রব্বুল মাল' বলা হয়। আর ব্যবসার কাজ যে করে তাকে 'মুদারিব' বলা হয়।'

AAOIFI-এর ১৩নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা : ২-এ মুদারাবার পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এভাবে—

المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال)، وعمل من جانب آخر (المضارب).

'মুদারাবা হলো, মুনাফায় অংশীদারির চুক্তি। চুক্তিটি সম্পন্ন হয় এভাবে যে, এক পক্ষ (রব্বুল মাল) মূলধন যোগান দেয়। আর অপর পক্ষ (মুদারিব) শ্রম বা ব্যবসায়িক কাজ আঞ্জাম দেয়।'

মুদারাবার মূল কথা

- এক পক্ষের পুঁজি থাকবে।
- অপরপক্ষ তথা ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে শ্রম বিনিয়োগ করবে।
- উভয় পক্ষ মুনাফায় অংশীদার হবে।

১. ২. মুদারাবা ও শিরকাত

শিরকাত ব্যবসায় শরিকদের হয় পুঁজি বা শ্রম বা দায়ে শিরকাত থাকে; কিন্তু মুদারাবায় উভয়পক্ষের এভাবে শিরকাত নেই। একপক্ষের শ্রম। অপরপক্ষের পুঁজি। এজন্য পূর্ববর্তী অনেক ফকীহ একে শিরকতের

১ মুদারাবাকে এক প্রকার শিরকাত বলা হয়েছে। কারণ, এতে পুঁজি বা শ্রমে উভয় পক্ষের কোনো শিরকাত নেই। কেবল মুনাফায় শিরকাত হয়। তাই একে এক প্রকার বা বিশেষ এক ধরনের শিরকাত বলা হয়েছে। এ বিষয়টি এ্যাওফি প্রদত্ত মুদারাবার সংজ্ঞায় আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাভাবিক প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে বর্তমান ফকীহদের অনেকেই একে সরাসরি শিরকাত বলে ব্যক্ত করছেন। যেমনটি আমরা এ্যাওফির বক্তব্যে দেখেছি। তবে মৌলিক বিষয়ে কারো মতভেদ নেই।

১. ৩. মুদারাবার ইতিহাস

মুদারাবা ব্যবসা ইসলাম উদ্ভাবন করেছে বিষয়টি এমন নয়। ইসলামের আগেও এর প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে মৌলিকভাবে তা বহাল রেখেছে। আর এর সাথে মানব কল্যাণ নিশ্চিত করতে কিছু শর্তারোপ প্রদান করেছে। ইমাম ইবনে আব্দিল বার রহ. (মৃত্যু : ৪৬৩) লিখেছেন,

> القراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم، وكان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام.
>
> 'মুদারাবার অনুমোদনটি ইজমা থেকে গৃহীত। এর বৈধতার ব্যাপারে জ্ঞানীদের মধ্যে কারো কোনো দ্বিমত নেই। জাহেলী যুগে এর প্রচলন ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ইসলামে বহাল রেখেছেন।'[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বিস্তারিতভাবে লিখেছেন—'জাহেলী যুগে মুদারাবা ব্যবসা ছিল। বিশেষত কুরাইশ গোত্রের লোকদের মাঝে এর প্রচলন ছিল। কারণ, আরব জাতি ব্যবসা নির্ভর জাতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পূর্বে অন্যের সম্পদ দ্বারা মুদারাবা ব্যবসা করেছেন। যেমন হযরত খাদিজা রা.-এর সম্পদ দ্বারা মুদারাবা ব্যবসা করেছেন।[২]

হযরত খাদিজা রা.-এর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবসার ধরন যে মুদারাবা ছিল তা ইবনে কাছীর রহ. তুলে ধরেছেন এভাবে—

---

১ আলইসতিযকার, খ. ৭, পৃ. ৩

২ সীরাতে ইবনে হিশাম দ্র., খ. ১, পৃ. ২০৩

قال ابن اسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرةً ذات شرف ومال، تستأجر الرجال على مالها مضاربة....فعرضت عليه أن يخرج لها في مال تاجراً إلى الشام.

'ইবনে ইসহাক রহ. বলেছেন, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান নারী। তিনি লোকদেরকে তার সম্পদ দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করার জন্য নিয়োগ দিতেন।...নবীজির কাছেও তিনি এ ধরনের ব্যবসার প্রস্তাব করলেন, তিনি যেন খাদিজার সম্পদ ব্যবসায়ী হিসাবে শামে নিয়ে যান।[১]

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ হয়েছে এভাবে—

امرأة تاجرةً ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه.

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান নারী। নানা লোকদেরকে তিনি তার সম্পদ দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করার জন্য নিয়োগ দিতেন।[২]

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে শাম থেকে ফেরৎ আসা আবু সুফিয়ানের যে বাণিজ্য কাফেলা মুসলমান কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, তাতে আবু

---

১ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর রহ., সীরাতুন্নবী অংশ দ্র.। উক্ত অংশটি মুস্তফা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের সম্পাদনায় স্বতন্ত্রভাবে বৃহৎ চার ভলিয়মে প্রকাশ হয়েছে। উদ্ধৃতিটি এর ১ম ভলিয়ম থেকে নেওয়া। পৃ. ২৬২

২ সিরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ১৭৭, টিকা যুক্ত করেছেন, শায়খ মাহমুদ সায়্যিদ তাহতাভী। প্রথম প্রকাশ, মাতবায়ে খাইরিয়্যা, ১৩২৯ হি.। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, খাদিজা রা. এর সাথে নবীজির ব্যবসার ধরন ছিল মুদারাবা। কেউ কেউ বলেন, সেটি ছিল ইজারা তথা ওয়াকালাহ বিল উজরাহ। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ, মুদারাবার কথা স্পষ্ট এসেছে। বাক্যের শুরুতে ইজারা শব্দ থাকলেও পরে মুদারাবা বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু সীরাত গ্রন্থে বাক্যের শুধু প্রথমাংশ উল্লেখ করায় কেউ কেউ এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তাছাড়া ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ সালাফ থেকেও মুদারাবার কথাই বর্ণিত হয়েছে। সালাফের কেউ শুধু ইজারার কথা বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

সুফিয়ানের সাথে মক্কার অনেকেরই মুদারাবা চুক্তি ছিল। এরপর যখন ইসলাম এসেছে তখন মুদারাবাকে বহাল রাখা হয়েছে। তাই দেখা গেছে, সাহাবীগণ অন্যের সম্পদ দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা করেছেন।

১. ৪. মুদারাবার দলিল

মুদারাবা বিষয়ে কুরআনে কারীম ও হাদীসে স্পষ্টভাবে কিছু বর্ণিত হয়নি।[১] বরং এটি সাহাবায়ে কেরামের আমল ও সালাফে সালেহীনের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. (মৃত্যু : ৩১৮ হি.) বলেন,

«وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير و الدراهم».

'আমরা দেখেছি, দিরহাম-দিনার দিয়ে মুদারাবা ব্যবসা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞানীরা একমত।'[২]

১. ৪. ১. সাহাবায়ে কেরামের আমল

সাহাবা-তাবেয়ীগণ মুদারাবা ব্যবসা করেছেন। এখানে নমুনাস্বরূপ তাঁদের কয়েকটি আমল উল্লেখ করা হলো।

'একবার খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা.-এর দুই ছেলে, আব্দুল্লাহ রা. ও উবাইদুল্লাহ রা. ইরাকের উদ্দেশে প্রেরিত এক যুদ্ধাভিযানে ছিলেন। ফেরার পথে বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরী রা.-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদেরকে সু-স্বাগতম জানান।

---

১ قال الإمام ابن المنذر رح.: « لم نجد للقراض في كتاب الله ذكراً ولا في سنة نبيه عليه السلام» كذا في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ٥٦١/١٠

২ আলআওসাত, খ. ১০, পৃ. ৫৬১। অবশ্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. السنة بالتقرير দ্বারা মুদারাবার প্রামাণ্যতা বর্ণনা করেছেন। (ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, খ. ১৯, পৃ. ১৯৫)। এ ছাড়া কিছু ফকীহ পূর্বে উল্লেখকৃত সূরা নিসার ১০১ নং আয়াত ও সূরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াত দ্বারাও কুরআন থেকে মুদারাবার দলিল পেশ করেছেন। কিন্তু এগুলো স্পষ্ট দলিল নয়। তাই আমরা এখানে তা উল্লেখ করিনি। বস্তুত এর মূল দলিল ইজমা। ইবনুল মুনযির রহ. ও ইবনে আব্দিল বার রহ. একেই গ্রহণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

বিদায় বেলা আবু মুসা আশআরী রা. তাদেরকে বললেন, 'আমি কি আপনাদের জন্য এমন কিছু করতে পারি, যাতে আপনারা লাভবান হবেন?' তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

আবু মুসা আশআরী রা. বললেন, 'এখানে বাইতুল মালের কিছু মাল আছে। আপনারা এগুলো আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর রা.-এর নিকট পৌঁছে দিবেন। আর যাওয়ার পথে এ সম্পদ দ্বারা ইরাক থেকে কিছু পণ্য ক্রয় করে নিবেন। এরপর তা মদিনার বাজারে বিক্রি করবেন।

এতে যা লাভ হবে তা হবে আপনাদের। আর মূল সম্পদটি খলিফাতুল মুসলিমীনের নিকট পৌঁছিয়ে দিবেন। আপনারা কি এতে রাজি আছেন?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত। এরপর আবু মুসা আশআরী রা. তাদেরকে ওই সম্পদ প্রদান করলেন। আর খলিফাতুল মুসলিমীনের বরাবর এ মর্মে পত্র লিখে দিলেন যে, তিনি যেন তাদের থেকে ওই সম্পদ গ্রহণ করেন।

এরপর আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ রা. যথারীতি ইরাকের পণ্য এনে মদিনায় বিক্রি করে লাভবান হলেন। হযরত উমর রা.-এর নিকট তাঁরা পৌঁছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে হযরত উমর রা. তার দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাফেলার সবাই কি এ রকম ব্যবসা করেছে? তাঁরা বললেন, না। উমর রা. বললেন, তাহলে তোমরা মুনাফাসহ মূল টাকা ফেরত দাও। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ রা. নিশ্চুপ। তবে উবাইদুল্লাহ রা. বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন এমনটি করা কি উচিত হবে? কারণ, এই সম্পদ যদি নষ্ট হত বা ধ্বংস হত তাহলে আমরা এর দায় গ্রহণ করতাম। তাহলে এখন এর মুনাফা কেন নিতে পারব না?'

উমর রা. পুনরায় বললেন, মুনাফাসহ মূল সম্পদ ফেরত দাও। আবারও আব্দুল্লাহ রা. চুপ। আর উবাইদুল্লাহ রা. আগের মতই জবাব দিলেন।

তখন উমর রা.-এর সভা পরিষদের উপস্থিত এক লোক বললেন, আমিরুল মুমিনীন আপনি লেনদেনটিকে মুদারাবা হিসাবে মেনে নিতে পারেন। উমর রা. তখন বললেন, ঠিক আছে। একে মুদারাবা হিসাবে গ্রহণ করা হলো।

এরপর তিনি মুদারাবার মূলনীতি অনুযায়ী মূলধন ও অর্ধেক মুনাফা গ্রহণ করলেন। আর আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ বাকি অর্ধেক মুনাফা নিলেন।[১]

উক্ত ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষা

উক্ত ঘটনা থেকে আমরা বেশ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যথা—

- **অপরের জন্য কল্যাণকামিতা :** আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ রা.-কে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে নিজের কোনো স্বার্থ ছিল না। কেবল তাদের উপকার ও কল্যাণকামিতাই উদ্দেশ্য ছিল। একজন মুসলিমের আচরণ এমন হওয়াই কাম্য।
- **বিশ্বস্থতা ও আমানতদারি :** আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ রা. পরিপূর্ণ আমানতদারিতার সাথে বাইতুল মালের অর্থ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া মাঝপথে ওই অর্থ দ্বারা ব্যবসা করার বিষয়েও আমীরুল মুমিনীনকে অবহিত করেছেন। কিছুই গোপন করেননি। অথচ ইচ্ছা করলে চেপে যেতে পারতেন। শুধু তাই নয় এ সম্পদের দায় গ্রহণের কথাও তাঁরা স্বীকার করেছেন। এটি তাদের সর্বোচ্চ আমানতদারিতার পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে এমন আমানতদারিতার এখন বড় অভাব!
- **দায়িত্ব আদায় ও অন্যের হক সংরক্ষণে যত্নবান** থাকা **:** সম্পদটি ছিল বাইতুল মালের। যা সকল নাগরিকের অধিকার। এ অধিকার সংরক্ষণে কঠোর হয়ে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. মুনাফাও ফেরত দিতে বলেছিলেন। এতে হযরত উমর রা.-এর দায়িত্ববোধ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। নিজের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সেই বোধে কোনরূপ চিড় ধরেনি।
- **মুদারাবা ব্যবসার বিধান :** এ ব্যবসা বৈধ। এখানে বাইতুল মাল ছিল রব্বুল মাল। আর আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ রা. ছিলেন যৌথ মুদারিব। হযরত আবু মুসা আশআরী রা. এ মুদারাবার সূচনা করেছেন। আর হযরত উমর রা. একে সবশেষে বহাল রেখেছেন। অথবা ঘটনা ঘটার পর হযরত উমর রা.-এর 'তাকয়ীফ' বা শরঈ বিশ্লেষণ করেছেন মুদারাবা হিসাবে।

---

১ মুয়াত্তা মালেক, আছার : ১৩৫৫

হযরত আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উসমান রা. তাকে এ শর্তে মুদারাবা ব্যবসার জন্য কিছু সম্পদ দিয়েছিলেন যে, মুনাফা তাদের মধ্যে যৌথ ভাবে বণ্টন হবে।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত উমর রা. আমাকে মুদারাবা ব্যবসা করার জন্য এক এতিমের কিছু সম্পদ দিয়েছিলেন। আমি ওই সম্পদ দিয়ে বাহরাইনে মুদারাবা ব্যবসা করেছি। এরপর যখন হযরত উমর রা.-এর নিকট এসেছি, তখন তিনি মুনাফা বণ্টন করে দিয়েছেন। আর মূল টাকা গ্রহণ করেছেন।[২]

১. ৪. ২. যুক্তির আলোকে মুদারাবা

সমাজের মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, এক. ধনী শ্রেণী। যাদের হাতে সম্পদ আছে। কিন্তু ব্যবসা করার মতো সময় নেই। অথবা ব্যবসার অভিজ্ঞতা নেই। দুই. যাদের হাতে ব্যবসা করার মত পুঁজি নেই। তবে ব্যবসা করার মতো সময় আছে। ব্যবসার জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও আছে। উক্ত দুটি শ্রেণীর সমন্বয় করার জন্যই মুদারাবা ব্যবসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শরীয়াহ মানুষের কল্যাণেই এসেছে। কল্যাণ বিনষ্ট করার জন্য নয়। [৩]

১. ৫. মুদারাবার পরিভাষাসমূহ

মুদারাবা ব্যবসায় তিনটি পরিভাষা গুরুত্বপূর্ণ। যথা :

- **পুঁজিদাতা :** একে বলা হয়, রব্বুল মাল (رب المال) তবে আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ 'সাহিবুল মাল' (صاحب المال) শব্দ ব্যবহার করেন। ইংরেজি : Capital provider
- **ব্যবসায়ী :** একে বলা হয়, মুদারিব (المضارب)। ইংরেজি : Labour provider

---

১ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১৩৫৬

২ আল আওসাত, ৮৩৫৬

৩ আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৯২৭

তবে বর্তমানে ব্যাপকভাবে সরাসরি ইংরেজিতেই রব্বুল মাল (Rab al-Mal) ও মুদারিব (Mudarib) ব্যবহার হয়।

- পুঁজি : একে বলা হয়, রা-সুল মাল (رأس المال)। ইংরেজি : Capital।

১. ৬. মুদারাবা ও শিরকতের মধ্যে পার্থক্য

শিরকাত বা অংশীদারি কারবার ও মুদারাবার মাঝে মোটা দাগের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—

	শিরকাত	মুদারাবা
১	শিরকাত (শিরকাতুল আমাল, শিরকাতুল আমওয়াল, শিরকাতুল উজূহ্) এর মধ্যে প্রত্যেকে শরিক হয় সম্পদ বা শ্রম বা দায় গ্রহণের মাধ্যমে।	মুদারাবায় কেবল মুনাফায় অংশীদারিত্ব হয়। অন্য কিছুতে নয়।
২	শিরকতের মধ্যে লোকসান হলে প্রত্যেক শরিক তার মূলধন বা দায় অনুপাতে বহন করবে।	মুদারাবায় লোকসান হলে তা কেবল রব্বুল মাল বহন করে। (যদি মুদারিবের কোনো ত্রুটি বা অবহেলা প্রমাণিত না হয়।)
৩	অন্যান্য শিরকাতে প্রত্যেক শরিক কাজ করতে পারে (কোনো কোনো শিরকাতে প্রত্যেকের কাজ করা বাধ্যতামূলক। যেমন, শিরকাতুল আমাল।)	মুদারাবায় রব্বুল মাল ব্যবসায়িক কোনো কাজ করতে পারবে না। তাকে Sleeping পার্টনার হয়ে থাকতে হয়।

বস্তুত এসব পার্থক্যের কারণেই পূর্ববর্তী ফকীহগণ শিরকতের অধ্যায়ে মুদারাবা আলোচনা করেননি। গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, মুদারাবা ইজারা চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে মুদারিবের শ্রমের বিপরীতে মুনাফা থেকে একটি অংশ গ্রহণ করে। যেমন, ইজারা চুক্তিতে শ্রমিক তার শ্রমের বিপরীতে উজরত/পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। তবে মুনাফায়

যেহেতু উভয়ে শরিক হয়, শুধু এ দৃষ্টিকোণ থেকে একে ইসলামের শিরকাত বা যৌথ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১. ৭. মুদারাবার প্রকার

মুদারাবার বিস্তৃত ব্যবহার থেকে বর্তমানে এর বিভিন্ন প্রকার তৈরি হয়েছে। তবে আমরা মুদারাবার শুধু মৌলিক একটি বিভাজন উল্লেখ করব। মৌলিকভাবে মুদারাবা দুই প্রকার। যথা :

১. মুদারারাবা মুতলাকা (শর্তহীন মুদারাবা / Unrestricted Mudaraba)।

২. মুদারাবা মুকাইয়্যাদা (শর্তযুক্ত বা সীমাবদ্ধ মুদারাবা / Restricted Mudaraba)।

উসমানী সালতানাতে রচিত 'ইসলামী বিধিবদ্ধ আইনের' ধারা নং ১৪০৬ ও ১৪০৭ ও AAOIFI-এর ১৩নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ৫নং ধারায় উক্ত দুটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সারকথা হলো :

১. ৭. ১. শর্তহীন মুদারাবা

শর্তহীন মুদারাবা (Unrestricted Mudaraba Contract) বলতে বোঝানো হয়, রব্বুল মাল ব্যবসায়ীকে ৪টি বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করা। যথা :

ক. ব্যবসার মেয়াদ নির্দিষ্ট হবে না।
খ. কোনো শহর বা স্থানের সাথে ব্যবসার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হবে না।
গ. ব্যবসার বিশেষ কোনো প্রকারও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে না।
ঘ. কোনো ক্রেতা-বিক্রেতা বা কোনো মহল্লার ক্রেতা-বিক্রেতাও নির্দিষ্ট করা হবে না।

যেমন, এভাবে বলা হবে, 'তুমি তোমার মতো করে ব্যবসা করবে।' এতে মুদারাবাটি নিঃশর্ত মুদারাবা বলে গণ্য হবে। মূলত এমন ব্যাপক নিঃশর্ত মুদারাবা তখনি হয়, যখন ব্যবসায়ীর ওপর পুঁজিদাতার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে। ব্যবসায়ী আমানতদার ও বিশ্বস্থ হয়।

তবে মুদারাবা চুক্তি যতই নিঃশর্ত হোক সেটা মুদারাবার মূল টার্গেট তথা মুনাফা বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী ও পুঁজিদাতা উভয়ের কল্যাণ সাধনের সাথে শর্তযুক্ত থাকবে। এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা উভয়ের কল্যাণের পরিপন্থী। আর ব্যবসায়িক সকল কার্যক্রম ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ উরফ বা প্রচলন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের কোনো একটা নির্দিষ্ট করা হলে সেটাই শর্তযুক্ত মুদারাবা (Restricted Mudaraba) হয়ে যাবে। যেমন বলা হলো, ব্যবসাটা হবে এক বছর মেয়াদী। অথবা বলল, শুধু ঢাকা শহরে ব্যবসা করবে। অথবা বলা হলো, কেবল অমুক পণ্যগুলোরই ব্যবসা করতে পারবে। অথবা বলা হলো, কেবল ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের সাথেই ক্রয়-বিক্রয় করবে—এভাবে বলা হলে সেটা শর্তযুক্ত মুদারাবা হয়ে যাবে। তবে এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না যা ব্যবসায়ীর কাজের প্রতিবন্ধক হয়।

১. ৭. ২. শর্তযুক্ত মুদারাবা (Restricted Mudaraba Contract) পরিচিতি

Restricted MudarabaContract হলো, উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের কোনো একটা নির্দিষ্ট করা। যেমন বলা হলো, ব্যবসা হবে এক বছর মেয়াদী। ইত্যাদি। তবে এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না যা ব্যবসায়ীর কাজের জন্য প্রতিবন্ধক হয়। যেমন, শর্তারোপ করা হলো, প্রতিটি ক্রয়-বিক্রয় রব্বুল মালের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে। অবশ্য রব্বুল মাল চাইলে ব্যবসায় পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

আধুনিক উদাহরণ

বর্তমান সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো মানুষ থেকে (কারেন্ট একাউন্ট ব্যতীত) মুদারাবা ভিত্তিতে ডিপোজিট গ্রহণ করে থাকে। উক্ত মুদারাবা সাধারণত হয়ে থাকে নিঃশর্ত মুদারাবা। অবশ্য মেয়াদি স্কিমগুলোর কথা ভিন্ন। তদ্রূপ ইসলামী জীবন বীমা ও সমিতি। একইভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শর্তযুক্ত মুদারাবার প্রচলন অধিক পরিলক্ষিত হয়।

১. ৮. মুদারাবার মৌলিক কিছু নীতিমালা

মুদারাবা একটি আকদ বা চুক্তির (Contract) নাম। অন্যান্য চুক্তির মতো এরও বুনিয়াদি কিছু বিষয় রয়েছে। প্রত্যেকটির সাথে রয়েছে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা। মুদারাবা চুক্তি বুঝতে হলে এর বুনিয়াদি বিষয় ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা বোঝার বিকল্প নেই।

১. ৯. মুদারাবার বুনিয়াদি বিষয়

মুদারাবা চুক্তির মোট ৬টি বুনিয়াদি বিষয় (Six Pillars of Mudaraba) রয়েছে। যথা :

১. মুদারাবা চুক্তি
২. রব্বুল মাল
৩. মুদারিব
৪. লাভ-লোকসান
৫. পুঁজি
৬. ব্যবসায়িক কাজ[১]

১. ৯. ১. মুদারাবা চুক্তি

যেকোনো চুক্তি (Contract) বাস্তবায়নের প্রথম ও প্রধান ধাপ হলো, যারা চুক্তিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করবে, তাদেরকে এমনভাবে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট চুক্তির বাস্তবতা ও তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চারটি নীতি উল্লেখ করা হলো—

১ হানাফী মাযহাবে মুদারাবা চুক্তির রুকন বা বুনিয়াদি বিষয় কেবল দুটি। যথা ইজাব ও কাবুল। আর বাকিগুলো রুকনের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রুকনটি আদায়ে যা যা করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৮, পৃ. ৯) আর মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবে রুকন তিনটি। যথা—ইজাব-কাবুল, রাব্বুল মাল-মুদারিব ও শ্রম-মুনাফা। আর শাফেয়ী মাযহাবে ৫টি। যথা—মূলধন, শ্রম, মুনাফা, ইজাব-কাবুল ও রাব্বুল মাল-মুদারিব। (আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৯২৮) এগুলো পারিভাষিক মতভেদ। মূল বিষয়টি হলো, মুদারাবা চুক্তির বুনিয়াদি বিষয়গুলো। যেগুলোর সমন্বয়ে মুদারাবা অস্তিত্ব ও বাস্তবায়ন হবে। তাই আমরা একসঙ্গে ৬টি বিষয় উল্লেখ করেছি। এটি জমহুরের (সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ) মতের অনুকূলে।

• মুদারাবার ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হওয়া। এ দুটি বিষয় মুদারাবার প্রধান রুকন বা বুনিয়াদি বিষয়। এ দুটির মাধ্যমেই মুদারাবা চুক্তির অস্তিত্ব লাভ হয়।

উক্ত ইজাব ও কবুল এমনভাবে হতে হবে, যার দ্বারা মুদারাবার মূল কথা ও বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এটি হতে পারে সরাসরি মুদারাবা শব্দ দিয়ে। যেমন, 'এই টাকা মুদারাবার মূলধন হিসেবে গ্রহণ করো। এরপর ব্যবসা করো। যা লাভ হবে তা অর্ধার্ধি বা অন্য কোনো হারে আমাদের মাঝে বণ্টন হবে।'

অথবা মুদারাবা বোঝায় এমন কিছু বলবে। যেমন, 'এই টাকা নাও। ব্যবসা করো। যা লাভ হবে তা অর্ধার্ধি বা অন্য কোনো হারে বণ্টন হবে।'

অথবা বলল, 'এই টাকা দিয়ে পণ্যগুলো খরিদ করো। যা লাভ হবে তার অর্ধেক তোমার।' দেখুন, এখানে শুধু খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। বিক্রি করার কথা বলা হয়নি। অথচ বিক্রি না করলে ব্যবসা হবে না; কিন্তু যেহেতু লাভের কথা বলা হয়েছে, তাই মুদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারণ, বিক্রয় ছাড়া লাভ হয় না।[১]

মোটকথা, উরফ ও প্রচলন অনুযায়ী মুদারাবা বোঝায় এমন কিছু বলতে হবে। এরপর মুদারিব (উভয় ক্ষেত্রে) তা গ্রহণ (Accept) করা। উক্ত কবুল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কবুল ইজাবের অনুকূলে হওয়া ও একই মজলিসে হওয়া।

• মুদারাবা চুক্তিতে মুনাফার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। মুনাফা কোন হারে বণ্টন হবে তাও চুক্তিতে স্পষ্ট করে নিতে হবে। চুক্তিতে মুনাফার বিষয়টি অস্পষ্ট থাকলে মুদারাবা ফাসিদ হয়ে যাবে।

• চুক্তি লিখিত হওয়া। অন্যান্য চুক্তির ন্যায় মুদারাবা চুক্তিও লিখিত হওয়া মুস্তাহাব। উক্ত শরীয়াহ পদ্ধতি পালন করলে চুক্তিসংক্রান্ত বহু ঝগড়া-বিভেদ সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

• একটি আদর্শ মুদারাবা চুক্তিপত্র রচনা করা। একটি আদর্শ মুদারাবা চুক্তিপত্রে যা থাকবে—

---

১ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৮, পৃ. ৯-১০

পুঁজি বিনিয়োগকারীর নাম, ব্যবসায়ীর নাম, মূলধনের পরিমাণ, ব্যবসার ধরন, মুনাফার হার, লোকসান হলে তা রব্বুল মাল বহন করবে। তবে ব্যবসায় সীমাল•ঘন, চুক্তির বরখেলাফের কারণে লোকসান হলে তা মুদারিব বহন করবে, মুদারিব কী কী তাসাররুফ করতে পারবে, কী কী ব্যয় মুদারাবা ফান্ড থেকে নেওয়া যাবে, আর কী কী কাজ করতে হলে রব্বুল মালের অনুমতি লাগবে, মুদারাবা চুক্তির সময়সীমা (যদি প্রয়োজন হয়) ও চুক্তির তারিখ। এ বিষয়গুলো চুক্তিপত্রে লেখা জরুরি।

এরপর উক্ত চুক্তিপত্রে উভয়ের দস্তখত থাকবে। দুজন সাক্ষী থাকবে। প্রত্যেকের নিকট উক্ত চুক্তিপত্রের কপি থাকবে।[১]

১. ৯. ২. রব্বুল মাল

• রব্বুল মাল মূলত মুআক্কিল। সে তার সম্পদে তাসাররুফ (Action) করার জন্য মুদারিবকে উকিল নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাই মুআক্কিল হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, এখানে রব্বুল মালের জন্যও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া। তবে মুসলমান হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং অমুসলিমও রব্বুল মাল হতে পারে।

• রব্বুল মাল একাধিক হতে পারে। এটি দু ভাবে হতে পারে। যথা :

এক. মুদারাবা চুক্তি হবে একজন মুদারিবের সাথে একাধিক রব্বুল মালের। এমন মুদারাবা বৈধ। এক্ষেত্রে মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতি হলো, প্রথমে মুদারিব তার পূর্ব নির্ধারিত মুনাফার হার নেবে। এরপর বাকিটা যৌথভাবে সকল রব্বুল মাল তাদের পুঁজির আনুপাতিক হারে গ্রহণ করবে।

দুই. প্রথমে একজন রব্বুল মালের সাথে মুদারাবা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এরপর মুদারিব আরেকজন রব্বুল মালের সাথে মুদারাবা চুক্তি করেছে। এক্ষেত্রে শরীয়াহ হলো, প্রথম রব্বুল মাল যদি নিঃশর্ত মুদারাবা চুক্তি করে থাকে অর্থাৎ এভাবে বলে যে, তুমি তোমার মতো করে ব্যবসা করো। তাহলে মুদারিবের জন্য আরেকজন রব্বুল মালের সাথে মুদারাবা

---

১ আইএফ এ কনসালটেন্সি-এর শরীয়াহ পরামর্শ বিভাগ কর্তৃক মুদারাবা চুক্তির একটি বিস্তারিত আদর্শ নমুনা ফরম তৈরি করা হয়েছে। আগ্রহীগণ সংগ্রহ করতে পারেন।

চুক্তি করা বৈধ হবে। আর যদি শর্তযুক্ত মুদারাবা হয়ে থাকে অর্থাৎ অন্য কারো থেকে পুঁজি গ্রহণ করা যাবে না বলে শর্ত থাকে, ব্যাপক চুক্তি না হয় তাহলে প্রথম রব্বুল মালের অনুমতি লাগবে।

সারকথা, প্রথম রব্বুল মাল যদি ব্যাপক অনুমতি দিয়ে রাখে বা একাধিক লোক থেকে মুদারাবা ফান্ড নেওয়া ও সবগুলো একটি টুলে রাখার ব্যবসায়িক রীতি থাকে, অথবা ব্যবসার ধরন এমন হয় যে, একাধিক ফান্ড লাগবে, আর মুদারিবও সবার ফান্ড নিয়ে ব্যবসা করতে সক্ষম হয় তাহলে (এসব শর্তে) তা বৈধ হবে। এ ছাড়া অন্য রব্বুল মাল থেকেও ফান্ড গ্রহণ করতে হলে প্রথম রব্বুল মালের অনুমোদন নিতে হবে।

বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং-এ মূল মুদারিব ব্যাংকের 'আইনগত সত্তা'। রব্বুল মাল অগণিত ডিপোজিটর।

১. ৯. ৩. মুদারিব

• রব্বুল মাল যেমন মুআক্কিল। তেমনি মুদারিবও উকিল। সে রব্বুল মালের পক্ষে তার সম্পদে তসররুফ করে থাকে। সুতরাং একজন উকিল হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, এখানেও তা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, বুঝমান হওয়া, মুরতাদ না হওয়া। তবে মুসলিম হওয়া জরুরি নয়।

তাই হিন্দুকেও ব্যবসার জন্য অর্থ প্রদান করা যাবে। অবশ্য পারতপক্ষে অমুসলিমকে মুদারিব না বানানোই নিরাপদ। কারণ, শরীয়াহ জ্ঞান না থাকার কারণে কারবার ফাসিদ হয়ে যেতে পারে। কিংবা উপার্জনে হারাম ঢুকতে পারে। এ জন্য সালাফে সালেহীন-অমুসলিম কাউকে ব্যবসার জন্য সম্পদ প্রদান করতেন না।[১]

---

১ আবু হামযা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম, আমার পিতা একজন আমদানিকারক। তিনি ছাগল আমদানি করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে শরিকানায় ব্যবসা করেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সে যেন কোনো ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকের সাথে শরিকানা ব্যবসা না করে। আমি বললাম কেন? তিনি বললেন, কেননা তারা সুদি লেনদেন করে আর সুদ কখনোই কোনো অবস্থাতে হালাল নয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ১০, পৃ. ৪৯০, সুনানে বায়হাকী, খ. ৫, পৃ. ৩৩৫, তাতে এ সংক্রান্ত আরো আসার রয়েছে)

শরীয়াহ দৃষ্টিতে একজন মুদারিবের জরুরি গুণাবলি নিম্নরূপ—

ক. বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।

খ. তাকওয়ার অধিকারী হওয়া।

গ. উত্তম আখলাকের অধিকারী হওয়া।

ঘ. মানুষের সাথে তার আচার-ব্যবহার ভাল হওয়া।

ঙ. সুদসহ হারাম কোনো লেনদেনের সাথে জড়িত না থাকা।

চ. ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যবসা নীতিমালা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা।

ছ. ব্যবসাসংক্রান্ত বাস্তব জ্ঞান থাকা।

জ. শরীয়াহসম্মত পন্থায় ব্যবসা করার দৃঢ় ইচ্ছা থাকা।

● রব্বুল মাল যেমন একাধিক হতে পারে, তেমনি মুদারিবও একাধিক হতে পারে। তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। যথা, **এক.** তসররুফ করা। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো, একই চুক্তিতে মুদারিব একাধিক হলে প্রত্যেক মুদারিব অপর মুদারিবের সম্মতি নিয়ে কাজ করতে হবে। আর শাফেয়ী মাযহাবে এমনটি করা জরুরি নয়। তবে রব্বুল মাল যদি এ শর্তারোপ করে যে, প্রত্যেকে অপরের সাথে পরামর্শ ও সম্মতি সাপেক্ষে কাজ করতে হবে তাহলে তাই করতে হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। **দুই.** মুনাফা বণ্টন। একেক মুদারিবের জন্য একেক রকম মুনাফার হার নির্ধারণ করা যাবে।

সারকথা, প্রত্যেক মুদারিবের কাজ যদি পৃথক পৃথক হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কাজে একজন অপরজনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর কাজ যদি যৌথ হয় এবং রব্বুল মাল সকল মুদারিবকে বা কতককে অপর মুদারিবদের সাথে প্রতিটি লেনদেন করার আগে আলোচনা ও সম্মতি নিয়ে যৌথভাবে কাজ করতে বলে তবে তা করতে হবে। আর যদি তা শর্ত না করা হয় তবে জরুরি নয়। আর রব্বুল মাল মুদারিবদের কাজের ধরন ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী একেকজনের জন্য মুনাফার হার একেক রকম নির্ধারণ করতে পারে।

বর্তমান ইসলামী ব্যাংকে যদিও মুদারাবা ভিত্তিতে বিনিয়োগ কম করা

হয়। তবে তারা চাইলে মুদারাবা ভিত্তিতেও বিনিয়োগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে একেক মুদারিবের জন্য মুনাফার হার একেক রকম নির্ধারণ করা যাবে।

- ফিকহের দৃষ্টিতে মুদারিবের মোট ৫টি চরিত্র হয়। সংক্ষেপে তা হলো :

১. **আমানতদার (Trustee)** : মুদারিব সর্বপ্রথম রাব্বুল মাল কর্তৃক প্রদত্ত পুঁজির আমানতদার।[১]

২. **উকিল (Agent)** : রব্বুল মাল যেমন মুআক্কিল। তেমনি মুদারিবও উকিল। সুতরাং একজন উকিল হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, এখানেও তা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া, মুরতাদ না হওয়া।

৩. **শরিক (Partner)** : মুদারিব ব্যবসার মুনাফায় শরিক হবে যদি মুনাফা হয়।

৪. **কর্মচারী (Employee)** : মুদারাবা ফাসিদ (Void) হলে মুদারিব একজন কর্মচারী হিসেবে মূল্যায়িত হবে। তখন সে কেবল ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। আর মুনাফা হবে কেবল রব্বুল মালের।

৫. **জামিন (Liable)** : মুদারিবের সীমালঙ্ঘন কিংবা শর্তের বরখেলাফের কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মুদারিব এর জামিন হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উপর্যুক্ত ৫টি গুণ মুদারিব একই সাথে লালন করে না; বরং এর মধ্য থেকে কেবল প্রথম তিনটি চরিত্র মুদারিব একই সাথে লালন করে।

উল্লেখ্য, উক্ত ৫টি গুণ মনে রাখার জন্য এভাবে ছন্দ আকারে পড়তে পারেন :

'মুদারিবের অবস্থা ৫টি
উকিল, শরিক, আমানতদার
কর্মচারী, জামিন-দার

---

১ হযরত হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, 'মুদারিব আমানতদার'। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮

সবাই মিলে গড়বো আমরা জান্নাতেরই দ্বার।'

১. ৯. ৪. মুদারাবায় লাভ-লোকসান বণ্টন নীতিমালা

মুদারাবা ব্যবসায় লাভ-লোকসানসংক্রান্ত নীতিমালা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা জরুরি। নিম্নে প্রথমে মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. ৯. ৪. ১. মুনাফাসংক্রান্ত নীতিমালা

বৈধ কাজ থেকে মুনাফা কামানো মন্দ কিছু নয়। বরং শরীয়াহসম্মত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

'তোমরা এতিমের সম্পদ দিয়ে ব্যবসা কর। যাকাত যেন তাদের সম্পদ খেয়ে না ফেলে।'[১]

সুতরাং মুদারাবা ব্যবসা থেকেও মুনাফা অর্জন বৈধ। তবে এর কিছু নীতিমালা রয়েছে। এখানে সেই নীতিমালাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

১. চুক্তির সময়ই মুনাফার হার স্পষ্টভাবে উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে। যাতে পরবর্তীতে একে কেন্দ্র করে কোনো ঝগড়া সৃষ্টি না হয়। চুক্তিতে মুনাফার বিষয় অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট থাকলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন, শুধু এতটুকু বলা হলো, এই টাকা নিয়ে মুদারাবা ব্যবসা কর। এর বেশি কিছু বলা হয়নি। তাহলে মুদারাবা ফাসিদ হবে। (বিস্তারিত ১১ নং ক্রমিক দ্র.)

২. মুনাফা নির্ধারণ করতে হবে শতকরা হারে। যেমন, মুনাফার ৪০ শতাংশ পাবে মুদারিব, ৬০ শতাংশ পাবে রব্বুল মাল। অথবা মুনাফার দুই তৃতীয়াংশ পাবে রব্বুল মাল। এক তৃতীয়াংশ পাবে মুদারিব।

---

১ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, অধ্যায় : এতিমের সম্পদের যাকাত। উক্ত হাদীসের সনদের ব্যাপারে হাইছামী রহ. লিখেছেন, رواه الطبراني في الأوسط وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح اهـ

সুনির্দিষ্ট অংকে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন, প্রতি মেয়াদে ৪ হাজার টাকা মুনাফা হিসাবে প্রদান করতে হবে।

৩. মুনাফার সাথে অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তির শর্তারোপ করা যাবে না। করলে সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন, বলা হলো, মুনাফা অর্ধার্ধি হারে বণ্টন হবে। তবে রব্বুল মাল তার গাড়ি বা বাড়ি এক বছরের জন্য মুদারিবকে ব্যবহার করতে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে মুদারাবা চুক্তি সঠিক হবে। তবে গাড়ি বা বাড়ি প্রদানের শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে।[১]

৪. মুনাফার হার নির্ধারণ করা হবে মুনাফা থেকে, পুঁজি থেকে নয়। সুতরাং যদি শর্তারোপ করা হয়, পুঁজির ১০% প্রদান করতে হবে, তাহলেও মুদারাবা ফাসিদ হয়ে যাবে।

৫. উভয় পক্ষ যৌথভাবে মুনাফায় অংশীদার হবে। কোনো একজনের জন্য সম্পূর্ণ মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না। এমনটি হলে এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে। হয় সকল মুনাফা থাকবে মুদারিবের। কারবারটি তখন করযে রূপান্তর হয়ে যাবে। অথবা সকল মুনাফা থাকবে রব্বুল মালের। কারবারটি তখন বিনিময়হীন চুক্তিতে (عقد التبرع) রূপান্তর হয়ে যাবে বা ব্যক্তি পারিশ্রমিকের (ইজারাতুল আশখাস) চুক্তি হতে পারে। মোটকথা, মুদারাবা হিসাবে বাকি থাকবে না।

৬. মুনাফা কেবল রব্বুল মাল ও মুদারিবের মধ্যেই বণ্টনের চুক্তি হবে। যদি তৃতীয় কারো জন্য মুনাফার হার ধার্য করা হয়, তবে তা বৈধ হবে।[২] এটি সকল অংশীদারদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিক্রমে হতে হবে। এর জন্য একে অন্যকে চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না।[৩]

---

১ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৮ পৃ. ২৬; শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩

২ আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ৪৯; আয যখীরাহ, খ. ৬ পৃ. ৪৩; ফাতাওয়া সিরাজিয়া, পৃ. ৫৩১; তাহতাভী আলা আদ্দুররিল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৬৮

৩ অধম মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকায় ইফতা পড়াকালীন পঞ্চম বর্ষে এ ধরনের একটি ফতোয়া অনুশীলন করেছি। এতে উস্তাযে মুহতারাম মুফতি আবুল হাসান মো. আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহসহ অন্যান্য উস্তাযবৃন্দ বৈধতার কথাই বলেছেন। ফতোয়াটি অধমের সংরক্ষণে আছে।

৭. বিভিন্ন ব্যবসার জন্য মুনাফার বিভিন্ন হার নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, চাউলের ব্যবসা করলে এত হার। মুড়ির ব্যবসা করলে এই হার। ইত্যাদি।

৮. মুদারিব ও রব্বুল মাল নিজেরা আলোচনা করে মুনাফার যেকোনো হার নির্ধারণ করতে পারে।

৯. স্থানের দৃষ্টিকোণ থেকেও মুনাফার হারে তারতম্য হতে পারে। যেমন নিজ শহরে ব্যবসা করলে এই হার। বাহিরে করলে এই হার।

১০. মুনাফার হার ব্যতীত মুদারিব ব্যবসায়িক কাজের বিনিময়ে ভিন্ন কোনো সুবিধা মুদারাবা ফান্ড থেকে পাবে না। যেমন, বেতন-বোনাস বা ফি। মৌলিকভাবে মুদারাবা ব্যবসায় মুনাফা ও পারিশ্রমিক একত্র হতে পারে না। অবশ্য ব্যবসায়িক কাজটা যদি এমন হয়, যা মুদারিব বা ব্যবসায়ী নিজে করা দায়িত্ব নয়। বরং তা কোনো শ্রমিক দিয়ে করাতে হয়। এমন কাজ মুদারিব নিজেই যদি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করতে চায় তবে সেটা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো :

ক. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার চুক্তিটি মুদারাবা চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চুক্তি হতে হবে। একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত হবে না।

খ. মুদারাবা ও ইজারা চুক্তি একটি অপরটিকে প্রভাবিত করবে না। সুতরাং মুদারাবায় মুনাফা না হলে বা কম হলে পারিশ্রমিক থেকে মুদারিব বঞ্চিত হবে না বা তার নির্ধারিত পারিশ্রমিক হ্রাস হবে না।

গ. মুদারিবকে ব্যবসায়িক কাজ থেকে বহিষ্কার করা হলে তথা মুদারাবা চুক্তি তার সাথে রহিত করা হলেও তার সাথে কৃত ইজারা চুক্তি অটোমেটিক বাতিল হবে না।[1]

১১. চুক্তিতে মুনাফার ব্যাপারে উভয়পক্ষ নিশ্চুপ থাকলে সেখানে যদি ব্যবসায়িক স্বতঃসিদ্ধ কোনো রীতি থাকে, যার ওপর নির্ভর করা যায় তবে সেই ব্যবসায়িক উরফ বা রীতি অনুযায়ী মুনাফার হার নির্ধারিত হবে। যেমন, উরফ যদি হয়, চুপ থাকলে অর্ধার্ধি হারে মুনাফা লাভ হবে তবে

---

১ এ্যাওফির ১৩ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড। ধারা : ৮/২, পৃ. ৩৭২, খ. ০১, শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড : মুদারাবা।

সেভাবেই মুনাফা নির্ধারণ হবে। আর যদি নির্ভরযোগ্য কোনো উরফ বা ব্যবসায়িক রীতি না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।[১]

১২. এভাবে যদি মুনাফা নির্ধারণ করা হয় যে, প্রথম মাসের মুনাফা বা প্রথম ৬ মাসের মুনাফা কেবল কোনো এক পক্ষ পাবে তবে তা বৈধ হবে না।

১৩. মুনাফা বণ্টন হবে মূলধনের নিরাপত্তার পর। সুতরাং লোকসান হলে প্রথমে তা মুনাফা থেকে বহন করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে।

১৪. চূড়ান্ত মুনাফা বণ্টনের আগে প্রতি মাসে প্রাক্কলিত করে অনুমানভিত্তিক মুনাফা বণ্টন করা যাবে। তবে তা হিসাব হবে চূড়ান্ত বণ্টনের পর। তখন অতিরিক্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা ফেরত দেওয়া হবে। আর পাওনা থাকলে তা প্রদান করা হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে, মুনাফার উক্ত অগ্রিম প্রদানটা সুদের হারের ভিত্তিতে যেন না হয়।[২]

১৫. চুক্তির সময় একটি হার নির্ধারণ করার পর, পরবর্তীতে আলোচনা করে উভয়ের সম্মতিতে অন্য কোনো হারও নির্ধারণ করা যাবে।

১৬. রব্বুল মাল যদি মুদারিবকে দুটি ফান্ড প্রদান করে। আর শর্ত করে, একটি ফাণ্ডের মুনাফা সে নিবে। অপর ফাণ্ডের মুনাফা মুদারিব নিবে। অথবা একটি সময়ের (Finanacial Period) মুনাফা রব্বুল মাল নিবে। অপর একটি সময়ের মুনাফা মুদারিব নিবে। তাহলে এসব শর্ত বৈধ নয়।[৩] তদ্রূপ এভাবে যদি শর্তারোপ করা হয় যে, নির্দিষ্ট একটি Transaction এর মুনাফা রব্বুল মাল নিবে। অপরটার মুনাফা মুদারিব নিবে তাহলে তাও বৈধ নয়।[৪]

১৭. যদি এভাবে মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয় যে, উদাহরণস্বরূপ ১০ হাজার টাকা মুনাফা হলে মুদারিব মুনাফার ৪০% পাবে। রব্বুল মাল পাবে ৬০%। তবে দশ হাজারের অধিক মুনাফা হলে সেটা মুদারিব

১ এ্যাওফির ১৩ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড। ধারা : ৮/৪

২ এ্যাওফির ১৩ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড। ধারা : ৮, পৃ. ২২০

৩ এ্যাওফির ১৩ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড। ধারা : ৮/৫

৪ প্রাগুক্ত।

নিয়ে নিবে। এভাবে মুনাফার হার নির্ধারণ করা বৈধ।

১৮. মুনাফার একাংশ রিজার্ভ রাখা হবে। যেন কখনো লস হলে এর থেকে তা পুষিয়ে দেওয়া যায়। এমন শর্তারোপ সকলের সম্মতিক্রমে বৈধ হবে। যেহেতু এর মালিকানা প্রত্যেকের বহাল থাকে, তাই প্রত্যেকে তার অংশের যাকাতও দিতে হবে।

১৯. ওযন বা Weight বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রফিট বন্টন করা যাবে। যেমন, কারো মূলধন ১০০ টাকা। তাহলে একে Weightage দিয়ে ৮০ টাকা করা যাবে। এর অর্থ হলো, সে ৮০ টাকার ওপর প্রফিট পাবে। তবে এটি পূর্ব থেকেই উভয়পক্ষের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিতে হতে হবে। আর লোকসানও এভাবে বণ্টন করা সঠিক হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আধুনিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মুদারাবার মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে নানা কথা আছে। ওযন পদ্ধতি (Weighting methods), আয় বণ্টন পদ্ধতি (Income Sharing Ratio (ISR)) ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে উত্তম—এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। অধমের 'ইসলামে ব্যাংকিং ধারণা' পাণ্ডুলিপিতে বিস্তর আলোচনা করেছি। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

১. ৯. ৪. ২. লোকসান সংক্রান্ত নীতিমালা

১. মুদারাবা ব্যবসায় লোকসান হলে সাধারণত সেটা পুঁজিদাতা বহন করবে অথবা পুঁজি থেকে পুষিয়ে নেওয়া হবে।

২. লোকসান হলে প্রথমে সেটা মুনাফা থেকে বাদ দেওয়া হবে। মুনাফা থেকেও তা পূরণ না হলে মূল পুঁজি থেকে তা বহন করা হবে।

৩. মুদারাবা ব্যবসায় লোকসান হলে এবং এর পেছনে মুদারিবের সীমালঙ্ঘন বা ত্রুটি বা শর্তের বরখেলাফ কিছু প্রমাণিত হলে, ওই পরিমাণ ক্ষতি মুদারিব বহন করবে।

৪. আয় ও ব্যয় সমান হলে মূল পুঁজি রব্বুল মাল পেয়ে যাবে। মুদারিব কিছুই পাবে না।

৫. মুনাফার হারের ন্যায় লোকসানের কোনো হার নেই। সুতরাং মুনাফা

যেই হারে প্রত্যেকে পাবে, লোকসানও সেই হারে প্রত্যেকে বহন করবে এমন শর্ত ফাসিদ। বৈধ নয়। মোটকথা, সাধারণ অবস্থায় লোকসান মুদারিবের ওপর বর্তাবে না।

১. ৯. ৪. ৩. মুদারিবের সীমালঙ্ঘন

মুদারিবের সীমালঙ্ঘনের অর্থ তিনটি। যথা, মুদারাবা চুক্তিতে যা যা করতে বলা হয়েছিল, সেভাবে না করা, নিজের দায়িত্ব ও অধিকারের সীমা অতিক্রম করা ও রব্বুল মালের কোনো শর্তের বরখেলাফ করা।

উদাহরণ, মুদারাবার সম্পদ মুদারিব ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা। যেমন, মুদারাবার গাড়ি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার শুরু করেছে। তাহলে তখন তা নষ্ট হলে এর দায় মুদারিবের ওপর বর্তাবে। (এটি দ্বিতীয়টির উদাহরণ)

তদ্রূপ রব্বুল মাল নির্দিষ্ট শহরে ব্যবসা করতে বা নির্দিষ্ট পণ্যে ব্যবসা করতে বলেছে—এসব শর্ত অমান্য করলে ও এরপর ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর দায় মুদারিবের ওপর বর্তাবে। (এটি প্রথমটির উদাহরণ)

এর মধ্যে যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতিও অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুদারাবার সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা। গোডাউনে কোনো পাহারাদার নিয়োগ না দেওয়া কিংবা মালামাল ভালো করে না বেঁধেই ট্রাকে বহন করা এরপর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ইত্যাদি পন্থায় মুদারাবার মাল সংরক্ষণে ত্রুটি হতে পারে। এটি প্রমাণিত হলে মুদারিব এর জন্য দায়ী হবে।

তদ্রূপ বলা হয়েছে, রাতে সফর না করতে, সমুদ্রে সফর না করতে—এসব শর্তও অমান্য করলে মুদারিব দায় গ্রহণে বাধ্য থাকবে। (এটি তৃতীয়টির উদাহরণ)

তদ্রূপ নিষেধ করা হয়েছে—বাকি দিতে বা নির্দিষ্ট কারো সাথে লেনদেন করতে—এসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে মুদারিব দায়ী হবে।

এসব ক্ষেত্রে যে অংশে সীমালঙ্ঘন হবে, ওই অংশের সম্পূর্ণ দায় মুদারিবের। তাই এ অংশের লাভ-লোকসানও তার। তবে লাভ হলে তা তার জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে না। বরং সদকা করে দিতে হবে।

অবশ্য নিষিদ্ধ ব্যক্তির নিকট যদি বিক্রয় করে তবে সেটা রব্বুল মালের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। তবে নিষিদ্ধ ক্রয়কে পরবর্তীতে রব্বুল মাল অনুমোদন দিলেও সীমালঙ্ঘন দূর হবে না।[১]

১. ৯. ৪. ৪. কখন সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে?

আদেশ অমান্য করাটাই অগ্রগণ্য বক্তব্য অনুযায়ী সীমালঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে; এবং এ কারণে গুনাহ্ হবে। হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ বর্তাবে যদি ওই অবস্থায় পণ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

১. ৯. ৫. পুঁজি

মুদারাবা চুক্তির মূল হলো, পুঁজি। তাই এখানে পুঁজি সম্পর্কিত শর্ত ও জরুরি কিছু শরীয়া আলোচনা করা হলো।

মুদারাবা চুক্তির মূল হলো, পুঁজি। পুঁজি ছাড়া মুদারাবা চুক্তি কল্পনা করা যায় না। এ পুঁজি রব্বুল মাল সরবরাহ করে থাকে। উক্ত পুঁজিসংক্রান্ত মৌলিক শরীয়াহ্ নীতিমালা নিম্নরূপ—

● পুঁজি টাকা বা মুদ্রা হবে। এটিই মূল। পুঁজি হিসাবে কোনো দ্রব্য কি নির্ধারণ করা যাবে?

এ বিষয়টি একটু দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফে সালেহীনের মতে, মুদারাবা চুক্তিতে পুঁজি নগদ মুদ্রায় হতে হবে। দ্রব্য সাব্যস্ত করা যাবে না।

ইমাম ইবনুল মুনযির রহ.(মৃত্যু : ৩১৮হি.) লিখেছেন—

'কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে মুদারাবার পুঁজি হিসাবে প্রদান করা যাবে কি না—বিষয়টি জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদপূর্ণ। তবে অধিকাংশ জ্ঞানী তা অপছন্দ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, হাসান বসরী রহ., ইবনে সিরীন রহ., ইবরাহীম নাখায়ী রহ., হারেস আল আকলী রহ., উবাইদুল্লাহ্ ইবনুল হাসান রহ.। আরো আছেন, ইমাম মালেক রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ.। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ., ইমাম আবু

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

সাওর রহ., ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.।"[১]

ইমাম ইবনুল মুনযির রহ.ও দ্রব্য দিয়ে মুদারাবা করা নাজায়েযের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[২]

উসমানী সালতানাতে রচিত 'ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন'-এর ১৪০৯ নং ধারার সিদ্ধান্তও এটিই।

অবশ্য কতিপয় সালাফ এর বৈধতার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। যেমন, তাউস রহ., হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান রহ., ইবনে আবি লাইলা রহ., আওযায়ী রহ. ও আরেক বর্ণনা অনুযায়ী এটি ইমাম আহমাদ রহ.-এরও মতামত। এ মতটাই হাম্বলী মাযহাবে অগ্রগণ্য।[৩]

AAOIFI-এর ১৩ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ৭ নং ধারায় এক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহ সমর্থিত হয়েছে। তাতে আছে—

'মুদারাবার পুঁজির ব্যাপারে মূল কথা এটিই যে, তা মুদ্রা হবে। তবে দ্রব্যও মূলধন হতে পারে। তা এভাবে যে, চুক্তির সময় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে নেওয়া হবে। সেই মূল্যটাই মূলধন হিসেবে ধরা হবে।

---

১ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৮, পৃ. ১৬

২ আল আওসাত, খ. ১০, পৃ. ৫৬৬

৩ দেখুন, আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪০৯; আল আওসাত, খ. ১০, পৃ. ৫৬৬-৫৬৭ (অবশিষ্ট টীকা দেখুন, পরবর্তী পৃ.)
نقل الماوردي في الإنصاف عن احمد القولين، الأول: لا يصح بالعروض، والثاني: تصح، وقال: وهي أظهر و اختاره أبو بكر و أبو الخطاب...، قلت: و هو الصواب اهـ.
উল্লেখ্য, দ্রব্য বা বস্তু দিয়ে নিঃশর্তভাবে অংশীদারি কারবার করা কেবল মালেকী মাযহাবে বৈধ। আর দ্রব্য দিয়ে মুদারাবা করা কেবল হাম্বলী মাযহাবে বৈধ। দুটি মাসআলা স্বতন্ত্র। কেউ কেউ উক্ত দুটি ফিকহী মতামত বিশ্লেষণে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। যেমন, এ্যাওফির ১৩ নং স্ট্যান্ডার্ডের ৭ নং ধারার শরঈ দলিলের আলোচনায় বলা হয়েছে, দ্রব্য দিয়ে মুদারাবার বৈধতা মূলত মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারে বলা হয়েছে। (খ. ১, পৃ. ২২৯) অথচ এটি কেবল হাম্বলী মাযহাবে বৈধ। মালেকী মাযহাবে বৈধ নয়। দ্রব্য দিয়ে মুদারাবার নিষিদ্ধতার বিষয়টি ইমাম মালেক রহ. থেকে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আল ইসতিযকার, খ. ৭, পৃ. ১৮। তবে ড. ওয়াহবা যুহাইলি রহ. এ বিভ্রান্তির শিকার হননি। তিনি দুটি মাসআলায় ফিকহী মতামতের বিশ্লেষণ যথাযথই করেছেন। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, খ. ৫, পৃ. ৩৯৩২)

উক্ত মূল্য নির্ধারণটি হবে অভিজ্ঞ লোকদের মতামতের ভিত্তিতে অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিতে।'

আমাদের বক্তব্য

দ্রব্য দিয়ে মুদারাবা নিষিদ্ধতার বিষয়টি যদিও ইজতিহাদ নির্ভর। তবে অধিকাংশ মুজতাহিদ সালাফে সালেহীনের মতামত নাজায়েযের পক্ষে। এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, তৎকালীন সময়ে দ্রব্য দিয়ে মুদারাবার প্রয়োজন হত না। এ প্রয়োজনীয়তা তখনো ছিল। তদুপরি তারা একে বৈধ বলেননি। আধুনিক যুগে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ যদিও আগের তুলনায় বেশ সহজ। তদুপরি মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তাই আমরা মনে করি, নিরাপদ হলো, দ্রব্যকে বিক্রি করে সরাসরি এর মূল্যকে মুদারাবার মূলধন হিসাবে নির্ধারণ করা। অথবা মুদারিবকে এভাবে বলা যে, দ্রব্যটি বিক্রি কর। এরপর এর মূল্যকে মুদারাবার পুঁজি হিসাবে গ্রহণ কর। এক্ষেত্রে প্রথম চুক্তি হবে ওয়াকালাহ চুক্তি। এরপর মুদারাবা চুক্তি হবে।

এভাবে যেহেতু প্রয়োজন পুরো হয়ে যাচ্ছে, তাই পারতপক্ষে সরাসরি দ্রব্যকে মূলধন হিসাবে নির্ধারণ না করাই উচিত। অবশ্য একান্ত সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহের অনুসরণ করা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, সরাসরি দ্রব্যকে মূলধন হিসাবে গণ্য করে এরপর এর মূল্যকে মূলধনের মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করা, আর সরাসরি দ্রব্যের মূল্যকে মূলধন হিসাবে নির্ধারণ করার মাঝে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান হিসাব হবে দ্রব্যের মূল্যের ভিত্তিতে। তবে সরাসরি দ্রব্যমূল্যকে মূলধন হিসাবে সাব্যস্ত না করার মাঝে অতিরিক্ত ফায়দা হলো, এতে ন্যূনতম মনোমালিন্য ও মতভেদ থেকেও নিরাপদ থাকা হয়।

- পুঁজির পরিমাণ, জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তির সময়ই উভয় পক্ষ জ্ঞাত থাকা। এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা বা অজ্ঞতা থাকলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

- কোনো দায়কে পুঁজি সাব্যস্ত করা যাবে না। যেমন, মুদারিবের কাছে আগে থেকেই রব্বুল মালের কিছু টাকা পাওনা আছে। সেটা হস্তগত না করে, সরাসরি তাকে পুঁজি বানানো বৈধ নয়। অথবা অন্য কারো যিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকা অর্থকে মুদারাবার মূলধন হিসাবে প্রদান করাও বৈধ নয়।[১]

- মুদারাবা বাস্তবায়নের জন্য পুঁজি অর্পণ করা। যতটুকু অর্পণ করা হবে, ততটুকুর মাঝে মুদারাবা কার্যকর হবে। এই অর্পণ সরাসরি হাতে হাতে হতে পারে অথবা চেকের মাধ্যমেও হতে পারে।

- মূলধনের নিরাপত্তা প্রদান করা যাবে না। কারণ, মুদারিব হলো, আমানতদার। তার নিকট মূলধন আমানত। সুতরাং মূলধন ফেরত প্রদান নিশ্চিত করা হলে সেটা করয ও সুদে (অতিরিক্ত মুনাফাসহ) পরিণত হবে।[২]

- রব্বুল মাল চাইলে মুদারিব থেকে নিরপত্তার জন্য কিছু সম্পদ নিয়ে রাখতে পারে। সেটা সে ব্যবহার করবে না। তবে যখন মুদারিবের

---

১ এর কারণ হলো, এতে 'শুবহাতুর রিবা' সৃষ্টি হয়। বিষয়টি দাঁড়াল এই যে, পাওনা টাকা এখনি দিতে হবে না। ব্যবসা করো। আমাকে মুনাফাসহ দিয়ো। এ প্রক্রিয়াটি ঋণের ওপর অতিরিক্ত নেওয়ার 'শুবাহ' সৃষ্টি করেছে। সরাসরি রিবা নয়, কারণ, উক্ত টাকার ঝুঁকি রব্বুল মালের ওপর থাকে। মুদারিবের ওপর ঝুঁকি হলে তো সরাসরি রিবা হয়ে যেত। আর এটি জানা কথা যে, রিবার ক্ষেত্রে 'শুবাহ'টাই মূল বা হাকিকতের স্থলাভিষিক্ত। (মুসতানাদ, মাআয়ীর, খ. ১, পৃ. ৩৮৫) তবে ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের টাকাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন স্বতন্ত্র। পূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

২ মূলধনকে মুদারিবের ওপর দায় হিসাবে গণ্য করার জন্য ফকীহগণ বিভিন্ন হীলা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, রব্বুল মাল অল্প কিছু টাকা ছাড়া পুরো মূলধন মুদারিবকে ঋণ হিসাবে প্রদান করবে। উক্ত ঋণের ওপর সাক্ষীও রাখবে। প্রকৃত অর্থেই ঋণ প্রদান করবে। এরপর তার সাথে শিরকাত করবে। মুদারিবের মূলধন হলো, প্রাপ্ত করয। আর রব্বুল মালের মূলধন হলো, ওই অল্প টাকা। শর্ত থাকবে উভয়ে কাজ করবে। আর মুনাফা যৌথভাবে বণ্টন হবে। এভাবে শিরকতের পর মুনাফা হলে নির্ধারিত হারে মুনাফা পাবে। আর লোকসান হলে, মুদারিব করয হিসাবে মূলধনের দায় বহন করবে। অবশ্য ওই অল্প টাকা দায়হীন থাকবে। এটি রব্বুল মালের লোকসান বলে বিবেচিত হবে। তবে সেটা যেহেতু অল্প টাকা তাই তা বিশাল অংকের বিপরীতে গণনাযোগ্য হবে না।–বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৮, পৃ. ২৮ বলার অপেক্ষা রাখে না, এসব হিলা ব্যাপকভাবে অনুসরণীয় নয়।

সীমালঙ্ঘন, ত্রুটি কিংবা মুদারাবা চুক্তির বরখেলাফ—এসব কারণে মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন ওই সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পারবে।[১]

- নিঃশর্ত মুদারাবা হলে বা রব্বুল মালের অনুমোদন থাকলে মুদারিব মূলধনকে অন্যান্য রব্বুল মালের মূলধনের সাথেও মিশ্রণ করতে পারে। সব মিলিয়ে একটি টুল হবে। বর্তমান ইসলামী ব্যাংকে এরই প্র্যাক্টিস হচ্ছে।

- মুদারিব যখন কোনো কোম্পানি বা ব্যাংক হয়, তখন সাধারণত সেই কোম্পানি বা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তাগণ নিজেরা বিনিয়োগ করে থাকেন। এরপর তারা মানুষ থেকে মুদারাবা ভিত্তিতে মূলধন গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে মুদারিব হলো কোম্পানি। তার অধীনে সকল বিনিয়োগকারী বা শেয়ারহোল্ডারগণ কাজ করেন। এক্ষেত্রে এই সকল বিনিয়োগকারীদের মাঝে পরস্পরের যে অংশীদারিত্ব তৈরি হয়, ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এটির তাৎপর্য নিয়ে দু ধরনের মতামত রয়েছে। যথা—

ক. এটি শিরকাতুল মিলক। সুতরাং প্রত্যেকে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন অনুপাতে মুনাফা পাবে। কমবেশি করা যাবে না। মালেকী ফকীহগণ এই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

খ. এটি শিরকাতুল আকদ (এরপর শিরকাতুল আমওয়াল)। সুতরাং প্রত্যেকের মুনাফার হার কমবেশি করা যাবে। মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ এই মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২]

- মূলধন যেহেতু মুদারিবের নিকট আমানত, তাই স্বাভাবিক কোনো কারণে মূলধন নষ্ট হলে বা ধ্বংস হলে এর জন্য মুদারিব দায়ী হবে না। অবশ্য মুদারিবের ত্রুটি, সীমালঙ্ঘন বা চুক্তি লঙ্ঘন করার কারণে ক্ষতি হলে ওই পরিমাণ ক্ষতি মুদারিব বহন করবে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আগে করা হয়েছে।

১. ৯. ৬. ব্যবসায়িক কাজ

---

১ এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, ১৩, ধারা, ৬, পৃ. ২১৯

২ দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৫৭

ব্যবসায়িক কাজ মুদারাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজের বিনিময়েই মুদারিব মুনাফা পেয়ে থাকে। এখানে এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শরিয়াহ আলোচনা করা হলো—

- ব্যবসার কাজ বৈধ হতে হবে।

- মুদারিব মুদারাবা ফান্ড থেকে রব্বুল মালের অনুমতি ছাড়া দান, করয, হিবা ইত্যাদি কাজ করতে পারবে না।

- মুদারিবের জন্য জরুরি হলো, মুদারাবার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। রব্বুল মালকে আশ্বস্ত করা যে, তার টাকা একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে আছে। সে সর্বদা তার কল্যাণকামী।

- রব্বুল মাল সরাসরি ব্যবসায়িক কাজে ব্যাপকভাবে বা যখন-তখন অংশগ্রহণের শর্তারোপ করতে পারবে না। এমনটি হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।[১] যেমন, বলা হলো, সকল ব্যবসায়িক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় সবই মুদারিবের সাথে সাথে রব্বুল মালেরও সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

অথবা এমন শর্তারোপও সঠিক নয় যে, প্রত্যেক লেনদেনের সময় রব্বুল মালের সাথে পরামর্শ ও অনুমতি নিয়ে করতে হবে। অথবা এমন শর্তারোপও বৈধ নয়, যা মুদারিবের ব্যবসায়িক স্বাধীনতা হরণ করে।[২]

পক্ষান্তরে যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, রব্বুল মাল যখন চাইবে তখন স্বতন্ত্রভাবে সে ব্যবসার কাজ করবে। তদ্রূপ মুদারিব যখন চাইবে তখন স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে। একজন অপরজনের কাজে দখল দেবে না। এমনটি হলে তা বৈধ হবে।[৩]

মুদারিব নিজে কাজ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়েও করাতে পারে। তবে এটি বেশ গভীরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন কাজটি মুদারিব নিজে করা দায়িত্ব, কোনটি অন্য কাউকে দিয়েও করানো যায়। এটি প্রতিটি ব্যবসার নির্ধারিত উরফ ও রীতিনীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩৩২

২ এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড ১৩, ধারা : ০৩/৯, খ. ১, পৃ. ২২২

৩ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩৩২

যেমন, ফেসবুকে পোস্ট বুস্ট করা। এটি অন্যকে দিয়েও করা যাবে।[১]

- মুদারাবার ব্যয় কেবল ব্যবসায়িক কাজেই নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়টি একটু আলোচনা সাপেক্ষ। ব্যবসায়িক কাজ করতে গিয়ে মুদারিবের বিভিন্ন খরচ হয়ে থাকে। কোন খরচ বা ব্যয়টি মুদারিব নিজে বহন করবে, কোনটি মুদারাবা বা ব্যবসার ফান্ড বহন করবে, তা অনেক সময় অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে কখনো এমন ব্যয়ের খরচও ফান্ড থেকে নেওয়া হয়, যা সঠিক নয়। তাই এটি বেশ সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হবে। যারা মুদারাবা ভিত্তিতে সমিতি বা ব্যবসা পরিচালনা করতে আগ্রহী হবেন, তাদের জন্য এ বিষয়ে পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হলো।

১. ১০. মুদারাবার ব্যয় নির্বাহ নীতিমালা

এ ব্যাপারে স্বতঃসিদ্ধ নীতি হলো, ব্যবসার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত (Direct Expenses) খরচগুলো মুদারাবা ফান্ড থেকে বহন করা হবে। আর যে খরচটা সরাসরি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত নয় (Indirect Expenses) সেটা মুদারিব একা বহন করবে। তদ্রূপ যে ব্যয় ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে তাও ব্যবসার ফান্ড থেকে সরবরাহ করা যাবে না।[২]

উক্ত নীতির ভিত্তিতে নিম্নে ব্যয়ের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

১. ১১. যেসব খরচ মুদারাবা ফান্ড বহন করবে

১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর, যাতে রাত সফরে কাটাতে হয়। এমন হলে সফরের খরচ তথা খানাপিনা ও থাকার খরচ ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে মুদারাবা ফান্ড থেকে নেওয়া যাবে।

২. পণ্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীর বেতন-ভাতা।

৩. পণ্যের প্যাকেট করার খরচ।

---

১ দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২৫৬

২ আল মুহিতুল বুরহানী, খ. ১৮, পৃ. ১৫৬, মাসিক আল কাউসার, ২০০৮ইং, আগস্ট, পৃ. ১৭

৪. পণ্যের গোডাউন ভাড়া।

৫. পণ্য পরিবহন খরচ।

৬. পণ্যের বিজ্ঞাপন খরচ।

৭. পণ্য বিপণন খরচ।

৮. শো রুম ভাড়া।

৯. পণ্যের বীমা খরচ।

১০. পণ্য সম্পৃক্ত মনিহারি।

১১. ক্রেতাদের আপ্যায়ন খরচ।

১২. এমন সব খরচ যা উরফ বা রীতি অনুযায়ী ফান্ড বহন করে থাকে।

বিশেষ নোট : উপরোল্লিখিত সকল খরচের পরিমাণ প্রচলিত ব্যবসায়িক উরফ বা রীতি অনুযায়ী নির্ণীত হবে। সর্বোপরি রব্বুল মালের সাথে পূর্ব আলোচনা সাপেক্ষে হতে হবে।

১. ১২. যেসব খরচ মুদারিব বহন করবে

১. অফিস খরচ। যে অফিস মুদারিব তার ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজে ব্যবহার করে। তদ্রূপ মুদারিব ধরা যাক একটি কোম্পানি। তাহলে কোম্পানির অফিস খরচ, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সবই কোম্পানি প্রদান করবে। অবশ্য মুদারিবের অফিস যদি পণ্যের শো রুম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, তাহলে উরফ ও রীতি অনুযায়ী এর ন্যায্য ভাড়া গ্রহণ করা যাবে।

২. মুদারিবের ব্যক্তিগত ব্যবসার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক ভ্রমণ।

৩. মুদারিবের ব্যক্তিগত অফিসের খানাপিনা ও নাস্তার খরচ। বর্তমানে এ বিষয়টি মারাত্মক অবহেলার শিকার।

৪. লোকাল যাতায়াত খরচ। যেমন বাসা থেকে অফিসে আসা।

৪. মুদারিবের অফিসের কর্মচারীদের বেতন-বোনাস। (যারা সরাসরি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত নয়)

৫. আমানত সংগ্রহকারীদের বেতন-ভাতা।

৬. মুদারিবের অফিসের যাবতীয় বিল। যেমন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি

ইত্যাদি।

৭. যে খরচটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদারিবের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, গাড়ি। টেলিফোন ইত্যাদি।

৮. ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী যে কাজগুলো ব্যবসায়ীকে করতে হয়, যেমন, ব্যবসায়িক ডিল করা, মূল্য গ্রহণ করা, ঋণ পরিশোধ করা ইত্যাদি কাজ মুদারিব নিজে করবে। এর জন্য সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। এসব কাজের জন্য সে কাউকে নিয়োগ দিলে তার খরচ সে নিজে বহন করবে। অবশ্য যে কাজগুলো রীতি অনুযায়ী নিজে করা জরুরি নয় এমন কাজের জন্য ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ দিতে পারবে। সেটা মুদারাবা ফান্ড বহন করবে।[১]

১. ১৩. মুদারিবের পরিতোষণ

মুদারিব মূলত যৌথ একটি ব্যবসার কাজ করে। সুতরাং শুধু এ কাজের জন্য যখন সে নিয়োজিত হবে, তখন তার একান্ত মানবিক প্রয়োজনগুলো পূরণের ব্যবস্থা মুদারাবা ফান্ড থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে নীতি হলো :

১. কাজটা এমন হতে হবে যা শতভাগ ব্যবসার জন্য হবে।

২. ব্যবসায়ীদের রীতি অনুযায়ী খরচ নেবে।

৩. ইসরাফ বা অপব্যয় কিংবা প্রয়োজন ছাড়া খরচ নেবে না।

উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী :

- মুদারিব যখন নিজ শহরে ব্যবসায়িক কাজ করবে তখন তার পরিতোষণ সে নিজে বহন করবে। কারণ, এখানে অবস্থানটা নিজ স্বার্থেই হচ্ছে। কেবল ব্যবসার জন্য নয়। অতএব, অফিসে বসে চা-নাস্তা করে বিলটা মুদারাবা ফান্ডের নামে করা মোটেও বৈধ নয়। তদ্রূপ দৈনিক পত্রিকা ক্রয় ইত্যাদি। (তবে রব্বুল মালের অনুমোদন সাপেক্ষে অথবা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত উরফ অনুযায়ী হতে পারে)
- ব্যবসার উদ্দেশ্যে যখন সফর করবে, চাই তা শরঈ দূরত্বের সফর

১ এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, পৃ. ২২২

হোক বা না হোক এবং সফরটা এমন হবে যে, রাতও তাকে বাহিরে কাটাতে হয়, তবে এমন সফরে মুদারিব মুদারাবা ফান্ড থেকে ন্যায়সঙ্গত পরিতোষণ গ্রহণ করতে পারবে।

- সফর করে রাতেই যদি নিজ ঘরে ফিরে আসে তাহলে ওই সফরের পরিতোষণ মুদারাবা ফান্ড থেকে নেওয়া যাবে না। অবশ্য শুধু যাতায়াত খরচ উরফ অনুযায়ী ফান্ড থেকে নিতে পারবে। তদ্রূপ খাবার গ্রহণের সময় হলে উরফ অনুযায়ী খাবারও গ্রহণ করতে পারবে। মোটকথা, এখানে উরফটা বিবেচ্য বিষয়। সাথে সাথে অবশ্যই তা ন্যায্য হতে হবে।
- পরিতোষণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—খানাপিনা, বাহন খরচ, কাপড় ধোয়া, চুল কাটার খরচ, তার খেদমত যারা করবে তাদের খরচ, থাকার জন্য হোটেল ভাড়া ইত্যাদি খরচ, যা ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী ব্যবসার ফান্ড থেকে বহন করা হয়ে থাকে। তবে ওষুধপত্রের খরচ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য এরও প্রচলন থাকলে তা মুদারাবা ফান্ড থেকে নেওয়া যাবে।[১]
- খরচটা সরাসরি মুদারাবা ফান্ড থেকে নেওয়া জরুরি নয়। নিজের থেকে খরচ করে ফান্ড থেকে নেওয়া যাবে। তবে ফান্ডে টাকা না থাকলে তা রব্বুল মাল থেকে নিতে পারবে না। অবশ্য ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য, পণ্য পরিবহন খরচ এগুলো ফান্ডে টাকা না থাকলেও রব্বুল মাল দিতে বাধ্য থাকবে।[২]
- নিজে শহরে ফিরে আসার পর পরিতোষণ অবশিষ্ট থেকে গেলে সেটা ফান্ডে ফেরত দেবে।
- খরচে অপব্যয় করলে বা ন্যায়সঙ্গত পরিমাণের অতিরিক্ত খরচ করলে অতিরিক্ত খরচ মুদারিব বহন করবে। যেমন—ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক হোটেলে না থেকে ফাইভ স্টার হোটেলে থেকেছে। তাহলে অতিরিক্ত খরচ সে নিজে বহন করবে।

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪

২ প্রাগুক্ত।

প্রকাশ থাকে যে, ওপরে যেসব খরচ নেওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে যদি পুঁজিদাতাদের অনুমোদন থাকে অথবা ব্যবসায়িক সুদৃঢ় রীতি থাকে, তাহলে ন্যায্য পরিমাণ নেওয়া যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভাবে খেয়ানত না হয়। এ আলোচনার উদ্দেশ্য এটি বোঝানো যে, বিষয়টি স্পর্শকাতর। সামান্যতম এদিক-সেদিক হলে সেটি খেয়ানত বলে গণ্য হবে। এ জন্য ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, Six Pillars of Mudaraba নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা সম্পন্ন হলো। এবার প্রাসঙ্গিক আরো কিছু জরুরি বিষয়ে আলোচনা করব।

১. ১৪. ফাসিদ (Void) মুদারাবার বিধান

প্রথমেই জানা উচিত, মুদারাবা ফাসিদ হয় কী কী কারণে। মুদারাবা ফাসিদ হওয়ার মৌলিক কারণ হলো—

- মুনাফা নির্ধারণের হার অস্পষ্ট থাকা বা অজ্ঞাত থাকা।
- মুদারিবের নিকট রব্বুল মালের পাওনাকেই পুঁজি হিসাবে নির্ধারণ করা।
- সুনির্দিষ্ট অংকে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা
- রব্বুল মাল ব্যবসায়িক কাজের শর্তারোপ করা
- মূলধন অর্পণ না করা।
- রব্বুল মাল কর্তৃক প্রদেয় শর্তের বরখেলাফ করা।

বিধান

এসব ক্ষেত্রে মুদারিব আর মুদারিব থাকবে না। সে শ্রমিকের পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং ব্যবসায় মুনাফা হলে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে, যা পূর্ব নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি হবে না। আর যদি কোনো মুনাফা না হয়

তবে কিছুই পাবে না।[1] আর কোনো ধরনের পরিতোষণ পাবে না।

১. ১৫. মুদারাবা নিঃশেষ করা

এ ব্যাপারে শরীয়াহ মূলনীতি হলো—

- মুদারাবা চুক্তি মূলত 'অনিবার্য চুক্তি নয়' (العقد غير اللازم)। তাই এক পক্ষীয়ভাবে তা রহিত করা বা নিঃশেষ করা যায়। তবে নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে এককভাবে তা রহিত করা যাবে না। যথা—

ক. মুদারিব কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে তা নিয়ম অনুযায়ী নিঃশেষ করার পূর্ব পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে যাবে।

খ. উভয় পক্ষ যখন কোনো সময়সীমার ওপর একমত হয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তখন নির্ধারিত সময়ের আগে এককভাবে তা রহিত করা যাবে না।[2]

- মুদারাবার পণ্য সব শেষ হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলেও মুদারাবা চুক্তি শেষ হয়ে যাবে।
- মুদারিব রব্বুল মালের ইন্তেকালের মাধ্যমেও মুদারাবা চুক্তি শেষ হয়ে যাবে।
- যদি কোনো সময় বেধে দেওয়া হয় যে, ওই সময়ের পর মুদারাবা চুক্তি নিজ থেকেই রহিত হয়ে যাবে। এমনটি বৈধ হবে কি না তা মতভেদপূর্ণ। হানাফী ও হাম্বলী ফিকহের দৃষ্টিতে বৈধ। যেমন বলল, এ কারবার এক বছর চলবে। এক বছর পর তা বিনা নোটিশে বন্ধ হয়ে যাবে। অপরদিকে মালেকী ও শাফেয়ী ফিকহ্ অনুযায়ী তা করা যাবে না।

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ৪, পৃ. ৩৬২

২ এ্যাওফি, স. ১৩, ধ. ৪/৩

১. ১৫. ১. মুদারাবা নিঃশেষ প্রক্রিয়া

যেসব ক্ষেত্রে পণ্য আছে, সেক্ষেত্রে মুদারাবা নিঃশেষ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ—

১. ১৫. ১. ১. বাস্তব নগদায়ন (Liquidation)

এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত যে, মুদারাবা কারবারকে নগদায়ন ব্যতীত (Liquidation) মুনাফা বণ্টন সম্ভব নয়। নিঃশেষ করাও সম্ভব নয়। কারণ, মুদারাবার মধ্যে সমস্ত পুঁজি কেবল রব্বুল মালের। তাতে মুদারিবের কোনো অংশ থাকে না। সুতরাং বাস্তব অর্থে পণ্য বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হবে। মালামাল বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তাতে প্রথমে রব্বুল মালের অধিকার সাব্যস্ত হবে। সে তার মূলধন পরিমাণ অর্থ ফেরত নেবে। তারপর যদি কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে এবং পুঁজিদাতা ও কারবারির মাঝে পূর্ব নির্ধারিত হারে বণ্টন হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এভাবে বাস্তব মুদ্রায়ন খুব একটা হয় না। বরং করা সম্ভব হয় না। বিশেষত বড় পরিসরের ব্যবসায় এমনটি মোটেও সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান Constructive Liquidation।

১. ১৫. ১. ২. বিধানগত মুদ্রায়ন (Constructive Liquidation)

এর মর্ম হলো, যখন চূড়ান্ত বণ্টন উদ্দেশ্য হয়, তখন প্রথমে সমস্ত পণ্যের বাজার মূল্য বের করা হবে। এরপর ধরে নেওয়া হবে ওই মূল্যে সমস্ত পণ্য বিক্রি হয়ে গেছে। উক্ত মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ব্যবসার সমুদয় মূলধন, লাভ-লোকসান হিসাব করবে। অর্থাৎ, যেসব মালামাল নগদায়ন হয়নি সেগুলো পুঁজিদাতা বা মুদারিব যে কোনো একজন নিয়ে নিবে। এরপর এর মূল্য নিজের প্রাপ্তাংশ থেকে বিয়োগ করা হবে। একটি উদাহরণ পেশ করা হলো—

ধরা যাক, খালেদ ওমরকে ১০০ টাকা দিয়েছে মুদারাবার জন্য। চূড়ান্ত বণ্টনের সময় দেখা গেল কিছু অংশ নগদ ক্যাশ। কিছু অংশ পণ্য আকারে আছে। ধরা যাক, মুনাফা বণ্টনকালে ৭৫ টাকা নগদ। আর

কিছু পণ্য আছে, যার মার্কেট ভ্যালু ৭৫ টাকা। মোট ১৫০। এবার খালেদ এই ৭৫ টাকার পণ্য নিয়ে নিবে।

এখন আমরা বলতে পারি, ব্যবসার সকল সম্পদ নগদ অর্থে পরিণত হয়ে গেছে। এখন টাকা দাঁড়াল ১৫০ টাকা। একশ হলো মূলধন। বাকি ৫০ হলো মুনাফা। এখান থেকে মূলধন বাবদ খালেদের হাতে চলে যাবে ১০০।

বাকি থাকবে ৫০। এই ৫০ থেকে মুনাফা বাবদ খালেদ পাবে ২৫। উমর পাবে ২৫ টাকা। তাহলে দেখা গেল খালেদের মোট পাওনা ১২৫ টাকা। সুতরাং এই ১২৫ থেকে ৭৫ কেটে দেওয়া হবে তার ক্রয়কৃত মূল্যবাবদ। সুতরাং তাকে দেওয়া হবে বাকি ৫০। অপরদিকে ওমর পেত ২৫। তা তাকে দেওয়া হবে।

মোটকথা, ৭৫ ছিল নগদ অর্থ। এখান থেকে ৫০ গেল খালেদের হাতে আর ২৫ গেল উমরের হাতে। পণ্যসামগ্রী যা ছিল সব চলে গেল একচ্ছত্রভাবে খালেদের মালিকানায়।

এ্যাওফির মুদারাবাসংক্রান্ত ১৩ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৮/৮এ— এভাবে মুদারাবা নিঃশেষকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ছকটি দেখুন :

মুদারিব : উমর	পুঁজি : ১০০	রাব্বুল মাল : খালেদ
	ব্যবসা করার পর যা হলো : ১৫০ (নগদ : ৭৫, পণ্যমূল্য : ৭৫)	
তার প্রাপ্তি : ২৫	লাভ : ৫০	তার প্রাপ্তি : মূল ১০০ + ২৫ = ১২৫

তাকে দেওয়া হবে : অবশিষ্ট ২৫		তাকে যা দেওয়া হবে : ৭৫ মূল্যবাবদ কাটা হবে। নগদ পাবে ৫০। মোট : ১২৫
সর্বমোট : ১৫০		

প্রকাশ থাকে যে, Constructive Liquidation এভাবেও হতে পারে যে, যে সম্পদ এখনো পণ্য আকারে আছে সেগুলো মুদারিব নিয়ে নিবে। যেমন, পূর্বোক্ত উদাহরণে, নগদ অর্থ ছিল ৭৫ টাকা। আর মুদারিবের অংশ ছিল ২৫ টাকা। আর পণ্য ছিল ৭৫ টাকার। এখন মুদারিব কেবল ৫০ টাকা দিয়ে সকল পণ্য ক্রয় করে নিবে। (বাকি ২৫ টাকা মুনাফা বাবদ না নিয়ে তা পণ্যমূল্য বাবদ কেটে দিবে) এভাবে রব্বুল মাল ৭৫+৫০=১২৫ পেয়ে যাবে।

১. ১৬. মুদারাবার কিছু আধুনিক প্রয়োগ

পূর্বোক্ত নীতিমালার আলোকে আধুনিক ইসলামি ফিন্যান্সের বিভিন্ন সেক্টরে 'মুদারাবা চুক্তি' প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এর আধুনিক কিছু প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো—

১. ১৬. ১. মুদারাবা মুনতাহিয়া বিত তামলিক (M. M. T.)

এটি একটি আধুনিক মুদারাবা প্রোডাক্ট। এর রূপরেখা হলো, গ্রাহকের ক্ষুদ্র কোনো বিনিয়োগ প্রয়োজন। যেমন—মুদি দোকান দেবে, কাপড়ের ব্যবসা করবে ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহককে রব্বুল মাল হিসেবে মূলধন যোগান দিতে পারে। এর সাথে আরেকটি স্বতন্ত্র ওয়াদা চুক্তি হবে এই যে, ক্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠানের মালামালগুলো ক্রয় করে নেবে। এটি একবারেও হতে পারে অথবা HPSM- এর মতো পিরিয়ড-ভিত্তিকও হতে পারে। যখন ক্রয়-বিক্রয় হবে, তখন তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পেপারে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে হবে। এ প্রোডাক্ট ব্যবহারের

মাধ্যমে মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্স করা যায়। সুদভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের একটি উত্তম বিকল্প ব্যবহার হতে পারে। পাশাপাশি এটি মুদারাবার ঝুঁকিকেওহ্রাস করে দেয়।

মুদারাবায় ঝুঁকিহ্রাস

- রব্বুল মাল মুদারিব থেকে প্রথমেই আর্থিক কোনো সিকিউরিটি নিয়ে রাখতে পারে। যদি ভবিষ্যতে তার পক্ষ থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত হয়, তবে সেখান থেকে তা কেটে রাখা হবে।[১]

- মুদারাবায় প্রফিট অর্জন ও সততা বৃদ্ধির জন্য এভাবে প্রফিট রেশিও নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, নির্ধারিত পরিমাণ প্রফিটের অধিক মুনাফা হলে সেটা ব্যবসায়ীর হবে। এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড একে অনুমোদন করেছে।[২]

- রপ্তানি বাণিজ্যে মুদারাবা প্রয়োগ তুলনামূলক ঝুঁকিমুক্ত। এতে গ্রাহক পূর্ব থেকে প্রস্তুত। এভাবে যেখানে ব্যবসার সেক্টর স্পষ্ট, সেখানে সহজেই মুদারাবা প্রয়োগ করা যায়।

১. ১৬. ২. মুদারাবায় Undertaking

ধরা যাক, সিদ্ধান্ত হলো, এক বছর মেয়াদি বা দুই বছর মেয়াদি মুদারাবা চুক্তি হবে; কিন্তু সমস্যা হলো, গ্রাহক বা রব্বুল মাল বছরের মাঝেই টাকা তুলে নিতে চায়। এতে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর থেকে উত্তরণের একটি উপায় হলো, চুক্তির শুরুতেই স্বতন্ত্রভাবে রব্বুল মাল থেকে এক তরফা ওয়াদা নিয়ে নেওয়া যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে মূলধন উঠিয়ে নিলে এ পরিমাণ টাকা চ্যারিটি ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে। এভাবে এ সমস্যা নিরসন করা যায়।

---

১ এ্যাওফি স. ১৩, ধ. ৬

২ এ্যাওফি স. ১৩, ধ. ৮/৫

১. ১৭. এ্যাওফি শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড থেকে মুদারাবা

এ্যাওফি এ বিষয়ে স্বতন্ত্র শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড রচনা করেছে। স্ট্যান্ডার্ড নং : ১৩। আমাদের উক্ত আলোচনায় এ্যাওফির উক্ত স্ট্যান্ডার্ড থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

মুশারাকা

প্রাথমিক কথা

'মুশারাকা' ইসলামিক ফিন্যান্সে একটি আলোচিত মডিউল। প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে মুশারাকা একটি উত্তম পদ্ধতি। আদর্শ ইসলামিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনেক। অথচ দুঃখজনক হলো বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ব্যবহারের হার হতাশাজনক। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২১ ইং. (অক্টোবর-ডিসেম্বর)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এ খাতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যবহার মাত্র ০.৪৯%। অধিকাংশ বিনিয়োগ হয়ে থাকে মুরাবাহা, বাইয়ে মুআজ্জাল ভিত্তিতে। এতে মার্কেট ইকনোমিতে সুদের বিপরীতে আলাদা করে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এ ব্যাপারে জরুরি কিছু বিষয় আলোচনা করা হলো।

২. ১. মুশারাকা কী?

এটি অনেকটা মুদারাবার মতোই। মুদারবায় আমরা জেনেছি, মুদারিব বা ব্যবসায়ী কেবল শ্রম বিনিয়োগ করে। কোনো অর্থ নয়; কিন্তু মুদারিব যদি নিজেও ব্যবসায় নিজের থেকে পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাহলে মুদারাবার সাথে শিরকাতও তখন এক হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়াটিই 'মুশারাকা' হিসেবে পরিচিত। যেখানে মুদারাবা ও শিরকাত

একত্র হয়। যেমন, জামিল সাহেব কামাল সাহেবকে এক লক্ষ টাকা মুদারাবা বাবদ প্রদান করলেন। এরপর কামাল সাহেব নিজ থেকে উক্ত মুদারাবা ব্যবসায় আরো ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলেন। তাহলে এতে মুদারাবার সাথে শিরকাতও একত্র হয়ে গেল। একেই আধুনিক পরিভাষায় 'মুশারাকা' বলা হয়। কারণ, এতে উভয় দিক থেকে ব্যবসায় (মুনাফা ও পুঁজিতে) অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

'মুশারাকা' মূলত আরবী শব্দ। شارك-يشارك-مشاركة এর আভিধানিক অর্থ হলো, পরস্পর একে অপরের শরিক বা অংশীদার হওয়া।

২. ২. মুশারাকার তাৎপর্য

ক. দুদিক থেকে পুঁজি বিনিয়োগ হবে। যথা : এক. মুদারিব বা ব্যবসায়ী কর্তৃক পুঁজি বিনিয়োগ। দুই. রব্বুল মাল বা পুঁজিদাতা কর্তৃক পুঁজি বিনিয়োগ।

খ. ব্যবসায়ী একজন হতে পারে অথবা একাধিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করবে।

গ. ব্যবসায়ী কোম্পানি হতে পারে, সেক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবসায়ী কোম্পানির মূল মুদারিবের পক্ষে তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করবে।

ঘ. ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীদের পরস্পর পুঁজি বিনিয়োগ মূলত শিরকাতুল আকদ বা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব (এরপর শিরকাতুল আমওয়াল)। অপরদিকে মূল রব্বুল মাল বা পুঁজিদাতার সাথে ব্যবসায়ীর সম্পর্ক মুদারাবা চুক্তি।

ঙ. শিরকাতুল আমওয়াল ও মুদারাবার এভাবে যৌথ চুক্তিই মূলত মুশারাকা।

২. ৩. মুশারাকা ও শিরকাত

মুশারাকা ও শিরকাত বাহ্যত দুটি কাছাকাছি মনে হয়। তবে বাস্তবে দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে মৌলিক ৪টি পার্থক্য একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো :

ক্র. নং	শিরকাত	মুশারাকা
১	এটি ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত একটি প্রাচীন অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা।	একটি আধুনিক অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা।
২	শিরকাত ব্যাপক। তাতে সকল প্রকার শিরকাত অন্তর্ভুক্ত।	এটি সীমিত। এখানে কেবল শিরকাতুল আমওয়াল পাওয়া যায়।
৩	উভয় অংশীদার পুঁজি বিনিয়োগের পাশাপাশি ব্যবসায়িক কাজেও অংশগ্রহণ করতে পারে।	পুঁজি উভয়ের; কিন্তু ব্যবসায়িক কাজ কেবল মুদারিব করবে।
৪	এখানে মুদারাবা চুক্তি নেই।	এখানে মুদারাবা চুক্তিও আছে।
৫	শিরকাতে মুনাফা বণ্টন হয় একবারে।	এখানে দু দফায় মুনাফা বণ্টন হয়।

২. ৪. মুশারাকার বৈধতা

মুশারাকা যদিও ফিকহের প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে শুধু এ কারণে কোনো কারবার নাজায়েয হতে পারে না। বরং দেখতে হবে এ সংক্রান্ত শরীয়াহ কোনো নীতিমালার যেন পরিপন্থী না হয়। আধুনিক যুগের ফকীহগণ দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, এর শর্তাবলি শরীয়াহ নীতিমালার পরিপন্থী নয়।

সহিহ হাদীসে এসেছে, المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

'মুসলমানদের যাবতীয় বিষয় তাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আরোপিত শর্ত অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তবে সে শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম করে বা হারামকে হালাল করে।'[১]

১ সুনানে আবু দাউদ, ৩৫৯৪

আধুনিক যুগের ফকীহগণ বলেছেন, মুশারাকার কোনো শর্ত এমন নয়, যা হারামকে হালাল করে বা হালালকে হারাম করে। সুতরাং তা মৌলিকভাবে বৈধ।

২. ৫. মুশারাকা ও সুদ

'মুশারাকা' সুদভিত্তিক ফাইন্যান্সিং এর একটি আদর্শিক বিকল্প ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন হয়। মুশারাকা কীভাবে সুদের বিরুদ্ধে কাজ করে তা সংক্ষেপে নিম্নের একটি ছকে দেখানো হলো :[১]

ক্র. নং	সুদ	মুশারাকা
১.	সুদভিত্তিক ফাইন্যান্সে ঋণের ওপর অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ পূর্বেই ধার্য করা হয়। ঋণগ্রহীতার লাভ হোক বা লোকসান হোক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না।	মুশারাকায় পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ পূর্বে ধার্য করা হয় না; বরং প্রকৃত মুনাফার পর তা সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য হয়।
২.	সুদী কারবারে বিনিয়োগকারী কোনো অবস্থাতেই লোকসানের দায়িত্ব বহন করে না।	মুশারাকায় বিনিয়োগকারীর লোকসানও হতে পারে।
৩.	সুদে Distribution of Wealth ইনসাফের সাথে হয় না।	মুশারাকায় Distribution of Wealth ইনসাফের সাথে হয়।
৪.	এটি শরীয়তসম্মত নয়।	এটি শরীয়তসম্মত।

১ এ ছাড়াও সুদ ও মুদারাবা-মুশারাকায় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেন সুদের চেয়ে মুশারাকা-মুদারাবা কল্যাণকর—এ বিষয়ে আমাদের মুরাবাহা গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদেরকে সেখান থেকে এ আলোচনাটি পড়ে নেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২. ৬. মুশারাকায় মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা

মুশারাকায় মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো লক্ষণীয় :

১. মুনাফার হার শুরুতে মূল চুক্তিতেই নির্ধারণ করে নিতে হবে।

২. সুনির্দিষ্ট অংকে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না।

৩. মুনাফার ভাগ হবে মোট দুটি। একটি মুদারিব বা ব্যবসায়ীর জন্য। এতে তার দুটি অংশ আছে, মুদারিব হিসাবে ও পুঁজিতে অংশীদার হিসেবে। আর দ্বিতীয় ভাগ পাবে রব্বুল মাল।

৪. মুদারিবের জন্য মুদারিব হিসেবে মুনাফার যে অংশ নির্ধারণ করা হবে তাতে উভয়ে স্বাধীন। যেকোনো হারে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে। মুদারিবের মুনাফার হার রব্বুল মালের মুনাফার হারের চেয়ে কমও হতে পারে। তবে মুনাফার যে অংশটি পার্টনার বা শরিক হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, তাতে পূর্বে উল্লেখকৃত শিরকতের মুনাফা বণ্টনের সকল নীতি প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, শিরকাতের অংশেও কেবল মুদারিব ব্যবসায়িক শ্রম দেবে। রব্বুল মাল কোনো শ্রম দেবে না। তাহলে সেক্ষেত্রে রব্বুল মাল Sleeping Partner[১] হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই মুদারিবের জন্য মুনাফার হার তার প্রদত্ত পুঁজির চেয়ে কম নির্ধারণ করা যাবে না। অথবা বলুন, রব্বুল মালের জন্য তার প্রদত্ত পুঁজির হারের চেয়ে অধিক মুনাফার হার নির্ধারণ করা যাবে না।

যেমন পূর্বোক্ত উদাহরণে জামিল সাহেব এক লক্ষ টাকা মুদারাবা হিসাবে কামাল সাহেবকে প্রদান করেছেন। এরপর মুদারিব কামাল সাহেব জামিল সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষে তাতে নিজ থেকে ৫০ হাজার টাকা পুঁজি হিসাবে যোগ করেছেন। তাহলে মোট পুঁজি দাঁড়াল,

---

১ স্লিপিং পার্টনার বলতে বোঝানো হয়, মূল চুক্তিতে ব্যবসায়িক কাজ না করার শর্তারোপ করা। যদি মূল চুক্তিতে এমন শর্তারোপ না করা হয় তবে বাস্তবে সে কোনো কারণে কাজ না করলেও তার ওপর স্লিপিং পার্টনারের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তদ্রূপ এমন শর্তারোপের পর কাজ করলেও তাকে স্লিপিং পার্টনার বলা হবে। বোঝা গেল, এখানে চুক্তিতে শর্তারোপ করা না করাটা মূল। বাস্তবে কাজ করা না করা নয়।

দেড় লক্ষ টাকা। এর এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি কামাল সাহেবের। আর দুই-তৃতীয়াংশ পুঁজি জামিল সাহেবের।

সুতরাং জামিল সাহেবের দুই-তৃতীয়াংশ পুঁজিতে কামাল সাহেব মুদারিব। তাই এ অংশে উভয়ের সম্মতিতে মুদারিব হিসাবে তার জন্য মুনাফার যেকোনো হার নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি যা কামাল সাহেব বিনিয়োগ করেছেন তাতে কামাল সাহেবের মুনাফার হার প্রদত্ত পুঁজির হারের চেয়ে কম হতে পারবে না।

এখন উপরোল্লিখিত উদাহরণে যদি সিদ্ধান্ত হয়, কামাল সাহেব শরিক বা পার্টনার হিসাবে তাকে মুনাফার এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। আর অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ মুদারাবা ভিত্তিতে জামিল ও কামাল সাহেবদের মাঝে অর্ধার্ধি হারে বণ্টন হবে। তাহলে ব্যবসায় যদি ১৫০,০০০/- মুনাফা হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ তথা ৫০,০০০/- কামাল সাহেব পাবেন অংশীদার (শরিক) হিসাবে। আর বাকি দুই-তৃতীয়াংশ তথা ১০০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- পাবে মুদারিব হিসাবে। অবশিষ্ট ৫০,০০০/- পাবেন জামিল সাহেব রব্বুল মাল হিসাবে। নিম্নের ছক থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় :

<table>
<tr><td>জামিল সাহেব</td><td colspan="2">কামাল সাহেব</td><td>মোট পুঁজি</td></tr>
<tr><td>১০০,০০০/-</td><td colspan="2">৫০,০০০/-</td><td>১৫০,০০০/-</td></tr>
<tr><td colspan="4">মুনাফা বণ্টন
↓</td></tr>
<tr><td>পুঁজিদাতা/রব্বুল মাল হিসাবে ৫০,০০০/-</td><td>শরিক হিসাবে ৫০,০০০/-</td><td>মুদারিব হিসাবে ৫০,০০০/-</td><td>মোট মুনাফা ১৫০,০০০/-</td></tr>
</table>

প্রকাশ থাকে যে, কোনো অংশীদারকে যদি প্রতি মাসে নির্ধারিত অংকের মুনাফা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে চুক্তিনামায় এ বিষয়টিও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, অংশীদারকে প্রদত্ত এ টাকা চুক্তির

মেয়াদান্তে সর্বশেষ যে হিসাব-নিকাশ করা হবে এর অধীনে থাকবে। অর্থাৎ যে কোনো অংশীদার যত টাকা নেবে তার সাথে Payment of Account-এর হিসাব-নিকাশ করা হবে। এ টাকা চুক্তির মেয়াদান্তে উক্ত অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হবে। আর যদি ব্যবসায় আদৌ কোনো লাভই না হয় বা আশাতীত লাভের তুলনায় কম হয়, তাহলে উক্ত অংশীদার যে পরিমাণ টাকা নিয়েছিল তা ফেরত দিতে হবে।

১. পুঁজিদাতা তথা রব্বুল মালও যদি ব্যবসায়িক কাজে অংশগ্রহণে একমত হয়, তবে তার মুনাফার হারও যে কোনো হারে হতে পারে। কারণ, তখন সে আর স্লিপিং পার্টনার নয়।

২. প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের হার প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে। তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির ভিত্তিতে মুনাফার হার নির্ধারণ করা যাবে না।

২. ৭. মুশারাকায় লোকসান বহনের নীতিমালা

১. মুশারাকাসহ সকল শিরকাত চুক্তির ব্যাপারে ইসলামী ফিকহে স্বীকৃত মূলনীতি হলো, লোকসান সর্বদা প্রত্যেক শরিক বা পার্টনার তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনুপাতে বহন করবে। এর কমবেশি নয়।

২. মুশারাকায় কোনো এক পক্ষ যদি লোকসান বহন না করার শর্ত করে অথবা নির্ধারিত সীমিত পরিমাণ লোকসান বহনের শর্তারোপ করে তবে তা বৈধ হবে না।

৩. লোকসান হলে প্রথমে তা মুনাফা থেকে কর্তন করা হবে। তাতেও লোকসান শেষ না হলে, তখন প্রত্যেক শরিক তাদের পুঁজি অনুপাতে তা বহন করবে।

২. ৮. আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মুশারাকার প্রয়োগ

আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুশারাকা ব্যবহার করা যায়। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো—

২. ৮. ১. প্রজেক্ট ফাইন্যান্স (Project Financing)

বড় ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে বাংলায় বলে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন'। আরবীতে বলে تمويل التشريع (তামবিলুত তাশরীয়ী)। আর ইংরেজিতে বলে Project Financing।

একজন পুঁজিপতি যদি গোটা প্রকল্পে নিজের একক পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে সে মুদারাবা পদ্ধতি অবলম্বন করবে। আর কয়েক পুঁজিপতি মিলে করতে চাইলে তা হবে শিরকাত। যদি উভয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে আর ব্যবসায়িক কাজকর্ম একজন বহন করে, তবে তা হবে মুদারাবা-মুশারাকা সমন্বিত রূপ। আধুনিক ভাষায় যাকে বলে 'মুশারাকা'।

প্রজেক্ট ফাইন্যান্স এর জন্য মুশারাকা ব্যবহার করা যায়। কখনো যদি কোনো অংশীদার মুশারাকা থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তাহলে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছুক অংশীদারের অংশটুকু ন্যায্য মূল্যে অন্য অংশীদার ক্রয় করে নেবে। এভাবে সে বের হতে পারবে, কারবারও চালু থাকবে। বের হওয়ার সময় পর্যন্ত কোনো মুনাফা হয়ে থাকলে সেটার কিছু অংশও পাবে।

অথবা বের হতে ইচ্ছুক শরিকের অংশটুকু তৃতীয় কারো কাছে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদি উক্ত মুশারাকার বিশেষ কোনো সনদপত্র থাকে, তাহলে তা সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করে দিয়েও মুশারাকা থেকে বের হওয়া যাবে। এমতাবস্থায় সনদ খরিদকারী প্রাক্তন শরিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

২. ৮. ২. মুশারাকা বন্ড/সিকিউরিটিজ (Securitization of Musharaka)

কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ প্রজেক্ট বড় হলে মোটা অংকের ইনভেস্টের প্রয়োজন হয়। যা ব্যক্তি বিশেষের বিনিয়োগ দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ফান্ডের জন্য সাধারণত যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হলো :

ক. কোম্পানি উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাগণ কর্তৃক পুঁজি বিনিয়োগ।

খ. শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে জনগণ থেকে পুঁজি সরবরাহ করা।

গ. ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা।

ঘ. জনসাধারণ থেকে শেয়ার নেওয়ার পরিবর্তে তাদের থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করা হয়। কোম্পানি এ উদ্দেশ্যে বন্ড (Bonds), ডিবেঞ্চার (Debentures) ইস্যু করে থাকে।

এর নানা শরীয়তসম্মত বিকল্প পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো **'মুশারাকা সার্টিফিকেট'**। এর সারমর্ম হলো :

- পূর্বে আমরা শিরকাতুল আমওয়াল নিয়ে আলোচনা করেছি। যার অর্থ হলো, দুই বা ততোধিক শরিক নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করে সম্মিলিতভাবে ব্যবসা করা। ব্যবসায় যা মুনাফা হবে, তা সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হারে পরস্পর বণ্টন করে নেবে। মুশারাকা সার্টিফিকেটেও এমনটিই হয়ে থাকে। এখানে কোম্পানি জনসাধারণ থেকে পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে। জনগণও পুঁজিদাতা। কোম্পানিও পুঁজিদাতা। তবে ব্যবসায়িক কাজ করবে কেবল কোম্পানি।

- ব্যবসায় যা মুনাফা হবে তা নির্ধারিত হারে বণ্টন করা হয়।

- বন্ডের ন্যায় মুশারাকাহ সার্টিফিকেটও সংশ্লিষ্ট বাহক যখন-তখন সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করে নিজের পুঁজি উসুল করতে পারবে। **(কমবেশি দামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'ঋণ বিক্রয়' সংক্রান্ত শরীয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে)** শেয়ারের ন্যায় এটিও কোম্পানির মালামালে অংশীদারত্বের প্রমাণ বহন করে। তবে এ সার্টিফিকেট প্রকৃতপক্ষে না বন্ড, না শেয়ার। নিম্নে পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো।

২. ৮. ৩. মুশারাকা সার্টিফিকেট বনাম বন্ড ও শেয়ার

মুশারাকা সার্টিফিকেট মূলত কোম্পানি ও বাহকের মাঝে সম্পাদিত একটি অংশীদারিত্ব চুক্তির প্রমাণপত্র। অপরদিকে বন্ড হলো সুদভিত্তিক ঋণের চুক্তিপত্রের প্রমাণ। শিরকাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তাই বন্ডের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অপরদিকে শিরকাতভিত্তিক মুশারাকা সার্টিফিকেট বৈধ।

আর শেয়ার সার্টিফিকেটের মতো মুশারাকা সার্টিফিকেটও শিরকতের এক প্রকার লিখিত সনদপত্র। অর্থাৎ উভয় প্রকার সার্টিফিকেটধারীর মাঝে ও কোম্পানির মাঝে শিরকতের (শিরকাতুল আমওয়াল) চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। মূল শরঈ প্রকারান্তরে (Classification) কোনো তফাত নেই। তবে বাস্তব কার্যক্রমে কিছু বিষয়ে মুশারাকা সার্টিফিকেট ও শেয়ার সার্টিফিকেটের মাঝে তফাত রয়েছে। তা হলো :

ক. বার্ষিক সম্মেলনে (AGM) এ শেয়ার সার্টিফিকেটধারীদের মতামতদানের (VOTING) অধিকার থাকে; কিন্তু মুশারাকা সার্টিফিকেটধারীদের এ সুযোগ থাকে না।

খ. শেয়ার সার্টিফিকেটের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরি হয় না। তবে মুশারাকা সার্টিফিকেট সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্যই হয়ে থাকে।

গ. মুশারাকা সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির বিশেষ কোনো প্রজেক্ট বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে শেয়ার সার্টিফিকেট দ্বারা সাধারণত গোটা কোম্পানির মধ্যে শিরকাত করা হয়ে থাকে।[১]

মুশারাকা সার্টিফিকেট ও সেকেন্ডারি মার্কেট

ব্যবসায় নগদ ক্যাশের পাশাপাশি এ্যাসেটও থাকলে সেক্ষেত্রে মুশারাকা বন্ড শেয়ারের মতো সেকেন্ডারি মার্কেটেও কমবেশি করে লেনদেন করা যাবে। তবে শর্ত হলো, প্রতিটি লটে আনুপাতিকহারে যে পরিমাণ ক্যাশ থাকবে, এর ফেইস ভ্যালু তার চেয়ে বেশি হতে হবে।

উদাহরণ : একশটি বন্ড। প্রত্যেকটির ফেইস ভ্যালু ১ লক্ষ টাকা। তাহলে পুরো সম্পদ এক কোটি টাকা। এখন যদি এই এক কোটি টাকা দিয়ে কোনো এ্যাসেট ক্রয় করা না হয়। তাহলে উক্ত বন্ড ফেইস ভ্যালুর

---

১ الدكتورفيصل محمد، أسهم الشركات، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، الجزء الثاني, العدد السادس، ص١٥٠٣، شركت ومضاربت عصرحاضرمين، للدكتورعمران أشرف عثماني، الباب الخامس حول سندات المشاركة.

চেয়ে কমবেশি করে বিক্রি করা যাবে না। তবে এ্যাসেটও যদি থাকে। তাহলে অধিক মূল্যে লেনদেন করা যাবে। তবে শর্ত হলো, মূল্যটা তরল সম্পদের বেশি হতে হবে। যেমন—একটি মুশারাকা প্রজেক্টের এ্যাসেট ৪০%। আর ক্যাশ হলো ৬০%। তাহলে একশ টাকা মূল্যের বন্ড ৬০-এর অধিক যত খুশি বিক্রি করা যাবে। তবে ৬০ বা এর কমে না হতে হবে।

অন্যদের মতে, এ্যাসেট ৫০% এর বেশি হতে হবে। তবেই অধিক মূল্যে লেনদেন করা যাবে। (পুঁজিবাজার বিষয়ক আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ)

২. ৮. ৪. এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট বিজনেসে মুশারাকার ব্যবহার

এক্ষেত্রে দুভাবে মুশারাকা-মুদারাবা বিনিয়োগ পলিসি ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা :

ক. জিরো মার্জিন এল.সি.। ইমপোর্টার কেবল মাল কিনে বিক্রি করে ব্যবসা করবে। এক্ষেত্রে মুদারাবা ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. মার্জিন এল.সি.। এক্ষেত্রে মুশারাকা করা যেতে পারে।

তদ্রূপ এক্সপোর্ট বিজনেসের ক্ষেত্রে মাল তৈরি ও বিক্রয়ের জন্য রপ্তানিকারকও যদি কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে, তবে তাতে মুশারাকা বিনিয়োগ পলিসি প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর না হয় মুদারাবা পলিসি প্রয়োগ হবে। (এ বিষয়ে পূর্বে সুদের প্রয়োগ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)

২. ৮. ৫. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (Financing of the working capital)

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সময় চলমান কারবারের খরচাদি যেমন, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, ইলেক্ট্রিসিটি বিল, কাঁচামাল ক্রয়, মেশিন ক্রয় ইত্যাদি চলমান খরচ মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

কনভেনশনাল সিস্টেমে উক্ত খরচ মেটানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ

করা হয়। চলমান কারবারের উক্ত প্রার্থিত ঋণ বা পুঁজিকে ইংরেজিতে বলা হয় Working Capital। আর আরবীতে বলে رأس المال العامل আর উক্ত খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করাকে বলা হয় Working Capital Financing আরবীতে বলে تمويل رأس المال العامل। এক্ষেত্রে সুদী ঋণের পরিবর্তে উক্ত খাতে মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এর রূপরেখা নিম্নরূপ :

প্রথমে পারস্পরিক সম্মতিতে চলমান কারবারের সকল ব্যবসায়িক পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এটাই হবে বিনিয়োগ গ্রহীতার পুঁজি। পূর্বে শিরকতের প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে, ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী শিরকতের মূলধন ক্যাশ হওয়া জরুরি নয়; বরং দ্রব্যও মূল্যমান নির্ধারণ পূর্বক শিরকতের মূলধন হতে পারে। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ.-ও বর্তমান প্রয়োজনের কারণে মালেকী মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।[১]

আর নগদ টাকা দেবে মুশারাকা বিনিয়োগ-দাতা। উভয়ে মুনাফার একটা হারও নির্ধারণ করে নেবে। তবে শর্ত হলো, বিনিয়োগদাতার মুনাফার হার প্রদেয় পুঁজি থেকে বেশি না হতে হবে।

কারণ, সে স্লিপিং পার্টনার। কারবার সমাপ্তিকালে কারবারের সমুদয় সম্পদ পুনরায় হিসাব করে মূল্যমান বের করা হবে। এতে যে মুনাফা বের হবে তা পূর্ব নির্ধারিত হারে বণ্টন করা হবে।

অথবা এভাবেও মুনাফা বণ্টন হতে পারে যে, কারবার শেষে ব্যবসার সক্রিয় অংশীদার ব্যক্তি (মুশারাকা বিনিয়োগ গ্রহীতা) পুঁজিদাতার বিনিয়োগকৃত অংশ কিনে নেবে এবং হিসাব-কিতাব ও মুদ্রায়নের আধুনিক পদ্ধতির (Valuation) মাধ্যমে ওই অংশের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। অতঃপর এ হিসাব অনুযায়ী উভয়ের মাঝে মুনাফা বণ্টন হবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

১ ইমদাদুল ফাতাওয়া, প্রকাশক : মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, খ. ৩, পৃ. ৪৯৫, শিরকাত অধ্যায়; শিরকাত ও মুদারাবাত আসরে হাযের মেঁ, ড. ইমরান আশরাফ উসমানী, পৃ. ২৫৪

উদাহরণ

উমরের একটি কোম্পানি আছে। কোম্পানির পুরো সম্পদের পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা। তার সাথে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মুশারাকা ফাইন্যান্স বাবদ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা জনাব বকর আরো ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। মোট হলো ৫০ লক্ষ টাকা। বিষয়টি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, উমরের সম্পদ ছিল ৩০ ইউনিট। আর বকর দিল আরো অতিরিক্ত ২০ ইউনিট। মোট পরিমাণ দাঁড়াল ৫০ ইউনিট।

শতকরায় এর বহিঃপ্রকাশ হলো, উমরের বিনিয়োগ হলো ৬০%। আর বকরের বিনিয়োগ হলো ৪০%।

মুনাফা বণ্টনে সিদ্ধান্ত হলো, বকর বাস্তব মুনাফার ২০% পাবে। বাকি ৮০% মুনাফা নেবে উমর।

বিনিয়োগের সময়সীমা শেষে দেখা গেল, সম্পদের মোট পরিমাণ ১০০ ইউনিটে উপনীত হয়েছে। এমতাবস্থায় উমর তার ব্যবসা চালু রাখতে চায়। আর বকর বের হয়ে যেতে চায়। এর সমাধান হলো, উমর বকরের অংশ তথা ৪০% ইউনিট ক্রয় করে তাকে এর মূল্য পরিশোধ করে দেবে।

আর মুনাফা পূর্বচুক্তি অনুযায়ী ২০% ও ৮০% এ বণ্টন হবে। এর অর্থ হলো, বকর পাবে ১০% মুনাফা। কারণ, ৫০ ইউনিট মুনাফার ২০% হলো ১০%। এই ১০% তার পূর্বের ২০ ইউনিটের সাথে যুক্ত হবে। মোট হবে ৩০ ইউনিট।

লোকসান হলেও উক্ত ৪০% ও ৬০% এর আনুপাতিক হারে তা বহন করতে হবে। ধরা যাক, ১০ ইউনিট কমে গেল। তাহলে ৪ ইউনিটের লোকসান বকর বহন করবে। কারণ, ৪ হলো ১০ এর ৪০%। এ চার তার বিশ থেকে কমবে। থাকবে : ১৬ ইউনিট। নিম্নের ছকটি দেখুন—

বকর : মূল বিনিয়োগ ২০ ইউনিট (৪০%। আর মুনাফার হার : ২০%)	মূল প্রজেক্ট	উমর : মূল বিনিয়োগ ৩০ ইউনিট (৬০%। মুনাফার হার : ৮০%)

	মূল ইউনিট : ৫০	
মুনাফা বণ্টন : ১০(২০%)+ তার মূল অংশ ২০ ইউনিট। মোট ৩০ ইউনিট।	মুনাফা হলো : ৫০ ইউনিট। সর্বমোট=১০০ ইউনিট।	৪০(৮০%)+তার মূল অংশ : ৩০ ইউনিট। মোট ৭০ ইউনিট।
সর্বমোট : ৩০	=১০০	সর্বমোট : ৭০

২. ৯. মুশারাকার মাধ্যমে Gross Profit-এ অংশীদার

Fixed Assets যদি বেশি হয় তাহলে পূর্বোক্ত পন্থায় মুশারাকার মাধ্যমে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে সমাধা করা মুশকিল। কারণ, সবগুলো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সহজ কথা নয়। সময়ে সময়ে তা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এ নিয়ে মতানৈক্যও হতে পারে। একাউন্টিং প্রবলেম হতে পারে। এর একটি সমাধান হলো, শুরুতেই এ চুক্তি করে নেওয়া যেতে পারে যে, শরিকদ্বয় Net Profit এর পরিবর্তে Gross Profit-এ অংশীদার হবে।

এর ব্যাখ্যা হলো, যেসব ব্যয় সরাসরি পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন, স্টাফ, বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদি। এসব বিনিয়োগ গ্রহীতা বহন করবে। আর যেসব খরচ সরাসরি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত, কেবল সেগুলোর মূল্য ধরা হবে। যেমন, কাঁচামাল। সরাসরি পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত স্টাফ। বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে তার মুনাফার হার বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ, একটি ফ্যাক্টরি। তার একটি বিল্ডিং আছে। এর মূল্যমান ২২ লক্ষ টাকা। মেশিনারিজ হলো, ২ লক্ষ। মাসিক স্টাফ বেতন ৫০ হাজার। ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ একটা ব্যাংক থেকে মুশারাকার ভিত্তিতে এক বছর মেয়াদি ৫০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে। এর অর্থ হলো, এক বছর পর মুশারাকা শেষ হয়ে যাবে। তখন যা লাভ হবে তা চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে। মুনাফা নির্ধারণ করার সময় Direct Expenses মূল আয় থেকে আলাদা করা হবে। তা হলো :

ক. কাঁচামাল ক্রয়বাবদ খরচ।

খ. প্রোডাক্ট তৈরিতে সরাসরি জড়িত কর্মচারীদের বেতন।

গ. বিদ্যুৎ বিল—যা সরাসরি পণ্য তৈরিতে লেগেছে।

ঘ. অন্যান্য বিল—যা সরাসরি মুশারাকাকে প্রদান করা হয়েছে।

বাকি থাকল, বিল্ডিং ও অন্যান্য খরচ। এগুলো শুধু মুশারাকার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া মুশারাকা শেষ হওয়ার পরও তা বহাল থাকবে, তাই এসব খরচ ধরা হবে না। সর্বোচ্চ এতটুকু করা যায় যে, বিনিয়োগদাতা আলোচনা করে এগুলোর একটি ভাড়া প্রদান করবে। যা লাভ-লোকসানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অথবা আলোচনা সাপেক্ষে সক্রিয় অংশীদার মুনাফা বাড়িয়ে নিতে পারে।

অধ্যায় : ১০

- ইজারা (Leasing) চুক্তি : পরিচিতি ও প্রকার।
- ভাড়া চুক্তি : পরিচিতি, প্রয়োগ ও বিধান।
- নিয়োগ (Hiring of Persons) চুক্তি : পরিচিতি, প্রয়োগ ও বিধান।

প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা

আরবী	বাংলা	ইংরেজি
عقد الإجارة (আকদুল ইজারা) / إجارة المنفعة أو الأعيان (ইজারাতুল মানফাআত আও আল-আ'ইয়ান) ↓	ভাড়া চুক্তি ↓	Lease contract ↓
المؤجر (আল মুজির)	ভাড়া দাতা	Lessor
আল মুসতাজির (المستأجر)	ভাড়াগ্রহীতা / ভাড়াটিয়া / ইজারাদার	Lessee
الشيء المستأجر فيه (আশশাইয়ুল মুসতাজার ফি)	ভাড়াকৃত বস্তু	Subject of Lease

আকদুল) عقد الإجارة / إجارة (ইজারা ইজারাতুল) الأشخاص (আশখাছ ↓	নিয়োগ চুক্তি ↓	Hiring of persons / Employment contract ↓
আল আজীর (الأجير)	চাকুরিজীবী / কর্মচারী/ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি	Employee
আল মুসতাজির (المستأجر)	নিয়োগদাতা	Employer
আল উজরাহ (الأجرة)	পারিশ্রমিক/ বেতন (চাকরিতে / কাজে)	Emolument / Salary / Rent / Remuneration
মুদ্দাতুল ইজারাহ (مدة الإجارة)	ভাড়ার মেয়াদ/ নিয়োগের মেয়াদ	Lease Period/ Employment contract Period

প্রচলিত ভাড়া চুক্তি ও নিয়োগ চুক্তি : প্রাথমিক কিছু কথা

সাধারণত 'ভাড়া চুক্তি' বলতে বস্তুর ভাড়া আদান-প্রদান বুঝিয়ে থাকে। যেমন, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। এটি আবার দু ধরনের হয়। স্বল্প মেয়াদি। দীর্ঘ মেয়াদি। ইংরেজিতে স্বল্প মেয়াদি ভাড়া চুক্তিকে বলে Rent| যেমন বলা হয়, Rent a car| বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়, To Let। দীর্ঘ মেয়াদি হলে বলে Lease। যেমন, বলা হয়, ১০ বছরের জন্য জমি লিজ নেওয়া হয়েছে।

আর কোনো ব্যক্তিকে যখন কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন সেটা হয় 'নিয়োগ চুক্তি'। ইংরেজিতে বলে Employment contract|

অবশ্য ইংরেজিতে একটি শব্দ আছে, যা কখনো কখনো উভয় চুক্তির ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। তা হলো, Hire।

কাউকে ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়, আদালতে মামলার জন্য অমুক উকিলকে 'হায়ার' করা হয়েছে। এটি হয় অস্থায়ী। তবে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি নিয়োগ হলে তাকে Employment contract বলে। তদ্রূপ গাড়ি ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রেও Hire শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেমনটি আগেও বলা হয়েছে, ইসলামী ফিন্যান্সে সবগুলোই 'ইজারা' চুক্তির (عقد الإجارة) অধীন।

মনে রাখতে হবে, ইসলামী ফিন্যান্সে 'ইজারা' চুক্তি প্রধানত দুই প্রকার। যথা—

ক. 'ইজারাতুল আশখাস' বা Hiring of persons। বাংলায় 'নিয়োগ চুক্তি'। এর অধীনে নিয়োগদাতাকে বলা হয় 'মুসতাজির' (المستأجر), ইংরেজিতে বলে Employer। আর যিনি নিয়োগ পান তাকে বলা হয় 'আজীর' (الأجير), ইংরেজিতে Employee।

খ. ইজারাতুল মানফাআত বা আইয়ান (إجارة المنفعة أو الأعيان)। তা হলো, কোনো বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার ভাড়া চুক্তি করা। যেমন গাড়ি ভাড়া, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। বাংলায় একে 'ভাড়া চুক্তি' বলে। এর অধীনে যিনি ভাড়া দিচ্ছেন, তাকে বলা হয় 'মুজির' (المؤجر) বা Lessor। আর যিনি ভাড়া গ্রহণ করেন, তাকে বলে 'মুসতাজির' (المستأجر) বা Lessee। এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। দেখা গেল, একই শব্দ চুক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১.১ ইজারা চুক্তি : পরিচিতি ও প্রকার

'ইজারা' : আভিধানিক পরিচিতি

'ইজারা' ইসলামী ফিকহের একটি পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ (Lexical meaning), কাজ বা উপকারের বিনিময়ে কাউকে কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করা।[১]

পারিভাষিক পরিচয়

ইসলামী ফিকহে 'ইজারা' একটি ব্যাপক চুক্তির নাম। এর অধীনে ভাড়া ও নিয়োগ চুক্তি দুটিই অন্তর্ভুক্ত। এর একটি মৌলিক পরিচিতি আছে, যাতে উভয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন,

ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতের অধীনে রচিত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-এর ধারা নং ৪০৫-এ ইজারার ব্যাপক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে এভাবে—

---

১ লিসানুল আরব, খ. ১, পৃ. ৭৭; আলকামুসুল মুহীত, খ. ১, পৃ. ৬৮৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩২; জাদীদ মাআশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা (পিএইচডি প্রবন্ধ। লেখক, ড. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ যুবায়ের আশরাফ উসমানী হাফিযাহুল্লাহ, পৃ. ১৩

وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.

'ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় ইজারা হলো, সুনির্দিষ্ট বিনিময়ের বিপরীতে নির্দিষ্ট উপকার বিক্রির নাম।'[১]

১. **'সুনির্দিষ্ট বিনিময়'** : এর অর্থ হলো, লেনদেনের সময়ই এটি নির্ধারণ করা জরুরি যে, বিনিময় কত দেওয়া হবে। ধরা যাক, একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। তাহলে এটি জরুরি যে, চুক্তির সময়ই ঘর ভাড়া নির্দিষ্ট করে নেওয়া। যদি বিনিময় জানা না থাকে, তাহলে এ কারণে ইজারা ফাসেদ (Void) হয়ে যাবে। তদ্রূপ কাউকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হলো, তাহলে সেক্ষেত্রেও শুরুতে চুক্তির সময়ই বেতন নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

২. **'উপকার'** : একে আরবীতে বলে 'মানফাআত'। ইজারা চুক্তির মাধ্যমে মূলত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সীমিত 'মানফাআত' লাভ করা হয়। ইংরেজিতে বলে Usufruct। এটিই ইজারার মৌলিক বিষয়। এর বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়ে শুধু মানফাআত নয়; বরং মূল বস্তুর মালিকানাও অর্জন করা হয়। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয় হয় স্থায়ী। আর ইজারা হয় অস্থায়ী। এ হলো ইজারা ও ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মৌলিক দুটি তফাত।[২]

ইজারা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য উক্ত মানফাআতও সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি। সুতরাং তা অজ্ঞাত থাকলে ইজারা ফাসিদ (Void) হয়ে যাবে। যেমন, কেউ একটি বাড়ি ভাড়া নিল। তাহলে এটি জানা জরুরি, কী কাজে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো।

প্রকাশ থাকে যে, ইজারার উক্ত ব্যাপক পরিচয়ের মাঝে ভাড়া চুক্তি ও নিয়োগ চুক্তি দুটিই এসে যায়। এরপরও আলাদা করে ভাড়া চুক্তির পরিচয় দেওয়া হলো—(সামনে প্রথমে ভাড়া চুক্তি, এরপর নিয়োগ চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো)

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী রহ. খ. ২, পৃ. ৪৭২

২ আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৮০০

২. ১. ভাড়া চুক্তির পরিচয়

‘মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা’-এর ধারা ৪২১ এ এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে—ভাড়া চুক্তি (Leasing of specific property) বলা হয়, বস্তু বা সম্পদ থেকে অর্জিত উপকারের ওপর বিশেষ ভাড়া চুক্তি।

এ ধরনের ভাড়া চুক্তি সাধারণত তিন ধরনের সম্পদে হয়ে থাকে। যথা—

১. স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া (Lease of real property)। আরবীতে একে ‘ইজারাতুল আক্বার’ (إجارة العقار) বলে। এর মধ্যে জমি, ফ্ল্যাট, দোকান, বাড়ি ইত্যাদি অ-স্থানান্তরযোগ্য স্থাবর সম্পদের ভাড়া অন্তর্ভুক্ত।

২. অস্থাবর সম্পদের ভাড়া (Lease of real merchandise)। আরবীতে একে ‘ইজারাতুল আরুদ’ (إجارة العروض) বলে। এর মধ্যে কাপড়, পাতিল, চেয়ার ইত্যাদি স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের ভাড়া অন্তর্ভুক্ত।

৩. প্রাণীর ভাড়া (Lease of real animals)। আরবীতে একে ‘ইজারাতুদ দাওয়াব’ (إجارة الدواب) বলে। এর মধ্যে বাহন হিসাবে বা কাজের জন্য প্রাণীর ভাড়া অন্তর্ভুক্ত। আজকাল যাবতীয় বাহনের ভাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত।[১]

২. ২. তাৎপর্য

ভাড়া চুক্তির মাঝে মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

- পূর্বোক্ত তিন ধরনের কোনো এক প্রকার সম্পদে এ চুক্তি হবে।
- সম্পদের বিশেষ উপকার গ্রহণের ওপর চুক্তি হবে।
- উপকার গ্রহণের বিপরীতে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।
- ভাড়া চুক্তিটি হবে মেয়াদ সাপেক্ষে। সেটি স্বল্প হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অথবা প্রথানুযায়ী (Customary practices) নির্ণীত হবে।

---

১ ধারা : ৪২১

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী ফিন্যান্সে আলোচিত আর্থিক চুক্তিসমূহের মাঝে 'ভাড়া চুক্তি' অন্যতম। বস্তু, দ্রব্য বা যে কোনো সম্পদের ভাড়াই এর অন্তর্ভুক্ত। সেই প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রচলন রয়েছে। বর্তমান সময়ে এর বিস্তৃতি সীমাহীন। এর ব্যবহার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক উভয় ক্ষেত্রেই আছে। ইসলামিক ব্যাংকিং এও 'বিনিয়োগ মডিউল' হিসাবে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে।

এ বিষয়ে এ্যাওফি একটি স্বতন্ত্র শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড রচনা করেছে। স্ট্যান্ডার্ড নং: ০৯।[১] এ ছাড়া 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা' গ্রন্থে ৫২২ থেকে ৬১১ পর্যন্ত মোট ৮৯ টি ধারায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।[২] আমাদের সমাজেও এর ব্যবহার প্রচুর। তবে শরীয়াহ সচেতনতা বেশ অপ্রতুল।

২. ৩. ভাড়াচুক্তির প্রকারভেদ

ব্যবহার ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় আমাদের সমাজে আলোচিত ভাড়াচুক্তির দু ধরনের প্রয়োগ রয়েছে। যথা :

১. মানুষের বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তি তার আর্থিক উপার্জনের জন্য কোনো বস্তু ভাড়া প্রদান করা। পরিভাষায় একে Operating lease বলে। আরবীতে বলে الإجارةالتشغيلية। (আল ইজারাতুত তাশগিলিয়্যাহ)।

এখানে ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছেই ভাড়াচুক্তিই মূল উদ্দেশ্য থাকে। ভাড়াচুক্তির মেয়াদ শেষে ভাড়াকৃত বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গ্রহীতাকেই সেই বস্তুর মালিকানা প্রদান করা হয় না।

---

১ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, পৃ. ৫৫০

২ শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী রহ. খ. ২, পৃ. ৪৭১। তাছাড়া ১৪২৬ হিজরি মোতাবেক ২০০৫ সালে পাকিস্তানের জনাব মুফতি মাওলানা ড. যুবায়ের আশরাফ উসমানী রহ. উর্দু ভাষায় ইজারা তথা চাকরি ও রেন্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পিএইচডি গবেষণাপত্র রচনা করেন। গবেষণাপত্রটির নাম 'জাদীদ মায়াশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা', পৃ. সংখ্যা ৫৫২। এ বিষয়ে তাতে বিস্তারিত শরীয়াহ নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বেশ উপকারী।

অথবা গ্রহীতা সেই বস্তুর মালিক হবে এমন কোনো পূর্ব-ওয়াদাও থাকে না। আমাদের চারপাশে এ ধরনের ভাড়াচুক্তিই অধিক। মোটকথা, এটি একটি বাস্তব ও প্রকৃত ভাড়াচুক্তি।

২. ইজারা বা ভাড়াচুক্তির নাম ব্যবহার করা হয়। তবে উদ্দেশ্য ফিন্যান্স বা বিনিয়োগ করা। ইজারা নয়। তাই কৌশলে ভাড়াকৃত বস্তুর মালিকানা গ্রহীতার কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব ওয়াদা থাকে, ভাড়াটিয়াকেই বস্তুর মালিকানা দিতে হবে। পরিভাষায় একে Financial lease বলে। আরবীতে বলে الإجارةالتمويلية (আল ইজারাতুত তামওয়ীলিয়্যাহ)। এর একাধিক প্রায়োগিক ব্যবহার রয়েছে। কোনোটি বৈধ। কোনোটি অবৈধ। বিস্তারিত সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

২. ৪. ভাড়াচুক্তির মূল উপাদান

ক. মূল ভাড়াচুক্তি (ইজাব ও কবুল)

খ. ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা

গ. ভাড়াকৃত বস্তু

ঘ. বিনিময় বা ভাড়া

উক্ত চারটি উপাদানের সাথে গুরুত্বপূর্ণ নানা শরীয়াহ বিধান রয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বুনিয়াদি কিছু বিষয় আলোচনা করা হলো।

২. ৪. ১. মূল ভাড়াচুক্তি

২. ৪. ১. ১. ইজাব-কবুল

• মূল ভাড়াচুক্তি স্বতন্ত্র ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। ইজাব ও কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভাড়াচুক্তি বোঝায় এমন যেকোনো শব্দ ব্যবহার করা। এটি সকলের নিকটই ইজারা চুক্তির রোকন।

• ইজাব-কবুল যেমন স্পষ্টভাবে হতে পারে। তেমনি আচরণের মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন, গাড়িতে উঠে গেলাম। এরপর নামার সময় নির্ধারিত ভাড়া শোধ করে দেওয়া হলো। পরিভাষায় একে 'ইজারা বিত-তাআতী' (الإجارة بالتعاطي) বা Hand to Hand lease contract বলে।[১]

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আতাসী, খ. ২, পৃ. ৬৬৪

২. ৪. ১. ২. ভাড়াচুক্তির পূর্বে ওয়াদাচুক্তি

মৌলিক বিধান এটিই যে, ভাড়াচুক্তি এমন বস্তুর ওপর হবে, যা দাতার মালিকানায় আগে থেকেই আছে। তবে এটিও বৈধ যে, গ্রাহক বা ভাড়াটিয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে ভাড়াদাতা কর্তৃপক্ষ প্রথমে সম্পদের মালিক হবে। এরপর পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী তা গ্রাহক বা ভাড়া গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে ভাড়ায় প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার ভাড়া গ্রহণের ইচ্ছা মূলত ওয়াদা (Promise to lease) বলে গণ্য হবে, যা বাস্তবায়ন করা জরুরি। উক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে পরবর্তীতে মূল ভাড়া চুক্তি সংগঠিত হবে। এটি Hand to Hand lease contract এর ভিত্তিতেও হতে পারে।

২. ৪. ১. ৩. ভাড়াচুক্তির পূর্বে মাস্টার এগ্রিমেন্ট

• মূল ভাড়াচুক্তির পূর্বে একটি Master agreement হতে পারে। তাতে ভাড়ার পরিমাণ, মেয়াদ, নীতিমালা বিস্তারিত আলোচনা হবে বা লিখিত হবে। এরপর ভবিষ্যতে মূল ভাড়াচুক্তি হবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মূল ভাড়াচুক্তি স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে হতে হবে। তবে তখন বিস্তারিত শর্ত ও নীতিমালা না বলে শুধু পূর্বকৃত মাস্টার এগ্রিমেন্টের রেফারেন্সই যথেষ্ট। এই Master agreement মূলত একটি লিখিত মযবুত ওয়াদা। যা মূল ভাড়াচুক্তির পূর্বে সম্পন্ন হয়।

২. ৪. ১. ৩. ১. Master Agreement-এর ব্যবহার

• ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, একই বস্তু একাধিক লোকের কাছে ভাড়া প্রদান করা হয়। প্রথম ব্যক্তির কাছে ভাড়া প্রদানের পর, পরবর্তী গ্রাহকের সাথে তখন Master agreement করা হয়। এরপর পরবর্তী নির্ধারিত সময়ে শুধু ইজাব-কবুল করে নেওয়া হয়। বিস্তারিত নীতিমালা পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, পূর্ব Master agreement অনুযায়ী প্রদান করা হলো।

২. ৪. ১. ৪. ভাড়া চুক্তিতে 'হামিশ জিদ্দিয়া' গ্রহণ

• মূল ভাড়া চুক্তির পূর্বে ওয়াদা চুক্তির সময়, ভাড়াদাতা গ্রাহককে কিছু

অগ্রিম অর্থ প্রদানের শর্ত করতে পারে। যেন গ্রাহকের প্রতিশ্রুতির ওপর ভাড়াদাতা নিশ্চিন্তে ভরসা রাখতে পারে। সাধারণত এই ধরনের অবস্থা দেখা যায় ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে। যারা মূলত ভাড়াদাতা নয়। গ্রাহকের আবেদনে এ্যাসেট ক্রয় করে তার কাছে ভাড়া প্রদান করে থাকে।

উক্ত গৃহীত অগ্রিম অর্থ-'হামিশ জিদ্দিয়া' (Security money) হিসাবে পরিচিত। পরবর্তীতে গ্রাহক যদি তার ওয়াদা রক্ষা না করে তাহলে উক্ত গৃহীত অর্থ থেকে ভাড়াদাতা এর বাস্তব (শরীয়াহসম্মত) ক্ষতিপূরণ রেখে দিতে পারবে। এর বিস্তারিত কর্মপন্থা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এক্ষেত্রে ভাড়া চুক্তির দুটি ধরন হতে পারে। যথা—

১. গ্রাহকের সাথে মূল চুক্তি ছিল 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত-তামলীক'। অর্থাৎ ইজারা চুক্তির শেষে স্বতন্ত্রভাবে গ্রাহক এর মালিক হয়ে যাবে (Financial lease)। (বিস্তারিত সামনে আসবে)। এক্ষেত্রে গ্রাহক ফিরে যাওয়ার পর প্রতিষ্ঠান সেই এ্যাসেট অন্য কাউকে 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত-তামলীক' ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করেছে। এটি হয়ে থাকে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে।

তাহলে এক্ষেত্রে ওই এ্যাসেটের মূল ক্রয় মূল্য বা মূল ব্যয় ও দ্বিতীয় চুক্তিতে অর্জিত ভাড়ার মাঝে যে তফাত থাকবে সেই বাস্তব ক্ষতি ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। ধরা যাক, মূল এ্যাসেটে আসল ব্যয় ২ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ভাড়া দেওয়ার পর সাকুল্যে ভাড়া এসেছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। তাহলে এক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা লস বলে বিবেচিত হবে। এটি সিকিউরিটি মানি থেকে রেখে দেওয়া যাবে। বাকিটা ফেরত দিবে।

তবে কোনো প্রকার সম্ভাব্য ক্ষতি নেওয়া যাবে না। যেমন, প্রথম গ্রাহকের সাথে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ভাড়া ধার্য হয়েছিল। সে ফিরে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে ভাড়া পাওয়া গেছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

তাহলে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এটি বাস্তব ক্ষতি নয়। বরং সম্ভাব্য ক্ষতি।[১]

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ২/৩

২. আর যদি এমন হয় যে, প্রথম গ্রাহকের সাথে কৃত ভাড়া চুক্তিটি ছিল সাধারণ ভাড়া চুক্তি। যা সাধারণত আমাদের সমাজে হয়ে থাকে (Operating lease)। তাহলে এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে।

ক. ভাড়াদাতা সেই এ্যাসেটটি অন্যত্র বিক্রয় করবে না। বরং হয় নিজে রেখে দিবে। কিংবা অন্য কারো কাছে ভাড়া প্রদান করবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে না। কারণ নিজের কাছে রেখে দিলে বা ভাড়া প্রদান করলে তার কোনো ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই।

খ. অন্যত্র বিক্রয় করে দেওয়া হবে। তাহলে এক্ষেত্রে অন্যত্র বিক্রয় করতে গিয়ে মূল ক্রয় মূল্য বা খরচ উঠে না আসলে যা তফাত হবে সেটি ক্ষতিপূরণ বাবদ গ্রহণ করা যাবে।[১]

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত অগ্রিম অর্থ তথা 'হামিশ জিদ্দিয়া' মূল ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে গ্রহণ করা হবে। এটি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হয়ে থাকে। যেখানে গ্রাহকের আগ্রহ ও তলবে প্রতিষ্ঠান এ্যাসেট ক্রয় করে তার কাছে ভাড়া প্রদান করে। সুতরাং আমাদের সমাজে বাড়ি বা দোকান ভাড়ার ক্ষেত্রে যে সিকিউরিটি মানি গ্রহণ করা হয়, এটি সেটি নয়। এর আলোচনা সামনে আসবে।

২. ৪. ১. ৪. ১. গৃহীত হামিশ জিদ্দিয়া ব্যবহার নীতি

উক্ত গৃহীত অর্থ-গ্রহীতার কাছে আমানত। সুতরাং এতে অন্যায় আচরণ করা যাবে না। তবে একে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে তা মুদারাবার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হবে। অথবা পরবর্তীতে যখন ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন হবে, তখন একে ভাড়া হিসাবেও গণ্য করার ব্যাপারে একমত হওয়া যাবে।[২]

২. ৪. ১. ৫. ভাড়াচুক্তি একটি অনিবার্য চুক্তি (Binding contract)

- ভাড়াচুক্তি একটি অনিবার্য চুক্তি (Binding contract)। যে কেউ তা একপক্ষীয়ভাবে রহিত করতে পারে না। অপর পক্ষের সম্মতি বা

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ২/৩

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ২/৪

পূর্ব নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী রহিত করতে হবে। তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে এক পক্ষীয়ভাবে রহিত করা যাবে। যথা :

ক. বিশেষ উযর দেখা দেওয়া। যেমন—ভাড়াকৃত বস্তুতে এমন দোষ দেখা দিয়েছে, যা এর থেকে উপকার গ্রহণে প্রতিবন্ধক। বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বাড়ির ছাদ ভেঙে গেছে। তবে তৎক্ষণাৎ ভাড়াদাতা যদি তা মেরামত করে দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এক পক্ষীয়ভাবে রহিত করা যাবে না।

খ. মূল চুক্তির মাঝেই ভাড়াদাতা বা গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃত চুক্তি বহাল রাখা বা রহিত করার শর্ত করেছিল। পরিভাষায় যা 'খেয়ারে শর্ত' নামে পরিচিত। এমন ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে যার পক্ষে শর্ত করা হয়েছিল, সে চাইলে একপক্ষীয়ভাবে চুক্তি রহিত করতে পারবে।

গ. ভাড়াদাতা মূল চুক্তির মাঝেই শর্ত করেছিল, যথাসময়ে ভাড়া শোধ না করলে চুক্তি রহিত করে দেবে।[1]

২. ৪. ১. ৬. ভাড়া চুক্তিতে আরবুন গ্রহণ

• এমন হতে পারে, ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভাড়াটিয়া এখনই ভাড়া ব্যবহার শুরু করবে না। কিছু দিন বা সময়ের পর ব্যবহার শুরু করবে।

এক্ষেত্রে ভাড়াদাতা ভাড়াটিয়াকে অগ্রিম কিছু অর্থ প্রদানের শর্তারোপ করতে পারে। শর্ত থাকবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়াগ্রহীতা চাইলে ভাড়াকৃত বস্তু গ্রহণ করে চুক্তি অব্যাহত রাখবে। অথবা চাইলে সেটি গ্রহণ না করে চুক্তি রহিত করে দিবে। আর যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, সেটির দুটি অবস্থা হতে পারে। যথা—

ক. চুক্তি বহাল রাখলে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ অগ্রিম ভাড়া হিসাবে গণ্য হবে।

খ. ভাড়া চুক্তি বহাল না রাখা হলে, ইসলামী ফিকহ একাডেমী, জিদ্দাহ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত গৃহীত টাকা পুরোটাই ভাড়াদাতা গ্রহণ করে

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ৭/২/২

নিতে পারবে। এ মর্মে আগেই শর্ত থাকবে।[1] অপরদিকে এ্যাওফি বলেছে,[2] এক্ষেত্রে কেবল বাস্তব ক্ষতি পর্যন্ত গ্রহণ করা উত্তম। এর অধিক গ্রহণ না করা উচিত। বাস্তব ক্ষতির ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

পরিভাষায় এই অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে 'আরবুন' বা Earnest Money বলে। কখনো বুকিং মানিও বলা হয়। তবে প্রচলিত বুকিং মানি ও আরবুন এক নয়। তাছাড়া এটি প্রচলিত সিকিউরিটি মানিও নয়, যা দোকান ও বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া থেকে গ্রহণ করা হয়।

২. ৪. ১. ৭. ভাড়া চুক্তির চূড়ান্ত ধাপ শুরু

• ভাড়া চুক্তির চূড়ান্ত ধাপ শুরু হয় ভাড়াকৃত বস্তু অর্পণের পর থেকে। 'অর্পণ' বলতে, এ অবস্থায় পেশ করা যে, ভাড়াগ্রহীতা এর থেকে চাইলে উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া। সুতরাং এর আগে কোনো প্রকার ভাড়া আবশ্যক হবে না। সুতরাং শুধু চুক্তি দ্বারাই ভাড়া আবশ্যক হয় না। 'অর্পণ'ও করতে হবে।

অবশ্য যদি এরূপ চুক্তি থাকে যে, ভাড়া চুক্তির পর অর্পণের মাঝে যে ব্যবধান হবে, সেটি পরবর্তীতে পুষিয়ে নেওয়া হবে, ওই পরিমাণ সময়/দিন ভাড়া ভোগের জন্য দেওয়া হবে, তাহলে এক্ষেত্রে চুক্তির পর থেকেই ভাড়া গ্রহণ করা যাবে। যদিও অর্পণ বিলম্ব হয়।[3]

২. ৪. ১. ৮. ভাড়া চুক্তির মেয়াদ

• ভাড়া চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। এটি লিখিত হতে পারে, মৌখিকও হতে পারে। নির্ধারিত মেয়াদের আগে ভাড়া চুক্তি বাতিল করতে হলে যৌথ সম্মতিতে বাতিল করা যাবে।

২. ৪. ১. ৯. ভবিষ্যৎ ভাড়াচুক্তি (Forward lease Contract)

ভাড়াচুক্তি ভবিষ্যতের দিকে সম্বোধনযুক্ত হতে পারে। যেমন—চুক্তি

---

১ মাজাল্লাতু মাজমাউ ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা : ০৮, ভলিয়ম, ০১, পৃ. ৭৯১

২ স. ৯, ধা. ৪/১/৪

৩ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৪/১/৩

হলো, আগামী ১ আগস্ট থেকে আপনার কাছে বাড়ি ভাড়া প্রদান করা হলো। এটি বৈধ। তবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে এটি বৈধ নয়। ক্রয়-বিক্রয় নগদ হতে হয়। পণ্য ও মূল্য বাকি রেখে চুক্তি সম্পন্ন করা যায় না। তাই এভাবে বলা বিধিসম্মত নয় যে, আপনার কাছে আগামী শুক্রবার এই জিনিসটি বিক্রি করা হলো। পরিভাষায় একে 'মুযাফ ইলাল মুসতাকবিল' চুক্তি (المضاف إلى المستقبل) বা Forward Contract বলে।

২. ৪. ১. ১০. ধারাবাহিক ভাড়াচুক্তি (Successive lease)

কোনো একটি বস্তুতে একাধিক লোকের সাথে বিভিন্ন সময়ের জন্য ভাড়াচুক্তি করা যাবে। একজনের পর আরেকজনের ভাড়াচুক্তি শুরু হবে। যেমন—চুক্তি হলো, যায়েদ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘর ব্যবহার করতে পারবে। জানুয়ারি থেকে উমর ঘর ব্যবহার করবে। ফেব্রুয়ারি থেকে জামাল ঘর ব্যবহার করবে। প্রত্যেকের সাথে স্বতন্ত্র ভাড়াচুক্তি করা হয়েছে। যা সময়ে সময়ে কার্যকর হবে। ভাড়াচুক্তিতে যেহেতু Forward Contract বৈধ, তাই এটিও বৈধ। শর্ত একটিই, তা হলো—একই বস্তুতে একই সময়ে দুটি স্বতন্ত্র চুক্তি হতে পারবে না।

আমাদের সমাজে প্রচলিত হোটেল বুকিং, হল বুকিং, কমিউনিটি সেন্টার বুকিং ইত্যাদি ভাড়াচুক্তি কখনো উক্ত Successive lease Contract অনুযায়ী হয়ে থাকে।

২. ৪. ১. ১১. ভাড়াটিয়া অন্যত্র ভাড়া প্রদান করা চুক্তি (Sub-lease contract)

আজকাল শহরে এর বেশ প্রচলন রয়েছে যে, একটা বাড়ি বা দোকান ভাড়া নিয়ে ভাড়াটিয়া তা অন্যত্র অধিক মূল্যে ভাড়া প্রদান করে থাকে। একে সাব লিজ, সাব লেট, উপভাড়া ইত্যাদি বলা হয়। আরবীতে বলা হয় 'ইজারা আলাল ইজারা' (الإجارة على الإجارة) এক্ষেত্রে শরীয়াহ নির্দেশনা হলো—

১. লিজকৃত বস্তুটি যদি এমন হয়, যা ব্যবহারকারীগণ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে বস্তুতে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে মালিকের স্পষ্ট অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া সাব-লিজ বৈধ হবে না। আর এমনটি না হলে, স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলে অন্যত্র ভাড়া দিতে অসুবিধা নেই।

২. প্রথম ভাড়াটিয়া যদি প্রথম ভাড়া পরিমাণ বা এর চেয়ে কম দ্বিতীয় ভাড়াটিয়া থেকে উসুল করে তবে তা সকলের নিকটই বৈধ। অবশ্য মালিকের অনুমোদন না থাকলে তাও করা ঠিক নয়।

৩. যদি প্রথম ভাড়া (অর্থাৎ যে ভাড়াটা প্রথম ভাড়াটিয়া প্রদান করে) এর চেয়ে বেশি ভাড়া উসুল করা হয় (এটিই বেশি হয়ে থাকে), তাহলে তা বৈধ হবে কি না—বিষয়টি সালাফে সালেহীনের যুগ থেকেই মতভেদপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে তা বৈধ। অতিরিক্ত গ্রহণ জায়েয। হাম্বলী ফকীহগণের কাছেও এটিই অগ্রগণ্য মত। হানাফী মাযহাবের আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতও তাই।

অপরদিকে অনেক হানাফী ফকীহদের মতে, দুটি পথের কোনো একটি অবলম্বন করা ছাড়া অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ বৈধ হবে না। যথা :

এক. প্রথম ভাড়াটিয়া লিজকৃত বস্তুতে বা ঘরে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করবে। এরপর সংযোজিত অংশসহ অন্যত্র ভাড়া দিলে অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে। যেমন, রং করে দেওয়া, কিছু সামানাপত্র দিয়ে রাখা। ইত্যাদি।

দুই. অথবা প্রথম ভাড়াটিয়া যে কারেন্সির মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করে, সেটা ছাড়া অন্য কারেন্সি দিয়ে বা অন্য কোনো বস্তু ভাড়া বাবদ দ্বিতীয় ভাড়াটিয়া থেকে গ্রহণ করবে।

উক্ত দুটি পথ অবলম্বন ছাড়া সাব-লিজে অতিরিক্ত গ্রহণ বৈধ হবে না।[১]

২. ৪. ১. ১২. অগ্রগণ্য মত

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতামত অধিক সতর্কতাপূর্ণ। কারণ, এখানে মূলত প্রথম ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রদেয় ভাড়ার টাকার সাথে দ্বিতীয় ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রদেয় ভাড়ার টাকার লেনদেন হচ্ছে। যা অতিরিক্ত আদান-প্রদান হওয়ায় সুদের সাদৃশ্য তৈরি করে।

---

১ প্রাগুক্ত, ধারা : ৩/৩ (খ. ১, পৃ. ১৩৩)

তাই স্বাভাবিক অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতের ওপর আমল করা কাম্য। এর মাধ্যমে সুদের সন্দেহ থেকেও বিরত থাকা হয়। হ্যাঁ, প্রয়োজন দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ও অন্যান্য ফকীহগণের মতও গ্রহণ করার অবকাশ আছে।[১]

২. ৪. ১. ১৩. এ্যাওফির সিদ্ধান্ত

এ্যাওফি এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতামত গ্রহণ করে একে বৈধ বলেছে। তবে শর্ত হলো—মালিকের পক্ষ থেকে কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা না থাকতে হবে।[২]

২. ৪. ১. ১৪. ব্যতিক্রম ক্ষেত্র

কখনো ভাড়াটিয়া দোকান বা বাড়ির একটা অংশ অন্যত্র ভাড়া প্রদান করে। যেমন—তিন রুমের একটি বাসা। এর এক রুম সাবলেট দেওয়া হলো। বাকি দুই রুম ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে না। ওই এক রুম যে কোনো মূল্যে ভাড়া দেওয়া যাবে। তবে মালিকের নিষেধাজ্ঞা না থাকতে হবে।

২. ৪. ১. ১৫. সিন্ডিকেট সাব-লিজ চুক্তি

● সাব-লিজের অধীনে এভাবেও বিনিয়োগ করা যায় যে, বড় একটি ইমারত বা হোটেল মোটা অংকের টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এরপর সেই ভাড়া পরিশোধের জন্য আরো কয়েকজনের নিকট আনুপাতিক হারে হোটেল ভাড়া প্রদান করা হলো। এরপর সকলে যৌথভাবে হোটেলটি তৃতীয় কারো কাছে সাব-লিজে প্রদান করবে। একে 'সিন্ডিকেট সাব-লিজ' বলে।

এটি বৈধ। শর্ত হলো, তৃতীয় সাব-লিজের আগেই উক্ত পার্টনার ঠিক করতে হবে। তৃতীয় সাব-লিজের পর পার্টনার নেওয়া যাবে না।[৩]

---

১ ইসলামী ব্যানকারী কী বুনিয়াদি, পৃ. ১৮৯

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৩/৩

৩ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৪/২/৪

২. ৪. ১. ১৬. ভাড়াটিয়া মূল মালিকের কাছেই ভাড়া প্রদান চুক্তি

• সাব-লিজের একটা প্রকার হলো, ভাড়াটিয়া অন্যত্র ভাড়া প্রদান করা। আর আরেকটি প্রকার হলো, মূল মালিকের কাছেই ভাড়া প্রদান করা। কখনো এমন হয়, দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দশ বছরের চুক্তি হয়েছে। এর মাঝে মূল মালিকের কয়েক মাসের জন্য বাড়িটি প্রয়োজন হয়েছে। তাই ভাড়াটিয়ার কাছ থেকেই নিজের বাড়ি কয়েক মাসের জন্য ভাড়া নিতে আগ্রহী।

এ্যাওফির সিদ্ধান্ত হলো সাব-লিজের প্রথম প্রকারের ন্যায় এটিও মৌলিকভাবে বৈধ। তৃতীয় পক্ষের কাছে যেমন ভাড়া দেওয়া যায়, তেমনি মূল মালিকের কাছেও ভাড়া দেওয়া যাবে। চাই ভাড়ার পরিমাণ মূল ভাড়াচুক্তির ভাড়ার চেয়ে কম হোক, বেশি হোক বা সমান হোক সবই বৈধ। তবে 'ঈনা' বা Buy Back না হতে হবে। (এটি একটি বিশেষ কৌশলী লেনদেন, যেখানে বিক্রেতার কাছেই পুনরায় পণ্য বিক্রি করা হয়। আর প্রথমটি হয়, বাকিতে (যখন ঋণদাতা হয় বিক্রেতা), পরেরটি হয় নগদ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এজন্য শর্ত হলো, দুটি ভাড়াই (মূল ভাড়া ও দ্বিতীয় ভাড়া) নগদ কিংবা অভিন্ন মেয়াদি হতে হবে। একটি নগদ, অপরটি বাকি হতে পারবে না। যেমন, মূল ভাড়াচুক্তির মেয়াদ এক বছর। এর জন্য নগদ ভাড়া আদায় করা হয়েছে এক লক্ষ টাকা। তিন মাস পর সেটি বাকিতে এক লক্ষ দশ হাজারের বিনিময়ে ৭ মাসের জন্য মূল মালিকের কাছেই ভাড়া দেওয়া হয়েছে। অথবা মাসে দশ হাজার টাকা নগদ ভাড়া বাবদ প্রদান করা হতো। এরপর মূল চুক্তির মেয়াদে দুই মাসের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে। যা বাকিতে শোধ করা হবে।

এগুলো বৈধ নয়। কারণ, এখানে অতিরিক্তটুকু মেয়াদের বিপরীতে আসছে। এটি সুদকে অনিবার্য করে। বিষয়টি দাঁড়াল এ রকম যে, যার এক লক্ষ টাকা দরকার, তার একটি বাড়ি এক বছরের জন্য এক লক্ষ টাকা নগদ গ্রহণ করে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এরপর ভাড়াগ্রহীতা সেটাই মূল মালিকের কাছে এক লক্ষ বিশে ভাড়া দিয়ে দিল। যা বাকিতে শোধ হবে। ফলাফল দাঁড়াল, যার বাড়ি, তার কাছেই বাড়ি রয়ে গেল। মাঝে

এক লক্ষ টাকার বিপরীতে এক লক্ষ বিশের লেনদেন হলো। এজন্যই উভয় ভাড়া নগদ হতে হবে। যদিও কমবেশি হয়। তখন আর সুদ গ্রহণের কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না।

তদ্রূপ মূল ভাড়া দুই মাস পর্যন্ত বাকিতে শোধ করার কথা ছিল। দ্বিতীয় ভাড়া তিন মাসে শোধ করা হবে। এটিও বৈধ নয়। দুটিই বাকি হলে, দুটির বাকি মেয়াদ সমান হতে হবে। কমবেশি করা যাবে না।

মোটকথা, ভাড়ার পরিমাণে কমবেশি হওয়া সমস্যা নয়। শর্ত একটিই, ভাড়ার মেয়াদ অভিন্ন হতে হবে। হয় দুটিই নগদ হবে। অথবা দুটির মেয়াদ অভিন্ন হবে।

এ্যাওফি উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে একে অনুমোদন করেছে।[১] তবে এর শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, মূল মালিকের কাছেই ভাড়া প্রদান করা মূলত ভাড়া চুক্তিকে রহিত করার নামান্তর। সুতরাং এটি আর তখন ভাড়াচুক্তি হিসেবে থাকবে না। এটি তৃতীয় পক্ষের কাছে সাব-লিজের মতো নয়। মালিকের কাছে ফেরত যাওয়া মানে ভাড়াচুক্তি রহিত করে দেওয়া। সুতরাং মালিকের প্রয়োজন হলে, সেটা ভাড়াচুক্তি রহিত করেও সমাধান করা যায়। তা না করে একে ভাড়া চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা সঠিক নয়।[২]

বলার অপেক্ষা রাখে না, মুফতি সাহেবের বক্তব্য যথেষ্ট বলিষ্ঠ।

২. ৪. ১. ১৭. হেড-লিজ চুক্তি (Head-Lease)

• এক হলো, সাব লিজ, যেখানে ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াকৃত বাড়ি অন্যত্র ভাড়া প্রদান করে থাকে। আরেক হলো, 'হেড-লিজ'। এটি সাব-লিজের বিপরীত। এখানে স্বয়ং ভাড়া দাতা একাধিক লোকের কাছে ভাড়া দিয়ে থাকে।

এর প্রেক্ষাপট হলো, বাড়ির মালিক মোটা অংকের ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি করেছে। এখন তার লোন পরিশোধের জন্য টাকা প্রয়োজন।

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৩/৪

২ দুরুসুল মাআয়িির, পৃ. ১৯৩

এজন্য সে বাড়ি ভাড়ায় প্রদান করে। এদিকে ভাড়া উসুল হয় ধীরে ধীরে। অপরদিকে মোটা অংকের লোন শোধ করতে হয়। অল্প সময়ে অনেক টাকা লাভের জন্য বাড়ির মালিক তৃতীয় পক্ষ যায়েদের সাথে এভাবে ভাড়া চুক্তি করে যে, তাকে বলে, আমি আমার বাড়ি ভাড়ায় প্রদান করেছি। সেখান থেকে ভাড়া আসে এই পরিমাণ। তুমি এক কাজ করতে পারো, তুমি এই বাড়ির এক চতুর্থাংশ ভাড়া হিসেবে নিতে পারো। এর বিপরীতে তোমাকে প্রাপ্তভাড়ার চার ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হবে।

এ চুক্তিতে যায়েদ সম্মত হয়ে নগদ এক চতুর্থাংশ ভাড়া প্রদান করে দেয়। এভাবে বাড়ির মালিকের নগদ টাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এভাবে সে উমর, বকর বিভিন্ন লোকের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নগদ টাকা সরবরাহ্ করে।

লক্ষ করি :

ক. এ পদ্ধতিতে মূল ভাড়া সম্পন্ন হয়েছে প্রথম ব্যক্তির সাথে। যে বাস্তবে বাড়িটি ভোগ করছে। এটিই প্রধান বা হেড ভাড়াচুক্তি।

খ. পরবর্তী শাখা ভাড়াগুলো কৃত্রিম। তারা বাড়ি ভোগ করছে না।

গ. একটা বস্তুকে একাধিক লোকের কাছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। অথচ ভোগাধিকার একজনের।

এ পদ্ধতিটি বিলকুল অবৈধ। এর কারণ হলো :

১. একবার যখন ভাড়াচুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে, তখন ভাড়াদাতা কেবল বস্তুর মূলের মালিক। উপকারের মালিক নয়। সুতরাং যা তার মালিকানাতেই নেই, সেটা সে অন্যত্র ভাড়া দিতে পারে না।

২. এটি সুদ গ্রহণের অপকৌশল। নগদ টাকা নিয়ে বাকিতে বেশি দেওয়া হবে।

৩. উসুলযোগ্য ঋণকে স্বল্প মূল্যে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। যা বৈধ নয়। বিশেষত দুটির পরিমাণে যখন পার্থক্য থাকে তখন তা স্পষ্ট সুদ।

এর বিকল্প হলো দুটি। যথা :

ক. প্রথম মূল বা হেড ভাড়াচুক্তি ক্যান্সেল করে অন্যদের সাথে ভাড়াচুক্তি করা।

খ. অথবা অন্যদের সাথে ভাড়াচুক্তি না করে, তাদের কাছে সেটি বিক্রি করে দেওয়া। এতে তারাই তখন ভাড়াদাতা হিসেবে আবির্ভূত হবে। এই প্রক্রিয়াটি আধুনিক 'সুকূক' প্রক্রিয়ায়ও করা যায়। তা হলো, সেকেন্ডারি মার্কেটে এই বাড়ির সুকূক ইস্যু করা হবে। বাড়িটির ওপর যদি একশ সুকূক ইস্যু করা হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, বাড়িকে একশ ভাগ করে আলাদা আলাদা করে বিক্রি করা হচ্ছে। যে এক ভাগ কিনবে, সে বাড়ির ১% এর মালিক। সে হিসেবে সে প্রাপ্ত ভাড়ার ১% লাভ করবে।

২. ৪. ১. ১৮. ভাড়াচুক্তিতে বায়িং এজেন্ট (Buying agent)

সাধারণ নিয়ম এটিই যে, ভাড়াদাতা ভাড়ার বস্তু নিজে সংগ্রহ করবে এরপর ভাড়া দেবে। তবে এমনটিও করা যাবে যে, গ্রাহক বা ভাড়াগ্রহীতাকেই ওই জিনিস প্রথমে ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধি হয়ে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। পরিভাষায় একে 'বায়িং এজেন্ট' বলে। যেমন, একটি মেশিন ক্রয় করা হবে। ব্যাংক যাবতীয় বিবরণ দিয়ে দেবে। সে অনুযায়ী ব্যাংকের পক্ষে গ্রাহক তা ক্রয় করবে। এক্ষেত্রে এর যাবতীয় দায় প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তাবে।

ব্যাংক তা বুঝে নেবে। এরপর ব্যাংক সেটি স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট ভাড়া প্রদান করবে। তবে উত্তম হলো, ব্যাংক সরাসরি গ্রাহককে উকিল বা ক্রয় প্রতিনিধি না বানিয়ে তৃতীয় কাউকে এ কাজ অর্পণ করা। এক কথায় এর মৌলিক নিয়মগুলো হলো :

ক. সরাসরি গ্রাহককে ক্রয়ের প্রতিনিধি বানানো ভালো নয়।

খ. গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষে ক্রয় করার কারণে এর পুরো দায় ও রিস্ক ব্যাংকের ওপর বর্তাবে।

গ. ব্যাংক সেটি বুঝে নেবে। তার আয়ত্বে ও রিস্কে নেবে।

ঘ. স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে গ্রাহক তা ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করবে।[1]

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৩/৭

২. ৪. ১. ১৯. ভাড়া চুক্তির ভিত্তিতে প্রি-এমশন দাবী

কখনো এমন হয়, আপনি একটি দোকান ভাড়া নিলেন। ওই দোকানের পাশের দোকান বিক্রি হবে। আপনি কি প্রি-এমশনের ভিত্তিতে ওই দোকান ক্রয়ের দাবী করতে পারবেন?

না, ভাড়াকৃত সম্পদের ভিত্তিতে প্রি-এমশন তথা শুফআর দাবি করা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে শুফআর দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।[1]

২. ৪. ২. ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা

২. ৪. ২. ১. ভাড়াদাতা (Lessor)

ভাড়াদাতা সংক্রান্ত শরীয়াহ মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

১. ভাড়াদাতা সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগল ব্যক্তি ভাড়াদাতা হতে পারবে না।

২. ভাড়াদাতা বুঝমান হওয়া। এতটুকু বয়স হওয়া যে, ভাড়াচুক্তির মূল বিষয় বুঝে, ভাড়া গ্রহণ করা বুঝে। নাবালক হলে এই পরিমাণ বুঝমান হওয়ার পাশাপাশি অভিভাবকের পক্ষ থেকে লেনদেন করতে নিষিদ্ধ না হওয়া। তবে সাবালক হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং যে বাচ্চা বুঝমান নয়, সে ভাড়াদাতা হতে পারবে না। অবশ্য শাফেয়ী ও হাম্বলী ফিকহে শুধু বুঝমান হওয়া যথেষ্ট নয়; সাবালক হওয়া জরুরি।

৩. ভাড়াদাতা যেমন একজন হতে পারে, তেমনি একাধিকও হতে পারে। একে Syndicate Ijarah বলে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ভাড়া সকল অংশীদার তাদের প্রত্যেকের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে লাভ করবে। তদ্রূপ ব্যক্তি হতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠানও হতে পারে।

৪. যদি একাধিক লোক যৌথভাবে কোনো একটা বস্তু ক্রয় করে বা মালিক হয়, এরপর কোনো এক শরিক স্বতন্ত্রভাবে তার যৌথ অংশ (Proportionate Share) ভাড়া দিতে আগ্রহী হয়, তাহলে সেটা অপর কোনো শরিকের নিকট দেওয়া যাবে, তেমনি তৃতীয় কাউকেও

---

১ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২২; আল মাবসূত, সারাখসী রহ., খ. ১৪, পৃ. ১৭১

ভাড়া দেওয়া যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, অপর শরিকদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। যেমন—জামাল, কামাল ও আদিল যৌথভাবে একটি বাড়ি ক্রয় করেছে। এরপর আদিল তার অংশ ভাড়া দিতে চাইল, তাহলে সে তা জামাল ও কামালকে যেমন দিতে পারে, তেমনি বাইরের কাউকেও দিতে পারে।

২. ৪. ২. ২. ভাড়াগ্রহীতা (Lessee)

১. ভাড়াদাতার ন্যায় ভাড়াগ্রহীতাও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে, বুঝমান হতে হবে। যা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

২. ভাড়াগ্রহীতা একাধিক হতে পারে।

৩. ভাড়াগ্রহীতা অমুসলিম হতে পারে। তবে যেই হোক তার আয়ের উৎস হালাল থাকতে হবে, যা থেকে সে ভাড়া শোধ করবে।

২. ৪. ৩. ভাড়াকৃত বস্তু

ভাড়াচুক্তির অন্যতম উপাদান 'ভাড়াকৃত বস্তু'। এ বিষয়ক বিস্তারিত শরীয়াহ মূলনীতি উল্লেখ করা হলো :

১. যে বস্তুটি ভাড়া দেওয়া হবে, সেটি এমন হতে হবে, যার মূল অক্ষুণ্ন রেখে এর থেকে উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং দুধ পানের জন্য গরু ভাড়া দেওয়া যাবে না।

২. ভাড়াচুক্তি যদি সুনির্দিষ্ট বস্তুতে না হয়; বরং 'ব্যক্তির যিম্মায় আবশ্যক হয়' (An asset undertaken by the lessor), তাহলে এতে মালিকানা অর্জন না করেও ভাড়াচুক্তি করা যাবে। (বিস্তারিত আসছে)

৩. ভাড়াগ্রহীতা কোনোক্রমেই ভাড়াকৃত বস্তুর মালিক নয়। সে কেবল এর উপকারের (Usufruct) মালিক। তাই এর রিস্ক গ্রহণ করবে মালিক। ভাড়াটিয়া নয়। ভাড়াটিয়া আমানতের সাথে তা ব্যবহার করবে। কোনোরূপ খেয়ানত করবে না। যেমন, বাড়ির রং নষ্ট করা, বিনা প্রয়োজনে দেওয়ালে পেরেক মারা, আঁকাআঁকি করা ইত্যাদি। বর্তমানে ভাড়া বাসা-বাড়িতে ব্যাপকভাবে এগুলো হয়ে থাকে। এসব আচরণ যে আমানাহ পরিপন্থী, তা আমরা ভুলতে বসেছি।

৪. লিজকৃত বস্তু গ্রহীতার নিকট আমানতস্বরূপ। তাই এর ঝুঁকি তার ওপর বর্তাবে না। তার কোনো সীমালঙ্ঘন না থাকলে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব মালিকের ওপর বর্তাবে। কারণ এর মালিকানা ভাড়াদাতার। তাই ঝুঁকিও তাকে বহন করতে হবে।

অবশ্য ভাড়াগ্রহীতার কোনো গাফলতি (Negligence) বা চুক্তিপরিপন্থী কোনো কাজ এর কারণে ক্ষতি হলে ওই পরিমাণ ক্ষতি প্রমাণসাপেক্ষে গ্রহীতার ওপর বর্তাবে।

৫. লিজকৃত সম্পদ উভয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। ধরা যাক, করীম সাহেব জামিল সাহেবকে বলল, আমি আপনাকে আমার দুটি দোকান থেকে একটি ভাড়া দিলাম। জামিল সাহেব তা মেনে নিলেন। তাহলে এমন লিজ বাতিল। কারণ, দোকান নির্দিষ্ট হয়নি।

৬. ইজারাকৃত বস্তুটি যদি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়, তবে সেদিন থেকেই ইজারা চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।

৭. লিজ এমন বস্তুর হতে হবে, যার এমন কোনো ব্যবহার রয়েছে, যা মূল্যবান। সুতরাং যার এমন ব্যবহার নেই, সেটা লিজ দেওয়া যাবে না। অতএব, মূল্যহীন বস্তু ভাড়া দিয়ে সুদ গ্রহণের কোনো অপকৌশলের আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

৮. উরফ (সামাজিক প্রচলন) বা চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াকৃত বস্তু থেকে ভাড়াটিয়া উপকৃত হবে। ব্যবহার ও ভোগে সীমালঙ্ঘন করবে না।

৯. ভাড়াচুক্তিতে যেভাবে কথা হয়েছে, সেভাবেই ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহার করবে। এর ব্যতিক্রম করবে না। যদি ব্যবহারের নীতিমালা নিয়ে চুক্তিতে কোনো আলোচনা না হয়, তবে সেক্ষেত্রে উরফ অনুযায়ী সাধারণত যে বস্তুর ব্যবহার যেভাবে করা হয়, সেভাবেই ব্যবহার করবে। এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন—উমর একটি প্রাইভেট কার শহীদ থেকে ভাড়া নিয়েছে। চুক্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, উমর কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারটি ব্যবহার করবে। সুতরাং এরপর উমর একে ভাড়ায় খাটাতে পারবে না। আর এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা না হয়ে থাকলে উরফ অনুযায়ী ব্যবহার করবে। সুতরাং মাল বহনের (Loading) জন্য ব্যবহার করতে পারবে না।

১০. যে বস্তুটি ভাড়া দেওয়া হবে, সেটি হতে পারে নগদ নির্দিষ্ট কোনো বস্তু। যেমন—নির্দিষ্ট গাড়ি আছে। সেটিই ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হলো।

১১. ভাড়াচুক্তি সুনির্দিষ্ট বস্তুতে না হয়ে; বরং অনির্দিষ্টভাবে ভাড়াদাতার দায়িত্ব ও যিম্মায়ও আবশ্যক হতে পারে। পরিভাষায় একে 'মাওসুফ ফিয-যিম্মা' বা An asset undertaken by the lessor (ব্যক্তির যিম্মায় যা আবশ্যক হয়) বলে।

এর অর্থ হলো, কোন গাড়িটা ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হবে সেটি নির্দিষ্ট থাকবে না; বরং এর মডেল, আসন সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, ব্র্যান্ড নেইম ইত্যাদির মাধ্যমে বিবরণ দেওয়া হবে। এরপর ভাড়াদাতার দায়িত্ব হলো, সেই বিবরণ অনুযায়ী গাড়ির ব্যবস্থা করা।

যেহেতু এখানে গাড়ি নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই সুনির্দিষ্ট কোনো গাড়ি ভাড়াগ্রহীতা দাবি করতে পারবে না। যেই গাড়িই হোক, বিবরণ অনুযায়ী হলেই হবে। সেটি গ্রাহক নিতে বাধ্য থাকবে।

তেমনিভাবে, ভাড়াদাতা বিবরণ অনুযায়ী কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করার পর সেটি অন্য কাউকেও দিতে পারে। এরপর সে ওইরকম আরেকটি গাড়ি প্রথম গ্রাহককে প্রদান করবে। তদ্রূপ যে গাড়ির ব্যবস্থা সে করেছিল, সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে, তাহলে এর স্থানে অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু এর বিপরীতে গাড়ি যদি মূল চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করা হতো, তাহলে সেটি ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে মূল ভাড়াচুক্তি বাতিল হয়ে যেত। অপরদিকে An asset undertaken by the lessor-এর মধ্যে একটা ধ্বংস হয়ে গেলে ওই বিবরণ অনুযায়ী আরেকটি দিতে হবে। উক্ত দ্বিতীয় প্রকারটি হানাফী মাযহাবে স্বীকৃত নয়। শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবে স্বীকৃত। এ্যাওফি এটিই গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে এ্যাওফি যে নির্দেশনা প্রদান করেছে, তা হলো :

- বিবরণ যথাযথ ও স্পষ্ট হতে হবে। যেন পরবর্তী সময়ে কোনো প্রকার ঝগড়া সৃষ্টি না হয়।

- ভাড়াদাতার সক্ষমতা থাকতে হবে, সে হয় প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ভাড়া দেওয়ার জন্য বস্তু তৈরি করবে অথবা সংগ্রহ করবে।
- অগ্রিম ভাড়া প্রদান করা জরুরি নয়। তবে তা যদি 'সালাম' চুক্তি হিসেবে করা হয়, 'সালাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অগ্রিম ভাড়া প্রদান করতে হবে। যেমন 'সালাম চুক্তিতে' অগ্রিম মূল্য প্রদান করা আবশ্যক। যে পরিমাণ ভাড়া প্রদান করা হবে, ঠিক সে অনুযায়ী ভাড়াচুক্তি হবে। সুতরাং শুধু প্রথম মাসের ভাড়া দিলে, প্রথম মাস পর্যন্ত ভাড়া সালাম চুক্তি হবে। পরবর্তী মাসে আবার চুক্তি নবায়ন করতে হবে।
- বিবরণ অনুযায়ী ভাড়াদাতা বস্তু সরবরাহ করতে না পারলে সেক্ষেত্রে ভাড়াগ্রহীতা কৃত চুক্তি রহিত করতে পারবে; এবং বিবরণ অনুযায়ী ভাড়া বস্তু প্রদানের তলব করবে।[১]

১২. যে বস্তু ভাড়া দেওয়া হবে, সেটি যদি সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং ভাড়া শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে এতে ভাড়াদাতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মালিকানা হতে পারে সরাসরি মূল বস্তুর মালিকানা অথবা শুধু ভোগ মালিকানা। এই দুই পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতেও যদি মালিকানা না থাকে, তাহলে তাতে সুনির্দিষ্টভাবে ভাড়াচুক্তি করা যাবে না।

১৩. ভাড়া পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রথমে সম্পত্তি ক্রয় করে। এরপর তা গ্রাহকের কাছে ভাড়ায় প্রদান করে। এরপর ক্রমান্বয়ে এর মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। (সামনে এইচপিএসএম-এর আলোচনায় তা বিস্তারিতভাবে এসেছে)

এক্ষেত্রে ক্রয়ের সময় গ্রাহকের নামে পণ্যের রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। যদিও এর পূর্ণ বা আংশিক মালিকানা প্রতিষ্ঠানেরও থাকে। তবে সেক্ষেত্রে গ্রাহকের পক্ষ থেকে একটি 'পাল্টা চুক্তি' (Counter dead) থাকা উচিত। এর মাধ্যমে, ভাড়াগ্রহীতা/গ্রাহক লিখিতভাবে এই ঘোষণা প্রদান করবে যে, 'গাড়ি বা যে বস্তুটি ভাড়ায় গ্রহণ করা হয়েছে/হবে, এটি যদিও আমার নামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, তবে বাস্তবে এর আংশিক

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৩/৫

বা পূর্ণ (যখন যা প্রযোজ্য) মালিক ভাড়াদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক।"[1]

১২. রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) করার দায়িত্ব। যেসব বস্তু ভাড়া দেওয়া হয়, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত করতে হয়। ইংরেজিতে একে Maintenance বলে। এটি দুই প্রকার। যথা :

ক. মূল রক্ষণাবেক্ষণ (Major Maintenance)

খ. ব্যবহার সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ (Operating Maintenance)

Major Maintenance বলতে বোঝায়, বস্তুর এমন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, যা না করা হলে এর থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। যেমন, ভাড়া বাসার গ্যাসলাইন লিক হয়ে যাওয়া, পানির মটর নষ্ট হওয়া, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি। ব্যবহারের সাথে যার সম্পর্ক নেই।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব দায় ও দায়িত্ব ভাড়াদাতার ওপর। এগুলো ঠিক করার দায়িত্ব ভাড়াটিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ভাড়াচুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। কনভেনশনাল বাণিজ্যিক ভাড়াচুক্তিতে এক্ষেত্রে সকল দায় ও দায়িত্ব ভাড়াটিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যা অন্যায় ও শরীয়াহ পরিপন্থী।

অবশ্য ইসলামী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যেহেতু Maintenance সেবা দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না, তাই এক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার সাথে এরূপ চুক্তি করা যাবে, সে ব্যাংকের পক্ষে Major Maintenance-এর কাজগুলো করে দেবে। এর খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

অপরদিকে Operating Maintenance হলো, ছোটখাটো মেরামত, যা কাজ/ব্যবহার করতে গিয়ে প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন—গাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে ছোটখাটো কোনো পার্স পরিবর্তন করা, ওয়াস করা, বাড়ির ক্ষেত্রে পানির কল ঠিক করা, বিদুৎ সুইচ ঠিক করা ইত্যাদি। ব্যবহার করার সময় যা উদ্ভূত হয়। এগুলোর দায় ও দায়িত্ব ভাড়াটিয়ার ওপর থাকবে।[2]

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা.৩/১

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৫/১/৭

আজকাল দেখা যায়, বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে এরূপ শর্ত করা হয়, 'বাড়ির ফিটিংস যেভাবে দেওয়া হয়েছে, হুবহু সেভাবেই সংরক্ষণ করতে হবে। যদি তা নষ্ট হয়, তাহলে তা ভাড়াটিয়া বহন করবে'। অথচ 'বাড়ির ফিটিংস' একটি ব্যাপক বিষয়। এর মাঝে দেয়াল ভেঙে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত। যা ভাড়াটিয়ার সীমালঙ্ঘন ছাড়াও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে দেখতে হবে, ভাড়াটিয়ার কোনো ত্রুটি আছে কি না। ত্রুটি না থাকলে সেটি বাড়ির মালিককেই বহন করতে হবে। ভাড়াটিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

২. ৪. ৩. ১. হারাম বস্তুর ভাড়া বা হালাল ভাড়া বস্তুর হারাম ব্যবহার : শরীয়াহ নীতিমালা

বর্তমানে ভাড়া চুক্তিতে দুটি বিষয় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। যথা, এক. হালাল বস্তু ভালো উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভাড়াটিয়া তা অবৈধ কাজে ব্যবহার করে। দুই. সরাসরি হারাম বস্তু ভাড়া প্রদান করা। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ নীতিমালা আলোচনা করা হলো।

২. ৪. ৩. ১. ১. হারাম কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার স্তর

হারাম কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা—

এক. সরাসরি নিজে হারাম কাজ করা।

দুই. সরাসরি নিজে হারাম কাজ করা নয়। তবে অন্যকে হারাম কাজ করতে সহযোগিতা করা।

তিন. নিজে সরাসরি হারাম কাজ করা নয়। অন্যকে সহযোগিতা করাও নয়। তবে হারাম কাজ সংগঠিত হওয়ার সবব বা কারণ (The reason) হওয়া। প্রত্যেকটির বিধান ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

বিধান

প্রথমটি বিলকুল হারাম। দ্বিতীয়টিও নিষিদ্ধ ও গুনাহ। এর দলিল সূরা মায়েদার ২ নং আয়াত-(তরজমা) 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে

একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ্ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ্কে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।'

ফিকহের ভাষায় এ স্তরকে বলা হয়—'ইয়ানত আলাল মাআসিয়্যাত' (الإعانة على المعصية)। অর্থাৎ পাপ কাজে সহযোগিতা করা (Helping others in sin)। এর পরিচিতি হলো—

পাপ কাজটি সংঘটিত হওয়ার পেছনে সহযোগিতাকারীর ভূমিকা প্রধান। একমাত্র তার সহযোগিতায়ই পাপ কাজটি সংঘটিত হয়েছে। পাপ কাজটি পাপী করলেও এর সাথে সহযোগিতাকারীর সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হয় না।

এর তিনটি প্রকার রয়েছে। তা হলো—

ক. সহযোগিতার নিয়ত করা। যেমন, পাপ কাজে সহযোগিতা করার নিয়তে গানের সি.ডি. ভাড়া দিল। ঘর ভাড়া দিল যেন পতিতাবৃত্তিতে সহযোগিতা হয়।

খ. মূল চুক্তিতে গুনাহের কথা উল্লেখ থাকবে। যেমন, কেউ বলল, আমার কাছে আপনার বাড়িটি ভাড়া দিন। তাতে আমি মদের বার খুলব অথবা সিনেমা হল করব। ইত্যাদি।

গ. এমন বস্তু বিক্রি করা যার একমাত্র ব্যবহার গুনাহের কাজে হয়ে থাকে। অথবা এমন বস্তু ভাড়া দেওয়া, যার একমাত্র ব্যবহার গুনাহের কাজে হয়ে থাকে। যদিও মূল চুক্তিতে গুনাহের কাজে ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ না করা হয়।

উপর্যুক্ত তিন প্রকারেই মূল পাপ কাজটি অন্য কেউ করলেও তা সংঘঠিত হওয়ার পেছনে সহযোগিতাকারীর ভূমিকাই প্রধান। তা হলো, পাপ কাজের নিয়ত করা। হয় স্পষ্টভাবে, না হয় বিধানগত দিক থেকে। সুতরাং এখানে চুক্তির উভয় পক্ষ গুনাহগার হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই গুনাহ টা চুক্তির মাধ্যমেই হয়ে গেছে। সুতরাং পরবর্তীতে গুনাহের কাজে ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহার না করলেও চুক্তির গুনাহ থেকে যাবে।

তৃতীয় প্রকার : তা হলো, নিজে সরাসরি হারাম কাজ করা নয়। অন্যকে সহযোগিতা করাও নয়। তবে হারাম কাজ সংঘটিত হওয়ার সবব বা কারণ (The reason) হওয়া। একে ফিকহের পরিভাষায় 'তাসাব্বুব' (التسبب) বলা হয়।

এর পরিচিতি হলো, পাপ কাজটি সরাসরি সহযোগিতাকারীর কারণে হয় না। বরং সে কাজটির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ/মাধ্যম হয়।

বিধান

এটিও মৌলিকভাবে হারাম। কুরআনে কারীমে এসেছে— 'হে মুসলিমগণ, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (ভ্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিণামে তারা অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে।'[১]

দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির (ইয়ানত ও তাসাব্বুব) মাঝে মোটা দাগের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ—

ক্র. নং	ইয়ানত (Helping others in sin)	তাসাব্বুব (The reason)
০১	এটি সাধারণত পাপ কাজের সাথে সরাসরি নিয়তের দিক থেকে সম্পৃক্ত হয়।	এটি সরাসরি পাপ কাজের সাথে কর্মগত দিক থেকে সম্পৃক্ত হয়।
০২	পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখে।	পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হয়।
০৩	এটি হারাম।	এটি ক্ষেত্র বিশেষ কখনো হারাম, কখনো মাকরুহ হয়।

এখানে ভাবার বিষয় হলো, 'তাসাব্বুব' (The reason) একটি বিস্তৃত বিষয়। সব ধরনের মুবাহ কাজও 'তাসাব্বুব' এর মধ্যে এসে যায়। যদি একে ব্যাপক রাখা হয় তবে দুনিয়ার কোনো মুবাহ কাজই হয়ত জায়েয থাকবে না। যেমন, গ্রামের কৃষক ফসল করার পর অনেকেই

১ সূরা আনআম : ১০৮

তা খায়। ভালো-মন্দ সকল মানুষই তা গ্রহণ করে। এর মধ্যে চোরও আছে। এভাবে চিন্তা করলে কোনো মুবাহ্ কাজই বৈধ থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী একটি সীমারেখা অবশ্যই থাকবে।

এই সীমারেখা (Boundary) নির্ধারণ কাজ সহজ নয়। অত্যন্ত জটিল কাজ। হাদীস ও ফিকহের যাবতীয় মূলনীতি সামনে রেখে তা নির্ণয় করতে হবে। বিষয়টি অতি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় এ নিয়ে মতভেদ থাকাও স্বাভাবিক। আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। ফকীহগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো।

'তাসাব্বুব' (The reason) এর প্রকার

'তাসাব্বুব' (The reason) দু' ভাগে বিভক্ত। যথা—

ক. নিকটবর্তী সবব (কারণ)।

খ. দূরবর্তী সবব (কারণ)।

নিকটবর্তী সবব

নিকটবর্তী সবব আবার দু ধরনের। যথা—

এক. হারাম। এই প্রকার সববের বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. সহযোগিতাকারী পাপ কাজটি ঘটার শক্তিশালী মাধ্যম হওয়া।

খ. সহযোগিতাকারীর সহযোগিতা যদি না হত তাহলে সাধারণত পাপ কাজটি ঘটার বাহ্যিক কোনো কারণ থাকত না।

উদাহরণ, হিন্দুদের দেবতাদেরকে গালিগালাজ করা, অশ্লীল মুভি তৈরি করা, পর্ণো ছড়ানো, অশ্লীল মুভির সি.ডি. ভাড়া দেওয়া, ইত্যাদি।

বিধান : এসব সবব এত শক্তিশালী যে তা মূল পাপ কাজ করারই নামান্তর। এজন্য যে 'সবব' হলো তার দিকেও পাপ কাজের নিসবত হবে। যদিও মাঝে আরেক ব্যক্তি পাপ করে। তাই এ ধরনের সববের শিকার হওয়া হারাম।

দুই. মাকরুহে তাহরীমী। এই প্রকার সববের বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. পাপ কাজটি ঘটার একমাত্র শক্তিশালী মাধ্যম নয়।

খ. সহযোগিতাকারী পাপ কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে কেবল সহায়ক হওয়া।

গ. পাপ কাজটি বস্তুর মূলের সাথেই সম্পৃক্ত। পাপ কাজের জন্য স্বতন্ত্র কোনো পরিবর্তন বা কাজ করতে হয় না।

ঘ. পাপ কাজ ঘটার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকা। চুক্তিতে স্পষ্ট না বলা, নিয়তও না থাকা।

উদাহরণ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত অমুসলিমদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা, ফেতনাবাজদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা, মদের বারের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া, অমুসলিমদের উপাসনালয়ের জন্য জমি বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া, সুদী ব্যাংক করার জন্য বাড়ি বা দোকান ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

বিধান

এসব সববের শিকার হওয়া মাকরুহে তাহরীমী। তবে জানা না থাকলে মাযুর বলে গণ্য হবে। এরপর যখন জানবে তখন চুক্তি রহিত করবে।

আর যদি চুক্তিতে পাপ কাজের কথা স্পষ্ট বলা থাকে অথবা পাপ কাজে সহযোগিতা করার নিয়ত থাকে তবে তো তা দ্বিতীয় প্রকার তথা 'ইয়ানত আলাল মাআসিয়্যাত' (Helping others in sin) এর মধ্যে ঢুকে যাবে, যা কঠিনভাবে হারাম।

দূরবর্তী সবব

এটিও দু ধরনের। যথা—

এক. মাকরুহে তানযিহী। এই প্রকার সববের বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. যে অবস্থায় আছে এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বস্তু দিয়ে পাপ কাজ করা যাবে না।

খ. পাপ কাজ করতে হলে তাতে স্বতন্ত্র কাজ করতে হবে।

গ. সংশ্লিষ্ট বস্তুটি সরাসরি পাপ কাজের কোনো মাধ্যম হওয়া।

উদাহরণ, ফেতনাবাজদের নিকট লোহা বিক্রি করা, এরপর সেটা দিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তৈরি করা ইত্যাদি।

বিধান

এসব সববের শিকার হওয়া মাকরুহে তানযিহী। কারণ, মাঝে স্বতন্ত্র কাজ করতে হয়। তবে সহযোগিতার নিয়ত থাকলে তা 'ইয়ানত আলা মাআসিয়্যাতের' মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুই. বৈধ। তা হলো পাপ কাজের সাথে সম্পর্কটা দূরবর্তী সম্পর্ক। সেটা সরাসরি পাপ কাজের কোনো মাধ্যম নয়। মাঝে একাধিক মধ্যস্থতা থাকে। যেমন, মুদী দোকানের জন্য দোকান ভাড়া দিলেন। সেই দোকান থেকে সুদখোরও তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে। এগুলো বৈধ।

আমাদের সমাজে এ ধরনের কাজই বেশি। অনেকে ভুল করে এসবকে পাপ মনে করে থাকে। আর বলে, সুদ থেকে তো বাঁচা সম্ভব নয়। যেমন, মুদী দোকান থেকে যে পণ্য কিনবেন সেটাতো সুদী লোন দিয়ে কোম্পানি তৈরি করেছে। গাড়িতে উঠবেন, ওই গাড়ি তো সুদী লোনে ক্রয় করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়া নিবেন, ওই বাড়ি তো বাড়ির মালিক সুদী লোন দিয়ে বানিয়েছে ইত্যাদি। এসব স্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ, সুদী লোন দিয়ে বাড়ি তৈরি ও সেই বাড়ি ভাড়া নেওয়া স্বতন্ত্র দুটি বিষয়। অনেক দুর্বলচিত্তের লোকেরা এসব কারণে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হয়।[১]

দ্যা এসেম্বলি অব মুসলিম জুরিস্টস, আমেরিকা-এর শরীয়াহ সিদ্ধান্ত

১৪২৮ হিজরি/২০০৮ ইং. সনে বাহরাইনে আমেরিকার 'মাজমাউ ফুকাহাউশ শারীয়াহ' (The Assembly of Muslim Jurists At America) তাঁদের পঞ্চম সেমিনারে এ বিষয়ে মৌলিক কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সংক্ষেপে রেজুলেশনটি বেশ সমৃদ্ধ ও চমৎকার। তা হলো—

---

১ জাওয়াহিরুল ফিকহ (নতুন এডিশন), খ. ৭, পৃ. ৫১০; ফিকহুল বুয়ু, খ. ১, পৃ. ১৮৯-১৯৪

পাপ কাজে সহযোগিতা করার চারটি স্তর হতে পারে। যথা—

ক. সরাসরি ও ইচ্ছাকৃত (Intentional) পাপ কাজে সহযোগিতা হবে। যেমন, কাউকে মদ দেওয়া হলো, যেন সে তা পান করে। (مباشرة مقصودة)

খ. সরাসরি পাপ কাজে সহযোগিতা করা হবে। তবে নিয়ত থাকবে না। যেমন, হারাম কোনো পণ্য বিক্রয় করা, যার বৈধ কোনো ব্যবহার নেই। (مباشرة غير مقصودة) এটি তখনি, যখন হারাম কাজে সহযোগিতার নিয়ত থাকবে না।

গ. পাপ কাজে সহযোগিতা করার ইচ্ছা আছে, তবে সেটা সরাসরি সহযোগিতা নয়। যেমন, সিগারেট বা মদ খাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। (مقصودة غير مباشرة)

ঘ. সরাসরি সহযোগিতা নয়, ইচ্ছাও নেই। যেমন, এমন বস্তু বিক্রয় করা, যার বৈধ ব্যবহারও আছে। মোবাইল, ল্যাপটপ বিক্রয় করা এর অন্তর্ভুক্ত। (غير مباشرة، ولا مقصودة)

উক্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ছিল উপর্যুক্ত চার প্রকারের মাঝে প্রথম তিন প্রকার নিষিদ্ধ ও অবৈধ। শুধু চতুর্থ প্রকার বৈধ।[১]

তবে অন্যান্য ফকীহগণ উক্ত চতুর্থ প্রকারের সাথে এটি যুক্ত করেছেন যে, এক্ষেত্রে যদি নিশ্চিত বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানা যায়, ক্রেতা/গ্রাহক এর অবৈধ ব্যবহার করবে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাও অবৈধ হয়ে যাবে। এজন্য ফকীহগণ বলেছেন, যার কাছে আঙুর বিক্রয় করা হবে, যদি জানা যায়, সে তা দিয়ে মদ বানাবে, তাহলে তার কাছে আঙুর বিক্রয় করা যাবে না। তবে এর জন্য স্ব-প্রণোদিত হয়ে আলাদা করে ইনভেস্টিগেশন করা জরুরি নয়।

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে আরো কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

---

১ ইসলাম সুওয়াল জওয়াব, প্রশ্ন নং: ২৪৭৫৮৬। (লিংক : https://islamqa.info/ar/answers/247586/ضابط-الاعانة-المحرمة-على-المعصية)

২. ৪. ৩. ১. ২. সি.ডি. বিক্রি/ভাড়ার ব্যবসার জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া

এখানে সি.ডি. দ্বারা উদ্দেশ্য অনৈসলামিক মুভির সি.ডি.। এটি নিকটবর্তী সববের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। মাকরুহে তাহরীমি। কারণ, তাতে পাপ কাজের নিয়ত নেই। তবে বিষয়টির ব্যাপারে মালিক অজ্ঞাত নয়।

এক্ষেত্রে সি.ডি. ব্যবসার করার গুনাহ্ ব্যবসায়ীর হবে। দোকান মালিকের নয়। তাই প্রাপ্ত ভাড়া যদিও হারাম হবে না। তবে সহযোগিতা করার জন্য স্বতন্ত্র গুনাহ্ হবে। অতএব দোকান মালিকের জন্য এ ধরনের ব্যবসার জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া জায়েয নয়। বিশেষত এলাকাটি যদি মুসলিম পল্লী হয়। আগে থেকে সেখানে সি.ডি.-এর প্রচলন না থাকে। তাহলে সেক্ষেত্রে কারো মতেই সি.ডি. দোকানের অনুমোদন দেওয়া বৈধ হবে না। সর্বসম্মতিক্রমে তা অবৈধ হবে। তাই এ ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরি।[১]

২. ৪. ৩. ১. ৩. সুদী ব্যাংকের নিকট বাড়ি ভাড়া দেওয়া

সুদী ব্যাংকের জন্য বিল্ডিং বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ নয়।[২] কারণ, তা 'ইয়ানাত আলা মাআসিয়্যাহ' এর অন্তর্ভুক্ত।[৩]

---

১ কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১২, পৃ. ৪৮৯; ইমদাদুল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৫৩৫

২ এ্যাওফি, স. ৯. ধা. ৫/১/১। যেমনটি আমরা দেখেছি, এটি এ্যাওফির সিদ্ধান্ত। অপরদিকে কারো মতে, ব্যাংকে যেহেতু শুধু সুদী লেনদেনই হয় না। বৈধ কিছু কাজও হয়ে থাকে। যেমন, বিল গ্রহণ করা, টাকা ট্রান্সফার করা ইত্যাদি। তাই ব্যাংকের কাছে বাড়ি ভাড়া দেয়া যাবে। তবে বিরত থাকা উত্তম। (ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া, খ. ৫, পৃ. ৬০৮)

৩ এ ব্যাপারে মুফতি তাকী উসমানী হাফি. বলেছেন, সুদী ব্যাংকের কাছে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার দুটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা—ক. বাড়িটি তৈরিই করা হয়েছে সুদী ব্যাংকের জন্য উপযোগী করে। একে অন্য কাজে ব্যবহার করা সহজ নয়। এরপর তাকে তাদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এটি হারাম। খ. বাড়িটি সাধারণ। ব্যাংকের জন্যই আলাদা করে তৈরি করা হয়নি। তাহলে সেটি ব্যাংকের কাছে ভাড়া দেওয়ার পর, ব্যাংক তাতে সুদী কাজ করলে তা ভাড়াদাতার জন্য হারাম হবে না। মাকরুহ হবে। তিনি বলেছেন, এটিই আমার পিতা মুফতি শফী রহ.-এর গবেষণা। (দুরুসুল মাআয়ির, পৃ.) উল্লেখ্য, প্রাপ্ত ভাড়ার ব্যাপারে মাসআলা হলো, যেসব কোম্পানি বা ব্যক্তির অধিকাংশ আয়

পক্ষান্তরে ব্যাংকের অন্য কোনো কাজের জন্য যদি ভাড়া নেওয়া হয়। যেমন, গোডাউনের জন্য ভাড়া। তবে তা বৈধ হবে।[1]

২. ৪. ৩. ১. ৩. গানের কনসার্টের জন্য মিউজিক ইন্সট্রুমেন্ট ভাড়া দেওয়া

যেহেতু এটি নিশ্চিত যে, মিউজিক ইন্সট্রুমেন্টগুলো হারাম কাজে ব্যবহৃত হবে, তাই তা নাজায়েয ও মাকরুহে তাহরীমি হবে। উপার্জনও হারাম হবে।

২. ৪. ৩. ১. ৪. ব্যাংকারের নিকট বাড়ি ভাড়া

ইনকামের একমাত্র উৎস যদি হয় সুদী ব্যাংকের চাকরি এবং ভাড়াও সেই ব্যাংক-সেলারি থেকে প্রদান করে তবে এমন লোকের নিকট বাড়ি ভাড়া প্রদান যদিও বৈধ। তবে তার হারাম অর্থ থেকে ভাড়া গ্রহণ হালাল নয়।[2] এমনকি উলামায়ে কেরাম বলেছেন, সুদখোর বাড়িওয়ালার ভাড়াটিয়া হওয়াও কাম্য নয়।

২. ৪. ৩. ১. ৫. হারাম টাকায় নির্মিত বাড়ি ভাড়া নেওয়া

হারাম টাকায় নির্মিত বাড়ির দুটি অর্থ। যথা—

ক. সুদী লোন নিয়ে বাড়ি করা। এই বাড়ি হালাল। কারণ, লোনের মালিক গ্রহীতা। তবে সুদ আদান-প্রদান হারাম। যেহেতু মূল বাড়ি হালাল, তাই তাতে থাকাও হালাল। এটিই বেশি হয়ে থাকে।

হারাম। তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা, দাওয়াত খাওয়া বৈধ নয়। তবে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি আর্থিক চুক্তির মধ্য দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা ইমাম কারখী রহ.-এর মতানুযায়ী সুযোগ আছে। শর্ত হলো, এই টাকা নির্দিষ্ট হারাম সম্পদ থেকে দেওয়া হচ্ছে বা এটি সরাসরি নির্দিষ্ট হারাম টাকা—এভাবে না বলা। হ্যাঁ, উত্তম হলো, যথাসম্ভব এর থেকেও বেঁচে থাকা। তাই শুরুতেই হালাল উৎস থেকে বিনিময়/ভাড়া প্রদান করতে হবে এমন সমঝোতা করে নেওয়া ভালো। (দারুল উলুম দেওবন্দ, ফতোয়া অনলাইন, প্রশ্ন নং : ১৭৬৬৯২)

১ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ১৯৪

২ ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭-এর অবলম্বনে।

খ. প্রাপ্ত সুদ দিয়ে বাড়ি করা। এটি দুর্লভ। এই বাড়ি হারাম। এ ধরনের বাড়ি ভাড়ায় গ্রহণ করার ব্যাপারে মুফতি আযীযুর রহমান উসমানী রহ. ফতোয়া দিয়েছেন—'হারাম অর্থে নির্মিত বাড়ির মধ্যে অবশ্যই নাপাকী রয়েছে। তাই তাতে থাকা ভালো নয়। তদুপরি যে থাকবে তার জন্য বৈধতা আছে। তাতে থাকা হারাম নয়। তবে বাড়ির মালিকের জন্য ভাড়ার অর্থ ঠিক নয়।'[১]

প্রকাশ থাকে যে, আলোচিত উদাহরণের বাহিরেও নানাভাবে হারাম পন্থায় ভাড়া চুক্তির ছড়াছড়ি রয়েছে। তাই এসব ক্ষেত্রে সচেতন থাকা জরুরি। একটু চেষ্টা করলে সহজেই হারাম থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

২. ৪. ৪. ভাড়া বা বিনিময়

ভাড়াচুক্তির অন্যতম বিষয় হলো বিনিময় বা ভাড়া। এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ নীতিমালা পেশ করা হলো :

১. মূল ভাড়াচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর তাতে ভাড়াদাতার অধিকার ও হক প্রতিষ্ঠা হয়—

ক. চুক্তির পর ভাড়াটিয়া এর থেকে উপকার গ্রহণের মাধ্যমে।

খ. অথবা উপকার গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগিতা সৃষ্টির পর সেটা ভাড়াটিয়ার কাছে অর্পণের পর। শুধু চুক্তির মাধ্যমে ভাড়ায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।[২]

২. উপকার-গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করে ভাড়াকৃত বস্তু যখন গ্রহীতার নিকট অর্পণ করে দেওয়া হবে, তখন থেকে ভাড়া শুরু হবে। এর আগে নয়। সুতরাং ভাড়াচুক্তির সাথে সাথে ভাড়া গণনা শুরু হবে না।

৩. ভাড়া অনিবার্য হওয়ার মূল ভিত্তি হলো, ভাড়াকৃত বস্তু ভাড়াগ্রহীতাকে অর্পণ করা। যেমন—বাড়ি অর্পণ করা, গাড়ি অর্পণ করা। এরপর তা ব্যবহার করা হলো কি না, তা বিবেচ্য নয়। সুতরাং বাড়ি ভাড়া নেওয়ার

---

১ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, খ. ১৫, পৃ. ৩২৫-৩২৬

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৫/২/২

পর মালিক যখন বাড়ি বুঝিয়ে দেবে, তখন থেকেই ভাড়া গণনা শুরু হবে। যদিও তা ব্যবহার না করা হয়।

৪. ভাড়ার পরিমাণ চুক্তির শুরুতেই নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। এটি বৈধ আছে যে, একেক সময়ের জন্য একেক রকম ভাড়া নির্ধারণ করা। তবে চুক্তির সময়ই তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। ধরা যাক, আহমাদ তার একটি ঘর উমরকে ৫ বছরের জন্য ভাড়া দিল। প্রথম বছরের ভাড়া ১০ হাজার প্রতি মাসে। সাথে চুক্তিতে এটিও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক পরবর্তী বছরের ভাড়া পূর্বের বছরের চেয়ে ১০% বৃদ্ধি হবে। উভয় পক্ষ তা ভালো করে জ্ঞাত থাকলে, শতকরা হার বুঝলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

৫. কখনো এরকম চুক্তি হয় যে, এক বছর পর থেকে ভাড়া বৃদ্ধি হবে। যেমন ঢাকার কোনো কোনো বাড়িওয়ালা বলে থাকে।

মূলত এর অর্থ হলো, দ্বিতীয় বছর যে ভাড়া বৃদ্ধি হবে তা আগেই বলে রাখা। ভাড়াটিয়া যেন থাকা-না থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি দূষণীয় নয়। ভাড়াচুক্তি প্রতি বছর নবায়ন হতে পারে। তবে তা স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী হতে হবে। কোনো প্রকার যুলুম যেন না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

৬. ভাড়া নগদ মুদ্রায় নির্ধারণ হতে পারে, দ্রব্য দিয়েও হতে পারে। যেমন—বলা হলো এক মাস বাড়িতে থাকবে। বিনিময়ে তোমার অমুক অমুক বইগুলো আমাকে দিয়ে দিতে হবে।

৭. ভাড়া অন্য কোনো সার্ভিসও হতে পারে। যেমন, তোমাকে বাড়িতে থাকতে দেবো, বিনিময়ে তুমি আমার বাসার সকল ইলেক্ট্রনিক কাজ করে দিতে হবে।[১] অথবা তোমার গাড়ি আমাকে ব্যবহার করতে দেবে। তদ্রূপ ক্রয়-বিক্রয়েও মূল্য হিসেবে কোনো 'উপকার' হতে পারে। যেমন, মোবাইলটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম, বিনিময়ে তোমার ল্যাপটপটি আমাকে এক মাসের জন্য ব্যবহার করতে দিতে হবে।

৮. দান করতে বাধ্য করা (আন্ডারটেকিং টু ডোনেট)। ভাড়া/বেতন

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৫/২/১

একবার নির্ধারণ হয়ে গেলে সময়মতো পরিশোধ না করার কারণে অতিরিক্ত আদায়ের শর্তারোপ বৈধ নয়। তবে ভাড়ার ক্ষেত্রে এমন চুক্তি করা যাবে যে, যথাসময়ে ভাড়া পরিশোধ না করলে ভাড়াগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট অংশ ভাড়াদাতার চ্যারিটি ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে। ওই দানকৃত অংশটি মালিকপক্ষ নিজেদের মুনাফা হিসেবে গণ্য করবে না; বরং তা দান করে দেবে।[১]

বিশেষত ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল লিজ চুক্তিতে এটি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে উক্ত অনুদান যথাযথ জায়গায় দান করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।[২]

৯. জামানত বা সিকিউরিটি মানি গ্রহণ। দোকান বা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচলন হলো, ভাড়ার শুরুতেই দোকান বা বাড়ির মালিককে অগ্রিম কিছু টাকা প্রদান করতে হয়। অগ্রিম অর্থ প্রদান ছাড়া বর্তমান সমাজে দোকান বা বাড়িভাড়া পাওয়া কঠিন। বিশেষ করে শহরে এ বাস্তবতা অনেক বেশি।

উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত টাকাকে 'জামানত', 'এডভান্স', 'অগ্রিম', 'সিকিউরিটি মানি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

ফিকহী বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে সাধারণত উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ তিনটি ক্যাটাগরির হয়ে থাকে। যথা :

২. ৪. ৪. ১. সুদমুক্ত সিকিউরিটি মানি/জামানত

চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ভাড়ার শুরুতেই অগ্রিম এককালীন নগদ অর্থ ভাড়াটিয়া থেকে গ্রহণ করা হয়। একে সাধারণত সিকিউরিটি মানি বা জামানত বলে। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

ক. এটি সুদমুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

খ. ভাড়ার মেয়াদ শেষে এককালীন ফেরত দেওয়া হয়।

গ. ফেরত দেওয়ার আগ পর্যন্ত তা বাড়ি/দোকানের মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে।

---

১ এ্যাওফি স্ট্যান্ডার্ড নং : ০৯, ধারা : ৪/৬

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৬/৪

ঘ. ভাড়াটিয়া নির্ধারিত ভাড়া, বিল ইত্যাদি পরিশোধ না করলে তা উক্ত সিকিউরিটি মানি থেকে কর্তন করা হয়। তদ্রূপ ভাড়াকৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার সময় তাতে যদি ভাড়াটিয়ার কারণে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে এর ক্ষতিপূরণও এর থেকে কর্তন করে রাখা হয়।

ঙ. উক্ত টাকার সম্পূর্ণ রিস্ক ভাড়াদাতা মালিকপক্ষ বহন করে।

শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের দুটি বিশ্লেষণ (Classification) হতে পারে। যথা :

ঙ. ১. বন্ধক

শরীয়তের দৃষ্টিতে 'রাহান' বা 'বন্ধক' বলা হয়, ঋণের বিপরীতে কোনো সম্পদকে আর্থিক নিরাপত্তাস্বরূপ ধার্য করা। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে সেই সম্পদ দ্বারা অথবা সম্পদ বিক্রি করে লব্ধমূল্য দ্বারা ঋণ উসুল করা হবে।[১]

এতে বোঝা গেল, 'রাহান' মূলত ঋণের নিরাপত্তা। তাই 'রাহান' সর্বদা ঋণের বিপরীতে হয়। ঋণ ছাড়া 'রাহান' হয় না। যেমন—মূল্য ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় হয় না।[২]

প্রশ্ন হলো, বাড়ি বা দোকান ভাড়ায় তো পূর্ব কোনো ঋণ নেই। বিষয়টি তো এমন নয় যে, ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিক থেকে ঋণ নিয়েছে। সেটার বিপরীতে রাহান রেখেছে।

সুতরাং উক্ত অগ্রিম সিকিউরিটি টাকাকে 'রাহান' বলা শুদ্ধ নয়। পূর্ব ঋণ ছাড়া যেমন রাহান বিশুদ্ধ নয়, তেমনি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্যও রাহান বিশুদ্ধ নয়। এ জন্য অনেকেই একে রাহান বলতে চান না।[৩]

---

১ আল মাওসুয়াহ আল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা, খ. ২৩, পৃ. ১৭৫; ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৯৯

২ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০২

৩ দেখুন, শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ কৃত লেখা গ্রন্থ গাইরে সুদী ব্যাংকারী পৃ. ২৭১। তিনি তাতে লিখেছেন, 'একে রাহান বলা ঠিক নয়। কারণ, الرهن بالدرك সঠিক নয়।'
উল্লেখ্য, الرهن بالدرك হলো, কোনো কিছু বিক্রয়ের পর ক্রেতা পণ্য বুঝে নিয়েছে; কিন্তু ক্রেতা আশঙ্কা করছে, পণ্যের কোনো দাবিদার বের হয়ে আসবে। তখন পণ্য হাতছাড়া

অবশ্য ভাড়া শুরু হওয়ার পর যদি অগ্রিম টাকা নিয়ে থাকে তবে সেটাকে রাহান বলা যেতে পারে। কারণ, তখন ভাড়াটা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। তবে এটি সাধারণত হয় না। সাধারণত অগ্রিম সিকিউরিটি দেওয়ার পরই ভাড়া শুরু হয়। সুতরাং রাহানের বিশ্লেষণ সঠিক নয়। তাছাড়া রাহান বললে আরেক সমস্যা হলো, তখন ওই টাকার ব্যবহার গ্রহীতার জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণ, রাহানের বস্তু গ্রহীতার জন্য ব্যবহার বৈধ নয়; বরং সুদ।

৬. ২. করয

দ্বিতীয় বিশ্লেষণ হলো, উক্ত অগ্রিম টাকা মূলত প্রথমত আমানত। এরপর ভাড়াটিয়ার পক্ষ থেকে ব্যবহারের অনুমতিতে মালিকপক্ষ তা ব্যবহার করায় শেষ পর্যন্ত করযে রূপান্তর হয়েছে। গবেষক আলেমগণ এ মতামতই ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ, মুফতি ড. যুবায়ের আশরাফ উসমানী, ড. মাওলানা এজায আহমাদ সামদানীসহ প্রমুখ। বিশ্ব বিখ্যাত ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তানের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।[1]

১৯৯২ সালে জামিয়াতুর রাশাদ, আযীম গড়ে অনুষ্ঠিত হয় 'ইসলামী ফিকাহ একাডেমী ইন্ডিয়ার' পঞ্চম ফিকহী সেমিনার। তাতে উক্ত সিকিউরিটি মানির Shariah Status নিয়ে আলোচনা হয়। মজলিসে উপস্থিত ফকীহদের অনেকেই একে উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে করয সাব্যস্ত করেছেন।

হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার মূল্যের নিরাপত্তার জন্য বিক্রেতা থেকে অগ্রিম রাহান নিয়ে রাখে। এটি সঠিক নয়। কারণ, শরীয়তে রাহান মূলত পূর্ব কোনো দায় উসূলের জন্য বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এখানে কোনো দায় নেই। এর অবৈধতার ওপর ইবনে কুদামা রহ. ইজমা নকল করেছেন। দেখুন, আল মাওসুয়াহ আল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা, খ. ২৮, পৃ. ৩১৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২০৮; শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী, খ. ৩, পৃ. ১৪৫

১ দেখুন, গাইরে সুদী ব্যাংকারী, মুফতি তাকী উসমানী, পৃ. ২৭১, জাদীদ মায়াশী নেযাম মেঁ কানুনে ইজারা, ড. ইমরান আশরাফ উসমানী, পৃ. ৪৬৮; ইসলামী ব্যাংকু মেঁ রায়েজ ইজারা, ড. ইজায আহমদ সামদানী, পৃ. ৫৭-৬০

তন্মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত গবেষক আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ যায়েদ সাহেব।[১] আমাদের নিকটও উক্ত বিশ্লেষণ অগ্রগণ্য। সিকিউরিটি মানির যে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এর সাথে উক্ত ব্যাখ্যা অধিক সংগতিপূর্ণ।

এ ব্যাখ্যায় একটি প্রশ্ন হয়, উক্ত টাকাকে করয ধরা হলে, এর অর্থ দাঁড়ায়, ভাড়াটিয়া মালিককে করয দিয়েছে এ শর্তে যে, মালিক তাকে বাড়ি বা দোকান ভাড়া দেবে। এতে ইজারা ও করয দুটি চুক্তি শর্তযুক্ত হয়ে যায়, যা নিষিদ্ধ।

শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ এর জবাব দিয়েছেন, উক্ত শর্ত এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আজ সিকিউরিটি মানি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো ভাড়াচুক্তির কল্পনাই করা যায় না। আর হানাফী ফকীহদের উসুল হলো, উরফ ও সামাজিক প্রচলন থাকলে শর্ত বৈধ হয়ে যায়। (যদি এতে বিশেষ শরীয়াহ পরিপন্থি কিছু না থাকে)[২] সুতরাং এতে কোনো সমস্যা নেই।

শরঈ বিধান

১. যেহেতু এটি করয, তাই এ কারণে 'উজরতে মিছিল' (মানসম্মত ন্যায্য ভাড়া। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বস্তুর সংশ্লিষ্ট এলাকার উপযুক্ত ভাড়া) থেকে ভাড়া কমানো জায়েয হবে না। যেমন—উজরতে মিছিল বিশ হাজার টাকা; কিন্তু স্বাভাবিক সিকিউরিটি মানি থেকে দুই গুণ বেশি প্রদানের শর্তে ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হলো। তবে তা সুদ বলে বিবেচিত হবে।

তদ্রূপ এমন অপশন পেশ করা হলো যে, ১০ লক্ষ টাকা ডিপোজিট মানি প্রদান করলে মাসিক ভাড়া দশ হাজার। ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করলে মাসিক ভাড়া ৭ হাজার। ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করলে মাসিক ভাড়া ৫ হাজার ইত্যাদি। এভাবে ডিপোজিট মানির সাথে ভাড়ার হ্রাস-বৃদ্ধিও সুদ

---

১ ইসলামী ফিকাহ একাডেমী ইন্ডিয়া জার্নাল, জাদীদ ফিকহী মাবাহেস, খ. ১, পৃ. ১২৪

২ গাইরে সুদী ব্যাংকারী, পৃ. ২৭২, দারুল উলূম করাচির পূর্বোক্ত ফতোয়ায়ও বলা হয়েছে, উরফে আমের কারণে উক্ত শর্ত বৈধ।-(ইসলামী ব্যাংকুঁ মেঁ রায়েজ ইজারা, ড. ইজায আহমাদ সামদানী, পৃ. ৫৭-৬০)

বলে বিবেচিত হবে। এখানে বাড়ি/দোকানের মালিকের সন্তুষ্টি যথেষ্ট নয়। যেমনিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে সুদ, ঘুষ, গারার বৈধ হয় না।

মুফতি মুহাম্মাদ সায়্যিদ সালমান মানসূরপুরী হাফিযাহুল্লাহ এক ফতোয়ায় লিখেছেন—

'ডিপোজিটের হার কমবেশির ভিত্তিতে শর্ত করে ভাড়ায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা করযের ওপর সুদের সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাই উক্ত শর্তারোপের সাথে এরূপ লেনদেন সঠিক নয়। সুতরাং বৈধতার পথ কেবল এই যে, ইজারা চুক্তিকে করযের চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা যাবে না; বরং সর্বাবস্থায় উজরতে মিছিল নির্ধারণ করবে। চাই সিকিউরিটি ডিপোজিট কম হোক বা বেশি হোক।'[১]

২. চূড়ান্ত পর্যায়ে উক্ত টাকা যেহেতু করয, আর ব্যাপক উরফ/প্রচলন থাকার কারণে এক্ষেত্রে করয ও ইজারা চুক্তিদ্বয় একত্র হওয়া দূষণীয় নয়, তদুপরি দুটি চুক্তি স্বতন্ত্র হওয়া ভালো। কারণ, কিছু ফকীহ উক্ত শর্তারোপকে প্রশ্নোক্ত কারণে বৈধ বললেও কিছু ফকীহ বৈধ বলে স্বীকার করেননি। তাই সন্দেহমুক্ত লেনদেন হলো দুটিকে একত্র না করা। একই চুক্তিতে একটির সাথে অপরটি সরাসরি শর্তারোপ না করা।

এটি এভাবে করা যেতে পারে যে, প্রথমে ইজারা চুক্তি করে নেবে। তাতে সিকিউরিটি মানি প্রদানের কোনো উল্লেখ থাকবে না। এরপর স্বতন্ত্রভাবে সিকিউরিটি মানি আদান-প্রদান হবে। তবে সর্বাধিক সঠিক পদ্ধতি হলো, সিকিউরিটি মানিকে অগ্রিম ভাড়া হিসাবে গ্রহণ করা। এর সহজ প্রয়োগ হলো, প্রতি মাসে সিকিউরিটি মানি থেকে অল্প হলেও ভাড়া বাবদ কিছু টাকা কেটে রাখা। (বিস্তারিত আসছে)

২. ৪. ৪. ২. সুদযুক্ত সিকিউরিটি মানি

সিকিউরিটি মানির দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হলো, সুদযুক্ত সিকিউরিটি মানি। এটি দুভাবে হয়ে থাকে। যথা :

১. অগ্রিম টাকা সুদ প্রদানের শর্তে নেওয়া হবে। এটি স্পষ্ট হারাম।

---

১ কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১২, পৃ. ৩০৩

২. অগ্রিম এডভান্সের হারের ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারণ করা। এডভান্স বেশি হলে ভাড়া কম করা তথা উজরতে মিছিল থেকে ভাড়া কম নেওয়া। এটিও নাজায়েয। ভাড়া সর্বদা উজরতে মিছিল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এডভান্স যতই হোক না কেন।[1] পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

২. ৪. ৪. ৩. অগ্রিম ভাড়া বাবদ নেওয়া

সিকিউরিটি মানির তৃতীয় ক্যাটাগরি হলো, ভাড়াটিয়া যখন চলে যাবে তখন শেষ দুই মাসের অগ্রিম ভাড়া বা এক মাসের বা আরো কমবেশি সময়ের ভাড়া সিকিউরিটি হিসেবে নেওয়া হয়। এটি বৈধ। এ টাকা ঋণ নয়; বরং অগ্রিম ভাড়া। যা সকলের নিকটই বৈধ।

সিকিউরিটি মানি ও দেশীয় আইন

আমাদের দেশে বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াসংক্রান্ত কিছু আইন আছে। খুব কম মানুষই এসব আইন সম্বন্ধে অবগত। যেসব আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ অত্যন্ত স্বল্প, এর শীর্ষে রয়েছে উক্ত আইন। জনাব মোঃ আনোয়ার আলী এডভোকেট এ বিষয়ক আইনগুলো একত্র করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার আইন।' উক্ত গ্রন্থের তিন নং অধ্যায়ে 'এডভান্স বা সালামীর আইন' শিরোনামে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো :

ক. 'বাড়ির মালিক যদি বাড়িটি নির্মাণ, অথবা পুনর্নির্মাণের দ্বারা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো বাড়ি কমপক্ষে বিশ বছর সময়ের জন্য ভাড়া দেন এবং নির্মাণ কাজ শুরু হবার তারিখ হতে দশ বছরের মধ্যে বাড়ির মালিক যদি ভাড়ার চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে রাজি হন, তাহলে তিনি ভাড়াটিয়া হতে সালামী, জামানত বা প্রিমিয়াম হিসেবে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।'

খ. 'উপর্যুক্ত কারণ ছাড়া বাড়ির মালিক কোনো ক্রমেই অগ্রিম হিসেবে এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত টাকা দাবী করতে পারবেন না।'

উক্ত দুটি আইন উল্লেখ করত সম্মানিত লেখক এডভোকেট আনোয়ার

---

১ কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১২, পৃ. ৩০৫

আলী লেখেন : 'অর্থাৎ এ আইনে সুস্পষ্টভাবেই ভাড়াটিয়া থেকে সালামী, প্রিমিয়াম, জামানত ও অনুরূপ কোনো টাকা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

তিনি আরো বলেছেন, বাড়ি ভাড়া অগ্রিম প্রদানের চুক্তিও আইনসিদ্ধ নয়।

বোঝা গেল, ব্যাপকভাবে প্রচলিত সিকিউরিটি মানি, এডভান্স মানি দেশীয় আইনসিদ্ধও নয়।

দেশীয় আইনের পাশাপাশি শরীয়তের দৃষ্টিতেও প্রচলিত সিকিউরিটি মানি আপত্তিকর। কারণ, তা হয় ইজারা চুক্তির সাথে করযের শর্তারোপ সদৃশ, নতুবা এর সাথে সুদ যুক্ত হয়। (অর্থাৎ সিকিউরিটি মানির কারণে স্বাভাবিক ভাড়া (উজরতে মিছিল) থেকে কম নেওয়া হয়, যা সুদের অন্তর্ভুক্ত)

তাছাড়া দেশীয় আইন শরীয়াহ পরিপন্থি না হলে তা পালন জরুরি। এসব বিবেচনায় শরীয়তের দৃষ্টিতেও সংশ্লিষ্ট আইনের অনুসরণ কাম্য।

এরপরও কেউ মোটা অংকের সিকিউরিটি মানি বা এডভান্স নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে করণীয় হলো, পুরো টাকা অগ্রিম ভাড়াবাবদ হিসেবে গ্রহণ করা। এরপর প্রতি মাসে অল্প অল্প করে হলেও ওই টাকা থেকে কিছু টাকা ভাড়া বাবদ কর্তন করা। পরবর্তী সময়ে যখন ভাড়াটিয়া দোকান বা বাড়ি ছেড়ে দেবে তখন হিসাব অনুযায়ী অবশিষ্ট টাকা ভাড়াটিয়া ফেরত পাবে। এ অবস্থায় ওই টাকার যাকাত বাড়ি/দোকানের মালিক আদায় করবে। কারণ, তা ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অথবা পুরো Lease Period-এর অগ্রিম ভাড়াবাবদ সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ, ভাড়ার দুটি অংশ হবে। একটি অংশ প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে আদায় করা হবে। আরেকটি অংশ পুরো Lease Period-এর বিপরীতে অগ্রিম আদায় করা হবে। সুতরাং কোনো কারণে Lease Period-এর আগে ভাড়াচুক্তি রহিত করা হলে অবশিষ্ট সময়ের বিপরীতে নেওয়া অগ্রিম টাকা ফিরিয়ে দেবে। যেমন, উমর খালেদ থেকে একটি দোকান ৫ বছরের জন্য ভাড়া নিল। মাসিক ভাড়া ১০ হাজার। তাহলে প্রতি মাসের ৫ হাজার টাকা হিসাব করে পুরো ৫ বছর তথা ৬০ মাসের বিপরীতে অগ্রিম ভাড়া বাবদ খালেদ উমর থেকে

তিন লক্ষ টাকা গ্রহণ করতে পারবে। এরপর প্রতি মাসে উমর বাকি ৫ হাজার টাকা ভাড়া আদায় করবে। পরবর্তী সময়ে কোনো কারণে দুই বছর পর উমর দোকান ছেড়ে দিলে খালেদ হিসাব করে ১৮০,০০০/- টাকা ফেরত দেবে। এ পদ্ধতিতেও যাকাত দেবে ভাড়াদাতা। কারণ, তা অগ্রিম ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[1]

সারকথা, বাড়ি/দোকান ভাড়ার ক্ষেত্রে একজন বাড়ি/দোকান মালিক হিসাবে করণীয় হলো—

১. সিকিউরিটি মানিকে অগ্রিম ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ হয় কেবল শেষ মাসের (বা আরো বেশি) অগ্রিম ভাড়াবাবদ অগ্রিম রাখা। অথবা প্রতি মাসে একটি অংশ ভাড়া বাবদ কেটে রাখা। (বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ হয়েছে)

২. অগ্রিম ভাড়া বাবদ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে মূল ভাড়া কমানো যাবে।

৩. অগ্রিম ভাড়াবাবদ গ্রহণ করা না হলে তা একটি করযের চুক্তি হবে। যদিও উরফ ও প্রথার কারণে ভাড়াচুক্তির সাথে এর সম্পৃক্ততায় অসুবিধা নেই, তদুপরি সম্ভব হলে উত্তম হলো, জামানত গ্রহণের চুক্তি ও ভাড়াচুক্তি দুটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রভাবে করা। দুটির পেপার আলাদা করা। একটির সাথে অপরটি একই চুক্তিতে সরাসরি শর্তযুক্ত না করা। (উক্ত তৃতীয় অপশন গ্রহণ না করাই ভালো; বরং ১ নং এ উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করাই শ্রেয়।)

৪. অগ্রিম ভাড়া নয় এমন সিকিউরিটি মানির কারণে (যা মূলত করয) শর্ত করে মূল ভাড়া কমবেশি করা যাবে না। এক্ষেত্রে ভাড়া সর্বদা উজরতে মিছিল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৫. সিকিউরিটি মানি/এডভান্স মানি গ্রহণ দেশীয় আইনের দৃষ্টিতে অনুমোদিত কি না, তা আরো ভালো করে কোনো আইনজীবী থেকে জেনে নেওয়া জরুরি।

---

১ গাইরে সুদী ব্যাংকারী, পৃ. ২৭৪-২৭৫, জাদীদ মায়াশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা, পৃ. ৩৬৮

একজন ভাড়াটিয়া হিসাবে করণীয় হলো—

১. ডিপোজিট মানি অগ্রিম ভাড়াবাবদ প্রদান করবেন। মালিককে বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন। এভাবে বলতে পারেন :

ক. অগ্রিম ভাড়াবাবদ আপনি ২ মাস নয়; বরং চাইলে ৫ মাসের ভাড়া রেখে দেন।

খ. প্রথমটিতে রাজি না হলে বলুন, প্রতি মাসে অন্তত কিছু টাকা হলেও ভাড়াবাবদ কেটে রাখুন। এতে আপনার সিকিউরিটি মানি নেওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। আরো বুঝিয়ে বলতে পারেন—এতে আরো সুবিধা হলো, ভাড়া চুক্তি ক্যান্সেল করার সময় আপনাকে একসঙ্গে এককালীন বিশাল অংকের টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে না। বরং প্রতি মাসেই কিছু কিছু আদায় হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সিকিউরিটি মানি কমে আসলে পুনরায় তা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

২. কোনোভাবেই যদি মালিকপক্ষ রাজি না হয়। সে সিকিউরিটি মানি হিসেবেই নিতে বদ্ধ পরিকর। তাহলে সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন, জামানত গ্রহণের চুক্তি ও ভাড়াচুক্তি দুটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রভাবে করতে। দুটির পেপার আলাদা করতে। একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত না করতে। পেপার না থাকলে কথাবার্তা/আলোচনা পৃথক পৃথক সেসনে করা।

৩. জামানতের (যা মূলত করয) কারণে মূল ভাড়া কমানোর প্রস্তাব করা হলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সিকিউরিটি টাকার যাকাত কে দেবে, এটি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। ভিন্নভাবে তা জেনে নিতে হবে।

২. ৫. ভাড়াচুক্তির ওপর আপতিত বিভিন্ন অবস্থা

১. ভাড়াদাতা যখন ভাড়াকৃত বস্তু ভাড়াটিয়ার কাছে বিক্রি করে দেবে, তখন ভাড়াচুক্তি শেষ হয়ে যাবে।

২. ভাড়াদাতা যদি ভাড়া চলাবস্থায় ভাড়াকৃত সম্পদ তৃতীয় কারো কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ফকীহগণের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যথা :

ক. বিক্রয়ের মাধ্যমে ভাড়াচুক্তি শেষ হয়ে যাবে। নতুন ক্রেতা/মালিকের সাথে ভাড়াটিয়া নতুন করে চুক্তি করে নিতে হবে। সে যদি ভাড়াচুক্তি অব্যাহত না রাখতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার কিছু করার থাকবে না।

খ. ভাড়াচুক্তির মেয়াদ যেহেতু শেষ হয়নি, তাই নতুন মালিক ভাড়াদাতার স্থানে অধিষ্ঠিত হবে। পূর্বচুক্তি অনুযায়ী ভাড়াচুক্তি বহাল থাকবে। নতুন মালিক এককভাবে তা রহিত করতে পারবে না। তবে নতুন মালিক ক্রয়ের সময় যদি ভাড়ার বিষয়ে অবগত না থাকে, তাহলে তার জন্য কৃত ক্রয়চুক্তি রহিত করার সুযোগ থাকবে।

কারণ, হতে পারে সে ক্রয় করেছে থাকার জন্য। এখন ভাড়ার কারণে থাকতে পারছে না।[১]

৩. শুধু ভাড়া উসুলের হক বিক্রি করা বৈধ নয়। যেমন, কাউকে প্রাপ্ত ভাড়ার এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দেওয়া হলো। ধরা যাক, সাকুল্য ভাড়া এক লক্ষ টাকা। এর এক তৃতীয়াংশ ৩৩ হাজার টাকা ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হলো। এটি স্পষ্ট রিবা। নিষিদ্ধ পন্থায় ঋণ বিক্রয়।

৪. ভাড়া যদি সুনির্দিষ্ট বস্তুর ওপর হয়, আর সেই বস্তুটি নিজ থেকে বা প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এতে ভাড়াচুক্তি অটো বাতিল হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ভাড়াদাতাকে এর পরিবর্তে অন্য বস্তু দেওয়া জরুরি নয়। তবে ভাড়া যদি অনির্দিষ্ট বস্তুর ওপর হয়, দায়ে আবশ্যক হয় (An asset undertaken by the lessor), তাহলে সেক্ষেত্রে ভাড়াদাতার ওপর পূর্ব-বর্ণিত গুণাবলি অনুযায়ী অন্য বস্তু ভাড়া হিসেবে প্রদান করা (Replace) জরুরি।

৫. ভাড়াকৃত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে, মেয়াদ পর্যন্ত পরবর্তী সময়ের ভাড়া বা কিস্তি শোধ করতে ভাড়াটিয়াকে বাধ্য করা যাবে না। সাধারণত কনভেনশনাল ফাইন্যান্সিয়াল লিজে এমনটি করা হয়। ইসলামী ফিন্যান্সে তা করা যাবে না। এমনটি করার অর্থ সুদভিত্তিক কারবার করা।

৬. ভাড়াকৃত বস্তু ভাড়াটিয়ার কাছে আমানত। সুতরাং ভাড়াটিয়ার

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৭/১/২

সীমালঙ্ঘন বা ত্রুটির কারণে ভাড়াকৃত বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেবল সেক্ষেত্রেই ওই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। স্বাভাবিক কারণে ধ্বংস বা ত্রুটিযুক্ত হলে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ আসবে না।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি হলো, বস্তুটি যদি এমন হয়, যার অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায়, তাহলে সেটাই প্রদান করবে। যেমন—সাইকেল ভাড়া নিয়েছে, সেটি ধ্বংস করে ফেলেছে। তাহলে ওই কোম্পানির আরেকটি সাইকেল দিয়ে দেবে। আর যদি এমন হয়, যার অনুরূপ বস্তু নেই। যেমন, প্রাণী। তাহলে সেক্ষেত্রে যেদিন ধ্বংস হয়েছে, সেদিন এর যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য আদায় করবে।[১]

৭. ভাড়াকৃত সম্পদ যদি আংশিক ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ভাড়াগ্রহীতার অধিকার আছে, কৃত চুক্তি রহিত করার। তদ্রূপ চাইলে উভয়ে এ পরিস্থিতিতে ভাড়া হ্রাসের ব্যাপারেও একমত হতে পারে। এক্ষেত্রে যে কয়দিন ভাড়াটিয়া উপকৃত হতে পারেনি, সে কয়দিনের ভাড়া তার কাছে চাওয়া যাবে না। অবশ্য উভয়ে একমত হয়ে যদি এর স্থানে অন্য কোনো বস্তু ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটি নতুন ভাড়াচুক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

ভাড়াটিয়ার সম্মতি ছাড়া শুধু ভাড়াদাতা এককভাবে ধ্বংসকৃত সম্পদের স্থানে অন্য বস্তু দিয়ে ভাড়া গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। এর কারণ হলো, ভাড়াকৃত বস্তু এখানে সুনির্দিষ্ট।[২]

৮. ভাড়াটিয়া যদি চুক্তিকৃত ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহার না করে তা ভাড়াদাতার কাছে এসে রেখে দেয়। আর বলে, আমি আর তা ব্যবহার করব না। আর মালিক এর সাথে একমত না হয়। তাহলে এক্ষেত্রে ভাড়া বহাল থাকবে। মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত এর ভাড়া দিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি এ সময়ে ভাড়াকৃত সম্পদ পেয়ে তা ভাড়াদাতার জন্য অন্যত্র ভাড়া দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ভাড়াটিয়ার সাথে সমঝোতা করে তা অন্যত্র ভাড়া দেওয়া যাবে। তখন প্রথম ভাড়াচুক্তি রহিত হয়ে যাবে।[৩]

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৭/১/৪

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৭/১/৪

৩ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৭/১/৭

২. ৬. ভাড়াচুক্তি শেষ করা ও নতুন করে পুনরায় চালু করা

১. ভাড়াচুক্তি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সাধারণত একতরফাভাবে রহিত করা যায় না। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে রহিত করা যায়। যেমন, ভাড়াকৃত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব না হওয়া, ভাড়া যথা নিয়মে আদায় না করা ইত্যাদি।

২. ভাড়াদাতা ও গ্রহীতা যে কারো মৃত্যুতে ভাড়াচুক্তি রহিত হবে না। তবে ভাড়াগ্রহীতার মৃত্যুতে তার ওয়ারিশগণ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, (ক) ভাড়া পরিশোধ করা তাদের জন্য কষ্টকর। অথবা (খ) তাদের আর এই ভাড়া প্রয়োজন নেই। তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ভাড়াচুক্তি রহিত করতে পারবে।

৩. ভাড়াচুক্তি যদি নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে সেই বস্তু ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে ভাড়াচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। অথবা বস্তু ধ্বংস হয়নি, তবে এর থেকে আর উপকার নেওয়া যায় না, তাহলে এক্ষেত্রেও চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৪. নিয়ম অনুযায়ী ভাড়াচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার মাধ্যমে চুক্তি রহিত হয়ে যায়। তবে ওই সময়ে কোনো কারণে যদি ভাড়া সম্পদ অর্পণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত ভাড়াচুক্তি বহাল থাকবে। আর এ সময়ে ন্যায্য ভাড়া (উজরতে মিছিল) আবশ্যক হবে। যেমন—তিন দিনের জন্য কোথাও যাওয়ার লক্ষ্যে একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। টার্গেট ছিল, তিন দিনের মধ্যে ফিরে এসে গাড়ি ফিরিয়ে দেবে; কিন্তু কোনো কারণে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। রাস্তায় চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে সেক্ষেত্রে এরপর থেকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হবে।

তদ্রূপ জমি ভাড়া নেওয়া হয়েছে ফসল করার জন্য। ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু এখনো ফসল পরিপক্ক হয়নি। তাহলে এক্ষেত্রেও ফসল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ন্যায্য ভাড়াচুক্তি বহাল থাকবে। অথবা চাইলে উভয়ে সম্মত হয়ে নতুন করে ভাড়াচুক্তি নবায়ন করতে পারে। অথবা শুরুতেই মূল চুক্তিতে এ ধরনের ধারা থাকবে যে, মেয়াদ শেষে কেউ

যদি নতুন করে চুক্তি নবায়ন করার প্রতি অনাগ্রহ না দেখায়, তাহলে অটো চুক্তিটি নবায়ন হয়ে যাবে।[১]

২. ৭. ভাড়া চুক্তি ও আধুনিক কিছু লেনদেন

ভাড়া চুক্তির আধুনিক কিছু লেনদেন আছে। যেমন, পজিশন ক্রয়-বিক্রয়, পজিশন ও জমি বিক্রয়, এডভান্স ও পজিশন বিক্রয়, দীর্ঘ মেয়াদি লিজ চুক্তি ইত্যাদি। এখানে সংক্ষেপে এগুলোর ওপর কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

২. ৭. ১. পজিশন ক্রয়-বিক্রয়

বর্তমানে শহর, উপশহরের বিভিন্ন মার্কেট বা শপিং মলে দোকানের পজিশন ক্রয়-বিক্রয়ের বহুল প্রচলন রয়েছে। এটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি হলো, একজন তার দোকান দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ভাড়া দিল। সাধারণত তা ৯৯ বছরের মেয়াদে হয়ে থাকে বা আজীবন মেয়াদের শর্তে হয়ে থাকে। প্রতি মাসে নির্ধারিত ভাড়া উসুলের সাথে এককালীন মোটা অংকের টাকাও উসুল করা হয়। ভাড়াটিয়া এককালীন মোটা অংকের টাকা দিয়ে মূলত এ নিশ্চয়তা অর্জন করে যে, মালিক তাকে যখন-তখন বিদায় করে দিবে না। অর্থাৎ মালিকের অধিকার ছিল, যখন-তখন তার সাথে ভাড়া চুক্তি শেষ করা। কিন্তু টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা হলো। অথবা বলুন, এই টাকার বিনিময়ে মালিক তার ফিরিয়ে নেওয়ার হক বিক্রয় করে দিল।

কেন তা করা হয়? সাধারণ ভাড়া চুক্তিতে মালিক পক্ষ যখন-তখন ভাড়াটিয়াকে চলে যেতে বলতে পারেন। যদিও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এক পক্ষীয়ভাবে তার জন্য ভাড়াটিয়াকে চলে যেতে বলা অন্যায়। ওয়াদা খেলাফী। তদুপরি মালিক হিসাবে সে তা করতে পারে। এতে

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৭/২/৬

বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী ভাড়াটিয়াদের অনেক সময় সমস্যা হয়। দেখা যায়, বেশ অর্থ ব্যয় করে দোকান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক অর্থ ব্যয় করে ডেকোরেশন করা হয়েছে।

এ অবস্থায় হঠাৎ করে ভাড়াটিয়াকে চলে যেতে বলা তার জন্য ক্ষতিকর। অর্থনৈতিকভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মূলত এই ক্ষতি দূর করার জন্যই ভাড়াটিয়া থেকে এক মুঠে এককালীন মোটা অংকের টাকা প্রদান করা হয়। বিনিময়ে দোকান মালিক তার ফিরিয়ে নেওয়ার হক ও অধিকার থেকে ফিরে আসে।

পরবর্তীতে মূল মালিক যদি দোকান ফেরত নিতে চায় তাহলে সমঝোতা করে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে দোকান ফিরিয়ে নিতে পারবে। কখনো এমনও হয় যে, যে ভাড়া নিল সে আবার অন্যকে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে ভাড়া দিয়ে দেয়।

শরঈ বিধান

শরঈ দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতির ব্যাখ্যা হলো, এখানে দুটি চুক্তির সমন্বয় ঘটেছে। যথা—ক. মালিক কর্তৃক লীজ এ্যাসেট ফিরিয়ে নেওয়ার হক বা অধিকার বিক্রয় করে দেওয়া (حق الرجوع)। খ. মূল এ্যাসেট ভোগ করার জন্য ভাড়া চুক্তি।

দ্বিতীয়টি তথা শুধু ভাড়া চুক্তিটি মৌলিকভাবে বৈধ। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে প্রথমটি তথা 'ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার' বিক্রয় চুক্তিটি মৌলিক আলোচনার দাবি রাখে।

গভীরভাবে দেখলে, বিক্রয় চুক্তিই এর প্রধান চুক্তি। এ জন্য আধুনিক ফকীহগণ একে 'অধিকার বিক্রয়' শিরোনামে আলোচনা করে থাকেন। যেহেতু এটিই এর প্রধান চুক্তি, তাই দুটি চুক্তি একত্রিকরণের প্রশ্ন এখানে আসবে না।

বাকি থাকল, 'ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার' বিক্রয়ের বিধান। এই অধিকারটি 'সম্পদ' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি না—বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কারো মতে, এটি নিছক একটি 'অধিকার'। যা সম্পদের মধ্যে পড়ে না। আর যদি সম্পদ না হয়, তাহলে অর্থ প্রদান হবে বিনিময়হীন, যা রিশওয়াহ

(ঘুষ)-কে অনিবার্য করে। মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ-সহ বিজ্ঞ ফকীহগণের একটি বৃহৎ অংশ এই মতামত পোষণ করেন।

অপরদিকে আরো কিছু ফকীহের মতে, কোনো কিছু সম্পদ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে উরফ ও প্রচলনের ব্যাপক দখল ও ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সময়ে উরফ ও প্রচলনের ভিত্তিতে উক্ত 'হক বা অধিকার' এখন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি বিনিময়যোগ্য। সে হিসাবে উক্ত লেনদেন বৈধ।[১] মালিক পুনরায় তার উক্ত অধিকার ফিরিয়ে নিতে চাইলে সেটাও অর্থের বিনিময়ে বৈধ হবে। গ্রাহক সেটি একই পন্থায় অন্যত্র পজিশন বিক্রয় করে দিলে, তার সাথে মূল মালিকের সম্পর্ক তৈরি হবে।

তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উত্তম হলো এক মুঠে প্রদেয় টাকাকে অগ্রিম ভাড়া হিসাবে বিবেচনা করা। প্রতি মাসে নির্ধারিত ভাড়ার সাথে ওখান থেকেও কিছু টাকা ভাড়া বাবদ কেটে রাখবে। মেয়াদ শেষে ভাড়াটিয়া যখন চলে যাবে তখন কিছু থেকে গেলে সেটা ফেরত দিবে। যেমনটি আমরা সিকিউরিটি মানির ক্ষেত্রে বলেছি। অর্থাৎ অফেরতযোগ্য কোনো অর্থ নেওয়া যাবে না। সেটা নিতে হলে এর একমাত্র পথ হলো, অগ্রিম ভাড়া বাবদ গ্রহণ করা।

২. ৭. ২. পজিশনের সাথে জমিও বিক্রয়

কোথাও উক্ত পজিশন ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এর সাথে আনুপাতিক হারে জমিও বিক্রয় করা হয়। এককালীন মোটা অংকের যে টাকা নেওয়া হয় এর বিপরীতে আনুপাতিক হারে জমি বিক্রয় করা হয়। আর দোকানের ভাড়া মাসিক হিসাবে প্রদান করা হয়।

শরঈ দৃষ্টিতে এটি বিলকুল বৈধ। এখানে কোনো অধিকার নয়, সরাসরি জমি বিক্রয় হয়েছে।[২]

---

১ ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া, খ. ৫, পৃ. ৩০২

২ জাদীদ মায়াশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা, পৃ. ৩৬৫

২. ৭. ৩. এডভান্স ও পজিশন মিশ্রিত চুক্তি

কোথাও এডভান্স ও পজিশন মিশ্রিত চুক্তিরও প্রচলন আছে। যেমন, মালিবাগ সুপার মার্কেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। সেখানে সুপার মার্কেটের দোকানগুলো নিম্নোক্ত পন্থায় বিক্রয় ও ভাড়া হয়ে থাকে। যথা—

ক. Possession sale বাবদ চুক্তির শুরুতেই এককালীন মোটা অংকের টাকা নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ ৮ লক্ষ টাকা নেওয়া হলো। এর মধ্যে কিছু অংশ তথা উদাহরণস্বরূপ ৪ লক্ষ টাকা অফেরতযোগ্য। লিখিত স্টাম্পে এই চার লক্ষ টাকার কোনো উল্লেখ থাকে না। (আমরা এ সংক্রান্ত অরিজিনাল চুক্তিপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করেছি।) তাতে শুধু লেখা থাকে—বাকি তিন লক্ষের কথা। এটি এডভান্স মানির মতো ফেরতযোগ্য। কেবল এ টাকাকেই মূল্য বাবদ দেখানো হয়।

খ. পরবর্তীতে ভাড়াটিয়া চুক্তি ভঙ্গ করতে চাইলে কেবল সেই তিন লক্ষ টাকাই পাবে, যা দলিলে দেখানো হয়েছে। এর বেশি নয়।

গ. প্রতি মাসে প্রতি স্কয়ার ফিট ১২.২৫/- ভাড়া হিসাবে আদায় করবে। স্থানীয় লোকেরা একে জমিদারি ভাড়া বলে।

ঘ. জমির মালিকানা প্রদান করা হয় না।

ঙ. মালিক পক্ষ চাইলে উচ্ছেদ করতে পারে। তবে সেটা সহজসাধ্য নয়।

চ. ভাড়া শুরুর পর দোকান চালু না করলে প্রতিদিনের জন্য ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

ছ. এ ছাড়া ভাড়ার সকল সাধারণ শর্ত ভাড়াটিয়াকে মানতে হয়। যেমন, এমন কিছু করা যাবে না, যা বিল্ডিং এর ক্ষতি করে, প্রতিবেশির ক্ষতি করে ইত্যাদি। দারোয়ান, নাইট গার্ড ইত্যাদির সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সাবলেট, সাব লীজ দিতে পারবে না।

শরঈ বিধান

শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতিতে নানা সমস্যা রয়েছে। যথা—যে অংশটি অফেরতযোগ্য, সেটি পজেশন সেলের বিনিময়। যা এভাবে গ্রহণ করা সঠিক নয়। তাছাড়া ভাড়া শুরুর পর দোকান চালু না করলে

প্রতিদিনের জন্য ৫০ টাকা জরিমানা গ্রহণ 'আল আক্ল বিল বাতিল' বা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত।

বিকল্প

ক. অফেরতযোগ্য অংশটি এক মাসের বা এক বছরের অগ্রিম ভাড়া বাবদ গ্রহণ করা যেতে পারে।[1]

খ. ফেরতযোগ্য অংশটি সিকিউরিটি মানি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত সিকিউরিটি মানির যাবতীয় বিধান ও পরামর্শ প্রযোজ্য হবে।

গ. আর্থিক জরিমানা বাদ দিতে হবে।

২. ৭. ৪. স্থায়ী লীজ চুক্তি

আজকাল স্থায়ী লীজের প্রচলনও রয়েছে। এর স্বাভাবিক পদ্ধতি হলো, সরকারী বা কোনো ওয়াক্ফ সম্পত্তির লীজ এভাবে নেওয়া হয় যে, ভাড়াটিয়া প্রতি মাসে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করবে। আর জমির মালিক এ কথা লিখে দেয় যে, এ জমি চিরদিনের জন্য ভাড়া হিসাবে নির্দিষ্ট ভাড়াটিয়াকে প্রদান করা হলো। এ চুক্তির পর জমির মালিক ও ভাড়াটিয়া উভয়ে খুব ভালো করেই জ্ঞাত থাকে যে, জমির মালিকানা তো মালিকের। তবে তা সর্বদা ব্যবহারের অধিকার কেবল ভাড়াটিয়ার। এ চুক্তি কারো মৃত্যুতে বাতিল হয় না। বরং ওয়ারিশদের মধ্যেও এ চুক্তি বহাল থাকবে। জমির মালিক ভাড়াদাতার অনুমতি ছাড়া তাকে সরাতে পারে না।

তাৎপর্য

উক্ত স্থায়ী লীজ অনেকটা মালিকানার সাথে সাদৃশ্য রাখে। কারণ জমির মালিক সহজেই ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে পারে না।

---

১ কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১২, পৃ. ৩২০

তা কেন করা হয়?

কখনো মানুষ, জমি ভাড়া নিয়ে বা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে ফিক্সড কিছু করতে চায়। যা স্থায়ী হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, ভাড়াটিয়ার যেহেতু মালিকানা নেই, তাই আশঙ্কা হয় কাজ শুরু করার পর বা সম্পন্ন হওয়ার পর জমির মালিক উচ্ছেদ করে দিতে পারে। তাই আশঙ্কামুক্ত থাকার জন্য উক্ত স্থায়ী ভাড়া পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য পাগড়ী বা সালামী বা পজেশনের মতো অগ্রিম কোনো অর্থ দিতে হয় না।

বিধান

উক্ত লীজ নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বৈধ। যথা—

১. চুক্তির শুরুতেই এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, জমিটি স্থায়ী পদ্ধতিতে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে।

২. মালিক পক্ষ এ নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে, জমি থেকে ভাড়াটিয়ার ভোগাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হবে না।

৩. মালিকের পক্ষ থেকে উক্ত নিশ্চয়তা লাভের পর ভাড়াটিয়া ভাড়াকৃত জমিনে অর্থ ব্যয় করে দৃশ্যমান স্থায়ী কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করবে। যেমন, জমি খনন করে তাতে নলকূপ বসাবে, ইমারত করবে ইত্যাদি।

উক্ত তিন শর্তে স্থায়ী লীজ বৈধ।

এভাবে লীজ চুক্তি ও লীজ পরবর্তী কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ভাড়াটিয়া নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো পালন করলে তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ—

ক. নির্ধারিত ভাড়া সময়মতো পরিশোধ করা।

খ. উজরতে মিছিল আদায় করবে। অর্থাৎ ওই সময় ওই ধরনের জমির ওই এলাকায় যে পরিমাণ ভাড়া নেওয়ার প্রচলন আছে সেটাই উজরতে মিছিল। উক্ত উজরতে মিছিল যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে।

তবে লক্ষণীয় হলো, এখানে উজরতে মিছিল দ্বারা, জমিতে ভাড়াটিয়া

কোনো কাজ করার পূর্বে এর যে স্বাভাবিক ভাড়া ছিল সেটা উদ্দেশ্য। ভাড়াটিয়া তাতে বিভিন্ন কাজ করার পর যে ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা নয়।

মোটকথা, ভাড়াটিয়ার বৃদ্ধিকরণ উজরতে মিছিল নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করবে না।

গ. ভাড়াটিয়া জমিকে তিন বছর পর্যন্ত বেকার ফেলে রাখতে পারবে না।

উপরোল্লিখিত শর্তের কোনোটির খেলাফ করলে স্থায়ী ভাড়া চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। আর যদি শর্তগুলো পালন করা হয় তবে ভাড়াটিয়ার স্থায়ীভাবে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকার হক বহাল থাকবে। মালিক পক্ষ উচ্ছেদ করতে পারবে না। তখন উক্ত হক উভয় পক্ষের ওয়ারিশদের মাঝেও মীরাস নীতি অনুযায়ী স্থানান্তরিত হবে। তদ্রূপ স্থায়ী লীজ যদি অন্যত্র হাত বদল করা হয় তবে এর বিনিময়েও সকল ওয়ারিশ মীরাস নীতি অনুযায়ী হকদার হবে।

ঘ. এটি কেবলই স্থায়ীভাবে ভোগাধিকার লাভের চুক্তি। এর মাধ্যমে মালিকানা স্বত্ব লাভ হবে না। সুতরাং তা বিক্রয়ের অধিকার ভাড়াটিয়ার নেই।[১]

১ জাওয়াহিরুল ফিকহ, খ. ২, পৃ. ৩০৩; ফাতাওয়ায়ে উসমানী, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮; কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১২, পৃ. ৩৪৪; জাদীদ মাআশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা, পৃ. ৩৯১। মুফতি সালমান মানসুরপুরী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন, “গত ১৪৩৪ হিজরিতে ২১-২২ রজব মাসে ‘শাইখুল হিন্দ হাল’ দেওবন্দে ‘ইদারাতুল মাবাহিসিল ফিকহিয়্যা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ’-এর নবম ফিকহী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে এ বিষয়ে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।” দেখুন, কিতাবুন নাওয়াযেল, প্রাগুক্ত। সেই সিদ্ধান্তের আলোকেই আমরা এখানে শর্তগুলো উল্লেখ করেছি।

২. ৮. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ভাড়া চুক্তির ব্যবহার ও শরীয়াহ নীতিমালা

প্রথম কথা

পূর্বে ভাড়া চুক্তির নানা উপাদান সংশ্লিষ্ট বুনিয়াদি শরীয়াহ নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। এবার আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ভাড়া চুক্তির ব্যবহার ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যে ভাড়া চুক্তি ব্যবহৃত হয়, সেটি Financial Lease চুক্তি নামে অভিহিত। যেখানে ভাড়া নয়; বরং বিনিয়োগ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ভাড়া শেষে ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াকৃত সম্পদের মালিক হয়ে যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান একে কেবল বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

২. ৮. ১. ফাইন্যান্সিয়াল লিজ চুক্তির ব্যাপারে মৌলিক কথা

১. ইজারা বা ভাড়াচুক্তি মৌলিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মূলগত দিক থেকে লিজ আদর্শ কোনো ফাইন্যান্স মডিউল নয়; বরং লিজ চুক্তি একটি সাদামাটা লেনদেন যার উদ্দেশ্য, আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমে সাময়িকভাবে কোনো বস্তুর ব্যবহারের অধিকার কাউকে প্রদান করা।

২. ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হওয়ার পর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল লিজের অনুমোদন দেওয়া

হয়েছিল। কারণ এটি একটি হিলাধর্মী লেনদেন। মৌলিক কোনো বিনিয়োগ-পদ্ধতি নয়; কিন্তু মুরাবাহার মতো একেও ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক ও স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। যা কাম্য নয়।

৩. কনভেনশনাল পদ্ধতিতে ফাইন্যান্সিয়াল লিজের যে ব্যবহার রয়েছে, সেগুলো মূলত বাতিল ও সুদী লেনদেন। এর বিপরীতে ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল লীজ চুক্তি সম্পূর্ণ শরীয়াহসম্মত ও তুলনামূলক ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামী অর্থব্যবস্থার আদর্শিক পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট শরীয়াহ পরিপালনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। বর্তমানে এক্ষেত্রে অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা কখনই প্রত্যাশিত নয়।

২. ৮. ২. প্রচলিত কনভেনশনাল বিনিয়োগ পদ্ধতি ও ইসলামের আধুনিক ভাড়া চুক্তি

বর্তমানে কনভেনশনাল বা সুদী বিনিয়োগ পদ্ধতির বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নানা শরীয়াহ বিকল্প তৈরি হয়েছে। এখনো সেই প্রচেষ্টা চলমান। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামের সনাতন ভাড়া চুক্তিকে আধুনিকায়ন করে সুদী নানা বিনিয়োগ পদ্ধতির বেশ কিছু বিকল্প তৈরি করা হয়েছে। মোটা দাগের সেই বিকল্পসমূহ হলো—

১. কনভেনশনাল হায়ার পারচেজ চুক্তি। বিকল্প : ক. শরীয়াহসম্মত কিস্তি ক্রয়-বিক্রয়। খ. আইএমবিটি।

২. সুদী ঋণ ভিত্তিক ফাইন্যান্স (হাউস লোন, কার লোন ইত্যাদি যৌথ বিনিয়োগ)। বিকল্প : এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতি।

৩. সুদী ঋণ। বিকল্প : সেল এন্ড লিজ ব্যাক।

৪. কনভেনশাল লিজ চুক্তি। (যৌথ বিনিয়োগ ব্যাতীত সম্পদের মালিকানা অর্জন) বিকল্প : আইএমবিটি।

নিম্নে প্রত্যেকটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

২. ৮. ২. ১. কনভেনশনাল 'হায়ার পারচেজ' (Hire purchase) চুক্তি ও কিস্তি ক্রয় বিক্রয়

এটি একটি কনভেনশনাল ইজারা প্রোডাক্ট। 'হায়ার' অর্থ ভাড়া। 'পারচেজ' মানে ক্রয়। অর্থাৎ, এটি এমন এক পদ্ধতি—যার মাধ্যমে ভাড়ার পাশাপাশি ক্রয় করাও নিশ্চিত হবে। শুধু ভাড়াচুক্তিই এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং ভাড়া শিরোনামে বিক্রয়চুক্তিই মূল উদ্দেশ্য। আরবীতে বলে, البيع الإيجاري/الإجارة التمليكية/الشراء بطريق الإجارة।

এর পদ্ধতি হলো :

কোনো বস্তু বাকি বা কিস্তিতে বিক্রি করা হয়। তবে সকল কিস্তি পরিশোধের পূর্ব-পর্যন্ত এর পূর্ণ মালিকানা বিক্রেতার থাকবে। আর এ সময়ে পণ্যটি ক্রেতার কাছে ভাড়া হিসেবে থাকবে। যখন সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ করা হবে, তখন এটি পূর্ণরূপে বিক্রয় চুক্তিতে রূপান্তর হয়ে এর মালিকানা পূর্ণরূপে ক্রেতার হাতে চলে যাবে।

আর পরিশোধিত সকল কিস্তি মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ শেষ কিস্তি আদায়ের পূর্ব-পর্যন্ত ধরা হবে কিস্তিগুলো মূলত ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। আর শেষ কিস্তি পরিশোধের পর বলা হবে, পরিশোধিত কিস্তিসমূহ মূল্য হয়ে গেছে। এ হিসেবে কিস্তি চলাকালীন বস্তুর মালিকানা থাকবে বিক্রেতার। বলা হবে, বস্তুটি ক্রেতা ভাড়া হিসেবে ব্যবহার করছে। আর শেষ কিস্তি পরিশোধের পর এর মালিকানা অটোমেটিক ক্রেতার হয়ে যাবে।

সাধারণত বাজারে যে দামে বাকিতে পণ্য বিক্রয় হয়, সে দামেই এখানে কিস্তিমূল্য নির্ধারিত হয়। ধরা যাক, একটি ফ্রিজ, নগদে ক্রয় করলে ৩০ হাজার। বাকিতে ক্রয় করলে ৩৫ হাজার। তাহলে উক্ত পদ্ধতিতে এর মূল্য ৩৫ হাজার ধরা হবে। যা কিস্তিতে আদায় করা হবে।

আমাদের দেশে ওয়ালটন, সিঙ্গার ইত্যাদি কোম্পানিগুলো কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। আমাদের কাছে সংগৃহীত ওয়ালটন কোম্পানির কিস্তিতে পণ্য বিক্রয়ের আবেদন ফরমে স্পষ্ট লেখা আছে :

'আবেদন পত্র (কিস্তিতে ওয়ালটন পণ্য ক্রয়ের জন্য)। কিস্তি চলাকালীন পণ্যটি ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে।'

এ ছাড়া ফরমে ক্রেতাকে Hire purchaser বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু ক্রেতা হিসেবে নয়।

উক্ত পদ্ধতিতে ভাড়া চলাকালীন বস্তুটির সম্পূর্ণ দায় ক্রেতার ওপর থাকবে। ওয়ালটনে এ সংক্রান্ত চুক্তিনামায় শর্তাবলির অধীনে উল্লেখ আছে 'ভাড়া গ্রহণকারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অবহেলা বা অন্য যেকোনো কারণে গ্রহণকৃত পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে এর ভাড়াগ্রহণকারী যাবতীয় ক্ষতিপূরণ ওয়ালটন প্লাজাকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।' (ধারা-০৪)

মোদ্দাকথা

ক. একটি পণ্যের ওপর একই সময় বিক্রয়চুক্তি ও ভাড়াচুক্তি সংগঠিত হয়। ফলে এটি না ভাড়া চুক্তি, না বিক্রয় চুক্তি।

খ. একই সময় দুটি চুক্তি চলমান থাকে। এজন্য আদালতে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, একে বিক্রয় চুক্তি বলা হবে, না কি ইজারা চুক্তি?

গ. ভাড়া চুক্তি থেকে বিক্রয় চুক্তি আলাদা নয়। শেষ-কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে অটোমেটিক সেটি বিক্রয় চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ক্রেতা পূর্ণ মালিকানা লাভ করে।

ঘ. ভাড়া বা ইজারা বলা হলেও বাস্তবে ভাড়া নয়। কারণ, বস্তুর সকল দায় গ্রহীতার ওপর থাকে।

ঙ. নির্ধারিত সময়ে কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত আর্থিক জরিমানা প্রদান করতে হয়।

চ. সময়ের আগে পাওনা পরিশোধ করলে বিশেষ রেয়ায়েত প্রদান করার শর্ত থাকে।

শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ :

১. একই সময়ে দুটি চুক্তি শর্তযুক্ত।

২. মেয়াদান্তে রিবা যুক্ত হয়।

৩. মেয়াদের আগে পরিশোধের শর্তে রিবা যুক্ত হয়।

৪. ভাড়াচুক্তি নামমাত্র। সকল রিস্ক ভাড়াদাতার থাকে না; বরং ভাড়াগ্রহীতাকেই বহন করতে হয়। ফলে এটি কার্যত সুদী চুক্তি হয়ে যায়।

৫. এতে কী চুক্তি হলো তা স্পষ্ট হয় না। এজন্য আদালতে এ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়, এতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি প্রয়োগ হবে, নাকি ভাড়াচুক্তি? এ নিয়ে বড় ধরনের বিরোধ ও বিতর্ক দেখা দেয়। ফলে এতে না ক্রয়–বিক্রয় চুক্তির মৌলিক শরীয়াহ অনুসরণ হয়, না ইজারা চুক্তির।

শরীয়াহ বিকল্প

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, আলোচিত 'হায়ার পারচেজ' চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়। তবে যেহেতু বিক্রয়টি হয় বাকিতে, মূল্য আদায় হয় কিস্তিতে। তাই বিক্রেতা যথা সময়ে পাওনা পরিশোধ না হওয়ার একটি ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় থাকে। একে প্রতিরোধ করার জন্য শর্ত করা হয়েছে—শেষ কিস্তি শোধের আগ পর্যন্ত পণ্যের মালিকানা ক্রেতার হবে না। এখান থেকে এক অদ্ভুত 'হায়ার পারচেজ' চুক্তির উদ্ভব হয়।

লেনদেনটির মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেহেতু সঠিক, তাই শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে একে সরাসরি 'বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি' হিসাবে করা হবে। এর জন্য যেসব শরীয়াহ রিকয়ারম্যান্ট আছে, সবই অনুসরণ করা হবে। এর সাথে ভাড়া চুক্তির কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

বাকি থাকল যথাসময়ে মূল্য অনাদায়ের ঝুঁকি। এটি নিরসনের জন্য নানা পন্থা শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ হিসাবে বলেছেন। যথা—

১. ক্রেতা থেকে পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো মূল্যবান জিনিস বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করবে। তবে শর্ত হলো, বন্ধককৃত বস্তু বিক্রেতা ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া রিবার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এটি বন্ধকের উদ্দেশ্যও নয়। বন্ধকের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে,

সময়মতো দেনা পরিশোধ না হলে এর মাধ্যমে তা পরিশোধ করা হবে।

২. অথবা ক্রেতা পণ্য হস্তগত করার পর সেটাই পুনরায় বন্ধক হিসাবে দিতে পারে।

বন্ধকের উভয় সুরতে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করলে, বিক্রেতা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রয় করে তার মূল্য উসুল করে নিতে পারবে। তবে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে। এরূপ শর্ত করা যেতে পারে যে, সর্বোচ্চ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করা হলে বন্ধককৃত বস্তু নিলামে উঠবে। এর জন্য আলাদা অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

প্রকাশ থাকে যে, বাকি বিক্রয়ে সরাসরি পণ্যকে মূল্য পরিশোধের জন্য আটকে রাখা যায় না। বরং সেটা ক্রেতা আগে হস্তগত করতে হয়। এরপর সেটা বন্ধক হিসাবে রাখা যাবে।

৩. অথবা শুরুতেই ক্রেতা থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেওয়া হবে যে, যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হলে, এই পরিমাণ টাকা বিক্রেতার বিশেষ ওয়েলফেয়ার ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে। এভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর, কিস্তি ফেইল হলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রেতা পূর্ব ঘোষিত বিশেষ হারে কিছু অর্থ বিক্রেতার ওয়েলফেয়ার ফান্ডে দান করবে। এরপর বিক্রেতা সেটি সদকা করে দিবে। নিজের মুনাফা হিসেবে উক্ত দানকে গণ্য করা যাবে না। এর উপকারিতা কেবল এতটুকু যে, ক্রেতা যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে অধিক যত্নবান হবে।

৪. অথবা কাউকে গ্যারান্টর বা জামিন হিসাবে গ্রহণ করা হবে। এভাবে নানা উপায় অবলম্বন করে ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব।

প্রকাশ থাকে যে, কিস্তি ক্রয়-বিক্রয়ে মৌলিক চারটি শরীয়াহ নীতি অনুসরণ করা জরুরি। যথা—

১. পণ্যের মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসেই সুনির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

২. চুক্তিতে এরূপ শর্ত করা যাবে না যে, কোনো কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করতে হবে। অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে মূল্যও বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও পরবর্তীতে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন

হতে না হয়, তদুপরি এভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কিস্তিতে কোনো কিছু ক্রয় করা যাবে না। কারণ এটি একটি সুদী চুক্তি।[১]

তদ্রূপ সময়ের আগে মূল্য পরিশোধ করলে ছাড় প্রদান করা হবে এরূপ শর্তারোপও করা যাবে না।

৩. মূল্য আদায়ের সময় বা কিস্তি পরিশোধের সময় ও সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া।[২]

যে কোনো ধরনের পণ্য কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উক্ত ৪টি শর্ত পালন হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা জরুরি। নতুবা লেনদেন শরীয়াহ পরিপন্থী হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রচলিত হায়ার পারচেজ চুক্তির দ্বিতীয় শরীয়াহ বিকল্প হতে পারে আইএমবিটি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হয়েছে।

২. ৮. ২. ২. সুদী ঋণ ভিত্তিক ফাইন্যান্স ও এইচপিএসএম

কখনো দেখা যায়, কারো বাড়ি করা দরকার। অথবা ফ্ল্যাট ক্রয় করা দরকার। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ নেই। কিছু ঋণের প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু আবাসন ব্যবসায়ীদেরকে দেখা যায়, এমন বিজ্ঞাপনও দিতে যে, তাদের কাছ থেকে প্লট বা ফ্ল্যাট ক্রয় করতে আগ্রহী হলে, তারাই সুদী লোনের ব্যবস্থা করে দিবে। কনভেনশনাল ফাইন্যান্সে একে 'হাউস লোন' বলে।

অগণিত মানুষ এভাবে সুদী ঋণ নিয়ে ঘরবাড়ির মালিক হচ্ছে। এ ছাড়া কখনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারি কোনো মেশিন বা যন্ত্র ক্রয়েও সুদী ঋণের

---

১ কুয়েত ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুশ শারিয়াহ ওয়াত দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা (Journal of Sharia and Islamic Studies)', সংখ্যা : ১, বর্ষ : ১৯৮৪ (এপ্রিল), (প্রথম বর্ষ)-এ কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত এক ফতোয়ায় লেখা হয়েছে—(ফতোয়া নং : ৬১/৮১, পৃ. ২৬৪) إذا اشترط ذلك أو اتفق عليه لاحقا حرم وإن لم يحصل ذلك بالفعل اهـ

২ আল লাজনাতু দাইমা লিল বুহুছিল ইলমিয়্যাত ওয়াল ইফতায় কিস্তি বিষয়ক এক ফতোয়ায় স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে—إذا كان الأجل معلوماً لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلوماً اهـ (ফতোয়া নং : ১৬৪০২, খ. ১৩, পৃ. ১৬)

আশ্রয় নেওয়া হয়। পরিবহন বা গাড়ি ক্রয়েও সুদী লোনের আশ্রয় নেওয়া হয়।

শরীয়াহ্ বিকল্প

এগুলোর একটি তুলনামূলক ভালো ইসলামী বিকল্প হলো—এইচপিএসএম পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত শিল্প প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট ও পরিবহন। এই তিন খাতে এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতি সুদী বিনিয়োগের বিকল্প হিসাবে প্রয়োগ করে থাকে।

২. ৮. ২. ২. ১. এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতির পরিচয়

উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি চুক্তি ও পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। পদ্ধতিগুলো হলো—

ক. শিরকাতুল মিলক। খ. বাই। গ. ইজারা।

উক্ত তিনটি চুক্তি ও পদ্ধতির মাঝে মূল মুখ্য পদ্ধতি হলো ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতি। বাকি পদ্ধতি দুটি আনুষঙ্গিক।[১] কারণ, ভাড়া প্রদানের মাধ্যমেই মূলত অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মূল রিটার্ন উঠে আসে।

এ পদ্ধতিতে তিনটি চুক্তির সমন্বয় করা হয়েছে বলে কেউ কেউ একে 'হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতি' বলেও অভিহিত করেছেন।[২] কেউ কেউ একে 'ইজারা বিল বাঈ তাহতা শিরকাতুল মিলক' বলেন। তবে সাধারণ পরিভাষায় এটি 'এইচপিএসএম' বা হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (Hiar Purchas under Sirkatul Milk (HPSM) / Diminishing Musharaka) নামেই অধিক পরিচিত।[৩]

১ একে এভাবেও বলতে পারেন, এ পদ্ধতির মাধ্যমে ভাড়া চুক্তির পাশাপাশি সম্পদের মালিকানা লাভ করার জন্য ক্রেতাকে কিস্তিতে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।—ড. ইকবাল কবীর মোহন, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং পৃ : ২৫৭

২ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, শরীয়াহ নীতিমালা, পৃ. ৯৩

৩ এটি একটি মতভেদপূর্ণ বিষয় যে, উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতিকে কোনো ক্যাটাগরিতে রাখা হবে। এখানে তিনটি সম্ভাবনা আছে। যথা, ক. পার্টনারশিপ ক্যাটাগরি। খ. লীজ। গ. বেচাকেনা। এ্যাওফি ও আরবী উলামায়ে কেরাম একে পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে রেখেছেন। এ্যাওফি এ নিয়ে আলোচনা করেছে শিরকাত বিষয়ক শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড-এ।

সংক্ষেপে এ পদ্ধতির মূল কথা হলো,

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক প্রথমে কোনো সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হয় গ্রাহক। অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেওয়ার ও কিস্তিতে বিক্রয় করার চুক্তি করে।

ড. হাসান আলী আস সাজিলী এর একটি বিশদ পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

عقد شركة بين طرفين في عين معينة (كعقار أو مصنع أو طائرة أو سفينة) يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في نهاية مدة معينة يبيع أحدهما للآخر جزءا محددا من نصيبه فيها، كالخمس مثلا خلال مدة خمس سنوات مثلا، لتصبح العين ملكا للمشتري جميعها في نهاية المدة، وعلى أن يؤجره ما يملكه فيها سنة فسنة خلال هذه المدة التي تتناقص فيها ملكيته، أو على أن يؤجراه لأجنبي عن العقد، ويقتسما الأجرة بنسبة ما يملكه، كل منهما في هذه العين من أسهم.) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، العدد: الثالث عشر، عنوان المقالة: االمشاركة المتناقصة و صورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، ص ١)

'অর্থাৎ, কোনো এ্যাসেট (যেমন : স্থাবর সম্পদ বা কোনো শিল্প প্রকল্প বা বিমান কিংবা জাহাজ)-এর ব্যাপারে দুটি পক্ষের মাঝে একটি অংশিদারত্ব চুক্তি কার্যকর হবে। এ চুক্তিতে উভয় পক্ষ এ ব্যাপারে একমত হবে যে, নির্ধারিত সময়ের পরে উক্ত এ্যাসেটের মালিকানা সম্পূর্ণরূপে কোনো এক পক্ষের হয়ে যাবে।

আমাদের বিবেচনায় এটি 'হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতি' হিসাবে স্বতন্ত্র ক্যাটাগরিতে থাকতে পারে। বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটিই ভালো হবে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর ব্যবহার তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে।

আর এটি এভাবে হবে যে, এক পক্ষ তার অংশটি নির্ধারিত অংশে বিভক্ত করে ধীরে ধীরে অপর পক্ষের কাছে বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে। যেমন, এ্যাসেটের এক পঞ্চমাংশের মালিকানা ন্যূনতম ৫ বছরের মধ্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর হবে। এটি করা হবে এ জন্য যে, যেন একটা সময়ে গিয়ে পুরো সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারিত এক পক্ষের কাছে পুরোপুরি স্থানান্তর হয়ে যায়।

সাথে সাথে উক্ত অংশীদারি চুক্তিতে এই সমঝোতাও থাকবে যে, এক পক্ষ তার মালিকানাধীন অংশটি অপর পক্ষের কাছে বছরে বছরে ভাড়ায় প্রদান করবে। এ ভাড়া চুক্তি চলতে থাকবে বিক্রয় চুক্তি অব্যাহত থাকাকালীন। যে সময়ে ক্রয়ের মাধ্যমে ভাড়াদাতার মালিকানা হ্রাস পেতে থাকবে। অথবা অন্য কাউকে ভাড়া দিবে যার চুক্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকে তাদের অংশানুপাতে ভাড়া ভাগ করে নিবে।'

এবার একটি উদাহরণসহ এর একটি ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা হলো। এতে বিষয়টি আরো সহজে বুঝতে সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ।

ক. প্রথমে ইসলামী ব্যাংক ও ক্লায়েন্টের মাঝে একটি ওয়াদা চুক্তি হয়। গ্রাহক ওয়াদা করবে, ব্যাংকের অংশ ভাড়ায় গ্রহণ করবে এবং ক্রয় করবে।

খ. এরপর উভয়ে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো কিছুর মালিক হবে। যেমন, তারা যৌথভাবে কোনো ফ্ল্যাটের মালিক হলো। এতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের বিনিয়োগ বেশি হয়ে থাকে। ধরা যাক, ফ্ল্যাটের ৮০.% বিনিয়োগ ব্যাংকের। আর ২০% বিনিয়োগ ক্লায়েন্টের। এভাবে ফ্ল্যাট প্রস্তুত হবে।

গ. ফ্ল্যাট প্রস্তুত হওয়ার পর ব্যাংকের অংশটি গ্রাহক ভাড়ায় গ্রহণ করবে। পূর্বোক্ত উদাহরণে ব্যাংকের অংশ ৮০%।

ঘ. ভাড়া চুক্তির পাশাপাশি ব্যাংকের অংশটি বিভিন্ন ইউনিট ও কিস্তিতে ভাগ করা হয়। ভাড়া চলাকালীন সময়ে সময়ে গ্রাহক ব্যাংকের অংশের একটি করে ইউনিট ক্রয় করে নেয়। প্রতিটি ইউনিটের একটি মূল্য সুনির্ধারিত থাকে। গ্রাহক কর্তৃক ধীরে ধীরে ব্যাংকের মালিকানাধীন

ইউনিটসমূহ ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পেতে থাকবে। অপরদিকে গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পাবে।

একটা পর্যায়ে এসে গ্রাহক ব্যাংকের সবগুলো ইউনিট ক্রয়সূত্রে মালিক হয়ে যাবে। এভাবে পুরো ফ্ল্যাটের মালিকানা এক সময় গ্রাহকের হয়ে যাবে। ব্যাংকের মালিকানা শূন্য হয়ে যাবে।

মোটকথা, এ পদ্ধতিতে প্রকল্পে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পেতে থাকে। তাই এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিও (Reducing Method) বলা হয়।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশের অনুশীলন অনুযায়ী এখানে ভাড়া ও ক্রয় চুক্তি একই সময় হয়ে থাকে। একই সাথে চলমান থাকে।

২. ৮. ২. ২. ২. এইচপিএসএম পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, উক্ত পদ্ধতিতে সম্পদে ব্যাংকের অংশটি গ্রাহক ভাড়া হিসাবে ব্যবহার করে। একই সঙ্গে তা ধীরে ধীরে ক্রয় করে নেয়। ব্যাংক তার অংশে দুটি কাজ করে। যথা—

- ভাড়া বা রেন্ট নির্ধারণ করা। এই ভাড়ার কিস্তি শেষ পর্যন্ত সমান থাকে। যদিও এমন হওয়ার দরকার ছিল, প্রথম দিকে ব্যাংকের অংশ বেশি থাকায় ভাড়া কিস্তি অধিক হবে, শেষের দিকে ব্যাংকের অংশ কম থাকায় ভাড়া কিস্তি কম হবে। তবে গ্রাহকের সার্বিক সুবিধা বিবেচনায় সকল ভাড়া কিস্তি সমান করে দেওয়া হয়।

ইসলামী ব্যাংকারগণ এমনটিই বলে থাকেন।[১] তবে আমাদের বিবেচনায় ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণের বিবেচনায় ভাড়া কিস্তি নির্ধারিত হওয়াই অধিক ভারসাম্য।

- বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা। এটিও বিভিন্ন কিস্তিতে ভাগ করা হয়।

বস্তুত গ্রাহক ব্যাংকের সম্পদের অংশটি একই সাথে ভাড়া হিসাবে

১ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, পৃ. ১০২

ব্যবহার করে। এর বিপরীতে ভাড়া কিস্তি পরিশোধ করে। পাশাপাশি সম্পদের মূল্যের কিস্তিও পরিশোধ করে। প্রতিটি ক্রয়-কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে গ্রাহক ক্রয়সূত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদের কিস্তির সমপরিমাণ অংশের মালিক হয়ে যান।

এভাবে ক্রমান্বয়ে সকল ক্রয়-কিস্তি পরিশোধ করা হলে গ্রাহক ব্যাংকের অংশটুকুর পুরোপুরি মালিক হয়ে যান।[1]

শরীয়াহ্ বিশ্লেষণ

এইচপিএসএম পদ্ধতির শরীয়াহ্ বিশ্লেষণে শরীয়াহ্ স্কলারগণ নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যথা—

- উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতির অংশীদারি চুক্তির তাৎপর্য ও প্রকৃতি নির্ণয়।
- সামগ্রিকভাবে এভাবে তিনটি চুক্তির সমন্বিত পদ্ধতির বৈধতা/ অবৈধতা।
- উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি বাস্তবায়নে শরঈ নীতিমালা।
- বিবিধ শরীয়াহ ইস্যু।

২. ৮. ২. ২. ৩. অংশীদারি চুক্তির তাৎপর্য ও প্রকৃতি নির্ণয়

আমরা দেখেছি—এইচপিএসএম পদ্ধতিতে প্রথমে গ্রাহক ও ইসলামী ব্যাংক যৌথভাবে একটি এ্যাসেটের মালিকানা লাভ করে। এই যৌথ মালিকানার ধরন ও প্রকৃতি কি?

ইসলামী ফিকহে যৌথ মালিকানার দুটি ধরন ও প্রকৃতি রয়েছে। যথা—

১. শিরকাতুল আকদ।

২. শিরকাতুল মিলক।

শেরকাতুল আকদ হলো, যৌথ উদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগ করা। এর উদ্দেশ্য হয় বিনিয়োগকৃত পুঁজির মাধ্যমে ব্যবসা করে লাভবান হওয়া। লোকসান হলে উভয়ে পুঁজির আনুপাতিকহারে তা বহন করবেন। শায়খ আলী আল খাফীফ এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

---

১ প্রাগুক্ত।

عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في المال وربحه أو على الاشتراك في ربحه دون الاشتراك في رأس المال، وتسمى في الحالة الأولى بشركة الأموال، وفي الحالة الثانية تسمى مضاربة أو قراضاً.

অর্থাৎ, শিরকাতুল আকদ হলো, দুই বা ততোধিক ব্যক্তিদের মাঝে যৌথভাবে সম্পদ বিনিয়োগ ও মুনাফা লাভের একটি চুক্তি। অথবা শুধু মুনাফায় অংশগ্রহণের যৌথ চুক্তি। একে মুদারাবা বলা হয়।[১]

অপরদিকে শিরকাতুল মিলক হলো, যৌথভাবে কোনো সম্পদের মালিক হওয়া। এটি দুভাবে হতে পারে। এক. কোনো কাজ ছাড়া হয়ে যাওয়া। যেমন, যৌথভাবে উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানা লাভ করা। দুই. ইচ্ছাকৃত কোনো কাজের মাধ্যমে হওয়া। যেমন, যৌথভাবে কোনো কিছু ক্রয়ের মাধ্যমে যৌথ মালিকানা বা শিরকাতুল মিলক সৃষ্টি হওয়া।

এর উদ্দেশ্য থাকে, যৌথভাবে মালিকানার আনুপাতিকহারে সম্পদের অধিকার ভোগ করা। মুনাফা বা ব্যবসায় এখানে উদ্দেশ্য থাকে না।

এ দুটি যৌথ অংশীদারত্বের মাঝে আরো কিছু পার্থক্য আছে। যথা—

• শিরকাতুল মিলক হয় মালিকানা অর্জনের নানা উপায় ও মাধ্যম থেকে। যেমন, ক্রয়, হেবা, মীরাস ইত্যাদি। অপরদিকে শিরকাতুল আকদ হয় ইজাব-কবুলের মাধ্যমে স্বতন্ত্র চুক্তির মধ্য দিয়ে।

• শিরকাতুল মিলকে এক শরিক অপর শরিকের অংশে বিনা অনুমতিতে তসররুফ করার অধিকার রাখে না। অপরদিকে শিরকাতুল আকদে প্রত্যেক শরিক ব্যাপকভাবে তসররুফের অধিকার রাখে।

• শিরকাতুল মিলকে প্রত্যেকের মালিকানা স্বতন্ত্র থাকে। কেউ কারো উকিল হিসাবে বিবেচিত হয় না। অপরদিকে শিরকাতুল আকদে প্রত্যেকে অপরের উকিল হিসাবেও বিবেচিত হয়।

---

১ আশ শারিকাত ফিল ফিকহিল ইসলামী বুহুছুন মুকারানা, পৃ. ২৫। লেখক : শাইখ আলী আল খাফীফ রহ.।

• শিরকাতুল মিলকে প্রত্যেক শরিক তার মালিকানার অংশ অনুপাতে উপকৃত হয়ে থাকে। অপরদিকে শিরকাতুল আকদে প্রত্যেক শরিক চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা পেয়ে থাকে। সুতরাং কোনো শরিক যদি ৬০% পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাহলে সে অপর শরিকের সম্মতিতে ৭০% লাভও নিতে পারবে। শর্ত হলো, সে স্লিপিং পার্টনার না হতে হবে।

আলোচিত এইচপিএসএম চুক্তিতে অংশীদারি চুক্তির প্রকৃতি নির্ণয়ে চার ধরনের মতামত তৈরি হয়েছে। যথা—

১. সমসাময়িক কিছু ফকীহগণের মতে, উক্ত অংশীদারি চুক্তিটি শিরকাতুল মিলক। ড. নাযীহ কামাল হাম্মাদ, ড. হাসান শাযিলী প্রমুখ শায়খগণ এর প্রবক্তা। তাঁদের যুক্তি হলো, এখানে গ্রাহক ও ব্যাংক যৌথ ভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে একটি সম্পদে যৌথ মালিকানা অর্জন করে থাকে। এটি শিরকাতুল মিলকের ইচ্ছেকৃত শিরকাতুল মিলকের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যেমন যৌথভাবে কোনো কিছু ক্রয় করে যৌথ মালিকানা অর্জন করতে পারে, এখানেও তাই হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এ মত গ্রহণ করা হয়েছে।[১]

২. কিছু ফকীহের মতে, উক্ত অংশীদারি চুক্তিটি শিরকাতুল আকদ (ইনান)। ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী রহ., ড. আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ রহ. প্রমুখ শায়খগণ এর প্রবক্তা। তাঁদের যুক্তি হলো, এখানে গ্রাহক ও ব্যাংক যৌথভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে যে মালিকানা অর্জন করে, এর উদ্দেশ্য মুনাফা কামানো। মালিকানা বহাল রেখে উপকৃত হওয়া ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এটি শিরকাতুল আকদ। মিলক নয়। এ্যাওফি, শরীয়াহ বোর্ড এ মত গ্রহণ করেছে।[২]

৩. কারো মতে, এটি না শিরকাতুল মিলক, না শিরকাতুল আকদ। কোনোটার সাথেই এর পুরোপুরি মিল নেই। শিরকাতুল মিলক বলা যায় না, কারণ এতে মুনাফা কামানো উদ্দেশ্য থাকে। শিরকাতুল আকদও পুরোপুরি বলা যায় না, কারণ এতে প্রত্যেকে তসররুফের ক্ষেত্রে একে

১ ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ পদ্ধতি, পৃ. ১০০

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫

অপরের সম্পূর্ণ উকিল বলা যায় না। এ টাকা দিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জনও উদ্দেশ্য নয়, যা শিরকাতুল আকদে হয়ে থাকে।

বস্তুত এটি একটি নতুন শিরকাত। যেখানে একজনের অংশীদারিত্ব অপরজনকে ক্রমান্বয়ে মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে যায়। বড়জোর কিছুটা সাদৃশ্য হয় শিরকাতুল আমওয়ালের সাথে। বিখ্যাত ফকীহ, ড. আজীল জাসিম আন নাশমী সাহেব এ মতের প্রবক্তা।

৪. কিছু ফকীহের মতে, একেক সুরত ও প্রয়োগে উক্ত অংশীদারি চুক্তিটি শিরকাতুল মিলক হবে, কখনো শিরকাতুল আকদ হবে। অর্থাৎ, যদি বাড়ি, গাড়ি বিনিয়োগে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তাতে উক্ত অংশীদারি চুক্তিটি শিরকাতুল মিলক বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ব্যবসায়িক এমন কোনো প্রকল্পে যদি প্রয়োগ করা হয়, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত মুনাফা আসে, তাহলে তখন উক্ত অংশীদারি চুক্তিটি শিরকাতুল আকদ বলে বিবেচিত হবে। যেমন, যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি বিমান ক্রয় করা হয়েছে। এরপর তা ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত মুনাফা অংশীদারদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

এ মতামতটি মুফতি তাকী উসমানী হাফি., ড. আলী আহমাদ সালূস প্রমুখ শায়খদের।[১]

পর্যালোচনা

সত্যি বলতে বিষয়টি জটিল। আমাদের বিবেচনায় উক্ত অংশীদারিত্ব চুক্তির মাঝে দু ধরনের শিরকতের বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়। গ্রাহকের দিক থেকে এতে শিরকাতুল মিলক-এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ব্যাংকের দিক থেকে শিরকাতুল আকদ এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কারণ তার উদ্দেশ্য মুনাফা করা। তবে সামগ্রিকভাবে কিছু ক্ষেত্রে শিরকাতুল মিলকের বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়ে উঠে, কখনো শিরকাতুল আকদের বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়। যেমনটি মুফতি তাকী উসমানী হাফি. বলেছেন।

---

১ বিস্তারিত দেখুন, আশ শারিকাতুল মুতানাকিসা ওয়া তাতবিকাতুহাল মুআসারাহ। প্রস্তুত করেছেন, ড. নুরুদ্দীন আব্দুল করীম। এমফিল গবেষণা। আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া। পৃ. ৬৫

প্রশ্ন থেকে যায়, এই মতভেদের ফলাফল কি? বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উক্ত মতভেদের ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে। যথা—

- শিরকাতুল মিলক এর মধ্যে এক শরিক অপর শরিককে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, সে অপর শরিকের অংশ ফেইস ভ্যালু দিয়ে ক্রয় করে নিবে। কিন্তু শিরকাতুল আকদের মাঝে-এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সঠিক হবে না। হ্যাঁ, এভাবে বলা যাবে, বাজারমূল্যে ক্রয় করে নিবে।
- শিরকাতুল মিলক ধরা হলে গ্রাহক হিসাবে নাবালকও যুক্ত হতে পারবে। তবে শিরকাতুল আকদ ধরা হলে এ সুযোগ থাকবে না।
- এইচপিএসএম প্রকল্প থেকে কোনো মুনাফা অর্জন হলে, সেটি প্রত্যেকের মালিকানার আনুপাতিকহারে বণ্টন হবে। কিন্তু শিরকাতুল আকদ ধরা হলে, প্রাপ্ত মুনাফা কমবেশি করেও বণ্টন করা যাবে।[১]
- প্রদেয় পুঁজি নগদ প্রদান করতে হবে। কোনো ঋণকে পুঁজি হিসাবে দেখানো যাবে না। তবে শিরকাতুল মিলক হলে, এতে সমস্যা নেই।

মোটকথা, এভাবে নানা দিক থেকে উক্ত মতভেদের ফলাফল প্রকাশ হতে পারে।

২. ৮. ২. ২. ৪. এইচপিএসএম পদ্ধতির বৈধতা/অবৈধতা

নানা শর্ত ও নীতিমালার আলোকে এইচপিএসএম পদ্ধতির বৈধতার পক্ষেই অধিকাংশ আলিম মতামত প্রদান করেছেন। আন্তর্জাতিক একাধিক শরীয়াহ সিদ্ধান্তে একে বৈধ বলা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে সুদভিত্তিক নানা বিনিয়োগ পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

১৪২৫ হি./২০০৪ ইং. সনে উমানে ইসলামী ফিকহ একাডেমী জিদ্দাহ-এর ১৫তম আন্তর্জাতিক ফিকহ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'ক্রমহ্রাসমান অংশীদারি বিনিয়োগ পদ্ধতি' বৈধ বলা হয়। তাঁদের এ বিষয়ক ১৩৬ নং (২/১৫) রেজুলেশনে বলা হয়েছে—

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫/৫

المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات وروعيت فيها الضوابط الآتية...

'ক্রমহ্রাসমান অংশীদারি বিনিয়োগ পদ্ধতির মাঝে যদি অংশীদারি চুক্তিসংক্রান্ত যাবতীয় শরীয়াহ বিধিবিধান পরিপালন করা হয় এবং তাতে সামনে আলোচিত নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি বৈধ।'

এ ছাড়া ১৪২৩ হি./২০০২ ইং. সনে এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড তাঁদের ১২ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড-এ আলোচিত 'ক্রমহ্রাসমান অংশীদারি বিনিয়োগ পদ্ধতি'-কে নানা নীতিমালার আলোকে বৈধ বলেন।[১]

মোটকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের দৃষ্টিতে নির্ধারিত শর্ত ও নীতিমালার আলোকে এ পদ্ধতি বৈধ। তবে কিছু ফকীহ মনে করেন, যতই শর্ত ও নীতিমালার কথা বলা হোক-দিন শেষে পদ্ধতিটি একটি সুদ গ্রহণেরই অপকৌশল। এমনভাবে একে ডিজাইন করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকে তার উদ্দেশ্য হাসিল করে নেয়। ড. আলী সালূস, ড. সালেহ মারযুকী প্রমুখ স্কলারগণ এ মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২]

এ মতামতটি অগ্রগণ্য না হলেও এতে সন্দেহ নেই। এ পদ্ধতি একটি হিলা বৈ কিছুই নয়। তাই যদিও তা সুদ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। তদুপরি চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা মোটেও সঙ্গত নয়। ইসলাম ও ইসলামের অর্থনীতির সার্বিক প্রয়োগ বিস্তৃত করার মাধ্যমে এ ধরনের লেনদেন সীমিত করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২. ৮. ২. ২. ৫. উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি বাস্তবায়নে শরঈ নীতিমালা

উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি বাস্তবায়নে নানা শরঈ নীতিমালা ও শর্ত রয়েছে। ফকীহগণ বিস্তারিতভাবে সেগুলো তুলে ধরেছেন। শর্ত ও

---

১ ধারা : ৫/১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

নীতিমালাসমূহকে আমরা প্রধান দুটি ভাগে উল্লেখ করতে পারি। যথা—

- মূল চুক্তিসংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা।
- ভাড়া চুক্তিসংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা।

• মূল চুক্তিসংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা

১. চুক্তি ও সম্পদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

২. মৌলিকভাবে শিরকাত চুক্তি, ভাড়া চুক্তি ও বেচাকেনা চুক্তি স্বতন্ত্রভাবে বৈধ। তবে ভাড়া চুক্তি ও ক্রয় চুক্তি একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত (Conditional) হবে না। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করতে হবে। হ্যাঁ, পূর্বে কেবল এক পক্ষীয় ওয়াদা থাকতে পারে। এরপর নির্ধারিত সময়ে স্বতন্ত্র চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া ও বেচাকেনা চুক্তি সম্পন্ন হবে।[১]

১ ভাড়া চুক্তি ও ক্রয় চুক্তি একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত করা 'আকদুন ফি আকদিন' বা 'বাইআতাইন ফি বাইআহ' এর অন্তর্ভুক্ত। এ পদ্ধতি সকলের নিকটই অবৈধ। এতে মূল চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। বিস্তারিত দেখুন, মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০৯, ৩১৩; আল ইনসাফ, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬। শায়খ ওয়াহবা যুহাইলী রহ.ও একে ফাসিদ বলেছেন। (আলফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৪৭৫, খ. ৫) দুঃখজনক হলো, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিক্রির সাথে ভাড়া কিংবা ভাড়ার সাথে বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা সমস্যাজনক নয়। এটি ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার উদ্দেশ্য বিরোধী নয়। (পৃ. ৯৬) এ কথাটি সঠিক নয়। এতে একটি চুক্তিকে অপর চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা হয়। যা কারো মতেই বৈধ নয়। আর ' এটি ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়ার উদ্দেশ্য বিরোধী নয়' কথাটিও ঠিক নয়। ইমাম ইবনে কুদামাহ রহ. একে চুক্তির পরিপন্থী শর্তের অধীনে উল্লেখ করেছেন। (প্রাগুক্ত) তাছাড়া এটি সহজেও বোধগম্য যে, কোনো কিছু বিক্রয় করা হয়েছে। সাথে বিক্রেতার কাছেই সেটি ভাড়া প্রদানের শর্তারোপ করা কিংবা ভাড়া দিয়ে ক্রয় করে নিতে বলা-ক্রয় চুক্তি ও ভাড়া চুক্তির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ক্রয় করে ক্রেতা স্বাধীন থাকবে। তাকে ভাড়ায় প্রদানে বাধ্য করা চুক্তির উদ্দেশ্য বিরোধী। অদ্রূপ ভাড়া গ্রহীতা শুধু ভাড়ার জন্য ভাড়া চুক্তি করে। তাকে আবার ক্রয়ে বাধ্য করা-ভাড়া চুক্তির উদ্দেশ্যেরও বিরোধী। মোটকথা, একটি স্পষ্ট ও সর্বসম্মত বিষয়ে এমন হালকা কথা বলা মোটেও সমীচীন বলে মনে হয়নি। আরো অবাক ব্যাপার হলো, উক্ত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াহবা যুহাইলী রহ.-এর যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তাও বিভ্রান্তিকর। উদ্ধৃতি ও লেখকের বক্তব্যের মাঝে কোনো মিল নেই। তাছাড়া ড. ওয়াহবা যুহাইলী রহ.-এর বক্তব্য যেখান থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখানে পরের প্যারায় স্পষ্ট ভাষায় ভাড়া চুক্তির সাথে ক্রয় চুক্তি বা ক্রয়

এ্যাওফি শরীয়াহ মানদণ্ডে (স. ২৫, ধ. ৩) এ ব্যাপারে বলা হয়েছে—

يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد منها جائزا بمفرده.

অর্থাৎ, একটি চেইনে একাধিক চুক্তির সমন্বয় হতে পারে। তবে একটি চুক্তি অপর চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত হতে পারবে না। এটি তখনই যখন প্রতিটি চুক্তি স্বতন্ত্রভাবে বৈধ হবে।

প্রকাশ থাকে যে, শিরকাত চুক্তির সাথে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিও শর্তযুক্ত হতে পারবে না। শিরকাত চুক্তি এমনভাবে সম্পন্ন হবে, তাতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির শর্তারোপ থাকবে না। হ্যাঁ, শিরকাত চুক্তির বাহিরে কোনো শরিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ওয়াদা প্রদান করতে পারে। (এই ওয়াদা ফেইস ভ্যালুতে হবে, না মার্কেট প্রাইজে হবে-০৬ নং নীতিমালায় তা আলোচনা হয়েছে)

এরপর শিরকাত চুক্তির বাহিরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে। মোটকথা একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত হবে না।[১]

আর শিরকাত চুক্তির সাথে ভাড়া চুক্তি শর্তযুক্ত হলে সমস্যা নেই।

৩. ভাড়া ও ক্রয় চুক্তি যেহেতু সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে, তাই ভাড়া কোনোক্রমেই পণ্যের ক্রয়মূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৪. এ চুক্তি অনুসারে ব্যাংক একজন অংশীদার, ভাড়াদাতা ও বিক্রেতা হিসাবে কাজ করবে। অপরদিকে গ্রাহক একজন অংশীদার, ভাড়াগ্রহীতা ও একজন ক্রেতা হিসাবে থাকবে।

৫. শিরকাতুল মিলক বা শিরকাতুল আকদ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে মঞ্জুরিকৃত অর্থ সরাসরি গ্রাহকের একাউন্টে বা তাকে নগদে প্রদান করা যাবে। কারণ সম্পদ ক্রয়ের জন্য যেকোনো অংশীদারকে দায়িত্ব দেওয়া বৈধ।

৬. মূল চুক্তিতে গ্রাহক এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না বা তার থেকে এমন

চুক্তির সাথে ভাড়া চুক্তিকে নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু লেখক তা কেন উদ্ধৃত করেননি বোধগম্য নয়।

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫/১

প্রতিশ্রুতি নেওয়া যাবে না যে, ব্যাংকের অংশটি গ্রাহক ফেইস ভ্যালুতে ক্রয় করে নিবে।[১]

তবে এক্ষেত্রে যেই দিন বিক্রি করবে সেই দিনের বাজার মূল্যের হিসেবে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে। অথবা আলোচনা সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারণ করত ক্রয় করে নেওয়া হবে-এমন প্রতিশ্রুতিও বৈধ।[২]

প্রকাশ থাকে যে, এ শর্তারোপ 'শিরকাতুল আকদ' এর ভিত্তিতে। যারা এ পদ্ধতিতে প্রয়োগকৃত অংশীদারি চুক্তিকে শিরকাতুল মিলক বিবেচনা করেন, তাদের দৃষ্টিতে এমন প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসুবিধা নেই। তবে আমাদের দৃষ্টিতে-এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

৭. শিরকাত চুক্তি চলাকালীন সম্পদে কোনো ধরনের অনিচ্ছাকৃত অঘটন ঘটলে, যেমন : সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক শরিক তার পুঁজি অনুপাতে তা বহন করবে।

৮. ক্রয় চুক্তি ও ভাড়া চুক্তি স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করার জন্য স্বতন্ত্র ডকুমেন্টস প্রস্তুত করতে হবে। মূল এইচপিএসএম ডকুমেন্ট-এ সকল চুক্তি লিখিত থাকবে না। কারণ এতে চুক্তিসমূহ একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে ঘনিভূত করে তোলে। যা সঠিক নয়।

৯. সম্পদে গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শুধু ব্যাংকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে শিরকাত হবে না। তদ্রূপ ক্রয়কৃত সম্পদে ব্যাংক ও গ্রাহকের যৌথ মালিকানার বিষয়টি চুক্তিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। শুধু তাই নয়; দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার ইক্যুইটি অনুযায়ী সম্পদে তাদের মালিকানা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।[৩]

১০. ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বন্ধক, জামানত ও গ্যারান্টি গ্রহণ করা যাবে। (শিরকাতুল মিলক ধরা হলে এ বিষয়টি অধিক সহনীয় হয়)

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫/২

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫/৭

৩ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, পৃ. ১০৪

* ## ভাড়া চুক্তিসংক্রান্ত শরঈ নীতিমালা

১. যৌথ ও অবিভক্ত মালিকানায় এক শরিক অপর শরিকের কাছে তার অংশ ভাড়ায় প্রদান করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শরিক তার মালিকানার আনুপাতিক হারে সম্পদের মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ বহন করবে।[১]

মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণের মাঝে বীমার খরচ অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে সম্পদের মূল মালিক এক সময় গ্রাহক হয়ে যাবে, এই যুক্তিতেও সকল খরচ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।[২]

তবে ভাড়াকৃত সম্পদে দৈনন্দিন ব্যবহারজনিত সাধারণ ব্যয় বহনের দায়িত্ব থাকবে ভাড়াগ্রহীতার ওপর।

২. সম্পদ ভাড়ায় প্রদানের যোগ্য হওয়ার আগে গ্রাহকের কাছে ভাড়া প্রদান করা যাবে না। যেমন, বিল্ডিং এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার আগেই ভাড়া চুক্তি শুরু করে দেওয়া। এমনটি করা যাবে না।

৩. অংশীদারি চুক্তি অনুসারে ভাড়াকৃত সম্পদে ব্যাংক তার অংশের মালিকানা ও ঝুঁকি বহন করবে। ব্যাংকের অংশের ঝুঁকি গ্রাহক বহন করবে না। গ্রাহকের অংশের ঝুঁকিও ব্যাংক বহন করবে না।

৪. কোনো ভাড়া কিস্তি অনাদায়ী থাকলে এর ওপর মেয়াদান্তে সময় বৃদ্ধির বিপরীতে অতিরিক্ত গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে এমনটি হলে পরবর্তী মাসের ভাড়া বৃদ্ধি করে দেওয়া যেতে পারে কিংবা ক্রয়-কিস্তি মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৫. ভাড়াকালীন সম্পদে ভাড়াগ্রহীতার অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অবহেলা কিংবা ভুলভ্রান্তির কারণে সম্পদের কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে, এর দায় গ্রাহক বহন করবে।

৬. এইচপিএসএম-এর সম্পদ প্রস্তুত করার জন্য কিংবা ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে ভাড়া বা চার্জ গ্রাহক থেকে আদায়

---

১ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫/৯

২ এ্যাওফি, স. ১২, ধ. ৫/৩

করা যাবে না। এ জন্য চুক্তিতে অবকাশকাল (Gestation Period)-এর উল্লেখ থাকতে হবে।

৭. ভাড়া চুক্তিতে প্রত্যেকটি ইউনিটের ভাড়া ও সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৮. ভাড়াকৃত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়াটা শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হতে হবে।

৯. সম্পদে ব্যাংকের অংশ থেকে যে পরিমাণ মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হবে, সে অংশের ভাড়া আর গ্রাহক থেকে নেওয়া যাবে না।

১০. সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা যাবে না। যেমন, এইচপিএসএম-পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত কোনো গাড়ি দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তার ভাড়া আদায় করা যাবে না। তদ্রূপ ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদ বা মেশিনারিজ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তার ভাড়াও আদায় করা বৈধ হবে না।

২. ৮. ২. ২. ৬. বিবিধ শরীয়াহ ইস্যু

এইচপিএসএম চুক্তিতে ওয়াদা চুক্তি

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ওয়াদা চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। গ্রাহক শুরুতেই ওয়াদাবদ্ধ হয় ব্যাংকের অংশ ভাড়ায় গ্রহণ করবে ও ক্রয় করবে। এই ওয়াদা এক পক্ষীয়ভাবে হবে, না দ্বিপাক্ষিক হতে পারে?

এ ব্যাপারে ইসলামী ফিকহ একাডেমী, জিদ্দাহ-এর সিদ্ধান্ত হলো উক্ত ওয়াদা একপক্ষীয় হতে হবে। অর্থাৎ এক পক্ষ ওয়াদা দিবে, সে অপর পক্ষের অংশ ভাড়া ও ক্রয় করবে। অপরপক্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে—তা করা না করার।

এরপর যথাসময়ে স্বতন্ত্র চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া ও ক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন হবে। সেক্ষেত্রে ইজাব-কবুল ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে।[১]

বাস্তব প্র্যাক্টিসে উক্ত এক পক্ষীয় ওয়াদা গ্রাহকের পক্ষ থেকে হতে পারে।

---

১ রেজুলেশন নং : ১৩৬ (২/১৫), ধারা : ৩

অপরদিকে মুফতি তাকী উসমানী হাফি. প্রমুখ ফকীহ্ মনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বিপাক্ষিক ওয়াদাও হতে পারে। পরবর্তীতে যথাসময়ে স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন হবে।[১]

তাছাড়া আলোচিত ডিমিনিশিং মুশারাকায় এ্যাওফি দু' দিক থেকেই ওয়াদা থাকাকে অনুমোদন করেছে।[২]

উক্ত ওয়াদা শরঈ ও আইন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে পালন করা আবশ্যিক হবে। বিশেষত ওয়াদা রক্ষা না করার কারণে অপর পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, ওয়াদার কারণেই অর্থ ব্যয় হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে ওয়াদাভঙ্গকারীকে বাস্তব ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে।[৩]

মতভেদ থেকে মুক্ত থাকতে, আমাদের বিবেচনায় যথাসম্ভব কেবল গ্রাহকের পক্ষ থেকে এক পক্ষীয় ওয়াদা থাকলে ভালো।

ভাড়াকৃত বস্তুর ইন্স্যুরেন্স

নিত্য ব্যবহৃত ভাড়া চুক্তি বা অপারেটিং লিজ চুক্তিতে সাধারণত 'ইন্স্যুরেন্স' ধারণা নেই। তবে ফাইন্যান্সিয়াল লিজ চুক্তিতে ব্যাপকভাবেই ভাড়াকৃত বস্তুর ইন্সুরেন্স করতে হয়। যেমন—ব্যাংক একটি মেশিন ভাড়া দিল। তাহলে এর ইন্সুরেন্স করতে হবে। কনভেনশনাল সিস্টেমে এই ইন্সুরেন্স ব্যয় ভাড়াটিয়াকে বহন করতে হয়।

অপরদিকে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, এইচপিএসএম পদ্ধতিতে মালিকানা যার, রিস্ক ও দায়ও তাকে নিতে হবে। সে হিসেবে ইসলামী ব্যাংক ইন্সুরেন্সের যাবতীয় খরচ একা গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। বরং মালিকানার আনুপাতিকহারে প্রত্যেকে তা বহন করতে হয়।

যেহেতু অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানকেও ইন্সুরেন্স খরচ বহন করতে হচ্ছে, তাই সে চাইলে শুরু থেকেই এর খরচ অনুমান করে ভাড়ার সাথে যুক্ত করে দিতে পারবে। তবে একবার ভাড়া ফিক্সড করার পর সেটি আর পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন—ধরা যাক, শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল,

---

১ বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা, খ. ২, পৃ. ১০৮

২ স. ৪৯, ধা. ৫/৩

৩ স. ৪৯, ধা. ৩/৪

Maintenance, ইন্সুরেন্স সব মিলিয়ে খরচ হবে ২০ হাজার টাকা। সে হিসেবে তিন মাসের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল খরচ বেড়ে গেছে। ২ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। তাহলে এখন এই দুই হাজার টাকা ভাড়াটিয়া থেকে নেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, পরবর্তী পিরিয়ডের জন্য নতুন করে ভাড়া চুক্তি নবায়ন করা যাবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক ইসলামী বীমা অনুপস্থিত। এহেন মুহূর্তে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য করণীয় কী? তা নির্ণয় করতে গিয়ে যুগের ফকীহগণের ভাষ্য হলো, সঠিক ইসলামী বীমা সেবা যদি অনুপস্থিত থাকে, লেনদেন ভলিয়ম মোটা অংকের অর্থের হয় ও ভাড়াকৃত বস্তুরও দাম বেশি থাকে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী বীমার ব্যবস্থা হওয়ার পূর্বপর্যন্ত প্রয়োজনে কনভেনশনাল বীমা গ্রহণ করা যাবে। আরবের প্রায় সকল উলামায়ে কেরামের মত এটি।

তাঁদের মতে, সাধারণ বীমা নিষিদ্ধ হওয়ার যে কারণ, সেটি রিবা নয়; বরং 'গারার'। যা প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে বৈধ হয়ে যায়।

মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ-এর ওপর মন্তব্য করে বলেছেন, উক্ত কারণ ও অনুমোদন আমার কাছে বোধগম্য নয়। তবে এ ধরনের কথা বলেছেন বড় বড় গ্রহণযোগ্য আলেম। তন্মধ্যে শায়খ সিদ্দীক আমীন আদ দরীর অন্যতম। তিনি এ সময়ে বীমার ফিকহ বিষয়ে সবচেয়ে বড় আলেম ও স্কলার। নির্ভরযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। এ ধরনের ক্ষেত্রে তিনি বেশ সংবেদনশীল। তদুপরি তিনি এর পক্ষে উক্ত মতামত দিয়েছেন। এদিকে ব্যবসায়িক রীতিও এত সুদৃঢ় যে তাদেরকে কনভেনশনাল বীমা থেকে বিরত রাখা প্রায় অসম্ভব। সব মিলিয়ে উক্ত মতামত অনুসরণ করা যায়।[১]

ভাড়া পরিবর্তন করা

ফাইন্যান্সিয়াল লিজ চুক্তি সাধারণত বেশ লম্বা সময়ব্যাপী হয়ে থাকে। ৫-৭ বছরব্যাপীও হয়। এই দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ভাড়া চলমান থাকা অনেক সময় ভাড়াদাতা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর হয়

---

১ দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২০৬

না। দেখা গেল, ভাড়া যে হারে নেওয়া হচ্ছে, বাজারে মূল্যস্ফিতি কিংবা প্রফিট রেশিও এর পরিমাণ আরো অধিক।

এর একটি প্রাথমিক সমাধান তো এই যে, এভাবে চুক্তি করা হবে, প্রতি বছর এত পার্সেন্ট ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে; কিন্তু এটি সব ক্ষেত্রে কার্যকর সমাধান হবে না। কারণ, দেখা যাবে, যে হার ঠিক করা হয়েছে, বাজারে প্রফিট/সুদ হার এর চেয়ে আরো বেশি। তখন ভাড়াদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবার কখনো কম হলে ভাড়াটিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই সমস্যা নিরসনের জন্য বিশেষ একটি ফর্মূলা বের করতে হবে। তবে যে ফর্মূলা তৈরি করা হবে, এর দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যথা :

ক. যে পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ভাড়া পরিবর্তন হবে, সেই পদ্ধতি ও মাধ্যম সুসংগঠিত হতে হবে ও এর মাধ্যমে ভাড়া সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সহজ হতে হবে। যা ঝগড়া সৃষ্টি করবে না।

এর অর্থ হলো, শুরুতে যদিও ভাড়ার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যাবে না। তবে এটি যে মাধ্যমে নির্ণীত হবে, সেটি বেশ সুসংগঠিত। একে কেন্দ্র করে কোনো প্রকার ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো, আমাদের ঢাকা শহরের সি.এন.জির ভাড়া নির্ধারণ হয় মিটারের মাধ্যমে। শুরুতে কত ভাড়া দিতে হবে তা জানা থাকে না। প্রতি মিটার একটি ভাড়া ধার্য থাকে। তবে কত মিটার যাওয়া হবে সেটি শুরুতে জানা থাকে না। গন্তব্যে পৌঁছার পর সবকিছু স্পষ্ট হয়। এটি বৈধ। কারণ, এখানে উভয় পক্ষ ভাড়া নির্ধারণের এই পদ্ধতির ওপর একমত। পদ্ধতিটিও সুসংগঠিত। যে কারণে এতে ঝগড়া সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ভাড়ার অজ্ঞতা এক্ষেত্রে বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক হবে না।

মোটকথা, এমন সুসংগঠিত পদ্ধতি হতে হবে, যার মাধ্যমে ভাড়া জ্ঞাত হওয়া নিয়ে কোনো প্রকার ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। এটিই এর মূল কথা।

খ. অজ্ঞতা ও গারার (Uncertainty) এ পরিমাণ না থাকা যে, এ কারণে যে কারো ওপর সীমাতিরিক্ত আর্থিক বোঝা সৃষ্টি হয়।

উক্ত দুটি মূলনীতিকে সামনে রেখে যে ফর্মূলা এ্যাওফি নির্ধারণ করেছে

এর সারসংক্ষেপ হলো :

১. প্রথম মাস বা প্রথম পিরিয়ডের জন্য সুনির্দিষ্ট অংকে ভাড়া নির্ধারণ করা হবে। এটি করা সম্ভব। কারণ, প্রথমবার তৎকালীন বাজার যাচাই করে সুনির্দিষ্ট অংকে ভাড়া নির্ধারণে কারো কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

২. পরবর্তী মাস বা পিরিয়ডের জন্য কোনো একটি ইন্ডিকেটরের (Indicator) সাহায্য নেওয়া হবে। সাধারণত এক্ষেত্রে কনভেনশনাল সিস্টেমে Banch Mark ভিত্তিক সুদের রেশিও গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ সুদের হার যে হারে বৃদ্ধি হবে, অটোমেটিক ভাড়ার হারও বৃদ্ধি হবে। এভাবে কোনো একটি ইন্ডিকেটর গ্রহণ করবে। যাতে কোনো প্রকার ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। এতে ভাড়ার অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে।

৩. বাকি থাকল ভাড়ার পরিমাণে গারার (Uncertainty) দূর করা। এমন যেন না হয় যে, যে ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করা হয়েছে, এতে এই পরিমাণ ভাড়া বৃদ্ধি হবে, তা আন্দায করতে পারেনি গ্রাহক। দেখা গেল, গ্রাহক চিন্তা করেছিল, সুদের হার হয়তো এই পরিমাণ বৃদ্ধি হবে; কিন্তু বাস্তবে সেটি হয়ে গেল অনেক। যা আগে চিন্তাও করা হয়নি। এতে ভাড়াটিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথবা এর বিপরীত হলে ভাড়াদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এজন্য এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। যেমন—বলা হবে, সর্বোচ্চ ৫০% অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে। এর অধিক সুদহার বেড়ে গেলে সেটি ধর্তব্য হবে না। কেবল ৫০% পর্যন্ত ধরা হবে। তদ্রূপ সর্বনিম্ন ২৫% ধরা হবে। এর নিচেও সুদের হার চলে গেলে তা ২৫% এর নিচে ধরা হবে না। আরবীতে ওপরের সীমানাকে 'সাকাফ' (السقف) বলে। আর নীচের সীমানাকে 'আরদ্ব' (الأرض) বলে। ইংরেজিতে যথাক্রমে Celling ও Floor বলে।

মোটকথা, কোনো ইন্ডিকেটরের সাহায্যে ভাড়ার হার নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবে এর সাথে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে হবে।[১]

প্রকাশ থাকে যে, এভাবে ভাড়া নির্ধারণ করা হলে তা যদিও বৈধ হয়ে

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ৫/২/৩, সাথে দুরুসুল মাআয়ির দ্র.।

যাবে, তদুপরি সুদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এভাবে ভাড়া নির্ধারণ করা ভালো অনুশীলন নয়।

২. ৮. ২. ২. ৭. এইচপিএসএম ও ডিমিনিশিং মুশারাকা (الشركة المتناقصة)

বিশেষ অর্থায়নের উদ্দেশ্যে অংশীদারি চুক্তি করা, এরপর অর্থায়নকারী তার অংশটুকু ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে দেওয়া। এ পদ্ধতিটি অন্যান্য বিশ্বে 'শারিকাতুল মুতানাকিসা' বা ডিমিনিশিং মুশারাকা নামে পরিচিত। এটিই বাংলাদেশে HPSM নামে পরিচিত।

আরব বিশ্বে ইসলামী ফিন্যান্সে ডিমিনিশিং মুশারাকার প্রথম ব্যবহার হয় মিশরে। সম্ভবত সেটি সত্তর দশকের শুরুর দিকে হবে। মিশরের একটি পর্যটন কোম্পানি কায়রো ও দক্ষিণ মিশরের আসওয়ান পর্যটন শহরের মাঝে পর্যটকদের সহজ যাতায়াতের জন্য একটি নৌবহর বা গাড়ি বহর স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় মিশরের একটি কমার্শিয়াল ব্যাংকের ইসলামী শাখা এতে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়।

গাড়ি বা নৌ বহরের মূল্য ছিল ৫ মিলিয়ন মিশরী মুদ্রা। কোম্পানি এক মিলিয়ন বিনিয়োগ করে। আর বাকি ৪ মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছিল ব্যাংকটি। তাদের মাঝে চুক্তি ছিল-কোম্পানী একেকটি কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে ব্যাংকের অংশ থেকে কিছু অংশের মালিক হয়ে যেত। এভাবে কিস্তি পরিশোধ বৃদ্ধির সাথে সাথে কোম্পানির মালিকানাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় পুরো প্রকল্পের মালিক হয়ে যায় পর্যটন কোম্পানি।

এরপর জর্দানের ইসলামী ব্যাংক জমি/ফ্ল্যাট, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রকল্পে উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি ব্যবহার করে। সেটি ১৯৭৫/৭৮ এর দিকের কথা।[১]

কেউ কেউ বলেছেন, ১৯৭৬ ইং. সনে ড. সামী হাসান হামুদ সাহেব

---

১ আল মুআমালাতুল মালিয়্যা আল মুআসারাহ ফিল ফিকহিল ইসলামী, ড. মুহাম্মাদ উসমান শাব্বীর, পৃ. ৩৩৪

প্রথম তাঁর গবেষণায় উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

যাই হোক, বর্তমানে পুরো বিশ্বেই ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে এ পদ্ধতিটি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এইচপিএসএম নামে ব্যবহৃত হয়। ৮০ এর দশকে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লি. এটি উদ্ভাবন করে।[২]

প্রশ্ন হলো, এইচপিএসএম ও ডিমিনিশিং মুশারাকা এক না ভিন্ন? বস্তুত এ দুটি বিনিয়োগ পদ্ধতির মাঝে মিল-অমিল দু দিকই রয়েছে।

মিলের দিকগুলো হলো—ক. দুটি পদ্ধতিই একটি অস্থায়ী অংশীদারি চুক্তি। খ.অ র্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে তার মালিকানা ছেড়ে দেয়। গ. একাধিক চুক্তির সমন্বয় ঘটে।

এ তিনটিই মূল কথা। এ দিক থেকে মৌলিকভাবে দুটি পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। শরীয়াহ বিধি-বিধানও অভিন্ন।

পার্থক্যের দিক কেবল একটি। মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। শারিকাতু মুতানাকিসার ব্যাখ্যায় এ্যাওফি ও অন্যান্য কিছু স্কলারগণ লিখেছেন, এতে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তর হবে সরাসরি কিস্তিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে। তারা ভাড়ার কথা মৌলিকভাবে বলেন না।

অপরদিকে HPSM এ পদ্ধতিতে মালিকানা হস্তান্তর হয় ভাড়া কিস্তি ও ক্রয় কিস্তি দুটির মাধ্যমে। অবশ্য শারিকায়ে মুতানাকিসায়ও ভাড়া প্রদান বৈধ। তবে মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া হিসাবে তারা প্রধানত কিস্তি ক্রয়কে উল্লেখ করে থাকেন।

---

১ ফাতাওয়াল মুশারাকাত, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশক: মা'হাদুল ইসলামী লিল বুহুস ওয়াত তাদরীব, আইডিবি-এর অঙ্গ সংগঠন। পৃ. ৩৪। ড. সামী সাহেবের গবেষণার নাম : تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق الشريعة الإسلامية। এটি তাঁর পিএইচডি গবেষণাপত্র। ৩০/৬/১৯৮৬ ইং. সনে গবেষণাটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পরবর্তীতে তা গ্রন্থাকারে একাধিক লাইব্রেরি থেকে প্রকাশ হয়। জর্দানের মাকতাবাতুশ শারক্ব অন্যতম প্রকাশক। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বুনিয়াদি চিন্তা ও তত্ত্ব বিনির্মাণে গবেষণাটি বেশ মূল্যবান একটি প্রচেষ্টা।

২ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি, পৃ. ৯৩

অবশ্য কতক স্কলার, শারিকাতু মুতানাকিসার ব্যাখ্যায় ভাড়ার কথাও মৌলিকভাবে বলে থাকেন।

শায়খ তাকী উসমানী হাফি. আরেকটি পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো—

ডিমিনিশিং মুশারাকা কিছুটা ব্যাপক। এতে প্রথমে যে 'শিরকাত চুক্তি' হয়, সেটি দুভাবে হতে পারে। যথা :

ক. শিরকাতের উদ্দেশ্যে প্রফিট বা লাভ করা। পরিভাষায় একে 'শিরকতে ইসতিরবাহ' বলে। এর প্রয়োগ পদ্ধতি হলো, দুজন যৌথভাবে কোনো একটি বাড়ির মালিক হবে। এরপর একজন অপরজনের অংশ ক্রয় করে নেবে। কোনো প্রকার ভাড়া চুক্তি হবে না।

এভাবে চুক্তি করা বৈধ। তবে শর্ত হলো, মূল শিরকাত-চুক্তিতে শরিক তার অপর শরিকের অংশ ফেইস ভ্যালু দিয়ে ক্রয়ের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না। কারণ, এতে মূলধন বা পুঁজির নিরাপত্তা প্রদান করা আবশ্যক হয়, যা বৈধ নয়। তাই মার্কেট ভ্যালু দিয়ে ক্রয়ের কথা বলতে হবে।

খ. প্রথমে যৌথভাবে কোনো বস্তুর মালিকানা অর্জন করা হবে। এরপর ভাড়া ও ক্রয়চুক্তি দুটি আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে চালু হবে। এক্ষেত্রে মৌলিক শিরকাত চুক্তি স্রেফ 'শিরকাতুল মিলক'। তাই এতে ফেইস ভ্যালু দিয়ে ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা যাবে।

উপর্যুক্ত দুটি পদ্ধতিই ডিমিনিশিং মুশারাকা। তবে এইচ পি এস এম কেবল দ্বিতীয়টি।[১]

মোটকথা

শারিকায়ে মুতানাকিসা ও এইচপিএসএম মূল উদ্দেশ্য ও ফলাফলের বিবেচনায় অভিন্ন। তাই প্রত্যেকটির শরীয়াহ বিধান ও নীতিমালাও প্রায় একই। পার্থক্য শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে। এ্যাওফি ও অন্যদের মতে, শারিকাতু মুতানাকিসায় মূলগতভাবে ভাড়া চুক্তি নেই। অপরদিকে

---

১ দুরুসুল মাআয়িির অবলম্বনে। পৃ. ২৫২

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে ভাড়া চুক্তিও আছে। আবার কতকের মতে দুটিতেই ভাড়া চুক্তি আছে।

বাকি শিরকাতুল মিলক ও আকদের যে পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা আমাদের দৃষ্টিতে গৌণ। কারণ দুটি পদ্ধতিতেই অংশীদারিত্ব চুক্তিটি শিরকাতুল মিলক হতে পারে, আকদও হতে পারে। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদ মতভেদ আলোচনা হয়েছে।

২. ৮. ২. ২. ৮. এইচপিএসএম-বিনিয়োগ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি সুদমুক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতি। এতে উভয় পক্ষের জন্য ইনসাফ রয়েছে। কারণ এতে গ্রাহক একদিকে তার প্রয়োজন বৈধভাবে পূরণের সুযোগ পায়। অপরদিকে অর্থায়নকারী ব্যাংকও অর্থায়ন করে বৈধভাবে লাভবান হয়ে থাকে। এর থেকে কখনো মুনাফা হয়ে থাকলে, সেটি মালিকানার আনুপাতিক হারে ইনসাফের সাথে বণ্টন হবে। লোকসান হলেও তা মালিকানার আনুপাতিক হারে বহন করা হবে।

২. উক্ত বিনিয়োগ পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে অর্থায়নকারী হিসাবে। অপরদিকে গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণ থাকে মালিকানা হিসেবে।

৩. এ পদ্ধতি গ্রাহকের প্রত্যাশিত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রাখে। এর মাধ্যমে বড় বড় প্রকল্প যেমন, হাসপাতাল, গার্মেন্টস, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করা সহজ হয়। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে গ্রাহক স্থায়ীভাবে প্রকল্পের মালিকানাও লাভ করে থাকে। একার পক্ষে যা কঠিন ছিল, সেটি এ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করা সহজ হয়ে যায়।

৪. এই পদ্ধতিতে লেনদেন করার ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বিনিয়োগ। সুদ ভিত্তিক ঋণ নয়। এ জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হলে গ্রাহক থেকে সুদ নেওয়া হয় না। বরং শরীয়াহসম্মত নানা বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা হয়।

৫. এ পদ্ধতিতে একাধিক চুক্তির সম্মিলন ঘটে। প্রত্যেকটি চুক্তি একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা হয়।

৬. এ পদ্ধতিতে গ্রাহককে প্রকল্পের মালিকানা লাভের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। সে চাইলে অল্প সময়ে মালিক হতে পারে, চাইলে ধাপে ধাপে চুক্তি অনুযায়ী মালিকানা লাভ করতে পারে।[১]

২. ৮. ২. ২. ৯. বাংলাদেশে এইচপিএসএম পদ্ধতির ব্যবহার

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপকভাবে এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ ইং. এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর ব্যবহারের হার ১৮.৯৮ শতাংশ।

মুরাবাহা ও বাইয়ে মুআজ্জালের পর এর ব্যবহার তৃতীয় সর্বোচ্চ। তবে শরীয়াহ পরিপালন এখনো প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছুতে পারেনি। এ সংক্রান্ত কাগজপত্রে নানা শরীয়াহ অনাগ্রসরতা রয়েছে। এখানে কিছু নমুনা হিসাবে তুলে ধরা হলো।

ক. ভাড়া চুক্তি ও ক্রয় চুক্তি শর্তযুক্ত

এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টে একই কাগজে গ্রাহক কর্তৃক ভাড়া গ্রহণ ও ক্রয়ের চুক্তির কথা রয়েছে। এটি একটি চুক্তিকে অপর চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়। যা বৈধ নয়। যেমন একটি ব্যাংকের ডকুমেন্টে আছে—

WHEREAS the client has also proposed that the portion of the Asset/Property owned by the Bank shall be taken by him on hire at a rent of TK........................ per day/month/quarter/year for a period of............... years, i.e. from................. to ....

WHEREAS the Client has also undertaken that he will buy the Bank's share of ownership

এখানে একই চুক্তিতে ভাড়া ও ক্রয় চুক্তির বিষয় উল্লেখ হয়েছে। বিশেষত ক্রয় চুক্তির আন্ডারটেকিং প্রদান করা হয়েছে।

---

১ আল মুশারকাতুল মুতানাকিসা ও তাতবিকুহাল মুআসারা : ৩৫-৩৭

পূর্বে এর শরীয়াহ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে করণীয় হলো, শুরুতে এ মর্মে শুধু একটি ওয়াদা চুক্তি থাকবে যে, গ্রাহক সময়ে সময়ে ভাড়া গ্রহণ করবে ও ক্রয় করে নিবে। এরপর ভাড়া ও ক্রয় বিষয়ে স্বতন্ত্র দুটি পেপার থাকবে। (আরো দেখুন, বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুয়াসারা, শারিকায়ে মুতানাকিসা দ্র.)

খ. ক্রয় মূল্যে ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ ক্রয় মূল্যে (Sale price as fixed) ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড ও অন্যারা বৈধ মনে করেন না।[১]

শিরকাতুল মিলক ধরা হলে, যদিও তা বৈধ হয়ে যায়। তদুপরি আমরা বলেছি, এমনটি না করা উচিত। এতে আন্তর্জাতিক শরীয়াহ মানদণ্ড রক্ষা হয় না।

একটি ডকুমেন্টে ক্রয় মূল্যে ক্রয়ের কথা এভাবে বলা আছে—

That after purchase/procurement/establishment of the Asset/Property by the Bank, if the Client fails to take delivery of the same on hire and purchase the Bank's owned portion/share on payment of the sale price as fixed herein.

গ. সুদের উপস্থিতি

এটি দুঃখজনক যে, এইচপিএসএম এর মতো একটি শরীয়াহসম্মত প্রডাক্টেও সুদের কথা থাকবে। একটি ডকুমেন্টে আছে—যথাসময়ে কোনো ভাড়া পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে, তাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না—এই ক্ষতিপূরণ স্পষ্ট দায়ের ওপর অতিরিক্ত গ্রহণ, যা সুদ। বিষয়টি এভাবে আছে—

The Hirer shall be liable to pay compensation for his/ their failure to pay the accrued dues.

---

১ আরো দেখুন, ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, রেজুলেশন নং : ১৩৬, ধারা : ৫/১

এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো বকেয়া ভাড়ার ওপর সরাসরি প্যানাল্টি আরোপ না করে, পরবর্তী পিরিয়ডের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এ ছাড়া আরো নানা উপায়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেউ কেউ বলেন, উক্ত জরিমানার অর্থ দান করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সঠিক নয় এ জন্য যে, দান করার আগে তা সুদ হয়ে যাচ্ছে। সুদ হিসাবে গ্রহণ করে দান করা সঠিক পদ্ধতি নয়। এ বিষয়ে দেশীয় আইনে সীমাবদ্ধতা থাকলে তা আলোচনা করে সুরাহা করা উচিত।

ঘ. পুরো সম্পদে যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ এককভাবে গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দেয়া

আমরা জানি, এইচপিএসএম পদ্ধতিতে গ্রাহকের হাতে ব্যাংকের অংশ আমানত হিসাবে থাকে। তাই এমন কোনো ক্রুটি যদি তাতে হয়ে যায়, যাতে গ্রাহকের কোনো হাত নেই, তাহলে সেই ক্ষতিপূরণ গ্রাহক থেকে নেওয়া যাবে না।[১]

কিন্তু একটি ডকুমেন্টে সব ধরনের ক্ষতিপূরণ গ্রাহকের ওপর ব্যাপকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি এভাবে উল্লেখ হয়েছে—

That the Client shall have only the possession and right to use the Bank's owned portion/share of the Asset/Property on regular payment of the rent and that he/she/they will keep the Asset/Property in good working condition and shall be bound to replace by suitable articles of similar kinds at his/her/their own cost or shall pay equal value for all such parts and accessories thereof which have broken or shall become broken, lost or worn-out and shall not alter, take away or remove any parts of the said Asset/Property without consent of the Bank in writing.

---

১ এ্যাওফি, স. ৫, ধা. ৩/২

ঙ. বীমার দায়িত্ব একা গ্রাহকের ওপর দেওয়া

আমরা জেনেছি, সম্পত্তির বীমার খরচ যৌথভাবে বহন করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ক একটি ডকুমেন্টে বীমার সকল খরচ একা গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

That the Client shall keep the Asset/Property comprehensively insured.

যদি ব্যাংক বীমার খরচ বহন করে, তবে এতে অসুবিধা নেই। এর বিপরীতে ব্যাংক তার ভাড়া বা মূল্য বৃদ্ধি করে নিতে পারে।

এভাবে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি এখনো সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টে রয়ে গেছে। এখানে যে উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করা হয়েছে, এটি একটি ইসলামী ব্যাংকের ডকুমেন্টস থেকে নেওয়া। সকল শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর ডকুমেন্টেস-এ যে একই ধরনের সমস্যা থাকবে, তা জরুরি নয়। কিছু সমস্যা প্রায় সবকটিতেই আছে। যেমন, ভাড়া ও ক্রয় চুক্তিকে শর্তযুক্ত করে দেয়া। আবার ব্যাংকভেদে কিছু সমস্যা কমবেশিও হতে পারে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য, সমালোচনা নয়; বরং সচেতনতা তৈরি করা।

ডকুমেন্টস এর পাশাপাশি বাস্তব প্র্যাক্টিসেও নানাভাবে শরীয়াহ বিচ্যুতি হতে পারে। যথা—

সম্পদ ভাড়ায় ব্যবহারের যোগ্য হওয়ার আগেই গ্রাহক থেকে রেন্ট উসুল করা। যথাসময়ে রেন্ট প্রদান না করলে কনভেনশনাল ব্যাংকের মতোই অতিরিক্ত গ্রহণ করা। সম্পদ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হওয়ার পরও ভাড়া উসুল করে যাওয়া। ক্রয়কৃত সম্পদে উভয় পক্ষের মালিকানার অনুপাত সুস্পষ্ট না থাকা। সম্পদ ক্রয়ের আগেই বিক্রয় চুক্তি করে নেওয়া ইত্যাদি।

এ ছাড়া আরো শরীয়াহ ত্রুটি আছে, ব্যাংকের অংশ স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (Damage) হলেও ব্যাংক এর দায় গ্রহণ না করা। বকেয়া ক্রয়-মূল্য নির্ধারিত কিস্তির আগে পরিশোধ করা হলে শর্ত করে ছাড় প্রদান।

মোটকথা, নানাভাবে শরীয়াহ বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন এ

পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ গ্রাহকের কি করণীয়?

এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হলো—

একজন সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে সংশ্লিষ্ট বড় বড় ডকুমেন্টস এ্যানালাইসিস করা, শ'খানেক ধারা পড়া, এরপর শরীয়াহ ত্রুটি চিহ্নিত করা, এ নিয়ে আবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের কারো সাথে কথা বলে সমাধানে উপনীত হওয়া—সব মিলিয়ে এ এক জটিল প্রসেস।

আবার এমনও হতে পারে, ডকুমেন্টস সব ঠিক আছে। কিন্তু অপারেশনস এ শরীয়াহ বিচ্যুতি হয়ে যেতে পারে। দেখা গেল, এ্যাসেট গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই রেন্ট দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

এসব বিষয় একজন সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে উপলব্ধি করা অনেকটাই অসম্ভব। উচিত ছিল, ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে শরীয়াহর ব্যাপারে আপসহীন হয়ে কাজ করবেন। গ্রাহকদেরকে শরীয়াহর ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল করবেন। মূল দায়িত্ব ছিল তাদের। কারণ তারাই শরীয়াহ পরিপালনের ঘোষণা দিয়েছেন।

কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তা অনেকাংশেই হয়ে উঠছে না, তাই অন্তর্বর্তীকালীন এভাবে তা সমাধান করা যায়।

ইসলামী ব্যাংকিং থেকে যিনি এইচপিএসএম বা অন্য কোনো ইসলামী বিনিয়োগ সেবা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন, তিনি তার অজান্তেই শরীয়াহ বিচ্যুতির শিকার হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে, ফিকহুল মুআমালাতে পারদর্শী কোনো মুফতি সাহেবের সাথে বিস্তারিত মশওয়ারা করে নিবেন। তাঁর কাছ থেকে সার্বিক পরামর্শ নিয়ে বিনিয়োগ গ্রহণ করবেন। তিনি কোথাও শরীয়াহ বিচ্যুতির কথা বললে, তা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন। সংশোধনের উদ্যোগ নিবেন।

বিষয়টি আরো সহজে করতে, শরীয়াহ কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে এমন কোনো ফার্মের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।[১] তাঁরাই

---

১ এ বিষয়ে ২০১৫ ইং. সন থেকে অত্যন্ত যত্নের সাথে একদল বিজ্ঞ মুফতি ও

আপনার পক্ষে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মমর্তা, হেড অব ইসলামী ব্যাংকিং এর সাথে কথা বলবেন। সমাধান করার চেষ্টা করবেন।

মোটকথা, ব্যাংকের দায়িত্ব ব্যাংকের কাঁধে। এর জবাবদিহিতা ব্যাংকের কাছে। তবে আপনি একজন গ্রাহক হিসাবে লেনদেনের একটি পক্ষ যেহেতু আপনিও, তাই আল্লাহর কাছে আপনার দায়িত্বের জন্য আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কতার সাথে শরীয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করত লেনদেন করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদের প্রতি সহায় হোন।

২. ৮. ২. ৩. সুদী ঋণ ও সেল এন্ড লিজ ব্যাক

বর্তমানে নানা কারণে মানুষের নগদ ক্যাশের প্রয়োজন হয়। কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া। পণ্যের বকেয়া মূল্য পরিশোধ করা, আমদানি মূল্য শোধ করা ইত্যাদি নানা কারণেই ব্যবসায় নগদ ক্যাশের প্রয়োজন হয়। এর জন্য সুদী অর্থব্যবস্থায় একমাত্র সমাধান সুদী ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা।

শরীয়াহ বিকল্প

সুদী ঋণের নানা শরীয়াহ বিকল্প আছে। সবচেয়ে ভালো বিকল্প-শুরু থেকেই মুশারাকা বিনিয়োগ গ্রহণ করা। এতে পরবর্তীতে নগদ ক্যাশের প্রয়োজন হলেও সেটি মুশারাকা চুক্তির অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারবে।

আগে থেকে যদি তা না করা হয়ে থাকে, তাহলে উপস্থিত নগদ ক্যাশের প্রয়োজন পূরণে সাময়িক ও তুলনামূলক মন্দের ভালো হিসাবে একটি পদ্ধতি হলো—'সেল এন্ড লিজ ব্যাক' বা 'সম্পত্তি বিক্রয়, ভাড়ায় গ্রহণ ও পুনঃক্রয়' পদ্ধতি।

তদ্রূপ কখনো এমন হয়, শরীয়াহ সচেতনতা না থাকায় কেউ হয়তো

আন্তর্জাতিকভাবে সার্টিফাইড দক্ষ শরীয়াহ টিমের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি শরীয়াহ কনসালটেন্সি ফার্ম কাজ করে যাচ্ছে। আইএফ এ কনসালটেন্সি লি. নামে প্রতিষ্ঠানটি পরিচিত।

সুদী লোন নিয়ে ফ্ল্যাট ক্রয় করেছে। এখন এর থেকে বের হতে চায়। সুদী লোন আর পরিশোধ করতে আগ্রহী নয়। এরও একটি তুলনামূলক বিকল্প হতে পারে সেল এন্ড লিজ ব্যাক।

প্রকাশ থাকে যে, সুদভিত্তিক বিনিয়োগের দুটি বিকল্প। যদি সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এর একটি বিকল্প এইচপিএসএম। আর যদি সম্পত্তি অর্জন করা উদ্দেশ্য না থাকে, নগদ ক্যাশের প্রয়োজন, তাহলে কৃত্রিমভাবে সম্পদকে ট্যাগ করে যে শরীয়াহ বিকল্প চিন্তা করা হয়, সেটিই সেল এন্ড লিজ ব্যাক।

২. ৮. ২. ৩. ১. সেল এন্ড লিজ ব্যাক (Sale and Lease Back) পরিচিতি

নাম থেকেই এর পরিচয় বোঝা যায়। যার নগদ অর্থের প্রয়োজন হবে, সে প্রথম ঋণদাতার কাছে তার কোনো একটি এ্যাসেট বা বস্তু বিক্রয় করে দিবে। এরপর সেটিই তার কাছ থেকে ভাড়ায় গ্রহণ করবে।[১] এরপর একট সময় তা পুনরায় ক্রয় করে নিবে। মোট তিনটি ধাপে পুরো পদ্ধতিটি সম্পন্ন হবে। প্রথমে বিক্রয়, এরপর ভাড়া গ্রহণ ও সর্বশেষ ক্রয় করার মাধ্যমে তা সমাপ্ত হবে।[২]

এ পদ্ধতি মূলত একটি হিলা বা কৌশল মাত্র। যা স্বাভাবিক অবস্থায় করা ঠিক নয়। একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ শর্তসাপেক্ষ তা করা যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

ক. প্রথম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ইজারা বা ভাড়াচুক্তি শর্তযুক্ত না হতে হবে।[৩]

খ. 'প্রথম ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় > ভাড়া প্রদান > গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়', এই তিনটি লেনদেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন হতে হবে। আলাদা আলাদা পেপার সাইন হবে। একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত হবে না।

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ৩/২

২ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ৮/৫

৩ এ্যাওফি, স. ৯, ধ. ৩/২

খ. ভাড়া চলাকালীন পণ্যের সম্পূর্ণ রিস্ক ভাড়াদাতা ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের থাকবে।[১]

ঘ. গ্রাহক থেকে ক্রয় করার পর তা তাকে পুনরায় ভাড়া দেওয়ার চুক্তি কমপক্ষে এক বছরের হবে।[২]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি কেবল একটি হিলা বা কৌশলী লেনদেন। একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিবিড় শরীয়াহ পর্যবেক্ষণের অধীনে কেবল সাময়িকভাবে করা যেতে পারে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে, কিছু ইসলামী ব্যাংক একে নিয়মিত প্রোডাক্ট হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে, যা খুবই দুঃখজনক।

২. ৮. ২. ৩. ২. লিজ ব্যাক ও বাই ব্যাক : পার্থক্য

সাধারণত 'ঈনা' বা 'বাই ব্যাক' হলো, ঋণপ্রত্যাশী তার কোনো পণ্য ঋণদাতার কাছে কম দামে নগদে বিক্রয় করা। এরপর পুনরায় সেই তা বাকিতে অধিক দামে ক্রয় করে নেওয়া। এ নিয়ে পূর্বে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এ লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অপরদিকে 'সেল এন্ড লিজ ব্যাক' হলো, ঋণ প্রত্যাশী তার পণ্য বা এ্যাসেট বিক্রয় করে পুনরায় ভাড়ায় গ্রহণ করা। এরপর ক্রয় করে নেওয়া। পদ্ধতিগত ভিন্নতা আছে দুটির মাঝে। তবে দুটিই হিলা ও কৌশলী লেনদেন। পরিণাম ও ফলাফলও প্রায় অভিন্ন। কারণ দুটি পদ্ধতিতেই চূড়ান্ত পর্যায়ে ঋণপ্রত্যাশী বিক্রেতাই ক্রেতা হয়ে যায়।

অবশ্য লিজ ব্যাক পদ্ধতিতে ভাড়া চুক্তির অনুপ্রবেশের কারণে সাধারণ বাই ব্যাকের চেয়ে কিছুটা সহনীয় হয়ে উঠে এবং উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

ক. বাই ব্যাকে দ্বিতীয় বিক্রির পর পণ্যে প্রথম বিক্রেতার মালিকানা বহাল থাকে না। আর এখানে বহাল থাকে। কারণ, তা বিক্রয় নয়, বরং ভাড়া। আর ভাড়াকৃত বস্তুতে ভাড়াদাতার মালিকানা বহাল থাকে।

---

১ জাদিদ মায়াশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা, পৃ. ৪৮২

২ এ্যাওফি, প্রাগুক্ত, ধারা : ৩/২, (খ. ১, পৃ. ১৩৩)

খ. বাই ব্যাকে পণ্যে প্রথম বিক্রেতার কোনো রিস্ক থাকে না। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ রিস্ক প্রথম বিক্রেতার। কারণ, ভাড়াকৃত বস্তুতে মালিকের পূর্ণ রিস্ক বহাল থাকে।

গ. সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা বাই ব্যাকে প্রথম ক্রেতা বহন করে না। অপরদিকে লিজ ব্যাকে প্রথম ক্রেতা তা বহন করে থাকে। কারণ সে ভাড়াদাতা।

মোটকথা, এসব পার্থক্যের কারণে এটি হুবহু বাই ব্যাক না হলেও এর সাথে সাদৃশ রাখে। তাই কেবল একান্ত প্রয়োজনে পূর্বোক্ত শর্তসাপেক্ষে তা ব্যবহার করা যাবে।

২. ৮. ২. ৪. কনভেনশনাল লিজ চুক্তি ও আইএমবিটি

আমেরিকায় সুদের ওপর একসময় মোটা অংকের কর আরোপ করা হতো। অপরদিকে ভাড়ার ওপর কোনো প্রকার কর আরোপ করা হতো না। তখন তারা এই কৌশল বের করল যে, সরাসরি সুদভিত্তিক লোন না দিয়ে, বিশেষ ভাড়া প্রক্রিয়া চালু করল।

তা হলো, কারো ৫ লক্ষ টাকা লোন দরকার। সে তা দিয়ে গাড়ি ক্রয় করবে। তাকে সরাসরি সুদে ৫ লক্ষ টাকা না দিয়ে, তার পছন্দমতো গাড়ি ক্রয় করে, সেটি গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ৫ লক্ষ টাকায় যে সুদ উসুল করা হতো, সেটি ভাড়ায় উসুল করা হবে। আর গ্রাহকের যেহেতু ভাড়া উদ্দেশ্য নয়; বরং গাড়ির মালিক হওয়া উদ্দেশ্য, তাই ওয়াদা দেওয়া হয়, পুরো টাকা উসুল করা হলে নামমাত্র মূল্যে সেটা দিয়ে দেওয়া হবে।

উদ্দেশ্য যেহেতু ভাড়া নয়; বরং সুদী লেনদেন। তাই ভাড়ার কোনো দায়দায়িত্ব ভাড়াদাতার সাথে সম্পৃক্ত হয় না। তাই ভাড়া বস্তু ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেটির দায় ভাড়াগ্রহীতার ওপরই আরোপিত হয়। এজন্য ৫ বছর মেয়াদি ভাড়াচুক্তিতে দুই বছরের মাথায়ও যদি ভাড়া বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তদুপরি ভাড়াগ্রহীতাকে ভাড়া দিয়ে যেতে হয়।

তদ্রূপ বীমা করার প্রয়োজন হলে, সেটিও গ্রাহক বা ভাড়াগ্রহীতা করে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী তা ভাড়াদাতার করার কথা ছিল।

মোটকথা, নামে ইজারা, আসলে কর থেকে বাঁচতে সুদী লেনদেন করা হয়। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতিও সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ, এটি নামমাত্র ভাড়াচুক্তি। সকল রিস্ক ভাড়াগ্রহীতাকেই বহন করতে হয়। ফলে এটি কার্যত সুদী চুক্তি হয়ে যায়।

মূলত এই কনভেনশনাল চুক্তিকেই পরিমার্জন করে শরীয়াহ নীতিমালার আলোকে তৈরি করা হয়েছে 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক' বা আইএমবিটি।[1]

২. ৮. ৩. ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক (IMBT)

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক' একটি বিশেষ আলোচিত বিষয়। এটি মূলত পূর্বোক্ত কনভেনশনাল ফাইন্যান্সিয়াল লিজের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাশাপাশি সুদভিত্তিক লোনের বিকল্প হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কনভেনশনাল ফাইন্যান্সিয়াল লিজের বিকল্প হিসাবে এর ব্যবহার এভাবে হয়ে থাকে, ধরা যাক, কারো বাস্তব অর্থে কোনো মেশিন বা অন্য কোনো বস্তুর মালিক হওয়া উদ্দেশ্য। তবে এর জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। এক্ষেত্রে কনভেনশনাল সিস্টেমে ব্যাপকভাবে চর্চিত পদ্ধতি হলো সুদী লোন গ্রহণ করে মেশিন ক্রয় করে নেওয়া অথবা পূর্বোক্ত কনভেনশনাল ফাইন্যান্সিয়াল লিজ।

অপরদিকে এই উদ্দেশ্য যেহেতু সঠিক, তাই ইসলামী ফিন্যান্সে এর একটি বিকল্প হলো বাকিতে মুরাবাহা করা। আরেক হলো ভাড়ার এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা, যেন নির্ধারিত সময় শেষে বস্তুর মালিকানা গ্রাহকের লাভ হয়ে যায়। মূলত এই দ্বিতীয় বিকল্পটিই 'ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক' নামে পরিচিত।

এর সরল অর্থ, 'এমন একটি বিশেষায়িত ভাড়াচুক্তি, যার পরিসমাপ্তি ঘটবে ভাড়াগ্রহীতাকে এর মালিকানা অর্পণের মাধ্যমে।'

সুদভিত্তিক লোনের বিকল্প ব্যবহার এভাবে হতে পারে, ধরা যাক,

---

১ দুরুসুল মাআয়ির দ্র.।

অনেক টাকা সুদী লোন নিয়ে কেউ ফ্ল্যাট ক্রয় করেছে। এখন সে তাওবা করেছে। সুদের সাথে আর যুক্ত হবে না। এখন সে চায়, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুদভিত্তিক লোন পরিশোধ কার্যক্রম অব্যাহত না রেখে দ্রুত সকল লোন পরিশোধ করে নিজেকে সুদ থেকে মুক্ত করবে। সাথে বাড়িটিও যেন তার থাকে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হলো উক্ত IMBT পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রথমে নিজের সেই ফ্ল্যাট লোনদাতা ব্যাংকের কাছে বিক্রি করে দেবে। এতে তার লোন পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এরপর স্বতন্ত্র চুক্তিতে ওই ফ্ল্যাট ব্যাংক থেকে IMBT পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহণ করবে। এ কাজটি অর্থায়নকারী সুদী প্রতিষ্ঠান না করতে চাইলে, অন্য কোনো ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও করা যায়। (বস্তুত এটি সেল এন্ড লিজ ব্যাক প্লাস আইএমবিটি পদ্ধতি। একে হাইব্রিট আইএমবিটিও বলা যেতে পারে।) তদ্রূপ কেউ সুদী লোন নিয়ে মেশিন ক্রয় করেছে। এখন সুদ থেকে ফিরে আসতে চায়, তার ক্ষেত্রেও এটি একটি তুলনামূলক উত্তম বিকল্প।

মোটকথা, সুদী ঋণ আদায়ের দায় থেকে মুক্তির জন্য তুলনামূলক হাইব্রিড আইএমবিটি ভালো। আর সরাসরি কোনো বস্তু বা সম্পদের মালিকানা লাভের একটি পদ্ধতি শুধু আইএমবিটি হতে পারে।

২. ৮. ৩. ১. প্রায়োগিক ব্যবহার পদ্ধতি

প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে মৌলিকভাবে তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যথা :

ক. প্রথমে মৌলিকভাবে দুটি ওয়াদা চুক্তি করতে হয়। যথা :

১. গ্রাহক ব্যাংককে ওয়াদা প্রদান করবে, ব্যাংক তার কাছ থেকে এ্যাসেট ক্রয়ের পর, সে তা ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করবে।

২. ব্যাংক এই ওয়াদা প্রদান করবে যে, ভাড়াচুক্তির নির্ধারিত সময়ের পর সেটা সে গ্রাহককে দিয়ে দেবে। উক্ত দুটি ওয়াদার ভিত্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেওয়ার জন্য নির্ধারিত এ্যাসেট কিনবেন। এই

দেওয়ার প্রক্রিয়া একাধিক রয়েছে। বিস্তারিত সামনে আসছে।

খ. ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সেই বস্তুটি ভাড়ায় প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক যে টাকায় বস্তুটি ক্রয় করেছে, এর ওপর যে পরিমাণ মুনাফা করতে আগ্রহী, সেটিই ভাড়া আকারে গ্রহণ করা হবে। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে সময়ে ভাড়া প্রদান করে যাবে।

গ. সকল ভাড়া প্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যাংকের যখন মূল ও লাভ অর্জন হয়ে যাবে, তখন সেটির মালিকানা গ্রাহকের কাছে অর্পণ করে দেওয়া হবে।

শর্তাবলি

উক্ত প্রক্রিয়াটি বৈধ হওয়ার জন্য মৌলিক শর্তাবলি হলো :

১. ওয়াদা চুক্তি কারো কারো মতে দ্বিপাক্ষিকও হতে পারে। (পূর্বে বিশদ আলোচনা হয়েছে) তবে ভালো হবে, এক পক্ষীয় করা। এটি এভাবে করা যেতে পারে, প্রথম ওয়াদায় গ্রাহক একপক্ষীয়ভাবে ভাড়া গ্রহণের ওয়াদা প্রদান করবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় ওয়াদায় ব্যাংক বা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এক পক্ষীয়ভাবে পণ্য বিক্রয় বা হেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে।

২. ভাড়াচুক্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ভাড়াচুক্তির যাবতীয় শরীয়াহ নীতিমালার অনুসরণ করতে হবে।

২. ভাড়া চলাকালীন এর সম্পূর্ণ মালিকানা ও রিস্ক ব্যাংকের থাকবে। এর বীমা খরচও ব্যাংক বহন করবে।

৩. ভাড়া চলাকালীন এটি গ্রাহকের কাছে সম্পূর্ণ আমানত হিসেবে থাকবে।

৪. ভাড়াচুক্তির সাথে সরাসরি বিক্রয়চুক্তি, হেবাচুক্তি শর্তযুক্ত হতে পারবে না। মূল ভাড়াচুক্তিতে এসবের কথা থাকবে না। প্রতিটি চুক্তির জন্য আলাদা আলাদা পেপার তৈরি করা হবে। আলাদাভাবে ইজাব-কবুল হবে। এমনকি আলাদাভাবে বিক্রয় বা হেবার ওয়াদার পেপারে এ ধরনের কোনো কথা থাকবে না যে, এটি আলাদা পেপার হলেও বাস্তবে তা মূল ভাড়াচুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৫. ভাড়াচুক্তি শেষে স্বতন্ত্রভাবে ভাড়াকৃত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করা হবে। কনভেনশনাল পদ্ধতির মতো, শেষ ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে অটো মালিকানা স্থানান্তর হবে না; বরং স্বতন্ত্র বিক্রয় বা হেবাচুক্তির মাধ্যমে মালিকানা স্থানান্তর করতে হবে।

২. ৮. ৩. ২. মালিকানা অর্পণের পদ্ধতি

এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড এক্ষেত্রে মালিকানা অর্পণের মৌলিক তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছে। যথা :

২. ৮. ৩. ২. ১. বিক্রয়ের ওয়াদা ও বাস্তবায়ন

ব্যাংক একেবারে শুরুতে একপক্ষীয়ভাবে এই ওয়াদা প্রদান করবে, গ্রাহক যদি সকল ভাড়া যথা নিয়মে পরিশোধ করে দেয়, তাহলে ব্যাংক সেটি গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে দেবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ওয়াদা হবে একপক্ষীয়। যে পক্ষ ওয়াদা দেবে, তার দিক থেকে সেটি রক্ষা করা আবশ্যক হবে। তবে অপর পক্ষ স্বাধীন থাকবে। যেন উভয় দিক থেকে ওয়াদা আবশ্যক না হয়।

এটি এ্যাওফির বক্তব্য। তাদের মতে, উভয় দিকে ওয়াদা আবশ্যক করা হলে, কার্যত সেটি চুক্তির সাথেই সাদৃশ্য হয়ে যায়। অপরদিকে ইসলামী ফিকহ, জিদ্দাহ বলেছে, এতে সমস্যা নেই। উভয়দিকে ওয়াদা আবশ্যক হতে পারে। এটি সরাসরি ভবিষ্যৎ বেচাকেনা (Forword/Future sell) হবে না। কারণ, ভবিষ্যতে যথানিয়মে স্বতন্ত্রভাবে বেচাকেনা বা ভাড়াচুক্তি করতে হবে।

উক্ত বিক্রয়-প্রক্রিয়ার ওয়াদা ও বাস্তবায়ন চারভাবে হতে পারে। যথা—

১. 'নামমাত্র মূল্যে' বিক্রয়ের ওয়াদা করা হবে। নামমাত্র মূল্য বলতে বোঝায় Token prise। অর্থাৎ, দশ বিশ টাকা। এ রকম নামমাত্র মূল্য। এই ধরনের মূল্যে স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।

২. অথবা বাস্তব যে ক্রয়-মূল্য ছিল, সে মূল্যে বিক্রয়ের ওয়াদা করা হবে।

৩. অথবা এই ধরনের ওয়াদা থাকবে, ভাড়া চলাকালীন গ্রাহক যদি বাকি মেয়াদের সকল ভাড়া একসঙ্গে পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সেটাই মূল্য হিসেবে বিবেচনা করে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে। যেমন—মূল ভাড়ার মেয়াদ ছিল ৬ বছর। তিন বছর পর, গ্রাহক বাকি তিন বছরের ভাড়া এক সঙ্গে প্রদান করে দেবে। তাহলে এটাকেই বিক্রয়মূল্য ধরে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা হবে।

৪. অথবা ভাড়াচুক্তি শেষে বাজারে ওই পণ্যের যে মূল্য পাওয়া যাবে, সেই মূল্যে বিক্রয়ের ওয়াদা করা হবে।

২. ৮. ৩. ২. ২. হেবা বা গিফট করার ওয়াদা হবে

শুরুতেই ভাড়াচুক্তি শেষে ব্যাংক সেটি গ্রাহককে হেবা করে দেওয়ার ওয়াদা করবে। এক্ষেত্রে ভাড়াচুক্তি শেষে স্বতন্ত্রভাবে হেবা করতে হবে।

২. ৮. ৩. ২. ৩. শর্তযুক্ত হেবা হবে

ভাড়াচুক্তির শুরুতেই এই শর্তে ভাড়াকৃত সম্পদ হেবা করে দেওয়া হবে যে, ভাড়ার শেষ কিস্তি/ভাড়া পরিশোধের শর্তে ভাড়াকৃত বস্তু হেবা করা হলো। এই ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী শেষ ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে অটো হেবা বা গিফট কার্যকর হয়ে যাবে। নতুন করে হেবাচুক্তি করতে হবে না। এই পদ্ধতিটি পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলার চেয়ে ব্যতিক্রম। এটি বৈধ। কারণ, হেবা একটি অনুদানমূলক চুক্তি। এটি ভবিষ্যতের দিকে সম্বোধিত হতে পারে, শর্তযুক্তও হতে পারে।

শুধু হেবার ওয়াদা ও শর্তযুক্ত হেবার মাঝে পার্থক্য হলো, শুধু হেবার ওয়াদার ক্ষেত্রে হেবা শুরুই হবে ভাড়াচুক্তির শেষে। অপরদিকে শর্তযুক্ত হেবার ক্ষেত্রে ভাড়াচুক্তির শুরুতেই হেবা সংগঠিত হয়ে গেছে। তবে তা কার্যকর হবে শেষ ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে। সহজ কথায়, হেবার ওয়াদা হলো, হেবা করব। আর শর্তযুক্ত হেবা হলো, এখনই হেবা করে দিলাম (শর্তসাপেক্ষে)।

২. ৮. ৪. সেল এন্ড লিজ ব্যাক ও আইএমবিটি

সাধারণ আইএমবিটি হলো, অর্থায়নকারী পক্ষের কোনো পণ্য ভাড়ায়

গ্রহণ করা। এরপর সেটির মালিক হওয়া। অপরদিকে সেল এন্ড লিজ ব্যাক-এ নিজের পণ্যই বিক্রয় করা হয়। এরপর সেটিই ভাড়ায় গ্রহণ করা হয়। সবশেষে আইএমবিটির মতোই মালিকানা পুনরায় গ্রহণ করা হয়।

দুটি পদ্ধতি ফলাফলের বিবেচনায় অভিন্ন। দুটিই হিলা বা কৌশলী লেনদেন। তবে পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। আইএমবিটির মধ্যে অন্যের পণ্যে লেনদেন হয়। অপরদিকে সেল এন্ড লিজ ব্যাকে নিজের পণ্যেই লেনদেন হয়। এ ছাড়া হিলার বিবেচনায় কৃত্রিমতা ও হিলার অর্থ তুলনামূলক অনেক বেশি প্রবল সেল এন্ড লিজ ব্যাক পদ্ধতিতে।

এটি বেশ স্পর্শকাতর। কারণ, কারো কাছ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করে, সেটি পুনরায় তার কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ 'ঈনাকে' অনিবার্য করে। এজন্য এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শর্তসমূহের মাঝে এ শর্তটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভাড়াচুক্তি ও ক্রেতা কর্তৃক পুনরায় বিক্রয় এ দুটি মালিকানা অর্জনের মাঝে এতটুকু সময় ব্যবধান হতে হবে, যেন পণ্যের মার্কেট মূল্যে তফাত সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ এ দুয়ের মাঝে অন্তত এক বছর ব্যবধান রাখার শর্তারোপ করছেন। এ শর্তের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন ঈনার সাথে সাদৃশ্য তৈরি না হয়।

সারকথা, IMBT দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। এক. সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যের মালিকানা অর্জনের জন্য। এর এক পদ্ধতি ব্যাংকিং মুরাবাহা করা। আরেক পদ্ধতি IMBT ব্যবহার করা। দুই. লিকুইডিটি ক্রাইসিস ম্যানেজ করার জন্য। এক্ষেত্রে এর সাথে 'সেল এন্ড লিজ ব্যাক' মডিউল যুক্ত হবে। পূর্ণ মডিউলের নাম হবে—'আইএমবিটি প্লাস সেল এন্ড লিজ ব্যাক।'

২. ৮. ৫. IMBT পদ্ধতিতে মাঝপথে ভাড়াচুক্তি বাতিল হওয়া

যদি এমন হয় যে, IMBT পদ্ধতিতে ভাড়া চলাকালীন মাঝ পথে ভাড়াগ্রহীতার কোনো সীমালঙ্ঘন ছাড়া ভাড়াকৃত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে 'উজরতে মিছিল' বা ন্যায্য ভাড়া ধার্য হবে। সুতরাং এর অতিরিক্ত যা নেওয়া হয়েছে, তা ফেরত দিতে হবে। কারণ, ভাড়াগ্রহীতা স্বাভাবিক

ভাড়ার চেয়ে অধিক ভাড়া প্রদানে সম্মত হয়েছিল এজন্য যে, সে পরিশেষে এর মালিক হয়ে যাবে। এখন যেহেতু সেটা হচ্ছে না, তাই স্বাভাবিক ভাড়াই সে প্রদান করবে। এর অধিক নয়।[১]

তবে এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ উক্ত বিষয়ের সাথে একমত হননি।[২] তাঁর দৃষ্টিতে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর এভাবে ভাড়া হ্রাস করা সঠিক নয়।

২. ৮. ৬. Hire purchase চুক্তি ও ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিকের মাঝে পার্থক্য

ক. Hire purchase হলো একটি কনভেনশনাল মডিউল। এর উদ্দেশ্য কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়। তবে শেষ-কিস্তি পরিশোধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নাম দেওয়া হয়েছে ভাড়া। মূল হলো বিক্রয়। ভাড়াচুক্তি কেবল নামমাত্র।

অপরদিকে ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক, একটি স্বতন্ত্র ইজারা চুক্তি। যা শেষ হওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে মালিকানা স্থানান্তর করা হয়। দুটিই বাস্তব। কোনোটিই নামমাত্র নয়।

খ. হায়ার পারচেজে একটি পণ্যের ওপর একই সময় বিক্রয় চুক্তি ও ভাড়াচুক্তি সংগঠিত হয়। ইজারা মুনতাহিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে হয়।

গ. হায়ার পারচেজে একই সময় দুটি চুক্তি চলমান থাকে। এজন্য আদালতে এটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, একে বিক্রয় চুক্তি বলা হবে, না ইজারা চুক্তি। ইজারা মুনতাহিয়াতে একই সময় দুটি চুক্তি চলমান থাকে না।

ঘ. হায়ার পারচেজে ভাড়াচুক্তি থেকে বিক্রয় চুক্তি আলাদা নয়। শেষ-কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে অটোমেটিক সেটি বিক্রয়-চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ক্রেতা পূর্ণ মালিকানা লাভ করে। ইজারা মুনতাহিয়াতে দুটি আলাদা আলাদা থাকে। মালিকানা স্থানান্তরের জন্য স্বতন্ত্র চুক্তি ও পেপার সাইন করতে হয়।

---

১ এ্যাওফি, স. ৯, ধা. ৮/৮

২ দুরুসুল মাআয়ির, পৃ. ২২৩

ঙ. হায়ার পারচেজে ভাড়া বা ইজারা বলা হলেও বাস্তবে ভাড়া নয়। কারণ, বস্তুর সকল দায় গ্রহীতার ওপর থাকে। ইজারা মুনতাহিয়াতে বাস্তব ইজারা হয়।

চ. হায়ার পারচেজে নির্ধারিত সময়ে কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত আর্থিক জরিমানা প্রদান করতে হয়। যা সুদ। ইজারা মুনতাহিয়াতে তা করা হয় না; বরং সমস্যা সমাধানকল্পে 'আন্ডারটেকিং টু ডোনেট' পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

ছ. হায়ার পারচেজে সময়ের আগে পাওনা পরিশোধ করলে বিশেষ রেয়ায়েত প্রদান করার শর্ত থাকে। যা বৈধ নয়। ইজারা মুনতাহিয়াতে অগ্রিম ভাড়া প্রদান করা যায়। এতে ভাড়া হ্রাসের সুযোগ থাকে। কারণ, তা দায় হয় না।

২. ৮. ৭. এইচপিএসএম, আইএমবিটি ও লিজ ব্যাক

উক্ত তিনটিই সুদভিত্তিক বিনিয়োগের বিকল্প। তবে তিনটির প্রয়োগক্ষেত্র স্বতন্ত্র। যথা—

যদি যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এর একটি বিকল্প এইচপিএসএম। আর যদি সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ছাড়া সম্পত্তি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর জন্য আইএমবিটি।

পক্ষান্তরে যদি সরাসরি নগদ ক্যাশের প্রয়োজন হয়, কোনো সম্পত্তির মালিকানা নয়, তাহলে কৃত্রিমভাবে সম্পদকে ট্যাগ করে যে শরীয়াহ বিকল্প চিন্তা করা হয়, সেটিই সেল এন্ড লিজ ব্যাক অথবা হাইব্রিড আইএমবিটি।

নিয়োগ চুক্তি

Shari'ah Principles for Job (Hiring of Persons) in the Light of AAOIFI Shari'ah Standard; Shari'ah Rulings of Private Employee & Shared Employee

প্রাথমিক কথা

ইসলামে ইজারা বা ভাড়াচুক্তির একটি দিক হলো বস্তু ভাড়াচুক্তি। আরেকটি দিক হলো—নিয়োগ চুক্তি। কারো অধীনে থেকে কাজ করা। চাকরি করা। জব করা। ইংরেজিতে বলে Employment agreement।

ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতের অধীনে রচিত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা* গ্রন্থে ৫৬২-৬১১ পর্যন্ত মোট ৪৯টি ধারা রয়েছে চাকরি বিষয়ে।[১]

এরপর আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড AAOIFI ১৪২৯ হিজরি মোতাবেক ২০০৮ সালে শুধু চাকরি বিষয়ে 'Hiring of persons (إجارة الأشخاص)' নামে তাদের ৩৪ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করেছে।[২]

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী রহ. খ. ২, পৃ. ৪৭১

২ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ৫৫০

এর আগে ১৪২৬ হিজরি মোতাবেক ২০০৫ সালে পাকিস্তানের জনাব মুফতি মাওলানা ড. যুবায়ের আশরাফ উসমানী রহ. উর্দু ভাষায় ইজারা তথা চাকরি ও রেন্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পিএইচডি গবেষণাপত্র রচনা করেন। গবেষণাপত্রটির নাম 'জাদীদ মায়াশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা।'[১] এ বিষয়ে বিস্তারিত শরীয়াহ নীতিমালা আলোচনা করা হলো।

৩. ১. নিয়োগ চুক্তি (Hiring of persons) পরিচয়

AAOIFI তাদের Hiring of persons বিষয়ে রচিত ৩৪ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ২-এ এর পরিচিতি পেশ করেছে এভাবে—

> هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، معينة كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاستشارية، ونحوها.
>
> 'নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বাভাবিক কোনো ব্যক্তি থেকে অথবা আইনগত কোনো সত্তা (Legal person) থেকে কোনো কাজ বা সেবার উপকার গ্রহণের চুক্তি করা। সেই উপকারটা হতে পারে সুনির্দিষ্ট অথবা দায়িত্বে নির্দিষ্ট। যেমন—শিক্ষা (Educational), স্বাস্থ্য (Health) ও পরামর্শ (Consultancy) প্রদানমূলক সেবা প্রদানের চুক্তি।'

উল্লেখ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরামর্শ প্রদান এমন সেবা যেগুলো দায়িত্বে নির্দিষ্ট হয়। ভবিষ্যতে যখন রোগী বা সেবা গ্রহীতা আসবে তখন তাকে সেবা প্রদান করা হবে। একেই আরবীতে বলা হয়েছে موصوفة في الذمة বা An asset undertaken by the lessor। এ বিষয়ে 'ভাড়াচুক্তিতে' বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

উক্ত পরিচয় থেকে জানা গেল, নিয়োগকৃত ব্যক্তি দু ধরনের হতে পারে। যথা : স্বাভাবিক ব্যক্তি ও আইনগত সত্তা।

---

১ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫২

৩. ২. নিয়োগ চুক্তির বৈধতা

নিয়োগ চুক্তির বৈধতা সর্বজন স্বীকৃত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

'তারা যদি তোমাদের জন্য শিশুদের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ো। আর (পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য) উত্তম পন্থায় নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে নিয়ো।'[১]

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা নারী তার শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার প্রাক্তন স্বামী ও শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পারিশ্রমিক যেন উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে ঠিক করে নেয়।

উক্ত আয়াতে নিয়োগ-চুক্তির কথা স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।

অন্যত্র শুআইব আ.-এর সাথে তার কন্যাদ্বয়ের কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ.

'নারীদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজি, আপনি একে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো কাজ দেন। আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারো থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং আমানতদারও। তার পিতা বলল, আমি আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আট বছর আমার এখানে কাজ করবে।'[২]

মেষ চরানোর জন্য নিয়োগ চুক্তি হয়েছিল। মূলত এখানে শুআইব আ.

---

১ সূরা তালাক : ৬

২ সূরা কাসাস : ২৬-২৭

মুসা আ.-এর সাথে দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করতে চেয়েছিলেন। এক হলো, মেষপাল চরানোর চাকরি নেওয়া। আর দ্বিতীয় হলো, মেয়ে বিয়ে করা।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী শরীয়তের কোনো বিষয় আমাদের শরীয়তে রহিত না করা হলে সেটা বহাল থাকে।[1]

কুরআনুল কারীমের পাশাপাশি হাদীসেও নিয়োগ চুক্তির প্রমাণ রয়েছে। হিজরতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ দেখানোর জন্য একজন গাইড নিয়োগ দিয়েছিলেন। হাদীসে এসেছে—

> استأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاثٍ.
>
> অর্থাৎ, বনু দিল গোত্রের এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রা. রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া নিলেন। লোকটি কুরাইশ কাফেরদের ধর্মালম্বী ছিল। তারা দুজন নিজ নিজ সাওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন।[2]

আরেক হাদীসে এসেছে—

> قال الله تعالى«ثلاثة أنا خصْمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً، ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر حرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره»
>
> 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন পাপির বিরোধিতা করব। যথা—
>
> এক. যে আমার নাম নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এরপর তা ভঙ্গ করেছে।

---

১ আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৮০১

২ সহিহ বুখারী, ইজারা অধ্যায়, হাদীস নং : ২১১৫

দুই. কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম বলে বিক্রি করে এর মূল্য হজম করেছে।

তিন. কারো থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ নেওয়ার পর তার পারিশ্রমকি দেয়নি।'[1]

উপর্যুক্ত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, নিয়োগ চুক্তি মৌলিকভাবে একটি বৈধ চুক্তি। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চুক্তি করেছেন। সাহাবারাও করেছেন। শুধু তাই নয় পারিশ্রমিক প্রদানের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর বৈধতা নিয়ে কোনো মতভেদ এখন নেই।[2]

৩. ২. ১. মূল নিয়োগ চুক্তি

ইজাব-কবুল

ক. মূল নিয়োগ চুক্তি স্বতন্ত্র ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। ইজাব ও কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উরফ ও প্রথানুযায়ী নিয়োগ চুক্তি বোঝায় এমন যেকোনো শব্দ ব্যবহার করা। এটি হতে পারে লিখিত, হতে পারে বক্তব্য, হতে পারে অনলাইনে যোগাযোগের মাধ্যমে। এটি সকলের নিকটই ইজারা চুক্তির রোকন।

খ. ইজাব-কবুল যেমন স্পষ্টভাবে হতে পারে। তেমনি আচরণের

---

১ সহিহ বুখারী, হাদীস : ২১১৪

২ বলা হয়, আবু বকর আল আসম, ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা, হাসান বসরী, ইবনে কায়সান, কাসানী, নাহরাওয়ানী—এই গুটি কতক আলেম ইজারা চুক্তিকে অবৈধ মনে করতেন। তারা মূলত সাহাবা যুগের পরবর্তী যুগের মানুষ। এর বিপরীতে সালাফে সালেহীন তথা সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত সকল ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ একে বৈধ মনে করেন।
তাই তো ইবনে রুশদ রহ. বলেছেন—إن الاجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول 'সালাফে সালেহীনের প্রথম যুগ তথা সাহাবাদের যুগ ও সকল এলাকার ফকীহদের নিকট ইজারা বৈধ।' তারা এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল পেশ করেছেন, যার কিছু আমরা উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত দেখুন—আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃ. ৩৮০১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ৪, পৃ. ৫ (দারুল হাদীস, কায়রো)

মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন—রেল স্টেশন বা বাস স্টেশনে কোনো কিছু বলার আগেই কুলিরা এসে মালামাল উঠিয়ে দেয়। এরপর পারিশ্রমিক দিতে হয়। পরিভাষায় একে 'ইজারা বিত তাআতী' (الإجارة بالتعاطي) বা Hand to Hand lease contract বলে।[1]

৩. ২. ২. নিয়োগ চুক্তির পূর্বে মাস্টার এগ্রিমেন্ট

মূল নিয়োগ চুক্তির পূর্বে একটি Master agreement হতে পারে। তাতে কাজের পরিমাণ, মেয়াদ, নীতিমালা বিস্তারিত আলোচনা হবে বা লিখিত হবে। এরপর ভবিষ্যতে মূল নিয়োগ চুক্তি হবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নিয়োগ চুক্তি স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে হতে হবে। তখন বিস্তারিত শর্ত ও নীতিমালা না বলে শুধু পূর্বকৃত মাস্টার এগ্রিমেন্টের রেফারেন্সই যথেষ্ট। এই Master agreement মূলত একটি লিখিত মযবুত ওয়াদা। যা মূল নিয়োগ চুক্তির পূর্বে সম্পন্ন হয়।

৩. ৩. নিয়োগ চুক্তির মৌলিক বুনিয়াদি বিষয়

নিয়োগ চুক্তির মৌল উপাদান নিম্নরূপ :

ক. মূল নিয়োগ চুক্তি (ইজাব ও কবুল)

খ. নিয়োগ-দাতা (Employer) ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Employee)

গ. বিনিময় বা পারিশ্রমিক।

ঘ. চুক্তির মূল বিষয়।

৩. ৪. নিয়োগ চুক্তিতে 'হামিশ জিদ্দিয়া' গ্রহণ

সাধারণত কোনো এক প্রতিষ্ঠান যখন আরেক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়োগ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন এ ধরনের প্রয়োজন দেখা দেয় যে, যারা কাজ করে দিবে, তারা মূল চুক্তির আগে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানকে 'অগ্রিম কিছু অর্থ' প্রদানের শর্তারোপ করে।

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আতাসী, খ. ২, পৃ. ৬৬৪

যেন নিয়োগদাতার প্রতিশ্রুতির ওপর নিশ্চিন্তে ভরসা রাখা যায়। কারণ এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে অপর পক্ষ অন্য কোথাও চুক্তি বদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

উক্ত গৃহীত অগ্রিম অর্থ-'হামিশ জিদ্দিয়া' (Security money) হিসাবে পরিচিত। পরবর্তীতে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান যদি তার ওয়াদা রক্ষা করে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র প্রদান না করে, তাহলে উক্ত গৃহীত অর্থ থেকে অপরপক্ষ তাদের ক্ষতিপূরণ রেখে দিতে পারবে।

'ক্ষতিপূরণ' দ্বারা উদ্দেশ্য, বাস্তব ক্ষতিপূরণ। তা হলো ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার পর যারা কাজ করবে, তারা যদি কাজের জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নিয়ে রাখে অথবা এর জন্য খরচ করে ইত্যাদি, তাহলে এসব বাস্তব খরচ পূর্বোক্ত 'অগ্রিম অর্থ' থেকে গ্রহণ করা যাবে।

৩. ৪. ১. গৃহীত হামিশ জিদ্দিয়া ব্যবহার নীতি

উক্ত গৃহীত অর্থ-গ্রহীতার কাছে আমানত। সুতরাং এতে অন্যায় আচরণ করা যাবে না। তবে একে পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে তা মুদারাবার মূলধন হিসাবে বিবেচিত হবে। অথবা পরবর্তীতে যখন নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হবে, তখন একে অগ্রিম পারিশ্রমিক/সেলারি হিসাবেও গণ্য করার ব্যাপারে একমত হওয়া যাবে।[১]

৩. ৫. নিয়োগদাতা (Employer) ও নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Employee)

নিয়োগদাতা ও নিয়োগপ্রাপ্ত উভয়ের জন্য শর্ত হলো—তারা নিয়োগ চুক্তির জন্য যোগ্যতা রাখা। অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া, পাগল না হওয়া, লেনদেনের ন্যূনতম বুঝ থাকা।

প্রকাশ থাকে যে, নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে (Employee) আরবীতে 'আজির' বলে।

---

১ এ্যাওফি, স. ৩৪, ধ. ৩/২

৩. ৫. ১. আজিরের (নিয়োগপ্রাপ্ত) প্রকার

আজির (Employee) মূলত দুই প্রকার। যথা—আজিরে খাস (Private Employee) ও আজিরে আম বা আজিরে মুশতারাক (Shared employee)। প্রত্যেকের পরিচিতি, তাৎপর্য ও শরীয়াহ নীতিমালা সামনে তুলে ধরা হলো।

৩. ৫. ১. ১. আজিরে খাস (Private Employee) : পরিচিতি ও তাৎপর্য

AAOIFI তাদের Hiring of persons বিষয়ে রচিত ৩৪নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৪/৩-এ আজিরে খাসের পরিচিতি পেশ করেছে এভাবে—

A Private Employee, who works for and under the supervision of a single employer, has no right to work, at the same time, for anyone else, except on permission of his former employer.

সারকথা, আজিরে খাস বলতে যা বোঝায় তা হলো :

১. নিয়োগকর্তার দিকে লক্ষ করে আজিরে খাস নির্ণিত হবে। ভোক্তাদের দিকে লক্ষ করে নয়। যেমন, দরজির দোকানের কর্মচারী। সে সকল ভোক্তার জন্য কাজ করে। তবে একজনের অধীনে। সুতরাং নিয়োগকর্তার দিকে লক্ষ করে তাকে আজিরে খাস বলা হবে; কিন্তু নিয়োগকর্তা প্রধান দর্জি যেহেতু সকলের জন্য কাজ করে, তাই সে আজিরে খাস নয়।

২. চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে যে, কর্মচারী বা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে নিয়োগদাতার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো কাজ করবে না। অন্যের কাজ না করার যদি শর্তারোপ না থাকে, তবে আজিরে খাস হবে না। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শর্তারোপ লিখিত, মৌখিক কিংবা উরফ বা প্রথাগতভাবেও হতে পারে।

৩. আজিরে খাসের চুক্তি হয় তার থেকে সময় নেওয়ার ওপর। তাই দৈনিক কত সময় কাজ করবে, তা চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

৪. আজিরে খাসের নিয়োগকর্তা যেমন একজন হতে পারে, তেমনি একাধিকও হতে পারে। যেমন—সব দোকানের মালিক বা বাসার মালিক তাদের দোকান বা বাসা পাহারা দেওয়ার জন্য একজন নৈশ প্রহরীকে নিয়োগ দিল।

৫. আজিরে খাস একজনও হতে পারে, আবার একাধিকও হতে পারে।

৬. আজিরে খাস মূলত তার সময়কে বিক্রি করে, কাজকে নয়। তাই নির্ধারিত সময়ে কোনো কাজ না থাকার কারণে বেকার বসে থাকলেও পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। ফিকহের ভাষায় একে বলেঃ يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة 'নির্ধারিত সময়ে নিজেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে পারিশ্রমিকের হকদার হবে।'

৭. চুক্তিতে শুরুতেই কী ধরনের কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা।[১]

৩. ৫. ১. ১. ১. পারিশ্রমিক নির্ধারণ পদ্ধতি

উভয়ে সম্মতিক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে। যথা—

- ইউনিটভিত্তিক পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, এক ইউনিট শেষ হলে এ পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে। আরেক ইউনিট শেষ হলে এ পরিমাণ পারিশ্রমিক বা বেতন পাবে।
- কাজ শেষ করার পর এক সঙ্গে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে—এভাবেও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে।
- কাজ নয়, বরং নির্ধারিত সময়ের পর এক সঙ্গে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এভাবেও নির্ধারণ করা যায়। যদিও তখন কাজ শেষ না হয়। যেমন, মাসে মাসে পারিশ্রমিক পাবে। দু বছরের চুক্তি।
- সময়ের ভিত্তিতেও নির্ধারণ করা যায়। নির্ধারিত সময়ের পর পর পারিশ্রমিক পাবে। কাজ চলমান থাকবে।

---

১ আদ্দুররুল মুখতার, খ. ৬, পৃ. ৬৯, আরো দেখতে পারেন, শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী, খ. ২., পৃ. ৪৮১-৪৮৩; ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৩১; জাদীদ মায়াশী নেযাম মেঁ ইসলামী কানুনে ইজারা, পৃ. ৭৪; এ্যাওফির স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং ৩৪, ধারা ৪/৩

- কাজ ও সময় উভয়ের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। তবেই এই পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে।

  পরবর্তীতে যদি নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হয়, তাহলে সেই কাজে যদি নিয়োগদাতার উপকার হয়, তাহলে সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবে।[১]

৩. ৫. ১. ১. ২. পারিশ্রমিক হিসাবে যা নির্ধারণ করা যায়

- পারিশ্রমিক নগদ টাকা হতে পারে। বর্তমানে এটিই অধিক হয়ে থাকে।
- পারিশ্রমিক পণ্য বা কোনো বস্তু হতে পারে। যেমন, কাজ করে দেওয়া হবে। বিনিময়ে দু বেলা ভাত খাওয়াবে।
- পারিশ্রমিক অন্য কোনো সার্ভিস বা উপকারও হতে পারে। যেমন, জনাব রায়হানের ছেলেকে জসিম পড়াবে, বিনিময়ে রায়হান জসিমের ছেলেকে পড়াবে।

৩. ৫. ১. ১. ৩. পারিশ্রমিক যখন অনিবার্য হয়

- চুক্তির মাধ্যমে বেতন/পারিশ্রমিক অনিবার্য হয়। আর প্রদান করা অনিবার্য হয় কাজ হওয়ার পর।

  অথবা কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ অর্পণ করার মাধ্যমে। যদিও তার থেকে কোনো কাজ নেওয়া না হয়।
- পারিশ্রমিক হাতে না আসা পর্যন্ত তাতে শ্রমিকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং এটি ঋণ। তবে দুর্বল বা মধ্যম স্তরের ঋণ। যার বিধান হলো, হস্তগত হওয়ার পর এর যাকাত আদায় করবে এবং হস্তগত হওয়ার পর বিগত দিনের যাকাত দিতে হবে না। তাই বকেয়া বেতনে বিগত দিনের যাকাত দিতে হয় না।

---

১ এ্যাওফি, স. ৩৪, ধ. ৫/২/২

৩. ৫. ১. ১. ৪. বেতন ও সুদ

ভাড়া/বেতন একবার নির্ধারণ হয়ে গেলে সময় মতো পরিশোধ না করার কারণে অতিরিক্ত আদায়ের শর্তারোপ বৈধ নয়। এটি সুদ।

তবে ভাড়ার ক্ষেত্রে এমন চুক্তি করা যাবে যে, যথাসময়ে ভাড়া পরিশোধ না করলে নিয়োগদাতা একটি নির্দিষ্ট অংশ চ্যারিটি ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে। ওই দানকৃত অংশটি মালিকপক্ষ নিজেদের মুনাফা হিসেবে গণ্য করবে না; বরং তা দান করে দেবে। সাধারণত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এমনটি করা যেতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ বোর্ডের সহায়তায় এর বিস্তারিত নীতিমালা ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।[১]

৩. ৫. ১. ১. ৫. বেতনের উৎস ও চাকরি

বেতন প্রদানের উৎস যদি হারাম হয় তবে চুক্তি ও কাজ সঠিক হলেও সেই বেতন গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে চাকরি করা হারাম নয়। যেমন—মদের ব্যবসা করে উপার্জন করে, একমাত্র উপার্জন মদ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ। এমন কারো অধীনে বৈধ কাজও করা যাবে না। তার গাড়ির চালক হিসাবে নিয়োগ হওয়া। অথবা তার বাড়িতে দারোয়ানের চাকরি নেয়া। কারণ তার আয়-উৎস সম্পূর্ণ হারাম।

৩. ৫. ১. ১. ৬. চুক্তির মূল বিষয়

একজন আজিরকে চাকরিতে নিয়োগের পূর্বে দেখতে হবে, নিয়োগ চুক্তির অধীনে তাকে কি ধরনের কাজ করতে হবে। কাজটি হালাল না হারাম।

৩. ৫. ১. ১. ৭. সন্দেহপূর্ণ চাকরি

এমন চাকরি যেখানে মূল চুক্তি বৈধ। তবে এর অধীনে এমন কাজ করতে হয়, যা সরাসরি হারাম বা গুনাহ নয়। তবে গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছতে

---

১ এ্যাওফি স্ট্যান্ডার্ড নং : ০৯, ধারা : ৪/৬

পারে। যেমন—সরকারের যুলুম-বিশিষ্ট কোনো আইন বা শরীয়তবিরোধী কোনো আইন সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এমন চাকরি হালাল-হারামের দৃষ্টিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও সন্দেহপূর্ণ। তবে তা মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত।

যা বোঝা গেল :

কোনো চাকরি বা পেশায় আত্মনিয়োগের আগে তিনটি বিষয় লক্ষ করতে হবে। যথা :

১. মূল নিয়োগ চুক্তি ও কাজ বৈধ কি না।

২. উক্ত কাজ বা চাকুরি করতে গিয়ে কোনো গুনাহে লিপ্ত হতে হয় কি না বা কোনো ফরয বিধান লঙ্ঘন হবে কি না।

৩. বেতন বা পারিশ্রমিক এর উৎস হালাল কি না।

উক্ত তিনটি বিষয়ের বৈধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে সংশ্লিষ্ট চাকরি বা পেশায় আত্মনিয়োগ করা যাবে। নতুবা বিকল্প চিন্তা করতে হবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো চাকরি বা পেশা হারাম বা হালাল বা মাকরুহ বা সন্দেহপূর্ণ হওয়ার নিশ্চিত ফায়সালা প্রদান সংশ্লিষ্ট চাকরি বা পেশা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে শরঈ বিচার-বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে।

শরীয়তের সাধারণ ও ব্যাপক মূলনীতির আলোকে আন্দায বা অনুমানের ভিত্তিতে কোনো চাকরি বা পেশা সম্বন্ধে নিজে নিজে শরঈ ফায়সালা গ্রহণ করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বিজ্ঞ মুফতি সাহেবের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরি।[১]

৩. ৫. ১. ১. ৮. এমন বস্তু তৈরির কারখানায় চাকরি করা—যা হারাম বা গুনাহের কাজেও ব্যবহৃত হয়

এটি একটি ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত বিষয়। বর্তমানে এমন কোনো বস্তু পাওয়া দুষ্কর, যা কেউ- না- কেউ হারাম কাজে ব্যবহার না করে। ধরা

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৩৮-২৩৯

যাক, কলম তৈরির কারখানা। কলম তৈরির পর সেটা ভালো কাজের পাশাপাশি সুদী ব্যাংকে সুদী কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে শরীয়াহ্ নীতি জেনে নেওয়া জরুরি।

এখানে তিনটি মৌলনীতি রয়েছে। যথা :

১. যে বস্তুর ব্যবহার হালাল-হারাম উভয় ক্ষেত্রেই হয়। অথবা হালাল ক্ষেত্রের ব্যবহার অধিক। এসব বস্তুর বিক্রি ও তৈরিতে চাকরি করা সবই বৈধ। উপার্জনও হালাল। বর্তমানে এমন পণ্যই অধিক।

২. যে বস্তুর বৈধ ব্যবহারও আছে। তবে অধিকাংশ ব্যবহার অবৈধ। যেমন, মিউজিক ইন্সটুলমেন্ট। এসব বস্তুর বিক্রি, ভাড়া, তৈরিতে চাকরি সবই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে বৈধ। এখানে তা গুনাহের কাজে যে ব্যবহার করবে তার গুনাহ্ হবে।[১]

৩. এমন বস্তু, যার একমাত্র ব্যবহার অবৈধ বা অবৈধ ব্যবহারই প্রবল। এমন বস্তু তৈরিতে চাকরি করা বৈধ নয়। প্রাপ্ত বেতনও জায়েয নয়।

৩. ৫. ১. ১. ৯. সুপারিশ করে পারিশ্রমিক তলব করা

কোনো ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া ইত্যাদির জন্য সুপারিশ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ নয়। এর কারণ হলো—

ক. ভালো কাজের জন্য সুপারিশ করা এটি একটি নেক কাজ। আর নেক কাজের বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়। (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)

খ. শরঈ দৃষ্টিতে সুপারিশ করা মূল্যবান বিশিষ্ট কোনো কাজ নয়। তাই তা বিনিময়যোগ্য নয়।

গ. সুপারিশ করায় পরিশ্রমসাধ্য কোনো কাজ নেই, যার ওপর পারিশ্রমিক নেওয়া যায়। বরং সুপারিশকারীর ব্যক্তিত্ব এখানে মূল। আর কারো ব্যক্তিত্ব মূল্যমান বিশিষ্ট নয়। সুতরাং এর ওপর কোনো কিছু গ্রহণ করা মূলত রিশওয়াহ বা ঘুষ।

ঘ. তাছাড়া সুপারিশের পর কাজ হওয়া না হওয়া অজ্ঞাত। সুতরাং এতে গারারও বিদ্যমান।

---

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৫২

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর কারণে সুপারিশের বিনিময় গ্রহণ বৈধ নয়।[১]

৩. ৫. ১. ১. ১০. দালালী/Brokerage চুক্তি

বর্তমানে মিডিয়া বা ব্রোকার বা দালাল হয়ে কারো কোনো কাজ করে দেওয়া একটি অন্যতম পেশা। জমি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্য দালাল বা ব্রোকারের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এতে যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় তা 'কমিশন' নামে পরিচিত। এ পেশা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে নিম্নোক্ত শরীয়াহ নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরি। যথা—

ক. পারিশ্রমিক/কমিশন ন্যায্য হওয়া।[২]

খ. কমিশন শুরুতেই নির্ধারণ করে নেওয়া।

গ. ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া।

ঘ. দাম বলার সময়ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দাম বলতে হবে। শুধু দাম বাড়ানোর জন্য বলবে না।

ঙ. চুক্তি যদি এমন হয় যে, বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ওপর পার্সেন্ট নিবে, যেমনটি আজকাল হয়ে থাকে। যেমন বলল, প্রতি হাজারে এত % পাবে। এটি বৈধ।

চ. চুক্তি হলো, দশ টাকার ওপর যা বিক্রি করতে পারবে তা তোমার। আর যদি অতিরিক্ত না হয় তাহলে কিছুই পাবে না। এটিও কোনো কোনো ফকীহের মতে বৈধ। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে এর বৈধতার ফতোয়া আছে।[৩]

ছ. বাস্তব আমল বা কাজ থাকা।

---

১ ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৪২

২ উদ্দেশ্য হলো, এমন পারিশ্রমিক হওয়া, যা সাধারণত সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ফিকহের ভাষায় এমন পারিশ্রমিককে 'উজরতে মিছিল' বলা হয়।

৩ আল আওসাত, খ. ১১, পৃ. ১৯৬, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ২০৭৭৯, এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, ৪৬, ধারা : ৬/৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া, ৫/৬৩১, ইতরে হিদায়া, পৃ. ১১২

কমিশন বৈধ হওয়ার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বাস্তব আমল যদি না থাকে; বরং কেবল পরামর্শ বা ইশারা-ইঙ্গিত তবে এ কারণে কমিশন গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

৩. ৫. ১. ১. ১১. কমিশন আদান-প্রদানের প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মিলিত ফিকহি সিদ্ধান্ত

'ইদারাতুল মাবাহিসিল ফিকহিয়্যা জমঈয়্যাহ উলামায়ে হিন্দ' ভারতের একটি ফিকহ বোর্ড। ভারতের বিখ্যাত আলেম ও ফকীহগণ এর সদস্য। গত ১৩৩৬ হি. মোতাবেক ২০১৫ ইং. সনে তাদের এগারোতম ফিকহি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়বস্তু ছিল, 'কমিশন ও তার বহুল প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি।'

সেমিনারে উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এরপর এর ওপর দীর্ঘ পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়। নিম্নে এর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো—

'১. বর্তমান সময়ে 'কমিশন' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কোথাও 'ইজারা', 'জুআলা'এর ওপর কমিশন শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোথাও স্পষ্ট ঘুষের ওপর কমিশন শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এজন্য এক কথায় না সর্বপ্রকার কমিশন বৈধ বলা যায়, না অবৈধ বলা যায়। সুতরাং কমিশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে যে কাজের ওপর কমিশন নেওয়া হচ্ছে সেটা ভালো করে যাচাই করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

২. যেসব ক্ষেত্রে কমিশন ইজারা বা জুআলার মধ্যে পড়ে, সেসব ক্ষেত্রে কমিশন গ্রহণ বৈধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো প্রযোজ্য হবে। যথা—

ক. কমিশন কোনো ওয়াজিব যিম্মাদারি বা দায়িত্বের বিনিময়ে না হওয়া, যা ব্যক্তির ওপর আগে থেকেই অনিবার্য হয়ে আছে।

খ. যে কাজের বিনিময়ে কমিশন নেওয়া হবে, সেই কাজটি বৈধ হওয়া।

গ. কমিশন লেনদেনের চুক্তি পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে হতে হবে। কোনোরূপ চাপ বা জোরজবরদস্তি করা যাবে না।

ঘ. কমিশনের পরিমাণ এভাবে সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যা নিয়ে পরবর্তীতে ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। এ নির্দিষ্টকরণটা হতে পারে সুনির্দিষ্ট অংকে অথবা পার্সেন্টের মাধ্যমে।

ঙ. কমিশন গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়াটি ধোঁকা-প্রতারণা মুক্ত হওয়া।

৩. জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে কমিশন গ্রহণ বৈধ। শর্ত হলো, কমিশন গ্রহীতা উভয় পক্ষের কাগজপত্র প্রস্তুত করে দেওয়া, লেনদেন পাকাপোক্ত করা এসব বাস্তবধর্মী কাজের বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ করবে। এ ছাড়া সর্বপ্রকার ধোঁকা-প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৪. ঠিকাদার, যার সাথে চুক্তি হয়েছে সে ঘর নির্মাণ করে দিবে। প্রয়োজনীয় আসবাবসামগ্রী সেই সংগ্রহ করবে। তাহলে এক্ষেত্রে দোকান থেকে সিমেন্ট, রড ইত্যাদি ক্রয়ের কারণে দোকানদার তাকে কোনো কমিশন প্রদান করলে তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে। কারণ, সে নিজের কাজের জন্য ক্রয় করে। এসব ক্রয়ের ক্ষেত্রে সে বাড়ির মালিকের উকিল বা এজেন্ট নয়।

পক্ষান্তরে আসবাবসামগ্রী সংগ্রহ করা যদি বাড়ির মালিকের দায়িত্বে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে দোকান থেকে ক্রয়ের কারণে দোকানী থেকে কমিশন প্রদান করা হলে, সেটা বাড়ির মালিকের হবে। ঠিকাদারের নয়। কারণ এক্ষেত্রে মূল ক্রেতা বাড়ির মালিক। সে কেবল তার পক্ষে এজেন্ট বা উকিল।

৫. স্কুল বা ভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ যদি কাজ করে। যেমন, কাগজপত্র রেডি করে দেয়া, এপ্লিকেশন লিখা ইত্যাদি। তাহলে এর বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ। তবে কোনো কাজ না করে শুধু নিজের নাম বলে সুপারিশ করে ভর্তির ব্যবস্থা করা হলে এর বিনিময় গ্রহণ বৈধ হবে না। এটি ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬. কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি নির্দিষ্ট দর্জি থেকে ড্রেস তৈরির জন্য ছাত্রদেরকে বাধ্য করে আর এর বিনিময়ে দর্জি থেকে কমিশন গ্রহণ করে তবে তা বৈধ হবে না।

৭. প্রাইভেট ইমপ্লোয়ী যেমন, কোম্পানির ম্যানেজার বা অন্য কোনো

কর্মকর্তা মূলত কোম্পানির প্রতিনিধি ও আমানতদার বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং তারা কোম্পানির জন্য কোনো কিছু ক্রয় করার কারণে দোকানী কোনো কমিশন প্রদান করলে এর মালিক তারা হবে না। বরং কোম্পানি হবে। তাই তা কোম্পানি বরাবর জমা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তা নিজে ব্যবহার করা যাবে না।

৮. নিলাম বা দরপত্রের ক্ষেত্রে কমিশন গ্রহণ করে নিলাম বা দরপত্র কাউকে প্রদান করা বৈধ নয়। এটি স্পষ্ট ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ অবস্থায় প্রার্থীর জন্যও কমিশন প্রদান বৈধ নয়।

৯. পণ্য বিক্রয়ের জন্য বা প্রচারণার জন্য কোম্পানি তার লোকদেরকে যে কমিশন প্রদান করে তা বৈধ।

১০. অনেক সময় দেখা যায়, ঔষধ কোম্পানি তাদের ঔষধ বিক্রির জন্য ডাক্তারদেরকে বিভিন্ন ইনআম বা হাদিয়া প্রদান করে। এটি যদি কোম্পানির স্বউদ্যোগে হয়ে থাকে, ডাক্তারের পক্ষ থেকে চাওয়া না হয় এবং ডাক্তার ইনআমের কারণে ওই কোম্পানির ঔষধ লিখতে বাধ্য না হন; বরং নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী লেখেন, তবে এসব শর্তে উক্ত ইনআম বা হাদিয়া গ্রহণ বৈধ হবে।

তদ্রূপ ঔষধ কোম্পানীগুলো বিভিন্ন ফার্মেসী মালিকদেরকে নির্ধারিত পরিমাণ ঔষধ বিক্রির ওপর যে কমিশন প্রদান করে থাকে তাও বৈধ। এটি মূল্যহ্রাস বা ইনআমের অন্তর্ভুক্ত।

১১. বর্তমানে ব্যাপকভাবে দেখা যায়, কিছু চিকিৎসক বিভিন্ন অজুহাতে নানা রকম কমিশন নিয়ে নিজেদের পকেট ভারি করেন। এতে চিকিৎসা খাত দিনদিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে। অথচ সঠিক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেস্টের কথা বলা, অন্য কোনো ডাক্তার বা হাসপাতালে রেফার করা—এসবই ডাক্তারের মূল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব কাজের বিনিময়ে ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, হাসপাতাল বা অন্য কারো থেকে কমিশন গ্রহণ মোটেও বৈধ নয়।

১২. প্রয়োজন ছাড়া কোনো টেস্ট করানোর কথা বলা অথবা

অনির্ভরযোগ্য কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রেফার করা সম্পূর্ণরূপে ধোঁকা ও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত ও নাজায়েয।

১৩. কেউ যদি কোনো ল্যাব বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু করে এবং বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী ডাক্তারদেরকে কমিশন প্রদান না করে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ডাক্তারদেরকে নির্ধারিত কমিশন প্রদান করা বৈধ হবে। তবে ডাক্তারের জন্য তা নেওয়া বৈধ হবে না।

১৪. কখনো দেখা যায়, বিভিন্ন অটো, টেক্সি যাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এরপর এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট হোটেল থেকে কমিশন গ্রহণ করে। এটি জুআলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বৈধ হবে। শর্ত হলো, কোনোরূপ ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যাবে না।[১]

৩. ৫. ১. ১. ১২. নিয়োগ চুক্তির ওপর আপতিত বিভিন্ন অবস্থা

১. চাকরি বা কাজ চলাকালীন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় অথবা তার কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে বা এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যদ্দরুন দীর্ঘদিন কাজ করা অসম্ভব হয়ে যায় আর এ সময় পর্যন্ত নিয়োগদাতা অপেক্ষা করতে পারবে না, এসব ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

২. নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ থেকে কাজ করতে অস্বীকার করে, তার স্থলে অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিও না দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিয়োগদাতা কৃত চুক্তি বাতিল করতে পারবে। আর এ কারণে তার বাস্তব কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে তা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে নেওয়া যাবে।[২]

৩. ৫. ১. ১. ১৩. নিয়োগ চুক্তি বাতিল বা রহিত করা

১. নিয়োগ চুক্তি অনিবার্য চুক্তি। তাই বিশেষ অবস্থা ছাড়া এককভাবে তা রহিত করা যাবে না।

---

১ কিতাবুন নাওয়াযেল, খ. ১২, পৃ. ৩৯৫-৩৯৮

২ এ্যাওফি, স. ৩৪, ধা. ৮/১/২

বিশেষ অবস্থা হলো :

ক. যেমন, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। বর্তমান করোনা পরিস্থিতি এর অন্যতম উদাহরণ।

খ. তদ্রূপ সার্ভিসে এমন কোনো দোষ পরিলক্ষিত হওয়া, যে কারণে উপকার গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়।

গ. কোনো পক্ষ যদি মূল চুক্তিতে নিজের জন্য 'খেয়ারে শর্ত' রাখে, তাহলে সে অনুযায়ী এককভাবে চুক্তি রহিত করা যাবে।

২. নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এরূপ শর্ত করতে পারবে, নিয়োগদাতা যথানিয়মে পারিশ্রমিক প্রদান না করলে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এককভাবে চুক্তি রহিত করতে পারবে।

৩. উভয়ে যৌথভাবে সম্মত হয়ে কৃত চুক্তি রহিত করতে পারবে।

৪. নিয়োগ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার মাধ্যমে কৃত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তবে কখনো অপর পক্ষের বিশেষ কোনো ক্ষতি দূর করার জন্য চুক্তি অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন—পাহারা দেওয়ার জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তার চাকরির মেয়াদ শেষ। পরবর্তী পাহারাদার এখনো এসে পৌঁছেনি। দুদিন সময় লাগবে। এ অবস্থায় উক্ত দুদিন চাকরি অব্যাহত থাকবে। পাহারাদার এককভাবে তা রহিত করতে পারবে না। অথবা সে চাইলেও চলে যেতে পারবে না। এর জন্য নতুন করে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা যাবে। অথবা নির্ধারণ না করা হলে উজরতে মিছিল বা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে।

৫. এভাবে চুক্তি করা যাবে, নিয়োগ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চুক্তি বাতিল বা রহিত করার ওপর নোটিশ না দেওয়া হলে, অটোমেটিক তা রিনিউ হয়ে যাবে।

৬. যাকে কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তার থেকে যদি পুরোপুরি কাজ না নেওয়া যায়, তাহলে নিয়োগদাতা এককভাবে তা রহিত করতে পারবে। যেমন—কোনো শ্রমিকের হাত ভেঙে গেছে। কাজ করতে পারছে না। তাহলে তাকে এককভাবে বিদায় দেওয়া যাবে।

৩. ৫. ১. ১. ১৪. ফাসিদ ইজারা

ফাসিদ ইজারা বলতে এমন ইজারা চুক্তিকে বোঝানো হয়, যা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে পারিপার্শ্বিক কোনো কারণে সঠিক নয়। যেমন পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়নি, সময়সীমা অজ্ঞাত, অতিরিক্ত কোনো শর্তারোপ যা চুক্তির পরিপন্থী ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। এর দাবি হলো, এমন চুক্তির পর চাকরি শুরু করা বা ভাড়াকৃত বস্তু অর্পণ কোনোটিই কারো ওপর অনিবার্য নয়।

কিন্তু ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি তা করে ফেলে তাহলে ধার্যকৃত উজরত বা পারিশ্রমিক পাবে না। বরং উজরতে মিছিল বা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। অবশ্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক যদি উজরতে মিছিলের কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাই পাবে। কারণ তারা এর ওপরই রাজি হয়েছে। আর যদি নির্ধারিত পারিশ্রমিক উজরতের মিছিলের বেশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উজরতে মিছিল পাবে। নির্ধারিত পারিশ্রমিক নয়।

৩. ৫. ১. ১. ১৫. বাতিল ইজার

বাতিল ইজারা বলতে এমন ইজারা চুক্তিকে বোঝানো হয়, যার মূল চুক্তি (نفس المعقود عليه) হারাম বা শরীয়াহসম্মত নয়। যেমন, ব্যভিচারের চুক্তি। এটি বিধানগত দিক থেকে অস্তিত্বহীন। তাই কোনো ধরনের পারিশ্রমিক পাবে না। পারিশ্রমিক হাতে আসলে তা দাতাকে ফেরত দিতে হবে। দাতা না পাওয়া গেলে সেটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।[১]

৩. ৫. ১. ২. আজিরে খাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ নীতিমালা

১. যে কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই কাজের জন্য উপস্থিত হতে হবে। এরপর কাজ অল্প হোক, বেশি হোক সেটি বিবেচ্য নয়। নিয়োগদাতার অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকা যাবে না। অবশ্য শরীয়াহসম্মত অন্যকোনো আবশ্যকীয় কোনো দায়িত্ব এসে গেলে ভিন্ন কথা।[২]

---

১ ইমদাদুল ফাতাওয়া , খ. ৩, পৃ. ৩৩৪; ইতরে হিদায়া, ২৫০

২ এ্যাওফি, স. ৩৪, ধা. ৭/১/১/

২. যে কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই কাজ নিজে না করলে পারিশ্রমিক পাবে না। তদ্রূপ অনিয়মিত ছুটি ভোগ করলে অথবা বিলম্বে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি কারণে কর্তৃপক্ষ ওই পরিমাণ বেতন কর্তন করতে পারবে।[১]

৩. যে সময়ে কেবল নিয়োগকর্তার কাজ করার চুক্তি হয়েছে সে সময়ে অন্যের কাজ করা জায়েয নয়। যদিও তা অধিক লাভজনক হয়।

৪. কাজ না করার কারণ যদি শ্রমিকের পক্ষ থেকে হয়। যেমন অসুস্থ হয়ে যাওয়া। তবে অনুপস্থিতকালীন সময়ের পারিশ্রমিক/বেতন পাবে না। নিয়োগকর্তা তা কেটে রাখার অধিকার রাখে।

অবশ্য চুক্তির সময় যদি এমন চুক্তি হয়ে থাকে যে, অসুস্থতাকালীন সময়ও বেতনসহ ছুটি থাকবে, তাহলে কর্মচারী অসুস্থতাকালীন ছুটিতে বেতনের অধিকারী হবে।

৫. নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়ার পর কাজ না হওয়ার কারণ যদি কেবল মালিকের পক্ষ থেকে হয়, সেক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার শর্তে কাজ না হলেও সে তার ওই দিনের পারিশ্রমিক/বেতন পাবে।

৬. উপস্থিত হওয়ার পর কাজ না করতে পারাটা যদি প্রাকৃতিক কারণে হয়, তবে সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক/বেতন পাবে না। যেমন—বৃষ্টির কারণে নিয়োগকৃত কৃষক মাঠে কাজ করতে না পারা।

৭. নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে কোনো কাজ না থাকলে, অন্য কাজে এত অধিক ব্যস্ত হওয়া বৈধ নয়, যদ্দরুন পরে যখন কোনো কাজ আসে তখন সেটা সুচারুরূপে করা সম্ভব হয় না।

৮. নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া শর্ত (যদি নিয়োগদানটা সময়ের সাথে শর্তযুক্ত হয়)।

৯. **ক্ষতিপূরণ :** এ ব্যাপারে সকলেই একমত, আজিরে খাস আমীন বা আমানতদার। তার হাতে মালিকের পক্ষ থেকে প্রদেয় বস্তু আমানত। সুতরাং সীমালঙ্ঘন ছাড়া কোনো জিনিস ভেঙে গেলে এর ক্ষতিপূরণ

---

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৪৪

তার থেকে নেওয়া যাবে না। যেমন বাসার কাজের বুয়া অনিচ্ছাকৃত কিছু ভেঙে ফেলল। তাহলে এ কারণে তার বেতন কম দেওয়া যাবে না। অবশ্য শ্রমিকের পক্ষ থেকে যদি সীমালঙ্ঘন পাওয়া যায় অথবা ত্রুটি পাওয়া যায় অথবা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন হেতু ক্ষতি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আজিরকেই দিতে হবে। এ বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করবে আদালত।[১]

১০. আজিরে খাস নামায পড়ার বিধান : চাকরির নির্ধারিত সময়ে নিয়োগকর্তা/মালিকের অনুমোদন ছাড়া কোনো নফল পড়তে পারবে না। কেবল ফরয ও সুন্নত নামায পড়তে পারবে। এতটুকু অধিকার শ্রমিকের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করা উচিত। এ ব্যাপারে অনেক অবহেলা সমাজে চোখে পড়ে। দেখা যায়, ফরয নামায পড়ারও সময় দেওয়া হয় না বা দেওয়া হলেও তাকে অনুৎসাহিত করা হয় কিংবা অন্য চোখে দেখা হয়। এমনটি কাম্য নয়। অন্তত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাযে বাধা দেওয়া জায়েয নয়। অবশ্য নফল নামাযের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বাধা দিতে পারবে। তবে নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় বরাদ্দ দেওয়া থাকলে, ওই সময়ে কর্মচারী নফলও পড়তে পারবে। এর জন্য স্বতন্ত্র অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, নফল ইবাদত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। শরীয়ত এটি বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। যেন অন্যের হক আদায়ে ত্রুটি না হয়। ভাবার বিষয় হলো, কিছু কর্মকর্তা অফিসের নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কাজ করেন না। ঘুমিয়ে বা গল্প করে সময় নষ্ট করেন। অথচ শরীয়ত নিয়োগকর্তার স্বার্থে নফল নামায না পড়ার অবকাশ দিয়েছে। সেখানে আমরা কতটা নির্দয়ভাবে কর্তৃপক্ষের হক নষ্ট করি!! চাকুরীজীবীদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া জরুরি।

১১. অনুমতি ছাড়া নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকা বৈধ নয়। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে মালিক বা কর্তৃপক্ষের কাজে আত্মনিয়োগ করা জরুরি।

১২. বর্তমান অর্থনৈতিক বহুমুখী কর্মকাণ্ডে আজিরে খাস নানাভাবে হতে পারে। যথা—

---

১ এ্যাওফি স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং ৩৪, ধারা ৪/৫

১. শুধু উপস্থিত থাকার ওপর চুক্তি। যেমন—বলা হলো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে। মেহমান যারা আসবে, তাদেরকে স্বাগত জানাবে। মেহমান না আসলেও থাকতে হবে। এখানে চুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে পারার চেয়ে উপস্থিত হওয়া মূল। তবে এর অর্থ এ নয় যে, উপস্থিত হবে, তবে কাজ করবে না।

২. শুধু কাজের ওপরও চুক্তি হতে পারে। নির্ধারিত সময় উপস্থিত থাকার ওপর নয়। কাজের যখন প্রয়োজন হয়, তখন এসে কাজ করে যাবে। মূল হলো, কাজ। সময় নয়। যেমন-বিদ্যুৎ সংযোগকারী সার্ভিস প্রদানকারী কোনো গ্রুপের সাথে চুক্তি করা হলো, যখনই বিদ্যুৎ এর সমস্যা দেখা দিবে, এসে মেরামত করে দিবে। এ ধরনের কর্মীরাও কাজের সময় আজিরে খাস হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, নিয়োগকারীর স্থানে এসে যথাসময়ের মধ্যে কাজ করে দিতে হবে।

৩. তদ্রূপ সময়ও নির্ধারিত, কাজও নির্ধারিত—এমনও হতে পারে। যেমন, প্রতিদিন সকাল নয়টায় এসে নিয়ে যাবে—এ মর্মে কোনো রিক্সা চালকের সাথে চুক্তি হলো। এটিও বৈধ। এ সময় রিক্সা চালক অন্য কাজ করতে পারবে না।

৪. সময়ের সাথে কাজের পরিমাণও সুনির্দিষ্ট। যেমন—প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা কাজ করবে। আর এ সময়ে ১০০ পৃ. কম্পোজ করতে হবে। এমন শর্ত বৈধ নয় (ফাসিদ)। কারণ, হতে পারে এ সময়ে ১০০ পৃ. কম্পোজ করা সম্ভব হবে না। এতে নিয়োগকারী উপকৃত হবে, তবে কর্মী পারিশ্রমিক পাবে না—এটি বৈধ নয়। সুতরাং যথারীতি পারিশ্রমিক দিতে হবে।

হ্যাঁ, কাজের টার্গেট দেওয়া যেতে পারে। বলা যেতে পারে, এ সময়ে এই পরিমাণ কাজ শেষ করতে হবে। তবে এর অর্থ এ হবে না যে, টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারলে মালিক পক্ষ উপকৃত হলেও কোনো প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না।

মোটকথা, এ আলোচনা থেকে এ মূলনীতি বের হয়, বেতন/পরিশ্রমিক যদি সময়ের সাথে শর্তযুক্ত থাকে তবে কাজটা এর অনুগামী বা প্রাসঙ্গিক। মূল নয়। সেক্ষেত্রে বেতন/পারিশ্রমিক পাবে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার ওপর। কাজের ওপর নয়।

আর যদি বেতন/পারিশ্রমিক কাজের সাথে শর্তযুক্ত থাকে, তবে সময় প্রাসঙ্গিক বা অনুগামী হবে। সেক্ষেত্রে বেতন/পারিশ্রমিক পাবে কাজের ওপর। নির্ধারিত সময়ে করে দেওয়ার কারণে নয়। তাই যতটুকু কাজ হবে, ততটুকুর পারিশ্রমিক পাবে। অন্যথায় ইজারা ফাসিদ হয়ে যাবে।[1]

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, বর্তমান সমাজে আজিরে খাসের সংখ্যাই অধিক। সরকারি-বেসরকারি সকল চাকরিজীবীর অন্তর্ভুক্ত। চাকরিজীবীদের জন্য উপরোল্লিখিত শরীয়াহগুলো অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। এসব শরীয়াহ নীতিমালার মূল কথা হলো, শ্রমিক বা কর্মচারী দ্বারা যেন মালিক বা কর্তৃপক্ষের কোনো হক নষ্ট না হয়। তদ্রূপ শ্রমিকদেরও যেন কোনো হক নষ্ট না হয়। অন্যের হক নষ্ট করে দুনিয়াতে কোনোভাবে ছাড় পেয়ে গেলেও আখেরাতে এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। তাই এ বিষয়ে সচেতন থাকা একান্ত জরুরি।

৩. ৫. ১. ৩. আজিরে মুশতারাক (Shared employee) : পরিচিতি ও তাৎপর্য

AAOIFI তাদের Hiring of persons বিষয়ে রচিত ৩৪ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৪/৩-এ আজিরে মুশতারাকের পরিচিতি পেশ করেছে এভাবে—

A Shared employee who works for more than one person and who is not supposed to work for a specific person at a specific time, is not subject to such restriction.

সারকথা, আজিরে মুশতারাক বলতে যা বোঝায়—

১. এমন শ্রমিক যে, একজনের বা নির্দিষ্ট কারো কাজ করে না; বরং সকলের কাজ করে। যেমন : ধোপা।

২. এখানে মূল হলো কাজ। তাই কী কাজ করা হবে, তা স্পষ্টভাবে

১ ইত্‌রে হিদায়া, পৃ. ২৩৪

নির্ধারণ করে নিতে হয়। কোথায় কাজ করবে তাও নির্দিষ্ট করতে হয়। এখানে কাজের জন্য উপস্থিতি মূল নয়। কাজের সময়সীমাও মূল নয়। তাই কাজের সময়সীমা উল্লেখ করা হয় না। অবশ্য সময়সীমা নির্ধারণ করা বৈধ। এটি ওয়াদা হিসেবে গণ্য হবে। যা ওয়াদা হিসেবে রক্ষা করা আবশ্যক হবে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার জন্য বাধ্য করা যাবে। যেমন—ধোপা বা দর্জিকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তদ্রূপ নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হলে চুক্তি রহিতও করা যাবে। আর যদি সময় নির্ধারণ করা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে উরফ অনুযায়ী সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

৩. এখানে এমন কোনো সময় থাকবে না যে, এ সময়ে সে কেবল নির্দিষ্ট লোকের কাজ করবে; বরং সে যে কারো কাজ করতে পারে। এটি তার একটি মৌলিক অধিকার।

৪. এখানে পারিশ্রমিকের অধিকার হয় কাজের বিনিময়ে। উপস্থিত হওয়ার বিনিময়ে নয়।

৩. ৫. ১. ৪. আজির মুশতারাক সংক্রান্ত শরীয়াহ মূলনীতি

১. আজিরে মুশতারাকের দায়িত্ব হলো, চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা। সময়ের সীমারেখা দেওয়া থাকলে, সেটিও রক্ষা করা।

২. এখানে মূল যেহেতু কাজ। তাই কাজ পূর্ণ না হলে পারিশ্রমিক পাবে না। তবে অগ্রগণ্য বক্তব্য হলো, কাজ শেষ না করলেও যতটুকু কাজ হয়েছে তা যদি এমন হয় যে, এর থেকে উপকৃত হওয়া যাবে তাহলে হিসাব করে এর পারিশ্রমিক দিতে হবে। যেমন, দুটি পাঞ্জাবি সেলাই করে দেওয়ার চুক্তি হয়েছে। যদি একটি দেয় তাহলে ওই পরিমাণ পারিশ্রমিক তাকে দিতে হবে।

অবশ্য শরীয়াহসম্মত প্রয়োজন ছাড়া শ্রমিকের জন্য কাজ শেষ না করে চুক্তি ভঙ্গ করা ঠিক নয়। এটি ওয়াদা ভঙ্গের মধ্যে পড়ে যাবে। বিশেষ প্রয়োজনে কাজ শেষ করার আগেই চুক্তি ভঙ্গ করতে চাইলে সেক্ষত্রে শ্রমিকের উচিত, বাকি কাজ শেষ করার জন্য নিয়োগকর্তাকে একজন ভালো শ্রমিক জোগাড় করে দেওয়া।

৩. ধোপা, দর্জি ইত্যাদি আজিরে মুশতারাক যদি বলে, সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্যকারো কাজ করবে না। কেবল আপনার কাজ করে দেবে, তাহলে সেটি তার এক পক্ষীয় বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে। এতটুকু কথার কারণে সে আজিরে খাস হয়ে যাবে না। তাই এ সময়ে অন্যকারো কাজও সে করতে পারবে। তবে সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ করে দেওয়া আবশ্যক।[১]

৪. ক্ষতিপূরণ, আজিরে মুশতারাক আমীন (তথা রিস্ক বহনকারী নয়) নাকি যামেন (الضامن তথা রিস্ক বহনকারী) বিষয়টি মতভেদপূর্ণ।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতামত হলো, তার হাত আমীনের হাত নয়; বরং যামেনের হাত। সুতরাং মাল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অবশ্য মুসীবত যদি এমন হয়, যার থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত সম্ভব নয়। যেমন ব্যাপকভাবে আগুন লেগে যাওয়া। তবে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেবে না। আর যেসব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেবে। বর্তমানে এর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়।

AAOIFI তাদের Hiring of persons বিষয়ে রচিত ৩৪ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৪/৬-তেও এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।

অতএব, লন্ড্রিতে কাপড় পুড়ে গেলে, সেলুনে মাথা কাটা ছেঁড়া হলে, দর্জি কাপড় নষ্ট করে ফেললে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫. যদি চুক্তি হয়, নির্ধারিত সময়ে সে অন্যের কাজ করবে না। তবে চুক্তি অনুযায়ী অন্যের কাজ করা শ্রমিকের জন্য বৈধ হবে না। তদুপরি কাজ করলে সেটার পারিশ্রমিক হারাম হবে না। তবে ওয়াদা ও চুক্তি খেলাফির গুনাহ হবে।

৬. পাবলিক বাস আজিরে মুশতারাক।[২] তাদের জন্য এমন কিছু গাড়িতে

---

১ ইত্রে হিদায়া, পৃ. ২৩২

২ পাবলিক বাস সকলের জন্য উন্মুক্ত। আপনি যখন পাবলিক বাসে উঠেন, তখন সে ওই সময়ে আর কাউকে নিতে পারবে না এমন কোনো চুক্তি হয় না; বরং আরো অনেককে নিতে পারে। মূল উদ্দেশ্য হলো, নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং পাবলিক বাস-পরিচালক মূলত আজীরে আম।

উঠানো বৈধ নয়, যার কারণে পূর্বের আরোহিরা কষ্ট পায় কিংবা তাদের সম্মানহানি হয়। এ বিষয়টি আজকাল পাবলিক বাসগুলোতে লক্ষ রাখা হয় কম। কখনো দেখা যায়, দুইজন দাঁড়ানোর জায়গায় ওরা চারজন পর্যন্ত তুলে নেয়। এতে যাত্রীদের কষ্ট হয়।

৭. অনেক সময় এমন হয়, পাবলিক বাস মাঝ পথে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে থেমে যায়। তখন অনেকে মোটেও ভাড়া পরিশোধ করে না। এটি অন্যায়। যতটুকু পথ অতিক্রম করেছে, ততটুকুর ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, সি.এন.জি. যা মূলত আজিরে মুশতারাক তবে একাই পুরো সি.এন.জি. ভাড়া নেওয়ার কারণে আজিরে খাস হয়ে যায় তার ক্ষেত্রেও একই বিধান।

৮. যে বাহনে একাধিক লোক উঠতে পারে সেখানে প্রথমে নারী উঠলে পরে পুরুষকে নেওয়া অথবা প্রথমে পুরুষ উঠলে পরে নারীকে নেওয়ার বিষয়টি আরোহিদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, এভাবে নারী-পুরুষ একত্রে অবস্থান লজ্জাজনক মনে করা হয়।

বিশেষ করে যারা ধার্মিক তাদের পাশে কোনো মহিলাকে বসানোর আগে অনুমতি নেওয়া জরুরি। অন্যথায় তা অন্যায় হবে। যেমন—অটো টমটম গাড়িতে দেখা যায়, ধার্মিক কারো পাশে মহিলা বা তার বরাবর কোনো মহিলাকে বসিয়ে দেয়। ধার্মিক ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া এটি চালকের জন্য অন্যায়। অবশ্য পাবলিক বাসগুলোতে যেহেতু নারীদের জন্য স্বতন্ত্র আসন থাকে, সেখানে পুরুষদের অনুমতি ছাড়াই নারীদেরকে নেওয়া যাবে। বরং নারী আরোহি আসলে, পুরুষদের জন্য সেসব আসন ছেড়ে দিতে হবে।[১]

৩. ৫. ১. ৪. ১. নিয়োগকর্তার করণীয়/দায়িত্ব

১. চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করা। এ ব্যাপারে অবহেলা কাম্য নয়।

---

১ এ্যাওফির স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং ৩৪, ধারা. ৪; ইতরে হিদায়া, পৃ. ২৩২; শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী, খ. ২, পৃ. ৪৮১-৪৮৩

২. কখন পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, সেটি পূর্ব-নির্ধারিত না হলে কাজ শেষ হওয়ার পর অনতিবিলম্বে পারিশ্রমিক প্রদান করবে।

৩. যথাসময়ে পারিশ্রমিক প্রদান না করলে আজিরে খাস কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে।

৪. কাজ করতে যা যা লাগে, উরফ ও প্রথানুযায়ী সেগুলো সরবরাহ করে দেওয়া নিয়োগদাতার ওপর আবশ্যক।[1]

৩. ৫. ১. ৪. ২. বেতন/পারিশ্রমিক সংক্রান্ত শরীয়াহ নীতিমালা

পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা

১. চুক্তির শুরুতেই বেতন বা পারিশ্রমিক স্পষ্ট করে নিতে হবে। কী পরিমাণ দেওয়া হবে, কখন দেওয়া হবে, কী পন্থায় দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয় চূড়ান্ত করে নিতে হবে। যেন পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

২. ভাড়া যদি ফিক্সড থাকে, বিবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে তাহলে শুরুতে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যেমন—লোকাল বাসগুলোর ভাড়া ফিক্সড থাকে। তাই আরোহণের সময় ভাড়া বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। এটি মূলত ‘ইজারা বিত তাআতি’ (Hand to Hand Service contract)। তবে বিবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে ভাড়া চূড়ান্ত করে নিতে হবে।

১ এ্যাওফি, স. ২৪, ধা. ৭/২/১

অধ্যায় : ১১

- সালাম।
- ইসতিসনা।
- মুরাবাহা। পরিচিতি, তাৎপর্য ও প্রায়োগিক দিকসমূহ।

সালাম চুক্তি : পরিচিতি, তাৎপর্য, বিধান ও প্রায়োগিক উদাহরণ

Introduction to Salam and its Methods of Application

পূর্বকথা

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো লেনদেন সঠিক হওয়ার জন্য বুনিয়াদি শর্তগুলোর মধ্যে একটি হলো, যে বস্তুটি বিক্রি করা হবে সেটি বিক্রেতার নিকট প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে থাকতে হবে। এ শর্তে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়। যথা :

১. বস্তুটি মওজুদ ও বিদ্যমান থাকা (Product to be Exist)। সুতরাং যে বস্তুটির অস্তিত্বই নেই সেটি বিক্রি করা যাবে না।

২. বিক্রেতার মালিকানা থাকা (Product to be in the Seller's Ownership)। সুতরাং মওজুদ থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার মালিকানা ছাড়া তা বিক্রি করা যাবে না।

৩. শুধু মালিকানাই যথেষ্ট নয়; বরং ওই বস্তুর ওপর বিক্রেতার পূর্ণ কবযও (হস্তগত) থাকতে হবে (Product to be in the Seller's Possession)।

শরীয়তের উক্ত ব্যাপক নীতিমালা থেকে কেবল দুটি লেনদেন ব্যতিক্রম। তা হলো, সালাম ও ইস্তেসনা চুক্তি।

১. ১. সালাম চুক্তি কী?

সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য মওজুদ থাকা, বিক্রেতার মালিকানায় থাকা ও হস্তগত হওয়া জরুরি; কিন্তু সালামে এ বিষয়গুলো জরুরি নয়। এটি মূলত এমন একটি ক্রয়-বিক্রয়, যেখানে পণ্য উপস্থিত থাকে না, বিক্রেতার মালিকানাও থাকে না এবং তার দখলেও থাকে না।

এরপরও উপস্থিত পূর্ণমূল্য অগ্রিম গ্রহণ করে নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রি করে দেওয়া হয়। পণ্য না থাকা সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতে কোনো একদিন উক্ত পণ্য ক্রেতাকে সরবরাহ করে দেবে। এককথায়, পূর্ণমূল্য নগদ গ্রহণ করে পণ্য বিলম্বে পরিশোধ করার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করার নামই হচ্ছে 'সালাম চুক্তি'। যেমন—ধানের অফ সিজনে কারো সাথে চুক্তি করা হলো, আগামী তিন মাস পর দশ মণ আতপ চাল দিতে হবে। মূল্য প্রদান করা হবে নগদে। আরবীতে একে সংক্ষেপে বলা হয়, بيع الآجل بالعاجل অর্থাৎ নগদ টাকা দিয়ে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়। এ ছাড়া লেনদেনটি 'সালাম' ও 'সালাফ' নামেও পরিচিত। ইংরেজিতে সহজে Advanced Contract বলা যায়।

সালাম চুক্তি বলতে যা বোঝায়

- সালাম একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এটি কোনো প্রকার ওয়াদা চুক্তি নয়।
- চুক্তির সময়ই পূর্ণমূল্য ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে অর্পণ করা জরুরি।
- ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। তদুপরি ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ করা হবে—এ দায়িত্ব নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করা হয়।
- পণ্য সুনির্দিষ্ট করা হয় না। তবে গুণাগুণ বর্ণনার মাধ্যমে অজ্ঞতা যথাসম্ভব দূর করা হয়।

১. ২. সালাম চুক্তির তাৎপর্য

১. পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সালাম চুক্তিতে পণ্যের অস্তিত্বই

থাকে না। সুতরাং এটি 'বাইউল মা'দুম' (بيع المعدوم) তথা অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রির অন্তর্ভুক্ত, যা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল ক্রয়-বিক্রয়। অথবা পণ্য মৌলিকভাবে আছে, তবে সেটা বিক্রেতার মালিকানায় নেই। এমন লেনদেনও হাদীসে নিষিদ্ধ। হাদীসের ভাষায় এরূপ লেনদেনকে বলে 'বাই'উ মা লা ইয়ামলিকহু।' (بيع ما لا يملكه) সুতরাং কিয়াস অনুযায়ী সালাম চুক্তি সঠিক হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু শরীয়তপ্রণেতা—যিনি 'বাইউল মা'দুমকে' নিষেধ করেছেন, যিনি 'বাই'উ মা লা ইয়ামলিকহুকে' নিষেধ করেছেন, তিনিই যেহেতু সালাম চুক্তিকে বৈধ বলেছেন, তাই সেখানে আর কোনো আপত্তি থাকে না।

২. মূলত অর্থ সংকট থেকে এ লেনদেনের উদ্ভব। বিক্রেতার অর্থ সংকট। তার নিকট পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। আবার ক্রেতাও চায় অল্প মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে। তাই সে এতে আগ্রহী হয়। কারণ, এতে স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অল্প মূল্যে পণ্য পাওয়া যায়। এজন্য একে 'বাইউল মাফালিস' (بيع المفاليس) গরিবদের বেচাকেনাও বলা হয়।[1]

১. ৩. সালাম চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

ক্র. নং	বাংলা	আরবী
১.	ক্রেতা	রব্বুস সালাম/আল-মুসলিম (رب السلم أو المسلم)
২.	বিক্রেতা	মুসলাম ইলাই (المسلم إليه)
৩.	পণ্য	মুসলাম ফী (المسلم فيه)
৪.	মূল্য	রা'সুল মাল (رأس المال)
৫.	সালাম চুক্তি	আকদুস সালাম (عقد السلم)

১ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ৪৩১

১. ৪. সালাম চুক্তির বৈধতা

সাধারণত বেচাকেনার মূলনীতির বাহিরে গিয়ে মানুষের ব্যাপক প্রয়োজনকে সামনে রেখে শরীয়ত সালাম চুক্তিকে বৈধ করেছে। কুরআনুল কারীমের এই আয়াত থেকেও এর প্রতি ইঙ্গিত হয়—

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের/বাকি লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।'[১]

বিশিষ্ট তাবেঈ সাঈদ ইবনে মানসূর রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

> أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية.
>
> 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে দায়ে আবশ্যিক হয় এমন সালাফ বেচাকেনা পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে হালাল করেছেন। এরপর তিনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।'[২]

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'সহিহুল বুখারী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন,

> قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.
>
> 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন। দেখলেন মানুষ বিভিন্ন ফলে এক বছর ও দুই বছর মেয়াদী সালাফ/সালাম চুক্তি করে। তিনি এ অবস্থা দেখে বললেন—'যে খেজুরের মধ্যে সালাম/সালাফ চুক্তি করবে, সে যেন সুনির্দিষ্ট পরিমেয় পাত্রে ও সুনির্দিষ্ট মাপে সালাম চুক্তি করে।'[৩]

---

১ সূরা বাকারা : ২৮২

২ মুসতাদরাকে হাকেম, কিতাবুত তাফসীর, সূরা বাকারা, হাদীস : ৩১৩০ (سكت عليه الذهبي)

৩ সহিহ বুখারী, সালাম অধ্যায়, শুরু অংশ, নাম্বার : ২২৩৯

ইমাম ইবনুল মুনযির রহ.-এর বৈধতার ওপর ইজমা নকল করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز.
>
> অর্থাৎ, আমরা যেসব আহলে ইলম/উলামাদেরকে জানি তাঁরা সকলেই সালাম চুক্তির বৈধতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১]

মোটকথা, সালাম চুক্তির বৈধতা সুপ্রমাণিত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে লেনদেনটি বাস্তবায়নে নানা শর্ত ও নীতিমালা রয়েছে। সামনে পর্যায়ক্রমে তা উল্লেখ হবে ইনশাআল্লাহ।

১. ৫. সালাম কীসে হতে পারে?

'সালাম' চুক্তি একটি ব্যাপক চুক্তি। এটি প্রাকৃতিক দ্রব্য, কারখানায় তৈরি দ্রব্য সব কিছুতেই হতে পারে। তবে শর্ত হলো, দ্রব্যগুলোর পরস্পরের মধ্যে যেন উল্লেখযোগ্য কোনো তফাত না থাকে। সুতরাং প্রাণী, পশু এসবে সালাম চুক্তি প্রয়োগ হবে না।

উল্লেখযোগ্য তফাত ও অনুল্লেখযোগ্য তফাত বলতে বোঝায়, যা প্রকার ও গুণাগুণ বলেও নির্ধারণ করা যায় না। এরপরও চরম অজ্ঞতা থাকার কারণে ঝগড়া সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এটি প্রাণীর ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। তদ্রূপ সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যেও সালাম চুক্তি হবে না।

১. ৬. সালাম চুক্তির মৌল উপাদান

সালাম চুক্তিতে মোট ৫টি মৌল উপাদান রয়েছে, যথা—

- সালামের মূল চুক্তি।
- সালাম চুক্তির মূলধন/মূল্য।
- সালাম চুক্তির পণ্য।
- সালাম চুক্তির মেয়াদ।
- পণ্য অর্পণের স্থান।

---

১ মুগনী, ৪/৩১২

১. ৬. ১. সালামের মূল চুক্তি

● সালামের চুক্তি সম্পাদনের জন্য যে ইজাব-কবুল ব্যবহৃত হবে, তাতে ‘সালাম’ শব্দ থাকা জরুরি নয়। বরং সালাম বোঝায় এমন শব্দ হলেও হবে।

● সালাম চুক্তি অনিবার্য হতে হবে। এতে কারো জন্য ‘খিয়ারে শর্ত’ থাকতে পারবে না। ‘খিয়ারে শর্ত’ হলো, চুক্তি হওয়ার পর সেটি রহিত করার অধিকার।[১]

১. ৬. ২. সালাম চুক্তির মূলধন/মূল্য

● সালাম চুক্তিতে মূল্য পূর্ণরূপে চুক্তির মজলিসে/সেসনে বিক্রেতা বরাবর হস্তান্তর করতে হবে। মূল্য বাকি রাখা যাবে না। তবে মালেকী ফিকহ অনুযায়ী, মূল্য যদি বস্তু বা দ্রব্য জাতীয় হয়, তাহলে সেটি বিলম্বেও প্রদান করা যাবে। যদিও তা সালাম পণ্য প্রদানের সময় পর্যন্ত বিলম্ব হয়।

পক্ষান্তরে মূল্য যদি নগদ ক্যাশ হয়, তাহলে তা ২ থেকে সর্বোচ্চ ৩ দিন পর্যন্ত শর্ত করেও বিলম্বে প্রদান করা যাবে।[২]

এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড একে গ্রহণ করেছে। তবে তাঁরা শর্তারোপ করেছেন, পণ্য প্রদানের তারিখ ও মূল্য প্রদানের তারিখ এক না হতে হবে। তদ্রূপ পণ্য প্রদানের তারিখের পরও মূল্য প্রদান করা যাবে না। (‘সালাম’সংক্রান্ত ১০ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা-৩/১/৪) এর অর্থ—মূল্য যেকোনো উপায়ে পণ্য প্রদানের আগে পরিশোধ করা নিশ্চিত করতে হবে।

● মূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর উপকারও নির্ধারণ করা যায়। যেমন—এক বছর পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট বাড়ি বসবাসের জন্য দেওয়া, বিমানে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া, লঞ্চ-স্টিমারে আরোহণের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি নির্দিষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট উপকার। এক্ষেত্রে যে বস্তু থেকে উপকার নেওয়া হবে সেটা অর্পণের মাধ্যমেই Salam Capital

---

১ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৬৫

২ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৬৬

হস্তগত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। সুতরাং বিমানের টিকিট দেওয়া হলে মূল্য হস্তগত হয়েছে বলে ধরা হবে।[1]

- মূল্য হিসাবে বিভিন্ন বস্তু বা দ্রব্যও নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন, চাল, গম ইত্যাদি। তবে শর্ত হলো, রিবা যেন অনিবার্য না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

- মূল্য (Salam Capital) উভয় পক্ষের কাছে জ্ঞাত থাকতে হবে। এমনভাবে জ্ঞাত থাকতে হবে, যা অজ্ঞতা ও ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা দূর করে দেয়।

এ মূলনীতি অনুযায়ী মূলধন যদি নগদ ক্যাশ হয় তাহলে মুদ্রার ধরন, পরিমাণ, প্রদানের পদ্ধতি সহই জ্ঞাত থাকতে হবে। আর যদি দ্রব্য হয়, তাহলে এর জাতীয়তা, প্রকার, গুণাগুণ ও পরিমাণ সবই জ্ঞাত থাকতে হবে।

- কোনো প্রকার দায় বা ঋণকে সালাম মূলধন হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না। সুতরাং বিক্রেতার কাছে আগে থেকে কোনো পাওনা থাকলে, তাকেই সালাম চুক্তির মূল্য হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না।

- দু দেশ থেকে বা একই দেশে দূর থেকে যদি সালাম চুক্তি করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এর সঠিক পদ্ধতি হলো ক্রেতা প্রথমে সালাম মূলধন ব্যাংকের মাধ্যমে বা মোবাইল টেকনোলজির মাধ্যমে কিংবা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিবে। এটি বিক্রেতার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে। টাকা পৌঁছার পর ফোনে সালাম চুক্তি করা হবে। এক্ষেত্রে চুক্তির সময় যেহেতু বিক্রেতার কাছে সালাম মূল্য আছে, তাই নতুন করে সালাম মূল্য হিসাবে হস্তগত করার প্রয়োজন নেই। হাম্বলী ফিকহে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে। এটি গ্রহণ করা যেতে পারে।[2]

১. ৬. ৩. সালাম চুক্তির পণ্য

- সালাম পণ্য এমন স্থানের সাথে সুনির্দিষ্ট করা যাবে না, যা নিশ্চিহ্ন হয়ে

---

১ স. ১০, ধ. ৩/১/১

২ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৬৮

যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন—সালাম চুক্তি হলো, নির্দিষ্ট আমগাছের দশ কেজি আম দিতে হবে। অথবা নির্দিষ্ট বাগানের ফল দিতে হবে। তদ্রূপ নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির পণ্য দিতে হবে—এমন চুক্তিও সঠিক হবে না। অবশ্য কোম্পানি যদি বড় পর্যায়ের হয়। যেমন, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। অথবা দেশীয় কোম্পানি, তবে বেশ বড় কোম্পানি। পণ্য অর্পণের মেয়াদও দীর্ঘ না হয়। সব মিলিয়ে নির্ধারিত সময়ে পণ্য অর্পণে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয়—তাহলে এসব শর্তে এমন সুনির্দিষ্ট কোম্পানির প্রডাক্টেও সালাম চুক্তি করা যাবে।[১]

উক্ত নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোম্পানির শেয়ারেও সালাম চুক্তি করা যাবে না।[২] কারণ, কোম্পানি শেয়ার সুনির্দিষ্ট। তাছাড়া এক্ষেত্রে নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, শেয়ার মূলত কোম্পানির যাবতীয় সম্পদে আনুপাতিক মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সম্পদে নগদ ক্যাশ, স্থাবর সম্পদও আছে। যেমন, বিল্ডিং, মেশিন ইত্যাদি। এগুলো সুনির্দিষ্ট বস্তু। পরস্পরে তফাতও হয় বেশি। এসব কারণেও কোনো কোম্পানির শেয়ারে সালাম চুক্তি করা যাবে না।[৩]

- সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যে সালাম করা যাবে না। পণ্য হবে অনির্দিষ্ট। কেবল জাতীয়তা, ধরন, গুণাগুণ ও পরিমাণ বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হবে। যেমন, খেজুর হলো জাতীয়তা, আজওয়া খেজুর হলো এর ধরন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হলো গুণাগুণ। মোটকথা এমনভাবে আলোচনা করে নিবে, যেন পরবর্তীতে পণ্য নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি না হয়।

এ নীতির আলোকে প্রাণীর মধ্যে সালাম চুক্তি করা যাবে না। কারণ প্রাণী বা পশু পরস্পরে নানা দিক থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে শাফেয়ী ও মালেকী ফিকহ অনুযায়ী, জাতীয়তা, ধরন, গুণাগুণ, বয়স ইত্যাদি বর্ণনার মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব হলে প্রাণীর ক্ষেত্রেও সালাম চুক্তি করা যাবে।[৪]

---

১ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৭৪

২ স. ২১, ধ. ৩/১১

৩ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৭৫

৪ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৭১

• সালাম পণ্য এমন হতে হবে, যা মেয়াদান্তে সাধারণত বাজারে মওজুদ থাকে। সহজেই বিক্রেতা অর্পণ করতে সক্ষম হয়।[1] তবে হানাফী মাযহাব মতে, সালাম চুক্তি থেকে নিয়ে সালাম পণ্য অর্পণ কাল পর্যন্ত সালাম পণ্য বাজারে মওজুদ থাকতে হবে। সুতরাং যদি চুক্তির সময় না থাকে, অর্পণের সময় থাকে অথবা এর বিপরীত হয় অথবা মাঝের সময়ে না থাকে, তবে এসব ক্ষেত্রে সালাম সহিহ হবে না। সালাফে সালেহীন থেকে ইমাম সাওরী রহ. ও ইমাম আওযায়ী রহ.ও উক্ত মতের প্রবক্তা ছিলেন। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে, চুক্তির সময় থাকা জরুরি নয়। অর্পণের সময় থাকলেই হবে। এ্যাওফি এটিই গ্রহণ করেছে।

• সালাম চুক্তির পণ্য মেয়াদে অর্পণ করা জরুরি কি না, বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফিকহে সালাম পণ্য মেয়াদে অর্পণ করতে হবে। এর জন্য নির্ধারিত মেয়াদ থাকবে। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে সালাম চুক্তি মেয়াদিও হতে পারে, মেয়াদ ছাড়াও হতে পারে।

পরিভাষায় একে 'সালামে হাল' (السلم الحال) বলে। অর্থাৎ এমন সালাম, যেখানে মেয়াদ মুখ্য নয়। মেয়াদ থাকলেও তা ক্রেতার জন্য আবশ্যিক নয়। ক্রেতা যেকোনো সময় সালাম পণ্য প্রদানের জন্য বলতে পারে। এ মতানুযায়ী, সালাম পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টিচিত্তে যে কোনো সময় অর্পণের চুক্তি করা যাবে। সুনির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ থাকতে হবে—তা জরুরি নয়। তেমনিভাবে এক-দুদিনের মতো ছোট মেয়াদও থাকতে পারে।

বর্তমান সময়ে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় একটি বহুল প্রচলিত বিষয়। এর একটি পদ্ধতি হলো, অনলাইন প্লাটফর্মে নানা পণ্যের ছবি দেওয়া হয়। ক্রেতা সেটি থেকে কোনো একটি পণ্য পছন্দ করেন। এরপর নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করে দেন। মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা সেটি ক্রেতা বরবার পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে কিছু কিছু অনলাইন প্লাটফর্মে নিয়ম থাকে—সর্বনিম্ন এতদিন, সর্বোচ্চ এত দিনের মধ্যে পণ্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

---

১ স. ১০, ধ. ৩/২/৮

আধুনিক ভাষায় এ ধরনের লেনদেন 'ড্রপশিপিং মডেল বিজনেস' (dropshipping model business) নামে পরিচিত। এ ধরনের লেনদেন সালাম চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। কারণ পণ্য এখানে সুনির্দিষ্ট নয়। তবে পণ্য প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নেই। সমকালীন কিছু ফকীহ এ পদ্ধতিকে 'সালামে হাল' বলে ব্যক্ত করেছেন।[১]

• চুক্তিতে পণ্যের যে কোয়ালিটি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল মেয়াদান্তে সেটাই অর্পণ ও গ্রহণ করতে হবে। পরিবর্তন বৈধ নয়।

• বিক্রেতা যদি চুক্তিতে বর্ণিত গুণাগুণ থেকে আরো ভালো মানের পণ্য অর্পণ করে, তবে ক্রেতার জন্য সেটিও গ্রহণ করা আবশ্যক। তবে শর্ত হলো, এর জন্য অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে ক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে না। এটি উত্তম পন্থায় পরিশোধ বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য চুক্তিতে বর্ণিত গুণই যদি মূল মাকসাদ হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো কোয়ালিটির পণ্য দিলেও সেটি ক্রেতা কর্তৃক গ্রহণ করা আবশ্যিক হবে না।[২] আর্থিক অক্ষমতার কারণে যথাসময়ে পণ্য অর্পণে বিক্রেতা ব্যর্থ হলে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে। এ কারণে আর্থিক কোনো ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে না।

• যে পণ্যের বিবরণের ওপর চুক্তি হয়েছিল, এর চেয়ে নিম্নমানের পণ্য প্রদান করা হলে, ক্রেতা তা গ্রহণে বাধ্য নয়। তবে গ্রহণ করলে সেটি উত্তম লেনদেন বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ মূল্য হ্রাস করেও সমঝোতা করে নিতে পারে।

• পণ্যের যে বিবরণের ওপর চুক্তি হয়েছিল, সেটিই প্রদান করতে হবে। ভিন্ন প্রকারের, একই জাতীয় পণ্য দিলেও হবে না। যেমন, আজওয়া

---

১ বিখ্যাত অনলাইন ফতোয়া ওয়েব সাইট Islam way.com এর সম্মানিত মুফতি শায়খ খালিদ আব্দুল মুনঈম আর-রাফেঈ হাফিযাহুল্লাহ ড্রপশিপিং বিজনেস মডিউলের ক্ষেত্রে উক্ত শরীয়াহ বিশ্লেষণ করেছেন (https://ar.islamway.net/fatwa/76913/)। উস্তাযে মুহতারাম মুফতি ইয়াহইয়া সাহেব একে সরাসরি সালামই বলেন (যেখানে সালাম করা সম্ভব)। প্রকাশ থাকে যে, ড্রপশিপিং বিজনেসের নানা পদ্ধতি আছে। একেকটার শরীয়াহ বিধান একেক রকম। সেক্ষেত্রে (ক্ষেত্রবিশেষ) 'সালামে হাল'/ 'সালাম' চুক্তি প্রয়োগ হতে পারে। সবক্ষেত্রে নয়।

২ স. ১০, ধ. ৫/২

খেজুরের ওপর চুক্তি হয়েছিল। তাহলে মরিয়ম খেজুর দিলে হবে না।

• আর্থিক সংকটের কারণে যথাসময়ে বিক্রেতা পণ্য অর্পণে ব্যর্থ হলে ক্রেতা তাকে সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দিবে। তবে এ কারণে কোনো প্রকার আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে না।

• নির্ধারিত মেয়াদে পণ্য পর্যাপ্ত নেই। সংকট দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্রেতার নিম্নোক্ত অধিকারগুলো অর্জন হবে :

১. ধৈর্য ধারণ করবে। যাবৎ পণ্যটি বাজারে সহজলভ্য হয়।

২. অথবা চুক্তি রহিত করে মূল্য ফেরত নেবে।

৩. অথবা নির্ধারিত শর্তানুযায়ী পণ্য পরিবর্তন করবে। (সামনে বিস্তারিত আসছে)

• পণ্য পরিবর্তন করা : স্বাভাবিক অবস্থায় সালাম চুক্তিতে বর্ণিত পণ্য পরিবর্তন করে অন্য পণ্য প্রদানের সুযোগ নেই। যদিও তা ক্রেতার সন্তুষ্টিচিত্তে হয়ে থাকে। কারণ তা পণ্য হস্তগত করার আগেই বিক্রয় করা অনিবার্য করে। এক হাদীসে এসেছে, من أسلف في شيئ فلا يصرفه إلى غيره 'যে ব্যক্তি কোনো বস্তুতে সালাম চুক্তি করবে সে তাকে পরিবর্তন করবে না।'[১] এটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতামত।

এর বিপরীতে ইমাম মালেক রহ. থেকে এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু মতামত পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শরীয়াহ মানদণ্ড প্রণেতা প্রতিষ্ঠান AAOIFI তাদের 'সালাম'সংক্রান্ত ১০ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা-৪/২-এ কিছু শর্তসাপেক্ষে সালাম পণ্য পরিবর্তনকে বৈধ বলেছে। শর্তসমূহ—

১. যা দিয়ে সালাম পণ্য পরিবর্তন করা হবে তা মুদ্রা না হতে হবে।

২. সালামের মূল চুক্তিতেই এই পরিবর্তনের কথা শর্তযুক্ত না থাকতে হবে।

---

১ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৪৬৮; আল ইলালুল কাবীর, ইমাম তিরমিযী রহ., হাদীস নং : ৩৪৬

قال ابن الهمام رح.: رواه الترمذي وحسنه، كذا في فتح القدير ٢٣١/٦

৩. এ পরিবর্তন হবে সালাম মেয়াদ উত্তীর্ণের পর।
৪. যার দ্বারা পরিবর্তন করা হবে সেটা Salam Capital অনুপাতে পণ্য হওয়ার যোগ্য হতে হবে।
৫. পরিবর্তিত পণ্য অর্পণের সময় পরিবর্তিত পণ্যের বাজারদর পূর্বপণ্যের বাজারদরের চেয়ে অধিক না হতে হবে।

১. ৬. ৪. সালাম চুক্তির মেয়াদ

সালাম চুক্তির মেয়াদ থাকলে সেটি সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। এর সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম কোনো মেয়াদ নেই। তবে সেটি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে এমন অজ্ঞতা থাকবে না, যা ঝগড়া পর্যন্ত নিয়ে যায়। বিভিন্ন সালাম পণ্যের জন্য বিভিন্ন রকম মেয়াদ নির্ধারণ করা যেতে পারে।[১] তবে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে মেয়াদ থাকা জরুরি নয়।

১. ৬. ৫. পণ্য অর্পণের স্থান

সালাম চুক্তিতে পণ্য কোথায় অর্পণ করা হবে, তা চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে। যদি তা নির্দিষ্ট না করা হয়, তাহলে চুক্তির স্থানই পণ্য অর্পণের স্থান বলে বিবেচিত হবে। তবে তা অসম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট উরফ ও রীতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হবে।[২]

১. ৭. প্যারালাল সালাম

সালাম চুক্তি মূলত একটি স্বাভাবিক লেনদেন। যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী, কৃষক, ব্যবসায়ীরা উপকৃত হয়ে থাকে। যেখানে বাস্তব দ্রব্যের লেনদেন হয়; কিন্তু একে যখন ইসলামিক ব্যাংকিং প্রোডাক্ট হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তা করা হয়, তখন সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা হলো স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সালাম করতে হলে পণ্য গ্রহণ করতে হবে। পণ্য গ্রহণ করা, গুদামজাত করা, এরপর তা বাজারে বিক্রি করা এগুলো ব্যাংকের সাথে যায় না।

---

১ স. ১০, ধ. ৩/২/৯

২ স. ১০, ধ. ৩/২/১০

এর সমাধান দিতে গিয়ে মুসলিম স্কলারগণ যেসব পথ বাতলে দিয়েছেন, সেগুলোর একটি হলো প্যারালাল সালাম (Parallel Salam)। আরবীতে বলে, السلم المتوازي (আস সালামুল মুতাওয়াযী)। মূল বিষয়ের আলোচনার আগে জরুরি দুটি কথা জেনে নেওয়া জরুরি :

১. ইসলামিক ব্যাংকিং বা ফিন্যান্সে আদর্শিক বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো মুদারাবা ও মুশারাকা। যার মাধ্যমে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি লাভ-লসভিত্তিক ব্যবসায় অবতীর্ণ হয়। এর বাইরে মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদি আদর্শিক বিনিয়োগ পলিসি নয়।

২. সালাম, ইস্তিসনা ইত্যাদিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের মডিউলগুলোও ব্যবহার করা যাবে। তবে এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদর্শিক পন্থা হলো সরাসরি ব্যবসায় অবতীর্ণ হওয়া। মুদারাবা-মুশারাকার বাইরে অন্যান্য মডিউল ব্যবহারে এটিই আদর্শিক পন্থা। এর বাইরে প্রোডাক্টকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখে বিনিয়োগ পলিসি গ্রহণ করা আদর্শিক পন্থা নয়। প্যারালাল সালাম মূলত এরই অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম স্কলারগণ বলেছেন, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শুরু অবস্থায় দ্বিতীয় পর্যায়ের মডিউলগুলো ব্যবহার করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে এসবের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেদিকে যাচ্ছে খুবই কম।

উপর্যুক্ত জরুরি দুটি বিষয় জানার পর নিম্নে প্যারালাল সালাম নিয়ে আলোকপাত করা হলো। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ পদ্ধতি হলো—

প্রথমে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসায়ীর সাথে সালাম চুক্তি করবে। প্রতিষ্ঠান ইনভেষ্ট করবে। ওই সময়ে প্রতিষ্ঠান অন্যকোনো ব্যবসায়ীর সাথেও আরেকটি Buy Salam Contract করে রাখবে। এটি সাধারণত এমন পক্ষ হবে, যাদের এ ধরনের পণ্য দরকার। হয় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, অথবা ব্যবসার প্রয়োজনে। এর মেয়াদও প্রথমটির মেয়াদের মতোই হবে। এখানে প্রতিষ্ঠান প্রথমটির চেয়ে অধিক মূল্য ধার্য করবে। নির্ধারিত মেয়াদে প্রথম চুক্তি থেকে পণ্য প্রতিষ্ঠানে আসবে। এরপর সেই মেয়াদেই প্রতিষ্ঠান সেটা দ্বিতীয় চুক্তিতে প্রদান করবে।

উভয় চুক্তির মূল্যের মার্জিনটা প্রতিষ্ঠানের প্রফিট বলে বিবেচিত হবে।

এটি বৈধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত ও নীতিমালা রয়েছে। যথা :

১. প্যারালাল সালাম চুক্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রথম চুক্তিতে সে হয় ক্রেতা। দ্বিতীয় চুক্তিতে হয় বিক্রেতা। তাই দুটি চুক্তি স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন হতে হবে। একটির সাথে অপরটি শর্তযুক্ত হতে পারবে না। যেমন, দ্বিতীয় চুক্তিতে যে পণ্যের ওপর চুক্তি হবে, সেটা উন্মুক্ত থাকবে। সরাসরি প্রথম চুক্তি থেকে প্রাপ্ত পণ্যের ওপর দ্বিতীয় চুক্তি করা যাবে না। এজন্যই কোনো কারণে প্রথম চুক্তি ফেইল হলেও, দ্বিতীয় চুক্তি অনুযায়ী পণ্য প্রদান করতে হবে। তদ্রূপ প্রথম চুক্তিতে পণ্যের কোয়ালিটি ভালো না হলে, সেটিই দ্বিতীয় চুক্তিতে দেওয়া যাবে না; বরং দ্বিতীয় চুক্তির গুণাবলি ও শর্তানুযায়ী পণ্য দিতে হবে।

২. প্যারালাল সালাম কেবল তৃতীয় পক্ষের সাথে করা যায়। প্রথম চুক্তিতে যিনি বিক্রেতা, তাকেই দ্বিতীয় চুক্তিতে ক্রেতা বানানো যাবে না। এটি নিষিদ্ধ Buy Back যা বৈধ নয়। এমনকি তৃতীয় পক্ষ যদি স্বতন্ত্র কোনো কোম্পানি হয়, কিন্তু এর অধিকাংশ মালিকানা প্রথম চুক্তির বিক্রেতার থাকে, তবুও বৈধ হবে না।

   তদ্রূপ তৃতীয় পক্ষ প্রথম চুক্তির বিক্রেতার উকিলও হতে পারবে না। সর্বোপরি দুটি চুক্তির পেপার, ডকুমেন্টস সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা হবে।[১]

১. ৭. ১. সালামের কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ

আমরা আমাদের বাস্তবিক জীবনে নিম্নোক্ত প্রকার লেনদেনে সালাম পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারি। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো :

১. মৌসুমের আগেই আমের অর্ডার দিয়ে রাখা।

২. মৌসুমের আগেই লিচুর অর্ডার দিয়ে রাখা।

---

১ ইসলামী ব্যাংকারী কি বুনিয়াদি, অবলম্বনে।

৩. মৌসুমের আগেই নির্দিষ্ট প্রকৃতির ধানের অর্ডার করা ইত্যাদি।

মোটকথা, এসব লেনদেন আমাদের সমাজে হচ্ছে। তবে সঠিকভাবে হচ্ছে খুবই কম। যেমন—কখনো আমের বোল আসার আগেই নির্দিষ্ট গাছের আম বা বাগান বিক্রি করে দেওয়া হয়। অথচ এটি নাজায়েয। হাদীসে পণ্যের অস্তিত্বের আগেই তা বিক্রি করে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সালাম পদ্ধতি ব্যবহার করে বৈধভাবে আমের ব্যবসা করা যাবে।[১]

১. ৭. ২. ইসলামী ব্যাংকিং-এ সালাম চুক্তি

ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর ব্যবহার সাধারণত ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে বিনিয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়। তবে এর পরিমাণ খুবই কম। গত অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে এর ব্যবহার হার মাত্র ১.২৩%। এটি আগে আরো কম ছিল। এখন কিছুটা বেড়েছে।

১. ৭. ৩. যেভাবে তা করা হয়

ধরা যাক, একটি গার্মেন্টস কোম্পানি। বিদেশ থেকে এক লক্ষ জামার অর্ডার পেয়েছে। কোনো একটা ইসলামী ব্যাংকের সাথে এল.সি. ওপেন করেছে। কাজ শুরু করেছে। পথিমধ্যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রয়োজন। ব্যাংক তখন জামার ওপর সালাম চুক্তি করত বিনিয়োগ প্রদান করতে পারে। সাথে এই চুক্তিও থাকবে, ওই জামাগুলো কোম্পানি ব্যাংকের পক্ষে বিদেশের বায়ারের কাছে বিক্রি করে দেবে।

সাদামাটা এই লেনদেনটিতে শরীয়াহ বেশ কিছু সমস্যা আছে। যথা : দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তির মাঝে শর্তযুক্ত হয়। ব্যাংক তার পণ্য বুঝে নেয় না। পণ্য বুঝে পাওয়ার আগেই খোদ বিক্রেতাকেই উকিল বানিয়ে দেওয়া হয়। এসব কারণে এটি ফাসিদ লেনদেনে রূপান্তর হয়ে যায়। কখনো সুদী কারবারও হয়ে যায়। সুতরাং শরীয়াহ অনুযায়ী করতে হলে

১ বোল আসার আগেই আম বাগান বিক্রির মাসআলা বিশদভাবে জানার জন্য দেখুন, ফাতাওয়ায়ে উসমানী, ৩/১০৯; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১০৫

শরীয়াহ পরিপালনের প্রতি আরো গুরুত্বারোপ করতে হবে। যা এই ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো প্রত্যাশিত মাত্রায় দেখা যায় না।

১. ৭. ৪. মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্স ও সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতি

বর্তমান সময়ে দারিদ্র্য গ্রামীণ সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর করতে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সুদভিত্তিক 'ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ' অন্যতম। বাংলাদেশে এ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে দেশের নানা প্রান্তে বহু বেসরকারী সংস্থা (NGO) ক্ষুদ্র ঋণের জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে বলা হয় ক্ষুদ্র ঋণের চারণভূমি। কিন্তু আদতে এর সুফল কি দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রত্যাশিত মাত্রায় ভোগ করতে পারছে?

'ক্ষুদ্র ঋণ' (Micro Credit) বলতে সাধারণত বোঝায়, আয় বৃদ্ধিকারক কোনো কাজে জামানতবিহীন অল্প পুঁজি সুদের শর্তে ঋণ হিসাবে প্রদান করা। এ ঋণটি ব্যবহৃত হয় আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে। ধরুন, কেউ সবজি চাষ করবে। বিক্রয় করবে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ক্রয় ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তার কাছে নেই। এ পরিস্থিতিতে তাকে সুদের শর্তে কিস্তিতে আদায়যোগ্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াই মূলত ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার এখনো ২০ শতাংশের কাছাকাছি। বেসরকারি হিসাবে এর হার দিগুণের অধিক। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী করোনা পরবর্তী দেশে দারিদ্র্যের হার বেড়ে ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[১]

আরেকটি গবেষণার তথ্যানুযায়ী, দেশে নতুন ও পুরনো মিলিয়ে জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। গরিব মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত কোটির বেশি।[২]

১ দৈনিক যুগান্তর, ২১ জানুয়ারি, ২০২২

২ দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৮ জানুয়ারি, ২০২২

এর অর্থ দরিদ্রের হার প্রতিনিয়ত বাড়ছেই। ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগে দিন শেষে সার্বিকভাবে লাভবান হচ্ছে কেবল ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। ক্ষুদ্র ঋণের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিক হলো, এতে ঋণ গ্রহণকারীর সফলতা কতটুকু হলো, কতটুকু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো সেটি বিবেচনায় থাকে কম। বরং ঋণদাতারা মেয়াদান্তে কিস্তি উসুলের প্রতিই অধিক মনোযোগী থাকে। এ কারণে দরিদ্র হার হ্রাসে এসব ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এহেন মুহূর্তে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ প্রচলিত সুদভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ইসলামী ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগ পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছেন। সেটি বিভিন্নভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। যথা—

- করযে হাসানা প্রকল্প।
- সালাম ও ইস্তিসনা প্রকল্প।

করযে হাসানা প্রকল্প ব্যবহার করে অগণিত মানুষ উপকৃত হচ্ছে। দেশের আনাচে-কানাচে ২০০ এর অধিক করযে হাসানাভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এর সবচেয়ে সফল প্রকল্প পাকিস্তানের সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি আখুওয়াত ফাউন্ডেশন। এর প্রতিষ্ঠাতা ড. আমজাদ সাকিব। সম্প্রতি (২০২২ ইং.) তিনি সুদবিহীন করযে হাসানাভিত্তিক এই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ সম্মাননা নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

করযে হাসানা কিভাবে কাজ করে, এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কেমন হবে—এ নিয়ে আমাদের বিশদ গবেষণা আছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, সালাম ও ইস্তিসনা পদ্ধতি প্রয়োগ। এর পেছনের কথা হলো, প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রহীতা প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে পণ্য বা সেবা তৈরি করে। এরপর সেটি বিক্রয় করে লাভ করা, ঋণ আদায় করা সবই তার একার দায়িত্বে থাকে। কখনো দেখা যায়, পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। কখনো উৎপাদন হলেও তা বিক্রয় করতে যোগ্য ক্রেতা পাওয়া যায় না।

এহেন মুহূর্তে এমন পদ্ধতি যদি নিয়ে আসা যায়, যিনি বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করবেন তিনিই উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ক্রয় করে নিবেন। তাহলে সেটি আরো অধিক যুৎসই পদ্ধতি হবে। এই কাজটিই হয়ে থাকে সালাম ও ইস্তিসনা বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে। (ইস্তিসনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)

এ দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। এরপর ওই অর্থ দিয়ে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিনিয়োগ সহায়তাকারীই ক্রয় করে নেবে। যদি তার সেটি প্রয়োজন না হয়, তাহলে প্যারালাল পদ্ধতি প্রয়োগ করে তা সমাধান করা যাবে। ইসলামী অর্থনীতির আলোকে যারা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন, তারা এ পদ্ধতি নিয়ে আরো গবেষণা করতে পারেন। বিভিন্ন গবেষণায় এ পদ্ধতিকে বেশ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

ইস্তিসনা চুক্তি : পরিচিতি, তাৎপর্য, বিধান ও প্রায়োগিক উদাহরণ

Introduction to Istisna (Manufacturing Contract) and its Methods of Application

২. ১. পূর্বকথা

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইস্তিসনা চুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইস্তিসনা শব্দটি আরবী (استصناع)। শাব্দিক অর্থ, কোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য কাউকে অর্ডার করা বা তলব করা। এটি এমন একটি লেনদেন, যেখানে পণ্য অস্তিত্বে আসার আগেই বিক্রি হয়ে যায়। সহজ ভাষায় এর সারকথা হলো, কোনো Manufacturer-কে অর্ডার দেওয়া যে, সে ক্রেতার জন্য নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোনো জিনিস তৈরি করে দেবে। এরপর Manufacturer যদি তাতে সম্মত হয়, তবেই ইস্তিসনা চুক্তি সম্পন্ন হয়।

শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ ইস্তিসনার সংজ্ঞা পেশ করেছেন এভাবে :

هو أن يطلب المشتري من البائع أن يأتي له بشيء مصنوع

بمواد من عنده موصوف في الذمة، ويلتزم البائع بذلك لقاء ثمن متفق عليه.

'বিক্রেতার কাছে ক্রেতা এ অর্ডার করা যে, বিক্রেতা তার নিজের কাঁচামাল দিয়ে ক্রেতার জন্য কোনো বস্তু তৈরি করে দেবে। এটি বিক্রেতার দায়ে আবশ্যিক হবে। উভয়ের ঐকমত্যে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতা উক্ত অর্ডার বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।'[১]

যা বোঝা গেল :

পণ্য তৈরির পর চূড়ান্ত পর্যায়ে ইস্তিসনা চুক্তি একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি।

- এটি কোনো ধরনের ওয়াদা চুক্তি নয়।
- পণ্য অবিদ্যমান থাকাবস্থায়ই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, পরিভাষায় অর্ডারদাতাকে বলা হয় 'মুস্তাসনে' (المستصنع)। আর ব্যবসায়ীকে বলা হয় 'সানে' (الصانع)।

২. ২. ইস্তিসনা চুক্তির বৈধতা

ইস্তিসনা চুক্তি কেবল হানাফী ফিকহে বৈধ। অন্যান্য ফিকহে বৈধ নয়। অন্যরা একে সালামের অধীনে সালামের যাবতীয় শর্তসহ বৈধ বলেন। স্বতন্ত্রভাবে ইস্তিসনাকে স্বীকার করেন না। কারণ, তাদের মতে এটি বিক্রেতার কাছে নেই এমন জিনিসের বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা নিষিদ্ধ। অপরদিকে হানাফী ফকীহগণ নিম্নোক্ত দলিলের ভিত্তিতে একে বৈধ বলেন,

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ও এরপর সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ এ লেনদেন করে আসছে। এভাবে এটি একটি শক্তিশালী 'তাওয়ারুসে উম্মাহ' দ্বারা প্রমাণিত। সালাফ থেকে এর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত নয়।

---

১ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৮৫

খ. বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংটি ও মিম্বর অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলেন।[১]

বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরামও এর বৈধতার পক্ষে মতামত পেশ করেছেন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক শরীয়াহ সিদ্ধান্তও একে স্বীকার করে নিয়েছে। এখানে আমরা এর বৈধতার পক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উল্লেখ করছি—

১. ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতের অধীনে রচিত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-র ৩৮৮ নং ধারায় ইস্তিসনা চুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[২]

২. ১৪১২ হি. মোতাবেক ১৯৯২ ইং. সনে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমী জেদ্দাহ' তাদের ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তে ইস্তিসনা চুক্তিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৩]

৩. আন্তর্জাতিক শরীয়াহ মানদণ্ড প্রণেতা সংস্থা AAOIFI এর বৈধতার পক্ষে মতামত প্রদান করে ১৪২২ হি. মোতাবেক ২০০১ ইং. সনে 'ইস্তিসনা' বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত করেছে।[৪]

২. ৩. কীসে ইস্তিসনা প্রয়োগ হতে পারে

ইস্তিসনার প্রয়োগক্ষেত্র হলো অর্ডারকৃত পণ্য এরূপ হতে হবে, যা তৈরি বা Manufacture-এর প্রয়োজন হয়। এমন ম্যানুফেকচার হতে হবে যা বস্তুর আসল ও স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং গম, যব, ধান এসবে ইস্তিসনা করা যাবে না। তদ্রূপ ধান থেকে চাল

---

১ আংটির বর্ণনার জন্য দেখুন, শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস : ৯১। আর মিম্বরের হাদীস দেখুন, সহিহ বুখারী, হাদীস : ৯১৭, ৪৪৮, ২০৯৪, ২৫৬৯
এখানে যদিও এটি স্পষ্ট নয় যে, লেনদেন দুটি ওয়াদা ছিল না ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ছিল। তবে পূর্ব থেকে চলে আসা সাধারণ রীতির দাবি হলো, লেনদেন দুটি ওয়াদা নয়, বরং ক্রয়ের চুক্তিই ছিল, যা ইস্তিসনা চুক্তি। (ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৮৬)

২ বিস্তারিত দেখুন, শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী, খ. ২, পৃ. ৪০০

৩ বিস্তারিত দেখুন, কারারাতু মাজমা, পৃ. ৩৪

৪ স্ট্যান্ডার্ড নং : ১১

করার ওপরও ইস্তিসনা করা যাবে না। কারণ, এতে চালের মূল অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। হ্যাঁ, চালের পিঠা করার অর্ডার দেওয়া হলে তবে তাতে ইস্তিসনা হতে পারে।

২. ৪. সালাম ও ইস্তিসনার মধ্যে পার্থক্য

সালাম ও ইস্তিসনা এই দিক থেকে অভিন্ন যে, উভয় চুক্তির মধ্যেই পণ্যের অস্তিত্ব, বিক্রেতার মালিকানা ও হস্তগত হওয়ার আগেই তা বিক্রি হয়ে যায়। তবে এ দুয়ের মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে মৌলিক কিছু পার্থক্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

	সালাম	ইস্তিসনা
১	সালাম সব জিনিসেই হতে পারে।	ইস্তিসনা সর্বদা এমন জিনিসের ওপর হয়, যা তৈরি করার প্রয়োজন হয়। কারণ, ইস্তিসনা চুক্তি মানেই হলো, প্রডাক্ট ও কাজ।
২	সালামে পূর্ণ মূল্য অগ্রিম প্রদান শর্ত।	ইস্তিসনার মধ্যে তা শর্ত নয়।
৩	সালাম চুক্তিসম্পন্ন হওয়ার পর একতরফাভাবে রহিত করা যায় না।	পণ্য তৈরির কাজ শুরু করার আগ পর্যন্ত ইস্তিসনা চুক্তি একতরফাভাবে রহিত করার সুযোগ আছে বলে অনেকে মনে করেন।
৪	পণ্য কখন অর্পণ করা হবে তা সালাম চুক্তিতে নির্ধারণ করা জরুরি।	ইস্তিসনার মধ্যে তা নির্ধারণ করা জরুরি নয়।
৫	সালাম চুক্তি বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত।	ইস্তিসনা চুক্তি কেবল হানাফী মাযহাবে বৈধ। (তবে এখন অন্যরাও বৈধতার কথা বলেন)

৬	সালাম শুধুই বাঈ বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি।	অপরদিকে ইস্তিসনা ইজারা ও বাঈ দুটি চুক্তির সমষ্টি।

সারকথা, সালাম চুক্তির ব্যাপকতা অনেক। তবে এর শর্ত কঠিন। অপরদিকে ইস্তিসনা চুক্তিতে ব্যাপকতা কম। তবে শর্ত সহজ।

২. ৫. ইজারা ও ইস্তিসনার মধ্যে পার্থক্য

ইজারা চুক্তি ও ইস্তিসনা চুক্তি এই দিক থেকে অভিন্ন যে, উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগদাতার জন্য কাজ করে। তবে দুটি চুক্তির মাঝে মৌলিকভাবে পার্থক্য আছে। যথা :

ইস্তিসনার মধ্যে, পণ্য তৈরি করার যাবতীয় কাঁচামাল ম্যানুফেকচারার বা বিক্রেতা সরবরাহ করে থাকে। কাঁচামাল যদি তার নিকট না থাকে, তবে সে তা নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থা করবে। অদ্রূপ পণ্য প্রস্তুতের জন্য কাজও করবে সে। পক্ষান্তরে কাঁচামাল যদি পুরোটা বা অধিকাংশ কিংবা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রাহক সরবরাহ করে দেয়, তবে সেটা তখন আর ইস্তিসনা থাকবে না; বরং ইজারা হয়ে যাবে।

যদি উভয়ে কাঁচামাল সরবরাহ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্রেতার কাঁচামাল বেশি হলে সেটা ইজারা হবে। আর কারিগরের কাঁচামাল অধিক হলে সেটা ইস্তিসনা হবে।[1]

উদাহরণ, কাপড় ক্রয় করে পাঞ্জাবি তৈরির জন্য দর্জিকে প্রদান করা, পায়ের মাপ দিয়ে জুতো তৈরি করার অর্ডার করা, বই ছাপানোর জন্য প্রেসের মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, আলমিরা, শোকেস তৈরির জন্য অর্ডার করা ইত্যাদি। এসবই ইস্তিসনা চুক্তি।

অপরদিকে কাঠ নিজে সরবরাহ করে তা দিয়ে আলমিরা তৈরি করার অর্ডার করা, রং ক্রয় করে তা দিয়ে রং করার জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া—এসব ইজারা চুক্তি।

---

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২০৬

২. ৬. ইস্তিসনা চুক্তি কীভাবে বাস্তবায়ন হবে?

সালাম চুক্তির মতো ইস্তিসনা চুক্তিতেও পণ্যের গুণাবলি বর্ণনার মাধ্যমে চুক্তি করতে হবে। কী ধরনের পণ্য তৈরি করবে, ডিজাইন কেমন হবে, সাইজ কেমন হবে, পরিমাণ কত হবে, কোয়ালিটি কেমন হবে, এই ৫টি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে মূল চুক্তিতেই।

সালামের ন্যায় এখানেও নির্দিষ্ট কোনো পণ্যে চুক্তি করা যাবে না। তবে এভাবে বলা যাবে, অমুক জিনিসের মতো হুবহু তৈরি করে দিন।

২. ৭. ইস্তিসনা চুক্তি কি অনিবার্য চুক্তি?

ইস্তিসনা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর তা বৈধ হওয়ার পাশাপাশি উভয় পক্ষের জন্য অনিবার্য হবে কি না, বিষয়টি হানাফী ফিকহে মতভেদপূর্ণ। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, অনিবার্য হবে না।

এর অর্থ হলো, অর্ডার অনুযায়ী পণ্য তৈরির পর ক্রেতা তা নেওয়া না নেওয়া দুটিরই অধিকার আছে। ক্রেতা তা দেখার পরও না নিতে চাইলে এর সুযোগ আছে। তেমনিভাবে তৈরিকারী বিক্রেতারও অধিকার আছে, তা অর্ডারদাতা ক্রেতাকে দেখানোর আগে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়ার। তবে অর্ডারদাতা ক্রেতা দেখে নিলে তখন আর এ সুযোগ বাকি থাকবে না।

অপরদিকে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতামত হলো, যখন চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। ইজাব-কাবুল হয়ে গেল তখন তা অনিবার্য হয়ে গেছে। এখন না ক্রেতা এককভাবে এর থেকে ফিরে আসতে পারবে। না বিক্রেতা একতরফাভাবে এর থেকে বিরত থাকতে পারবে। ক্রেতা নমুনা দেখার দ্বারা অথবা গুণাগুণ বর্ণনা করার দ্বারাই তার 'না দেখা থেকে সৃষ্ট স্বাধীনতা' (খেয়ারে রুইয়াত) রহিত হয়ে গেছে। আর তৈরিকারীর খেয়ার বা চুক্তি রহিত করার সুযোগ বাতিল হয়েছে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন আল্লামা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনভী রহ.।[১]

---

১ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২০৬

অবশ্য বিক্রেতা যদি পূর্ব আলোচিত গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্য পেশ করতে না পারে, তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতার তা না নেওয়ার সুযোগ আছে।

২. ৭. ১. অগ্রগণ্য মতামত

এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতামত অগ্রগণ্য। কারণ, অনিবার্য না হলে তৈরিকারী বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীতে উসমানী সালতানাতের অধীনে রচিত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-র ৩৯২ নং ধারায় ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[১]

প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনভী রহ. (মৃত্যু : ১৩২৭ হি.)ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২]

১৪১২ হি. মোতাবেক ১৯৯২ ইং. সনে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমী জেদ্দাহ' তাদের ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তের ধারা-০১-এ বলেছে—

> إن عقد الاستصناع-وهو وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.
>
> 'ইস্তিসনা চুক্তি মূলত এমন একটি বিশেষ চুক্তি, যা অর্ডারগ্রহীতার যিম্মায় কাজ ও অর্ডারকৃত বস্তুতে কাজসংক্রান্ত হয়ে থাকে। এটি চুক্তির সকল শর্ত ও রুকন পাওয়ার শর্তে উভয় পক্ষের জন্য একটি অনিবার্য চুক্তি বলে বিবেচিত হয়।'[৩]

AAOIFI 'ইস্তিসনা' বিষয়ে তাদের ১১ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা-২/২/১-এ লিখেছে— عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توفرت فيه شروطه 'চুক্তির যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেলে ইস্তিসনা চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য একটি অনিবার্য চুক্তি। শর্তসমূহ হলো, যে জিনিস তৈরি করা হবে এর জাতীয়তা, প্রকার, পরিমাণ, প্রার্থিত গুণাবলি নির্দিষ্ট করা, মূল্য জ্ঞাত থাকা, মেয়াদ থাকলে তাও জ্ঞাত থাকা।'[৪]

---

১ শরহুল মাজাল্লাহ, আল আতাসী, খ. ২, পৃ. ৪০৬

২ ইতরে হিদায়া, পৃ. ২০৬

৩ বিস্তারিত দেখুন, কারারাতু মাজমা, পৃ. ৩৪

৪ দেখুন, আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৭০

২. ৭. ২. ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী অনিবার্য কখন হবে?

এ বিষয়ে দু ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লামা ফাতাহ মুহাম্মাদ লাখনভী রহ., আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড AAOIFI-এর সিদ্ধান্ত ও এর আগে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমী জেদ্দাহ'-এর সিদ্ধান্ত থেকে অনুমিত হয়, ইজাব-কাবুলের মাধ্যমেই চুক্তি অনিবার্য হয়ে যাবে। যদিও তা কাজ শুরুর পূর্বে এবং মুস্তাসনেকে (অর্ডারকারী) দেখানোর আগে হয়ে থাকে। তবে শর্তানুযায়ী না পেলে সেক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য পণ্য গ্রহণ না করার সুযোগ আছে। 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-এর ৩৯২ নং ধারার ভাষ্য থেকেও তাই বুঝে আসে।

কিন্তু উক্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার আল্লামা তাহের আল আতাসী রহ. অনেকটা জোর করে এ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন যে, প্রথমেই চুক্তিটা অনিবার্য হবে না। পরবর্তীতে যখন কাজ শুরু করা হবে এবং ক্রেতার নিকট কাজ শেষে পেশ করা হবে তখন শর্তানুযায়ী পেলে অনিবার্য হবে। অর্থাৎ কাজ শুরুর আগে অনিবার্য হবে না।[১]

মূলত ইস্তিসনা চুক্তি অনিবার্য করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। সর্বশেষ বক্তব্য ছিল, চুক্তির সাথে সাথেই উভয় পক্ষের জন্য অনিবার্য হবে। মূলত 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-র রচয়িতাগণ এর ওপর ভিত্তি করেই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর শুরু থেকেই চুক্তিটিকে অনিবার্য সাব্যস্ত করেছেন। কাজ শুরু করার পর থেকে নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আল্লামা তাহের আল আতাসী রহ.-এর ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য নয়।[২] আন্তর্জাতিক লেনদেনে এ মতামতই অগ্রগণ্য।

সার কথা, চুক্তিসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই চুক্তিটি উভয়ের জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পরবর্তীতে শর্তানুযায়ী পণ্য না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে শর্ত ভঙ্গের কারণে ক্রেতার পণ্য গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার সৃষ্টি হবে।

---

১ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, শরহু আল আতাসী, খ. ২. পৃ. ৪০৬ (এ অংশের ব্যাখ্যাকার আল্লামা খালেদ আতাসী নন। বরং তাঁর ছেলে তাহের আতাসী।)

২ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৯১-৫৯২

এ অধিকার সৃষ্টির সাথে চুক্তি অনিবার্য না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রকাশ থাকে যে, ইস্তিসনা চুক্তির ভিত্তি যেহেতু 'তাআমুল' ও প্রচলনের ওপর। তাই যদি এই প্রচলন থাকে যে, কাজ শুরুর আগে, সানে (অর্ডারগ্রহীতা) অর্থ ব্যয়ের আগে-আগেই অর্ডারদাতা চুক্তি রহিত করতে চাইলে করতে পারে, তবে এর সুযোগ আছে। কিন্তু কাজ শুরু করার পর বা অর্থ ব্যয়ের পর এক তরফাভাবে তা করার কোনো সুযোগ নেই।

২. ৮. ইস্তিসনা লেনদেনে তৈরিকারী/অর্ডার গ্রহণকারীর আমল/কাজ কি শর্ত?

ইস্তিসনা চুক্তির মধ্য দিয়ে তৈরিকারী/অর্ডার গ্রহণকারীর যিম্মায় কী অনিবার্য হয়—তা নিয়ে দু ধরনের মতামত রয়েছে। যথা—

এক. আলোচিত পণ্য ও চুক্তির পর সেই পণ্য তৈরির কাজ। এর অর্থ হলো, অর্ডার গ্রহণকারী যদি চুক্তির পর কোনো কাজ না করে আগে থেকে তৈরি কোনো পণ্য পেশ করে তবে তা ইস্তিসনা চুক্তি হবে না। ইস্তিসনা সঠিক হওয়ার জন্য চুক্তির পর আমল বা কাজ লাগবে।

দুই. শুধু পণ্য। কাজ নয়। এর অর্থ, পূর্ব থেকে তৈরি পণ্য পেশ করলে ও চুক্তির সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ হলে কিংবা অর্ডারদাতা এর ওপর রাযী থাকলে ইস্তিসনা চুক্তি সঠিক হয়ে যাবে।

২. ৮. ১. অগ্রগণ্য বক্তব্য

এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বক্তব্য হলো প্রথমটি। কারণ, ইস্তিসনা বলাই হয়, কাজ তলব করাকে। সুতরাং চুক্তির পর নতুন করে কাজ না হলে তা ইস্তিসনার তাৎপর্য থেকে বের হয়ে যায়।

১৪১২হি. মোতাবেক ১৯৯২ ইং. সনে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমী জেদ্দা'-এর ৬৭/৩/৭ নং সিদ্ধান্তের ধারা-০১-এ তাই বলা হয়েছে। ধারাটির ভাষ্য হলো—

إن عقد الاستصناع-وهو وارد على العمل والعين في الذمة-
ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

'ইস্তিসনা চুক্তি মূলত এমন একটি বিশেষ চুক্তি, যা অর্ডারগ্রহীতার যিম্মায় কাজ ও অর্ডারকৃত বস্তুতে কাজসংক্রান্ত হয়ে থাকে, যা সকল শর্ত ও রুকন পাওয়ার শর্তে উভয় পক্ষের জন্য একটি অনিবার্য চুক্তি বলে বিবেচিত হয়।'[১]

প্রশ্ন হলো, অর্ডারগ্রহণকারী বিক্রেতা যদি পূর্ব থেকে তৈরি প্রডাক্ট পেশ করে এবং অর্ডারদাতা ক্রেতা এতে সম্মত থাকে তবে কি তা সঠিক হবে না?

হ্যাঁ, সঠিক হবে। তবে সেটা প্রথম চুক্তি তথা ইস্তিসনার কারণে নয়। বরং অন্য একটি চুক্তি তথা 'উভয়ে একমত হয়ে যাওয়া' (التعاطي بتراضيهما) এর কারণে বৈধ হচ্ছে।[২] তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে—

ক. বিক্রেতা পূর্ব থেকে তৈরিকৃত পণ্য পেশ করলে তা ক্রেতাকে অবহিত করতে হবে। নতুবা তা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ. চুক্তিতে যদি শর্ত থাকে যে, বিক্রেতা তৈরি করে দিতে হবে। আগের পণ্য দিলে হবে না। তবে সেক্ষেত্রে পূর্বের তৈরি করা জিনিস দেওয়া যাবে না।

গ. এ পদ্ধতিতে উভয় দিকে বিনিময় বাকি রাখা ও কাজ না করার কোনো হিলা বানানো যাবে না।[৩]

২. ৯. ইস্তিসনা চুক্তির শরঈ অবস্থান (Classification) নির্ণয়

ইস্তিসনা চুক্তির মূল কথা কী, এর শরঈ অবস্থান (Classification) কী-এ নিয়ে হানাফী ফকীহগণের মাঝে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। যথা—

ক. ইস্তিসনা শুরু থেকেই একটি ফ্রেশ বাঈ বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এখানে মূল পণ্য হলো, তৈরিকৃত প্রডাক্ট।

---

১ বিস্তারিত দেখুন, কারারাতু মাজমা, পৃ. ৩৪

২ শরহুল মাজাল্লাহ, খ. ২, পৃ. ৪০০

৩ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৭১, ধারা-৩/১/৫, স্ট্যান্ডার্ড : ১১

খ. ইস্তিসনা চুক্তি মূলত দুটি বৈধ চুক্তির সমন্বিত রূপ। সালাম ও ইজারা। সালাম হলো, আলোচিত পণ্য সরবরাহ করে দেওয়া। আর ইজারা হলো, সেই পণ্য তৈরির জন্য অর্ডারদাতা অর্ডারগ্রহণকারীকে পারিশ্রমিকে নিয়োগ দেওয়া।

গ. ইস্তিসনা চুক্তি প্রথমে একটি ইজারা। এরপর পণ্য তৈরির পর অর্পণের পূর্ব মুহূর্তে তা বাঈ বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে রূপান্তর হয়। শুরু থেকেই বেচাকেনা চুক্তি হলে এটি অনিবার্য হত যে, অর্ডার নেওয়ার পর পণ্য তৈরির আগেই অর্ডারগ্রহণকারীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে সেটা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। অথচ তা করা হয় না। বোঝা গেল, ইস্তিসনা চুক্তি শুরু থেকেই বেচাকেনা চুক্তি নয়।

শেষোক্ত মতামতই অগ্রগণ্য।[১]

২. ১০. ইস্তিসনা চুক্তির মৌল উপাদান

ইস্তিসনা চুক্তিতে মোট ৩টি মৌল উপাদান রয়েছে, যথা—

- ইস্তিসনার মূল চুক্তি।
- ইস্তিসনা চুক্তির পণ্য।
- ইস্তিসনা চুক্তির মূল্য।

২. ১০. ১. ইস্তিসনার মূল চুক্তি

• ইস্তিসনা চুক্তি অনিবার্য চুক্তি। (পূর্বোক্ত মতভেদের আলোকে) সুতরাং পণ্য তৈরির পর ক্রেতা কর্তৃক তা গ্রহণের সময় পুনরায় ইজাব-কবুল করতে হবে না।

• ইস্তিসনা চুক্তিতে নিমার্ণকারী বিক্রেতা পণ্যের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার শর্তারোপ করতে পারবে না।

• ইস্তিসনা চুক্তিকে কোনো ধরনের সুদ গ্রহণের অপকৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন—জামাল জুতা কারখানার মালিক। তার ৫ লক্ষ টাকা নগদ করয দরকার। সে একটা কোম্পানি বা সমিতির

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২; ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৮৭

নিকট কিংবা ইসলামী ব্যাংকের নিকট ৫ লক্ষ টাকা করয চাইলে তারা তাকে ইস্তিসনা চুক্তির অফার করল। সেটি এভাবে হবে, কোম্পানি জামালের কাছ থেকে এক লক্ষ পিস জুতা নগদ ৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করে নেবে। জুতাগুলো অর্পণ করা হবে এক সপ্তাহ পর। এরপর জুতা বুঝে পাওয়ার পর সেই জুতাগুলো পুনরায় জামালের নিকট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকায় এক বছরের কিস্তিতে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

তদ্রূপ প্রস্তুতকারক কোম্পানির মালিকানার একতৃতীয়াংশ বা এর অধিক যদি থাকে অর্ডারদাতার, তাহলে সেক্ষেত্রেও পরস্পরে ইস্তিসনা চুক্তি করতে পারবে না। কারণ এটিও সুদ গ্রহণের অপকৌশল। এগুলো নিষিদ্ধ বাইউল ঈনা বা Buy back চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। ইস্তিসনা চুক্তিকে এ ধরনের সুদ গ্রহণের হিলাস্বরূপ ব্যবহার করা যাবে না।[১]

- চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও অর্ডারকারী অর্ডারে নানা পরিবর্তন আনতে পারবে। এর সাথে পণ্য মূল্য, পণ্য ডেলিভারি ডেইট পরিবর্তন হতে পারে। তবে এসবই হতে হবে আলোচনা সাপেক্ষে।

- ইস্তিসনা চুক্তিকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে 'আরবুন' গ্রহণ করা যাবে। 'আরবুন' হলো—চুক্তি বা ইজাব-কবুলের পর অগ্রিম কিছু এ শর্তে গ্রহণ করা, ক্রেতা/অর্ডারকারী যথাসময়ে পণ্য গ্রহণ করলে ওই টাকা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। তবে পণ্য নিতে না আসলে, প্রদত্ত অর্থ অফেরতযোগ্য হয়ে যাবে। এ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড বলেছে, এক্ষেত্রে পুরো টাকা অফেরতযোগ্য না করে শুধু বাস্তব ক্ষতি পরিমাণ টাকা রেখে বাকিটা ফেরত দেওয়া উত্তম।[২]

২. ১০. ২. ইস্তিসনা চুক্তির পণ্য

- অর্ডারকৃত পণ্য এমন হতে হবে, যা তৈরি করতে হয়। পরিমাণ, গুণাবলি, ডিজাইন ইত্যাদি স্পষ্ট করে নিতে হবে। সালামের মতো সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যে এ চুক্তি হবে না।

---

১ স. ১১, ধ. ২/২/৪

২ স. ১১, ধ. ৩/৩/১

• এমন কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্যও ইস্তিসনা চুক্তি করা যাবে, যার কোনো পূর্ব ডিজাইন বাজারে নেই। শর্ত হলো পর্যাপ্ত বিবরণ, ডিজাইন ও গুণাগুণের মাধ্যমে কাজটি করা সম্ভব হতে হবে।

• পণ্য অর্পণ করার আগ পর্যন্ত তাতে অর্ডারকারীর অধিকার সৃষ্টি হবে না। তাই বিক্রেতা চাইলে যেটি তৈরি করেছে, সেটি অন্য কাউকেও দিতে পারে। শর্ত হলো, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই অর্ডারকারীর অর্ডারের বিবরণ অনুযায়ী আরেকটি পণ্য যথাযথভাবে সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে। পাশাপাশি আরেকটি শর্ত হলো, পূর্ব অর্ডারকারী সেটি দেখে চূড়ান্ত না করা।[১]

• এমন শর্তারোপ করা যাবে যে, পণ্যটি অর্ডারগ্রহণকারী নিজে তৈরি করতে হবে। অন্য কাউকে দিয়ে তৈরি করা যাবে না। এমন শর্ত মেনে নেওয়া হলে তা রক্ষা করা আবশ্যিক।

• আগে থেকে তৈরি করা আছে এমন পণ্যও অর্ডারকারীকে দেওয়া যাবে।[২] এটি তখনই যদি অর্ডারকারী নতুন করে তৈরির শর্তারোপ না করে থাকে। পাশাপাশি এ সুযোগকে পণ্য ও মূল্য বাকি রেখে লেনদেন করার জন্য হিলা হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে না। যেখানে তৈরি করে দেওয়া মুখ্য থাকে না।

• চুক্তি অনুযায়ী যে বিবরণ দেওয়া হবে, যে সময়ে ডেলিভারি করতে বলা হবে, সেগুলো বিক্রেতার জন্য অনুসরণ করা জরুরি।

• অর্ডারকৃত পণ্য হস্তগত করার পূর্ব-পর্যন্ত এর মালিকানা প্রস্তুতকারক বিক্রেতার। তাই এর যাকাত সেই দেবে। এর ঝুঁকিও তার। সেটি নষ্ট হলে বা ধ্বংস হলে তার হবে। মালিকানাসংক্রান্ত খরচ, সংরক্ষণ করার দায়িত্বও তার থাকবে।

• যদি এমন হয় যে, প্রস্তুতকারক যে পরিমাণ খরচের হিসাব করেছিল,

---

১ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৬০১

২ এটি এ্যাওফির বক্তব্য অনুযায়ী। তবে পূর্বে আলোচনা হয়েছে এক্ষেত্রে ইসলামী ফিকহ একাডেমী জিদ্দাহ এর বক্তব্যের আলোকে সেটি তখন ইস্তিসনা চুক্তি থাকবে না। বরং পণ্য হস্তান্তরের সময় সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে শুদ্ধ হবে।

বাস্তবে প্রোডাক্ট বা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সেই পরিমাণ খরচ হয়নি; বরং কম হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস করা প্রস্তুতকারকের ওপর আবশ্যক নয়। তদ্রূপ খরচ বেড়ে গেলেও মূল্য ফিক্সড হওয়ার পর তা বৃদ্ধি করা যাবে না।[১]

• ইস্তিসনা চুক্তিতে এ শর্তারোপ করা যাবে যে, বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য অর্পণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও ক্রেতা যদি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা গ্রহণে বিলম্ব করে তাহলে, অর্ডারকারী ক্রেতা বিক্রেতাকে ওই পণ্য বিক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ দিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এরপর তা বিক্রি করে বিক্রেতা তার মূল্য উসুল করে নেবে।

যদি অতিরিক্ত অর্থ থেকে যায়, তবে সেটা ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হবে। আর মূল্য হ্রাস হলে ওই পরিমাণ অর্থ ক্রেতা থেকে গ্রহণ করা হবে। আর বিক্রয়ের খরচও ক্রেতা বহন করবে।[২]

• পণ্য অর্পণের সময় যদি দেখা যায় সেটা চুক্তিতে উল্লেখকৃত গুণাবলি ও শর্তানুযায়ী হয়নি, তাহলে সেক্ষেত্রে মুস্তাসনের (ক্রেতার) অধিকার আছে, সেটা ফেরত দেওয়ার। অথবা কোনোরূপ চার্জ করা ছাড়া যেভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করার। অথবা তারা উভয়ে মূল্য হ্রাসের ব্যাপারেও সমঝোতা করে নিতে পারে।

• প্রোডাক্টের মতো কোনো কাঁচামালকেও ক্রেতা তার পণ্য তৈরির জন্য ফিক্সড করতে পারবে না। তবে প্রস্তুতকারক বিক্রেতা যদি প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, 'নির্দিষ্ট কাঁচামালগুলো নির্দিষ্ট ক্রেতার নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট ছাড়া অন্য কোনো প্রোডাক্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করা হবে না' এবং এই প্রতিশ্রুতিটা এই শর্তের অধীনে হয় যে, কিছু মূল্য অগ্রিম প্রদান করতে হবে। যেন কিছু কাঁচামাল বিক্রেতা ক্রয় করতে পারে। এভাবে হলে ওই কাঁচামাল নির্দিষ্ট ক্রেতার নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট তৈরির জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

• যথাসময়ে পণ্য তৈরির পরও ক্রেতা তা নিতে না আসলে, সেটি

---

১ ৭-৯ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৭২, ধা. ৩/২/৪-৩/২/৬ স্ট্যান্ডার্ড : ১১

২ ৭-১০ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৭৫, ধা. ৬/৩-৬/৯ স্ট্যান্ডার্ড : ১১

বিক্রেতার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে। সুতরাং বিক্রেতার সীমালঙ্ঘন বা ত্রুটি ছাড়া অন্য কারণে এ সম্পদ ধ্বংস হলে এর দায় বিক্রেতার ওপর বর্তাবে না। এ ছাড়া এ সময়ে সংরক্ষণের পেছনে কোনো খরচ হয়ে থাকলে, সেটিও ক্রেতা বহন করবে।

২. ১০. ৩. ইস্তিসনা মূল্য

• ইস্তিসনা মূল্য মুদ্রা হতে পারে, বস্তুর ভোগাধিকারও হতে পারে। এই ভোগ/উপকার অন্য কোনো বস্তুর হতে পারে, ইস্তিসনা চুক্তিতে তৈরি বস্তুরও হতে পারে। যেমন, Bulid Operate Transfer বিনিয়োগ পদ্ধতিতে এমনটি হয়ে থাকে। কোনো কন্সট্রাকশন কোম্পানির সাথে চুক্তি হলো, তারা একটি ব্রিজ নির্মাণ করবে। এরপর নিজেরাই সেটি পরিচালনা করবে। ভাড়া বা টুল গ্রহণ করবে। এরপর নির্ধারিত সময়ে তা অর্ডারদাতা পক্ষকে অর্পণ করে দিবে।

• ইস্তিসনা চুক্তিতে এরূপ চুক্তি করা যাবে যে, বিক্রেতা যদি নির্ধারিত সময়ে অর্ডারকৃত পণ্য অর্পণে বিলম্ব করে, তবে সেই অনুপাতে মূল্য হ্রাস করা হবে। শর্ত হলো, বিলম্ব হওয়ার পেছনে অপ্রতিরোধ্য কোনো কারণ না থাকা। যেমন—হরতাল, বন্যা, যুদ্ধ ইত্যাদি।

• সালামের মতো সমুদয় মূল্য চুক্তির সময়ই অর্পণ করা আবশ্যক নয়; বরং তা বাকি থাকতে পারে। নির্ধারিত কিস্তির ভিত্তিতেও আদায় করা যেতে পারে। তদ্রূপ কাজ অনুযায়ী মূল্য পরিশোধও হতে পারে। যেমন—পার ইউনিট কাজ সমাপ্ত হলে সে অনুপাতে টাকা দেওয়া হবে। তবে শর্ত হলো, মূল্য আদায়ের সময়গুলো এভাবে নির্ধারণ করা যেন ঝগড়া সৃষ্টি না হয়।[1]

২. ১১. প্যারালাল ইস্তিসনা

• এ বিষয়ে পূর্বে সালাম অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। প্যারালাল সালাম যেমন, প্যারালাল ইস্তিসনাও তেমন।

---

১ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৭২, ধা. ৩/২/২ স্ট্যান্ডার্ড : ১১

● প্রস্তুতকারক থেকে গ্রহণের আগে ক্রেতা সেটি অন্যত্র বিক্রয়ের চুক্তি করতে পারবে না। হ্যাঁ, পূর্বোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্যারালাল ইস্তিসনা করতে পারবে।

-পণ্য তৈরির পর অর্ডারকারী সেটি প্রস্তুতকারককেই তার পক্ষে বিক্রয় করে দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারবে। এটি বিনা পারিশ্রমিকে হতে পারে, নির্ধারিত কমিশনের ভিত্তিতে হতে পারে অথবা ইস্তিসনা মূল্যের ওপর পার্সেন্টিজ আকারেও হতে পারে। তবে শর্ত হলো—ক. প্রথমে অর্ডারকারী বা তার উকিল কর্তৃক ওই পণ্য কবয (হস্তগত) করতে হবে। খ. বিক্রেতাকেই উকিল নিয়োগের বিষয়টি মূল ইস্তিসনা চুক্তিতে শর্তযুক্ত হতে পারবে না।[১]

২. ১২. প্রায়োগিক উদাহরণ

ইস্তিসনার কিছু প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো। এসব ক্ষেত্রে ইস্তিসনা পদ্ধতি প্রয়োগ হয়ে থাকে। যথা :

১. সফটওয়্যার তৈরির অর্ডার।

২. ওয়েবসাইড তৈরির অর্ডার।

৩. বিবাহের কার্ড তৈরির অর্ডার।

৪. ভিজিটিং কার্ড তৈরির অর্ডার।

৫. কোনো অনুষ্ঠানের জন্য পার্সেল খাবার সাপ্লাই দেওয়ার অর্ডার।

৬. লেপ-তোষক বানানোর অর্ডার।

৭. ইট তৈরি করে দেওয়ার অর্ডার ইত্যাদি।

২. ১৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এ ইস্তিসনা চুক্তি

ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর ব্যবহার সাধারণত ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে বিনিয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়। তবে এর পরিমাণ খুবই কম। গত অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ইসলামী

---

১ স. ১১, ধ. ৬/৯

ব্যাংকিং সেক্টরে এর ব্যবহার হার মাত্র ০.০২%। অর্থাৎ, অর্ধ শতাংশও নয়। এতটুকু ব্যবহারও পুরোপুরি শরীয়তসম্মত উপায়ে হয় কম। এর ব্যবহার পদ্ধতি প্রায় সালামের মতোই। তদ্রূপ ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগেও সালামের মতো ইস্তিসনা পদ্ধতি সমান ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সালাম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

মুরাবাহা : পরিচিতি ও বিধান

Introduction to Murabahah Contarct and It's methods of application

ভূমিকা

বর্তমান ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বহুল আলোচিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের মাঝে মুরাবাহা অন্যতম। বস্তুত এটি একটি সুপ্রাচীন লেনদেন পদ্ধতি। প্রাচীন ফিকহের গ্রন্থসমূহে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। সুদূর অতীতে এর বাস্তব প্রয়োগ থাকলেও আমাদের নিকট অতীত সময় থেকে নিয়ে এর এর ব্যবহার খুব একটা নেই। মানুষ লাভে বেচাকেনা করে, তবে লাভে বেচাকেনা মানেই মুরাবাহা নয়। মুরাবাহা লাভে বেচাকেনার এক বিশেষ পদ্ধতির নাম। এর সাথে আমাদের সমাজের ব্যবসায়ীরা খুব একটা পরিচিত নয়।

ষাটের দশকে সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং এর যাত্রা শুরু হয়। সুদী ব্যাংকিং নিশ্চিত সুদ আরোপ করে অর্থায়ন করে। কিন্তু ইসলামে তা স্বীকৃত নয়। নিশ্চিত মুনাফা হবে এমন বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামে নেই। ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী, যিনি মুনাফা নিবেন, তাকে লোকসানের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। এটিই প্রকৃত টেকসই ও ভারসাম্য অর্থনীতির কথা। তাই ইসলামী ব্যাংকিং করতে হলে তাকে সে পথেই হাঁটার কথা ছিল। যা ইসলামে মুদারাবা

ও মুশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি নামে পরিচিত। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্যোক্তাগণ প্রথম দিকে সুদী ব্যাংকিং এর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এমন কিছু পদ্ধতি প্রত্যাশা করলেন, যাতে ঝুঁকি থাকবে না, আবার শরীয়াহসম্মতও হবে।

তৎকালীন শরীয়াহ স্কলারগণ তাদের উক্ত প্রস্তাবে সাময়িকভাবে কিছু বৈধ হিলাধর্মী বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুমোদন করেন। সেসব পদ্ধতির মাঝে মুরাবাহা অন্যতম। অনুমোদনটি সাময়িক এ জন্য ছিল যে, মুরাবাহা ও এ ধরনের পদ্ধতিগুলো মূলত আদর্শিক কোনো অর্থায়ন ও বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। সেই সনাতন মুরাবাহাকে বিশেষভাবে অর্গানাইজ করে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে যদিও লেনদেন সরাসরি সুদ থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আদর্শিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। তাই একে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে প্রতিনিয়ত শরীয়াহ স্কলারগণ নিরুৎসাহিত করে আসছেন। কিন্তু বাস্তবে তা কমই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এ এখনো মুরাবাহাই প্রধান বিনিয়োগ পদ্ধতি। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গত অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে এর ব্যবহার হার ছিল ৪৯.৩৯%, যা সর্বোচ্চ ব্যবহৃত বিনিয়োগ পদ্ধতি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সুদী ব্যবস্থা থেকে অবশ্যই আমাদের বের হতে হবে। সুদী ব্যাংকিং-এর একটি ইসলামী রূপরেখা উলামায়ে কেরাম প্রথমদিকে অনুমোদন করেছেন। যা এখনও বহাল আছে। তবে এর চেয়ে আরও ভালো, টেকসই, আদর্শিক মডেল ও পদ্ধতি (প্রয়োগনীতিসহ) নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা উচিত। এখানে মুরাবাহা[১] নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো।

---

১ আরবী ভাষায় আধুনিক মুরাবাহা বিষয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। নিম্নে কিছু গবেষণা উল্লেখ করা হলো, এ লেখা তৈরির সময় এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ—
১.শায়খ মুহাম্মাদ আলী আত তাসখীরী কৃত- «نظرة إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء» প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে, ও.আই.সি.-এর অঙ্গ সংগঠন 'মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী' (Islamic Fiqh Academy)এর জার্নালে। সংখ্যা : ৮, ১৪০৯ হি.।
২. শাইখ আহমাদ ইবনে সালেম মুলহিম কৃত «بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية»। প্রকাশক : মাকতাবাতুর রিসালা, ওমান, ১৯৮৯ ইং.।

৩. ড. আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ রহ. কৃত «أسلوب المرابحة و الجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية» প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে, ও.আই.সি.-এর অঙ্গ সংগঠন 'মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী' (Islamic Fiqh Academy)-এর জার্নালে। সংখ্যা : ৮, ১৪০৯ হি.।

৪. শায়খ রবী ইবনে মাহমুদ আর রুবী কৃত «بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف الإسلامية»। উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কার অঙ্গ সংগঠন 'মা'হাদুল বুহুস আল ইলমিয়্যা' তা ১৪১১ হিজরিতে প্রকাশ করেছে।

৫. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল আশকার কৃত «بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية»। জর্দানের দারুন নাফায়েস ১৪১৫ হিজরিতে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

৬. শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে হামেদুল হামেদ কৃত «تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء»। রিয়াদের দারু বেলেনহিয়া ১৪২৪ হিজরিতে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

৭. শায়খ আব্দুল আযীম আবু যায়েদ কৃত «بيع المرابحة وتطبيقاتهاالمعاصرة في المصارف الإسلامية»। দামেস্কের দারুল ফিক্‌র ১৪২৫ হিজরিতে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

৮. শায়খ জাফর ইবনে আব্দুর রহমান কাস্‌সাস কৃত «بيع المرابحة للآمر بالشراء-دراسة فقهية»। অনলাইন ভার্সন, শাওয়াল, ১৪৩২ হি.।

৯. ড. বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ (মাজমাউ ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দার প্রধান) কৃত المرابحة للآمر بالشراء (অনলাইন ভার্সন)।

১০. ড. সামী হাসান মাহমুদ কৃত «بيع المرابحة للآمر بالشراء» প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে, ও.আই.সি.-এর অঙ্গ সংগঠন 'মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী' (Islamic Fiqh Academy)-এর জার্নালে। সংখ্যা : ৮, ১৪০৯ হি.।

১১. শায়খ আব্দুল হামিদ ইবনে মাহমুদ আল বা'লী কৃত فقه المرابحة في التطبيق الإقتصادي المعاصر গ্রন্থটি। প্রকাশ করেছে কায়রোর মাকতাবাতুস সালাম।

১২. শায়খ আহমাদ আলী আব্দুল্লাহ কৃত المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية গ্রন্থটি। প্রকাশ করেছে সুদানের দারু সুদানিয়া আল খুরতুম, ১৪০৮ হি.।

১৩. শায়খ বদর ইবনে আব্দুল্লাহ আলমুতাওবী কৃত المرابحة في البنوك الإسلامية ومناقشته و ضعها على ضوء الأدلة গ্রন্থটি। কুয়েত থেকে প্রকাশিত।

১৪. শায়খ হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আলআমীন কৃত الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة।

১৫. ড. রফীক ইউনুস আল মিসরী হাফিযাহুল্লাহ কৃত «بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية» প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে, ও.আই.সি.-এর অঙ্গ সংগঠন 'মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী' (Islamic Fiqh Academy)-এর

শাব্দিক বিশ্লেষণ

'মুরাবাহা' শব্দটি আরবী (المرابحة)। এর মূল হলো, الربح তথা ব্যবসার মুনাফা। এখান থেকে 'মুরাবাহা'র অর্থ : পরস্পরে লাভবান হওয়া। আরবীতে বলা হয়, بعت الشيئ مرابحة অর্থ, আমি তার কাছে অমুক বস্তুটি এভাবে বিক্রয় করেছি যে, আমাদের উভয়ের লাভ হয়েছে। বিক্রেতা লাভবান হওয়ার অর্থ, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। ক্রেতা লাভবান হওয়ার অর্থ, পণ্যের পূর্বমূল্য বা খরচ জেনে ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতারিত না হওয়া। ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করা।[১]

৩. ১. পারিভাষিক পরিচিতি

'মুরাবাহা' ইসলামী ফিকহে লাভে বিক্রয়ের একটি বিশেষ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির নাম। ব্যবসার সাধারণ রীতি হলো, যে দামে পণ্য ক্রয় করা হবে এর চেয়ে কিছুটা লাভে বিক্রয় করা। লাভে বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে পণ্য ক্রয় বাবদ মূল্য বা খরচ ও মুনাফার পরিমাণ আলাদা করে স্পষ্ট করে বলে বিক্রয় করে, আর ক্রেতা তাতে সম্মত হয় তবেই সেটা মুরাবাহা চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।

ধরা যাক, ২০০ টকা দিয়ে 'ক' এক জুড়া জুতা ক্রয় করল। এরপর সে তা মুরাবাহা ভিত্তিতে 'খ' এর নিকট ১০ টাকা Murk Up (পণ্য

জার্নালে। সংখ্যা : ৮, ১৪০৯ হি.।

১৬. ড. হুসামুদ্দীন মুসা আফফানাহ কৃত بيع المرابحة للآمر بالشراء, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ ইং.। এ ছাড়াও মুরাবাহা বিষয়ে আরবী ভাষায় আরো অনেক গবেষণা আছে ও হচ্ছে। উর্দু ভাষায়ও মুরাবাহা বিষয়ে বিভিন্ন বইপত্র লেখা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ড. মাওলানা ইজায আহমাদ সামদানী কৃত 'ইসলামী ব্যাংকুঁ মেঁ রায়েজ মুরাবাহা কা তরিকে কার।' প্রকাশক : ইদারাতে ইসলামিয়্যা, করাচি, লাহোর। প্রকাশকাল : ২০০৬ ইং.।

এ ছাড়া ইসলামী ফিকাহ একাডেমী ইন্ডিয়ার জার্নাল 'জাদীদ ফিকহী মাবাহিস'-এর মধ্যেও এ বিষয়ে গবেষণামূলক ১৪ টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জার্নাল ভলিয়ম : ৩, প্রকাশকাল, ২০০৯ ইং., প্রকাশক : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচি।

১ তাজুল আরুস, ৬/২১৯

বাবদ মূল খরচের ওপর অতিরিক্ত মুনাফা)[১] এর ভিত্তিতে বিক্রয় করতে আগ্রহী। তাহলে সে উক্ত পণ্য বাবদ তার খরচ ২০০ টাকা উল্লেখ করত এর ওপর ১০ টাকা মুনাফা নেওয়ার কথা চুক্তিতেই ঘোষণা করতে হবে। এতে 'খ' রাজি হলে তা মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লামা আলাউদ্দিন কাসানি (মৃত্যু : ১১৯১ ইং.) রহ. সংক্ষেপে এর পরিচিতি দিয়েছেন এভাবে—

بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح.

অর্থাৎ, প্রথম মূল্যের সমজাতীয় মূল্য ও অতিরিক্ত কিছু মুনাফার বিনিময়ে বিক্রি করার নাম মুরাবাহা।[২]

আল্লামা আলী উদ্দীন আল মারগীনানী (১১৩৫-১১৯৭ ইং.) বলেছেন,

المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

'মুরাবাহা লেনদেন হলো, মূল্য ও সংশ্লিষ্ট খরচসহ প্রথমবার পণ্যে যে পন্থায় মালিকানা অর্জন হয়েছিল, সেটা দ্বিতীয়বার কিছু মুনাফাসহ বিক্রি করা।'[৩]

মূল চুক্তিতে ক্রয়মূল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী রহ. (১০৫৮-১১২৬ ইং.) মুরাবাহার সংজ্ঞা পেশ করেছেন নিম্নোক্তভাবে—

هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحًا للدينار أو الدرهم.

---

১ 'মার্ক আপ' একটি বিশেষ পরিভাষা, এর দ্বারা বোঝানো হয়, মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য ক্রয় বাবদ মূল খরচের ওপর অর্জিত অতিরিক্ত মুনাফা।–(মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, ইসলামী ব্যাংকারী কী বুনিয়াদি, পৃ. ২৬৬)

২ বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১৩৮

৩ আল হিদায়া, ফাতহুল কাদীরসসহ, ৬/১২২
আল্লামা জালালুদ্দীন খারিযমী রহ. হেদায়া লেখকের উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,
قوله : بالعقد الأول : أي بما ملكه، وقوله بالثمن الأول : أي بما قام عليه اه كذا في الكفاية ١٢٢/٦
'অর্থাৎ, 'প্রথম চুক্তি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে পন্থায় প্রথম চুক্তিতে পণ্যের মালিক হয়েছিল। আর 'প্রথম মূল্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পণ্য ক্রয় বাবদ যা খরচ হয়েছে তা।'

'মুরাবাহা হলো, মূল চুক্তিতে বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করেছে, সেটা ক্রেতাকে অবহিত করবে। অতঃপর এর ওপর অতিরিক্ত মুনাফা শর্ত করবে। চাই সেটা দিরহাম দিয়ে হোক বা দিনার দিয়ে হোক।'[১]

ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অডিট নীতিমালা ও শরীয়াহ গাইড্স লাইন প্রণেতা আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI (এ্যাওফি) 'মুরাবাহা'র পরিচিতি পেশ করেছে এভাবে—

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية.

'মুরাবাহা হলো, বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করেছে, সেই মূল্য ও অতিরিক্ত মুনাফা—যা উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হবে-এর বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করা। মুনাফা নির্ধারিত হবে মূল্যের শতকরা হারে অথবা সুনির্দিষ্ট অংকে। চাই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিটা পূর্ব ওয়াদানুসারে হোক অথবা পূর্ব ওয়াদা ছাড়া হোক।'[২]

৩. ২. মুরাবাহার বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে মুরাবাহার যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত হয়, সংক্ষেপে তা হলো :

- বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্য চুক্তিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।
- ক্রয়মূল্যের পাশাপাশি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সরাসরি খরচও (যদি থাকে) মূল চুক্তিতে উল্লেখ করা যাবে (বাধ্যতামূলক নয়)।[৩] যেমন—পণ্য পরিবহন খরচ, পণ্য রং করার খরচ ইত্যাদি পণ্যসংক্রান্ত সরাসরি ব্যয়। অথবা শুধু খরচ বলে এতে পণ্য ক্রয় বাবদ মূল

---

১ বিদায়েতুল মুজতাহিদ, ২/১০৭

২ ভলিয়ম, ০১, পৃ. ১২২

৩ মাজমাউল আনহুর, ২/৭৫

মূল্য ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খরচও উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। তবে খরচ না বলে শুধু ক্রয়মূল্য বলে এর মধ্যে খরচও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না (যদি খরচ থাকে)।

- মুরাবাহার মূল্য হবে মূলত প্রথম বিক্রির মূল্যের সমজাতীয় ও অতিরিক্ত কিছু। যেমন—টাকা দিয়ে ডলার ক্রয় করা হলে, দ্বিতীয় বিক্রয়েও মূল্য টাকা ও অতিরিক্ত কিছু হবে। অতিরিক্তটা টাকা ছাড়া অন্য কোনো বস্তুও হতে পারে। তবে মূল মূল্যটা টাকায় হতে হবে। কারণ, প্রথম ক্রয়মূল্য টাকা ছিল।

৩. ৩. মুরাবাহার বিধান

মুরাবাহা একটি বৈধ ক্রয়-বিক্রয়। এতে শরীয়াহ নিষিদ্ধ কোনো উপাদান নেই। একটি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার যাবতীয় গুণাবলি তাতে বিদ্যমান। তাই এটি কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তা হলো, وأحل الله البيع 'আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন।'[১]

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.(১৩৬১-১৪৫১-খ্রি.) লিখেছেন, 'একটি লেনদেন বৈধ হওয়ার যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকায় মুরাবাহা একটি বৈধ লেনদেন। এতে পণ্য যেমন সুনির্দিষ্ট, তেমন মূল্যও সুনির্দিষ্ট। কোনো ধরনের আপত্তি ছাড়াই যুগ যুগ ধরে মানুষ এ লেনদেন করে আসছে। কোনো আপত্তি ছাড়া যুগের পর যুগ মানুষের কোনো লেনদেন বা আচরণ বৈধ হওয়ার ওপর স্বতন্ত্র একটি দলিল। কারণ হাদীসে এসেছে, 'মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে যাকে ভালো মনে করে, সেটা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নিকটও ভালো।'[২]

বলার অপেক্ষা রাখে না, আল্লামা আইনী রহ.-এর উক্ত বক্তব্য মুরাবাহার বৈধতার ওপর ইজমার দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

সালাফে সালেহীন থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হাকাম রহ., শাবী

---

১ সূরা বাকারা : ২৭৫

২ আল বিনায়াহ, ১০/৩৫০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ৩৫৮৯। ইমাম হাইসামী এর সূত্রের ব্যাপারে বলেছেন, رجاله موثوقون অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।—(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১, পৃ. ১৭৭)

রহ., হাসান বসরী রহ. ও সাওরী রহ. প্রমুখ সালাফ থেকে মুরাবাহা লেনেদেনের বৈধতা প্রমাণিত।[১]

হাসান বসরী রহ. বলেছেন,

إذا بعت متاعا مرابحة فاحسب ما انفقت عليه، ولا تحسب ما انفقت على نفسك.

'যখন তুমি কোনো পণ্য মুরাবাহা হিসাবে বিক্রয় করবে, তখন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্য সংশ্লিষ্ট খরচ ধরতে পারবে। তবে তোমার ব্যক্তিগত খরচ ধরা যাবে না।'[২]

একটি হাদীস থেকেও মুরাবাহার বৈধতা বোঝা যায়—

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক কাপড় ব্যবসায়ী কোথাও একটি কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওই কাফেলায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি৭৭ ওয়াসাল্লামও ছিলেন। কাফেলার একজন কাপড় বিক্রেতাকে বলল, তুমি তোমার কাপড়টি কত দিয়ে বিক্রি করবে? বিক্রেতা বলল, এর মূল ক্রয় মূল্য এত। এর ওপর আমি অতিরিক্ত মুনাফায় এই দামে বিক্রি করব। এভাবে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু বিক্রেতা পণ্যের মূল মূল্যের বিবরণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। তাই সে মনে মনে বলল, আমি মিথ্যা বললাম, অথচ এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত আছেন! পরবর্তীতে একদিন লোকটি অনুতপ্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো পণ্যটি এত দামে বিক্রি করেছি। অথচ এর মূল মূল্য এত ছিল না। (অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অধিক মুনাফা নিয়েছি।) নবীজি সা. বললেন, 'অতিরিক্ত অংশটুকু সদকা করে দাও।'[৩]

---

১ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, খ. ৮, পৃ. ২৩৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ১১,পৃ. ৪১১,২৭৪,৭০৬

২ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ১১, পৃ. ৭০৬

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, খ. ১১, পৃ. ২৭৪, হাদীস নং : ২২২৭৬। শায়খ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ উক্ত হাদীসের পাদটীকায় এর সূত্রের ব্যাপারে লিখেছেন, الحديث مرسل، رجاله ثقات। অর্থাৎ, হাদীসটি মুরসাল। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

উল্লিখিত লেনদেনটি একটি মুরাবাহা লেনদেন ছিল। মৌলিকভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করেছেন। তবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কারণে অতিরিক্ত মুনাফা সদকা করে দিতে বলেছেন। মুরাবাহা লেনদেন বাতিল করেননি বা পুরো মূল্য সদকা করতে বলেননি।

মোটকথা, মুরাবাহা লেনদেন সালাফে সালেহীন থেকে যুগ-যুগ ধরে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়া চলে আসছে। তাই এর বৈধতার ব্যাপারে মৌলিকভাবে উল্লেখযোগ্য কারো কোনো দ্বিমত প্রমাণিত নয়।

৩. ৪. আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফিকহী ফোরামে মুরাবাহা বিষয়ে আলোচনা

'মুরাবাহা' বর্তমান ইসলামী বিশ্বে ফিকহুল মুআমালাতের একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফিক্হ ফোরামে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। মুরাবাহার বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত। ফোরামগুলোতে এর প্রয়োগ পদ্ধতি, শরীয়াহ বিধানাবলি, ভুলত্রুটি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সবশেষে সিদ্ধান্তও প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে মুরাবাহা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ফোরামের কেবল নাম উল্লেখ করা হলো। এসব ফোরামে মুরাবাহাকে মৌলিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৩. ৪. ১. প্রথম ইসলামী ব্যাংক সম্মেলন ফতোয়া, দুবাই, মে, ১৯৭৯ ঈসায়ী

জুমাদাস সানিয়া, ১৩৯৯ হিজরি মোতাবেক মে, ১৯৭৯ ঈসায়ীতে দুবাইয়ে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক সম্মেলন (مؤتمر المصرف الإسلامي الأول) অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫৯ জন বিশিষ্ট আলেম অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ব্যাংকিং মুরাবাহা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।[১]

---

১ ড. ইউসুফ কারযাভী হাফিযাহুল্লাহ কৃত بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية পৃ. ১০

৩. ৪. ২. দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক সম্মেলন ফাতাওয়া, কুয়েত, মার্চ ১৯৮৩ ঈসায়ী

এ সম্মেলন ৬-৮ জুমাদাস সানিয়া ১৪০৩ হিজরি মোতাবেক ২১-২৩ মার্চ ১৯৮৩ ঈসায়ী তারিখে কুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বের ১২টি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। বিশিষ্ট আলেমগণও যোগদান করেন। সম্মেলনে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর কিছু সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে মুরাবাহা বিষয়ক সিদ্ধান্ত ছিল অন্যতম।[১]

৩. ৪. ৩. দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্মেলন

সম্মেলনটি ১৯৮৩ ইং. সনে ইসলামাবাদ, পাকিস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।[২]

৩. ৪. ৪. Internatonal Islamic Fiqh Academy (Jaddah) এর সেমিনার

কুয়েতে ১৯৮৮ ইং. সনে ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের আন্তর্জাতিক ফিকহী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ‘ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা’ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তও প্রদান করা হয়।[৩]

৩. ৪. ৫. Islamic Fiqh Academy (India) এর সেমিনার

তাদের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফিকহী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ১৯৯০ ইং. সনের ৮-১১ জুন। উক্ত সেমিনারে আলোচিত ৫টি বিষয়ের একটি ছিল ‘ব্যাংকিং মুরাবাহা’। আধুনিক মুরাবাহার

---

১ সিদ্ধান্ত নং : ৮ম ও ৯ম এবং প্রাগুক্ত; ফিকহুন নাওয়াযেল, দারু ইবনুল জাওযী, প্রকাশকাল : ২য় এডিশন, ২০০৬ ইং., খ. ৩, পৃ. ২২৭

২ ড. বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ (প্রধান, ইসলামী ফিকাহ একাডেমী, জেদ্দা) কৃত المرابحة للآمر بالشراء (অন লাইন ভার্সন)। পৃ. ৩০

৩ ইসলামী ফিকাহ একাডেমী, জেদ্দার জার্নাল, মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা, ৫, খ. ২, পৃ. ১৫৯৯

বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্তও প্রদান করেছেন।[১]

৩. ৪. ৬. AAOIFI শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড

Accounting and Auditing organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)। (আরবী নাম,هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) সংস্থাটি ১৪২৩ হি. মোতাবেক ২০০২ ইং. সনে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' বিষয়ে দীর্ঘ শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করে।[২]

৩. ৫. মুরাবাহার তাৎপর্য

সমাজে কিছু মানুষ আছেন, যারা ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা ভালো বুঝেন না। সরল মনের মানুষ। সহজেই প্রতারিত হয়ে যান। অথবা মৌলিকভাবে ব্যবসা বুঝলেও যে পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী, নির্দিষ্টভাবে সে পণ্য বা পণ্যমূল্য সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা থাকে না। ফলে বুঝতে পারেন না, বিক্রেতা যে মূল্য চেয়েছে সেটা যুক্তিসঙ্গত কি না। এতে সহজেই প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সমাজের এই শ্রেণীর মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামে 'মুরাবাহা' চুক্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যে চুক্তিতে বিক্রেতা পণ্যের ক্রয়মূল্য বা খরচ ও এর ওপর মুনাফার হার দুটিই স্পষ্ট করে বলবে। এতে ক্রেতা বুঝতে পারবে, বিক্রেতা কত লাভ করতে আগ্রহী। এতে ক্রেতার জন্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। বিক্রেতার জন্যও খুব বেশি মূল্য ধার্য করা সম্ভব হয় না।[৩]

---

১ ইসলামী ফিকাহ একাডেমী ইন্ডিয়ার জার্নাল, জাদীদ ফিকহী মাবাহেস, ভলি. ৩, পৃ. ৪০৮, প্রকাশকাল : ২০০৯ ইং, প্রকাশক : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যা, করাচি।

২ আল মাআয়িরুশ শারইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১০৫। স্যান্ডার্ড নং : ০৮

৩ আল বাহরুর রায়েক, ৬/১৭৭

৩. ৬. প্রাচীন মুরাবাহার সাথে অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির পার্থক্য

প্রাচীন মুরাবাহাটি মূলত অন্যান্য বিক্রয়চুক্তির মতোই একটি সাদামাটা বিক্রয়চুক্তি (Simple sales contract)। তবে অন্যান্য সাধারণ বিক্রয়চুক্তির চেয়ে এর একমাত্র মৌলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, মুরাবাহায় বিক্রেতা (Seller) স্পষ্টভাবে ক্রেতাকে (Buyer) বলবে, 'পণ্যটির ক্রয়মূল্য এত বা পণ্যবাবদ আমার খরচ হয়েছে এত। এরপর এত মুনাফা ধার্য করে তা বিক্রি করতে আগ্রহী।'

সুতরাং চুক্তিতে Cost of Product + Profit Ratio-এর কোনো আলোচনা না হলে সেটা মুরাবাহা হবে না। যদিও বাস্তবে মূল খরচের ওপর মুনাফা ধার্য করা হয়।

মুরাবাহার উক্ত বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে বলা হয় Cost Plus Profit Policy in The sales contract, এ পলিসি না থাকলে সেটা মুরাবাহা না হলেও শুধু এ কারণে মূল লেনদেন অবৈধ হবে না; বরং সেটা তখন সাধারণ বেচাকেনা তথা 'মুসাওয়ামা' (Bargaining sale) হিসেবে বিবেচিত হবে।

নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে ইসলামী ফিকহের প্রাচীন মুরাবাহা ও অন্যান্য সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যের আরো বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

ক্র. নং	ইসলামী ফিকহে বর্ণিত মুরাবাহা	ইসলামী ফিকহে বর্ণিত অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি
১	মূল চুক্তিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য বা Cost of Product ঘোষণা করতে হবে।	মূল চুক্তিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য বা Cost of Product ঘোষণা করা জরুরি নয়।

২	পণ্যের দাম সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে মুরাবাহা সঠিক হবে না। যেমন, 'ক' একটি চুক্তিতে একসাথে ২০০০/- টাকা দিয়ে একটি রেডিমেট স্যুট ও এক জোড়া জুতা ক্রয় করেছে। এখন সে শুধু জুতা জোড়া মুরাবাহা করতে চাইলে তাতে মুরাবাহা হবে না। কারণ, ভিন্নভাবে শুধু জুতার খরচ স্পষ্টভাবে Identify করা সম্ভব নয়।	পণ্যের দাম সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও সেক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় 'মুসাওয়ামা' (Bargaining) হিসেবে সঠিক হবে। সুতরাং উক্ত উদাহরণে Reasonable যেকোনো Price-এ জুতা জোড়া বিক্রি করা যাবে।
৩	বেচাকেনায় যারা পারদর্শী নয় তাদের জন্য মুরাবাহা লেনদেন উদ্ভব হয়েছে। যেন তারা Cost of Product জেনে নিশ্চিন্তে পণ্য ক্রয় করতে পারে। প্রতারিত যেন না হয়।	সকলের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে।
৪	মুরাবাহায় পূর্বোক্ত পন্থায় মুনাফা লাভ করা উদ্দেশ্য।	সাধারণ বেচাকেনায় মুনাফা কামানো জরুরি নয়।
৫	ব্যাংক ভিন্ন আমাদের সাধারণ জীবনে মুরাবাহার প্রচলন খুবই সীমিত।	আমাদের সাধারণ জীবনে 'মুসাওয়ামা' (Bargaining) পদ্ধতির ব্যবহারই অধিক। যেখানে মুনাফা কামানো হয়, তবে চুক্তিতে Cost of Product ও Profit আলাদা করে বলা হয় না।

সূত্র : নিজস্ব চিত্রায়িত

৩. ৭. মুরাবাহাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধান

মুরাবাহার সাথে যেহেতু অন্যান্য বিক্রয়চুক্তির কিছু পার্থক্য আছে, তাই সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সঠিক হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো থাকার পাশাপাশি মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য আরো অতিরিক্ত কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে তা উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো—

১. পণ্যের পূর্ব ক্রয়মূল্য ও পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত খরচ যা ব্যবসায়ী মহলে পণ্যের খরচ হিসেবে গণ্য হয় (যদি থাকে) তা চুক্তির সময়ই বিক্রেতা কর্তৃক দ্বিতীয় ক্রেতা জানতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, Cost of produc বা 'পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত খরচ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে খরচ পণ্যের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করে কিংবা মূল্যের মাঝে বৃদ্ধি ঘটায়। যেমন—পণ্য পরিবহণ ব্যয়, পণ্য রং করার খরচ ইত্যাদি।[১]

২. চুক্তির সময়ই মুনাফা জ্ঞাত হওয়া। মুনাফা হতে পারে সুনির্দিষ্ট টাকা। অথবা কোনো নির্দিষ্ট সামগ্রী। অথবা পণ্যের পূর্বমূল্য ও খরচের (যদি থাকে) শতকরা হার। যেমন—বলা হলো, প্রতি শতে ৫ টাকা মুনাফা ধার্য করে বিক্রয়ে সম্মত আছি। এর অর্থ হলো, পণ্যবাবদ মূল্য বা খরচ হলো, একশ টাকা। এর ওপর ৫ টাকা মুনাফা ধার্য করা হয়েছে। মুনাফা নির্ধারণের উপর্যুক্ত সবকটি পদ্ধতি বৈধ।[২]

৩. পণ্যের পূর্বমূল্য এমন না হওয়া, যার দ্বারা তারই সমজাতীয় ও সমপরিমাণের এমন কিছু ক্রয় করা হয়েছে, যা সুদী পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক কেজি গম দিয়ে এক কেজি গম ক্রয় করা হয়েছে। তাহলে এখন ক্রয়কৃত এক কেজি গমকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না। কারণ, মুরাবাহা বলাই হয়, পণ্যের পূর্বমূল্যের সমজাতীয় মূল্য ও অতিরিক্ত কিছুর বিনিময়ে দ্বিতীয়বার বিক্রি করা। সুতরাং এখানে পূর্বমূল্য গমের সাথে অতিরিক্ত কিছু মূল্যবাবদ বৃদ্ধি করা হলে সেটা 'রিবাল ফযল' হিসেবে গণ্য হবে।

---

১ আল বাহরুর রায়েক, খ. ৩ পৃ. ১৮২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খ. ৩ পৃ. ১৮৫

২ বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১৩৯

তবে পূর্বমূল্য যদি ভিন্ন জাতীয় হয় তাহলে বৈধ হবে। যেমন, ৫০০ টাকা দিয়ে ৬ ডলার ক্রয় করা হলো। তাহলে উক্ত ৬ ডলার ৫২০ টাকায় মুরাবাহা করা যাবে। কারণ, টাকা ও ডলার সমজাতীয় নয়।[1]

৪. পণ্যের পূর্বমূল্য যদি বস্তুগত বিষয় হয়, তাহলে হানাফী ফকীহদের মতে তা সমজাতীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যেমন, এক কিলো গম দিয়ে যব ক্রয় করা হলো, দেড় কিলো গম দিয়ে কাপড় ক্রয় করা হলো।

এমন হলে উক্ত ক্রয়কৃত যব বা কাপড় এভাবে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা যাবে যে, চুক্তিতে বিক্রেতা বলবে, আমি কাপড়টি এর পূর্বমূল্য দেড় কিলো গম ও দশ টাকার বিনিময়ে বিক্রির প্রস্তাব করছি।

আর যদি বস্তুটি সমজাতীয় বস্তু না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মুরাবাহা বৈধ হবে না। যেমন—কুরবানীর মৌসুমে দুটি ছাগলের বিনিময়ে একটি গরু ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে সেই গরু মুরাবাহা হিসেবে দ্বিতীয়বার বিক্রি করা যাবে না। কারণ, পূর্ব-ক্রয়মূল্য ছাগল সমজাতীয় বস্তু নয়। এর ফলে দ্বিতীয় ক্রেতা সেই ছাগল বা ছাগলের মতো অন্য ছাগলও দিতে পারবে না। তদ্রূপ ছাগলের মূল্যও দিতে পারবে না। কারণ, এর মূল্য নির্ধারণে মতভেদ হবে। অবশ্য কোনো কারণে যদি সেই ছাগল দুটি দ্বিতীয় ক্রেতার হস্তগত হয়, তবে কেবল সেই ক্ষেত্রেই মুরবাহা বৈধ হবে। যেমন—কামাল জামালের কাছ থেকে দুটি ছাগলের বিনিময়ে একটি গরু ক্রয় করেছিল। জামাল সেই ছাগল দুটি ফরহাদের কাছে বিক্রি করেছে। তাহলে এখন কামাল তার গরু মুরবাহা হিসেবে ফরহাদের নিকট বিক্রি করতে পারবে। কারণ, সেই ছাগল দুটি ফরহাদ মূল্য হিসেবে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে।

এ হলো, হানাফী মাযহাবের বিবরণ। মালেকী মাযহাবের মতামত হলো, পূর্বমূল্যটি সমজাতীয় হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সেটা দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট না থাকলে সংশ্লিষ্ট বস্তুতে মুরাবাহা বৈধ হবে না।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত হলো, পূর্বমূল্য যেকোনো কিছু হতে পারে। সমজাতীয় না হলেও মুরাবাহা বৈধ হবে। সুতরাং পূর্বোক্ত

---

১ বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১৪০

গরুর উদাহরণে বিক্রেতা বলবে, আমি গরুটি দুটি ছাগলের বিনিময়ে ক্রয় করেছি। ছাগল দুটির মূল্য দশ হাজার টাকা। আমি এখন তা দুই হাজার টাকা লাভে বিক্রি করতে সম্মতি আছি।[1] বলার অপেক্ষা রাখে না, শেষোক্ত মতামত বর্তমান সময়ের সাথে অধিক উপযোগী।

৫. মুরাবাহার মূলধনের ক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা মূল চুক্তিতে উল্লিখিত যে মূল্য দ্বারা পণ্য ক্রয় করেছিল, সেই মূল্য উল্লেখ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে ওই মূল্যের পরিবর্তে যেটা আদায় করা হয়েছে সেটা নয়। যেমন, ১০০ ডলার প্রদানের শর্তে জনাব ফরহাদ সাহেব জনাব কামাল সাহেবের নিকট একটি মেশিন বিক্রি করেছেন। চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর উভয়ের সম্মতিক্রমে কামাল সাহেব ১০০ ডলার না দিয়ে ৭০০০ টাকা পরিশোধ করলেন। তাহলে পরবর্তী সময়ে কামাল সাহেব যদি সেই মেশিনটি মুরাবাহা হিসেবে রহীম সাহেবের নিকট বিক্রি করতে চান, তাহলে উক্ত মেশিনের পূর্বমূল্য হবে সেই ১০০ ডলার। ৭০০০ টাকা নয়। তাই তাকে মুরাবাহা বিক্রয়ের সময় ৭০০০ টাকার পরিবর্তে ১০০ ডলারের কথা বলতে হবে।

৬. বর্তমান সময়ে ব্যবসায়ীগণ বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করেন। স্বাভাবিকভাবে তা হয়ে থাকে ডলারের বিনিময়ে। এখন আমদানিকারক যদি ডলার দিয়ে ক্রয়কৃত পণ্য মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে চান, তাহলে এর পদ্ধতি কী?

এর পদ্ধতি হলো, প্রথম মূল্য ডলার ও অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে মুরাবাহা করতে হবে। যেমন, ২০০ ডলার মূল্য হলে, বলবে ২০০ ডলার পূর্বমূল্য ও ৫০০০ হাজার টাকা লাভে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব করছি। এতে দ্বিতীয় মূল্যটা হবে ডলার+ টাকা সমন্বয় মূল্য। তা না করে যদি, মুরাবাহার দ্বিতীয় মূল্য পুরোটা টাকায় নেওয়া হয় তবে সেটা মুরাবাহা হবে না।

অবশ্য যদি এমন করা হয় যে, প্রথমে ডলার দিয়ে মুরাবাহা মূল্য নির্ধারণ করা হলো, যেমন, ২১০ ডলার (২০০ ডলার পূর্বমূল্য ও ১০ ডলার মুনাফা) মূল্য ধরা হলো।

---

১ ফিকহুল বুয়ূ, মাকতাবায়ে মারেফুল কুরআন, করাচি, খ. ২, পৃ. ৬৩৩

এরপর মূল্য পরিশোধের সময় উভয়ে সম্মতি হলো যে, সেই ২১০ ডলারের পরিবর্তে এর সমমূল্য টাকায় পরিশোধ করবে।

তাহলে এমন ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তিনটি। যথা :

১. সমমূল্যে পরিশোধের বিষয়টি মূল চুক্তিতে শর্তযুক্ত হবে না।

২. পরিশোধের দিন ডলারের যে মূল্য হবে সেটা ধর্তব্য হবে।

৩. পুরো মূল্য উপস্থিত পরিশোধ করতে হবে।

সুতরাং উপর্যুক্ত উদাহরণে প্রতি ডলার ৯০/- টাকা হলে, ২১০ ডলার হবে= ১৮,৯০০/- টাকা। উক্ত টাকা বিক্রয় মজলিসেই পরিশোধ করতে হবে।

৭. যদি একই চুক্তিতে দুটি বস্তু ক্রয় করা হয়। এরপর এর কোনো একটা মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে, বস্তুগুলো সমজাতীয় কি না। যদি সমজাতীয় হয় তাহলে মুরাবাহা হিসেবে একটা বা কিছু অংশ বিক্রি করা যাবে। যেমন, গম বা ধান ক্রয় করা হয়েছে।

তাহলে এসব বস্তু সমজাতীয় হওয়ায় ধানের কিছু অংশ মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা যাবে। যতটুকু পণ্য বিক্রয় হবে ততটুকুর পূর্বমূল্য মুরাবাহার মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন, ২০০০/- টাকা দিয়ে ৬ কেজি গম ক্রয় করা হলে, তিন কেজি গম এক হাজার টাকা মূলধন ধরে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা যাবে।

কিন্তু ক্রয়কৃত বস্তু সমজাতীয় না হলে সেক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পন্থায় ক্রয়কৃত পণ্যের কিছু অংশে মুরাবাহা করা যাবে না। যেমন—দুটি গরু এক সঙ্গে ক্রয় করা হয়েছে এবং পৃথকভাবে উভয়টির মূল্য উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একটি গরুকে মুরাবাহা ভিত্তিতে বিক্রয় করা যাবে না।

৮. মুরাবাহার মূলধন দু প্রকার। যথা :

এক. পূর্ব-বিক্রয়মূল্য।

দুই. পণ্যসংক্রান্ত সরাসরি খরচ। যেমন—পরিবহন খরচ, সংরক্ষণ বাবদ খরচ, পণ্যসংক্রান্ত ট্যাক্স ইত্যাদি সরাসরি পণ্যসংক্রান্ত খরচও মূলধন

এর সাথে সম্পৃক্ত হবে। এক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা বলবে, 'পণ্য বাবদ আমার খরচ এত, আর এর ওপর মুনাফা ধার্য করা হলো এত।' একথা বলবে না যে, 'আমি এত দিয়ে ক্রয় করেছি।' কারণ, তা মিথ্যা হবে।

কিন্তু যেসব খরচ সরাসরি পণ্যসংক্রান্ত নয়, যেমন, স্টাফদের বেতন, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি এগুলো মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কোনটি মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত হবে, কোনটি হবে না এটি নির্ধারিত হবে ব্যবসায়িক রীতিনীতির ভিত্তিতে। তবে এসব খরচ মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করা না গেলেও এ কারণে মুনাফা বৃদ্ধি করা যাবে।

৯. বিক্রেতা যদি দান, হেবা, মিরাস সূত্রে কোনো বস্তুর মালিক হয়ে থাকে, তবে সেটাও মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা যাবে। এক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা করবে এভাবে যে, 'বস্তুটির মূল্য ধরা হয়েছে এত। আর এর ওপর মুনাফা করতে আগ্রহী এত।'

১০. মুরাবাহা বিক্রয়ে বিক্রেতার ওপর জরুরি, ক্রেতার আগ্রহ ও চিন্তায় প্রভাব ফেলতে পারে, পণ্যসংশ্লিষ্ট এমন সব কিছু স্পষ্ট করে চুক্তিতে উল্লেখ করা। যেমন—প্রথম বিক্রয় বাকিতে হয়ে থাকলে; সেটাও মুরাবাহা বিক্রয়ে ক্রেতাকে জানাতে হবে।[১]

মুরাবাহা বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথম বিক্রয়ে যদি বিক্রেতা মূল্য হ্রাস করে, তবে সেটা মুরাবাহা বিক্রয়েও হ্রাস হবে। যেমন, যায়েদ সাহেব উমর থেকে ৫০০ টাকায় একটি কাপড় ক্রয় করেছেন। এরপর সেটা রহীমের নিকট মুরাবাহা হিসেবে ৫২০ টাকায় বিক্রি করেছেন। এরপর উমর সাহেব ১০ টাকা মূল্য হিসেবে হ্রাস করেছেন। তাহলে এক্ষেত্রে যায়েদ সাহেব রহীম থেকেও ১০ টাকা হ্রাস করবেন।

তবে হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের মতানুসারে প্রথম বিক্রয়ের মূল্যহ্রাস মুরবাহা বিক্রয়ে প্রভাব বিস্তার করবে না। এটি ব্যক্তিগত হেবা বলে গণ্য হবে। (অবশ্য খেয়ারে মজলিস বা খেয়ারে শর্তের সময়সীমার মধ্যে তা হয়ে থাকলে সেটা মুরাবাহায়ও প্রভাব বিস্তার করবে)।

---

১ ফিকহুল বুয়ূ, খ. ২. পৃ. ৬৩৭

৩. ৮. মুরাবাহায় খেয়ানত

মুরাবাহা বিক্রয়টি সম্পূর্ণরূপে আমানত ও বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভরশীল। এজন্য একে بيع الأمانة (বাইউল আমানাহ) তথা 'আমানতভিত্তিক বিক্রয়' বলা হয়। পণ্যের পূর্বমূল্য ও পণ্য ক্রয়ের প্রক্রিয়া, যা ক্রেতার আগ্রহে প্রভাব ফেলতে পারে সবই অত্যন্ত আমানতদারিতার সাথে ক্রেতাকে জানাতে হয়।

তাই বিক্রেতা যদি মিথ্যা বিবরণ দেয়। যেমন, পণ্যের পূর্বমূল্য সঠিক বলেনি অথবা যা বলা দরকার ছিল তা বলেনি। গোপন রেখেছে, তাহলে তা গুনাহ হওয়ার পাশাপাশি ক্রেতা যদি তা পরবর্তী সময়ে জানতে পারে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতার নিম্নোক্ত অধিকার অর্জিত হবে :

খেয়ানত যদি মূল্যের ধরনের ব্যাপারে প্রমাণিত হয়, যেমন পূর্বক্রয়টি ছিল বাকিতে, কিন্তু সেটা মুরাবাহা বিক্রয়ে বলা হয়নি, তাহলে এমন ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকার থাকবে বিক্রয়চুক্তি বহাল রাখার অথবা বাতিল করে দেওয়ার।

আর যদি মূল্যের পরিমাণে খেয়ানত প্রমাণিত হয়, যেমন বলেছে ১০ টাকায় কিনেছে। অথচ প্রমাণিত হয়েছে ৮ টাকায় কিনেছে, তাহলে এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বক্তব্য হলো, বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে পারবে না, তবে ওই পরিমাণ টাকা মুনাফাসহ মুরাবাহা থেকে হ্রাস হবে। সুতরাং উক্ত উদাহরণে ২ টাকার আনুপাতিক হারে মুনাফা বিক্রেতা থেকে ফেরত নেওয়া হবে।[১]

৩. ৯. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা

বর্তমান ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যাংকিং মুরাবাহার চর্চা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগ সম্পন্ন হয় মুরাবাহার মাধ্যমে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং এর সাথে যারা সম্পৃক্ত

---

১ বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫০; ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৬৪৪

হবে বা মুরাবাহা ভিত্তিক বিনিয়োগ গ্রহণ করবে তাদের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার সাথে গভীরভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত জরুরি।

৩. ১০. ব্যাংকিং মুরাবাহার নাম

আরবী ভাষায় ব্যাংকিং মুরাবাহার অনেক নাম রয়েছে। নিম্নে এর প্রসিদ্ধ কিছু নাম উল্লেখ করা হলো—

১. المرابحة للآمر بالشراء (আল মুরাবাহা লিল আমির বিশ শিরা)

২. المرابحة المركبة (আল মুরাবাহা আল মুরাক্কাবা)

৩. بيع المواعدة (বাইউল মুআআদা)

৪. المرابحة المصرفية (আল মুরাবাহা আল মাসরাফিয়্যা)

উপরোল্লিখিত নামগুলোর মধ্যে প্রথম নামটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 'মুরাবাহা' বিষয়ে AAOIFI এর ৮ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডে এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্হ একাডেমি, জেদ্দাহ তাদের ৩০২ নং রেজুলেশনে উক্ত নামটিই চয়ন করা হয়েছে।

(AAOIFI Shari'ah standard, 2008, V.1,P.105; Journal of international Islamic Fiqh Academy , Jeddah, N.5, V.2, P.1599)

ড. হুসামুদ্দীন আফফানাহ লিখেছেন, এ নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন ড. সামী হাসান আহমাদ হাম্মূদ তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ «تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية» (ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ ও ইসলামী শরীয়াহর সাথে এর মিল-অমিল)-এর মধ্যে। অভিসন্দর্ভটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৬ ইং. সনে।[১]

'আল মুরাবাহা লিল আমির বিশ শিরা'-এর শাব্দিক অর্থ, 'পণ্য ক্রয়ের জন্য যিনি আদেশ করেছেন তার স্বার্থে মুরাবাহা লেনদেন করা।' এখানে আদেশকারী হলো, মুরাবাহা-গ্রাহক বা ক্লায়েন্ট। আর আদিষ্ট ব্যক্তি হলো, ইসলামী ব্যাংক। এর ইংরেজি নাম : Murabaha to the Perchase Orderer.

---

১ ড. হুসামুদ্দীন মুসা আফফানাহ কৃত بيع المرابحة للآمر بالشراء, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ ইং., পৃ. ১৯

দ্বিতীয় নামটির অর্থ, যৌগিক মুরাবাহা। কারণ, এতে একাধিক আকদ বা চুক্তির সম্মিলন ঘটে। যেমন, ওয়াদাহ, ওয়াকালাহ ও সর্বশেষ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এর বিপরীতে প্রাচীন মুরাবাহাকে বলা হলো, المرابحة البسيطة (আল মুরাবাহা আল বাসিতাহ)। এর অর্থ, সরল বা সাধাসিধে মুরাবাহা।

তৃতীয় নামের অর্থ, ওয়াদাভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়। কারণ, মুরাবাহাটি ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে ওয়াদার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। (ক্লায়েন্ট ওয়াদা দিয়ে থাকে, সে ব্যাংক থেকে পণ্যটি মুরাবাহা ভিত্তিতে ক্রয় করে নিবে) আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্হ একাডেমীর চেয়ারম্যান মুরাবাহর জন্য এ নামটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[১]

সর্বশেষ নামটির অর্থ, ব্যাংকিং মুরাবাহা। সংক্ষেপে এ নামটির ব্যবহার উত্তম। এ লেখায় এ নামটি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে সংক্ষেপে মূল বিষয়টি ব্যক্ত করা যায়।

৩. ১১. ব্যাংকিং মুরাবাহা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা

ব্যাংকিং মুরাবাহা মূলত সুদী বিনিয়োগের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর মূলকথা হলো, কারো কোনো পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন; কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ নেই। লোকটি যদি সুদী ব্যাংকে অর্থের জন্য গমন করে তাহলে ব্যাংক তাকে সুদভিত্তিক লোন প্রদান করবে। এরপর লোকটি সেই লোন দিয়ে উদ্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে তার প্রয়োজন নির্বাহ করবে।

অপরদিকে সুদমুক্ত ইসলামী কোনো ব্যাংকে যদি লোকটি গমন করে এবং নিজের উক্ত প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে, তাহলে ইসলামী ব্যাংক তাকে সরাসরি ফান্ড সরবরাহের পরিবর্তে যে পণ্য ক্রয়ের জন সে ফান্ড চেয়েছে, সেটা প্রথমে ব্যাংক নিজে ক্রয় করবে। সাধারণত তা হয়ে থাকে গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে। এরপর তা মুরাবাহা ভিত্তিতে বাকীতে অধিক মূল্যে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দিবে।

---

১ দেখুন, ড. বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ (রঈস, মাজমাউ ফিকহিল ইসলামী জেদ্দা) কৃত بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية পৃ. ১

যেহেতু এখানে গ্রাহক ব্যাংকে এসে পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংককে প্রস্তাব করেছে, এরপর তার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যাংক আদেশদাতা গ্রাহকের পক্ষে পণ্য ক্রয় করে মুরাবাহা বিনিয়োগ করেছে, তাই একে আরবীতে বলে, المرابحة للآمر بالشراء। (পণ্য ক্রয়ের জন্য যিনি আদেশ করেছেন তার স্বার্থে মুরাবাহা লেনদেন করা)। মূল বিষয়টি আলোচনার পর এবার আমরা ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার সংজ্ঞা পেশ করছি—

৩. ১২. ব্যাংকিং মুরাবাহার সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক সমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'গাইড লাইন্‌স'-এ 'ইসলামিক ব্যাংকিং মুরাবাহা'-র পরিচিতি পেশ করা হয়েছে এভাবে—

Bai-Murabaha: Contractual buying and selling at a mark-up profit is called Murabaha. In this case, the client requests the Bank to purchase certain goods for him. The Bank purchases the goods as per specification and requriement of the client. The client receives the goods on payment of the price which includes mark-up profit as per contract. Under this mode of investment the purchase/cost price and profit are to be disclosed separately.

'অর্থাৎ, বাঈ-এ- মুরাবাহা হলো, একটি বিশেষ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, যাতে মূল খরচের ওপর অতিরিক্ত মুনাফার শর্ত করা হয়, যাকে মুরাবাহা বলা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে, গ্রাহক ব্যাংক বরাবর আবেদন করে যে, ব্যাংক তার জন্য নির্দিষ্ট পণ্য যেন ক্রয় করে। এরপর ব্যাংক গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে। সবশেষে গ্রাহক সেই ক্রয়কৃত পণ্য অতিরিক্ত মুনাফা প্রদানের শর্তে গ্রহণ করে। মুনাফার হার লেনদেন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এতে পণ্য ক্রয় বাবদ মূল খরচ ও মুনাফা সুস্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক করে উল্লেখ করা হয়।'[১]

---

১ Guidelines for conducting Islamic Banking, Section V, P.12

অন্যান্য গবেষকগণও এর কাছাকাছি সংজ্ঞাই প্রদান করেছেন। সবগুলোর সারকথা হলো, মোট তিনটি স্তরে মুরাবাহা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা—

১. গ্রাহক, যে ব্যাংককে পণ্য ক্রয়ের আদেশ করেছে এবং ব্যাংক থেকে ক্রয়কৃত পণ্যটি কিনে নিবে বলে ওয়াদাও প্রদান করেছে।

২. ইসলামী ব্যাংক, যে গ্রাহকের আবেদন মঞ্জুর করে পণ্যটি নিজে বা গ্রাহককে প্রতিনিধি করে সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করবে।

৩. সবশেষে গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক থেকে ক্রেতা হিসাবে পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে নিবে।

উক্ত তিনটি স্তরের প্রথম স্তরে গ্রাহক, ব্যাংকের সাথে একটি ওয়াদা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। উক্ত ওয়াদা রক্ষা করা নৈতিকতার পাশাপাশি বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আবশ্যক। দ্বিতীয় স্তরে ইসলামী ব্যাংক, যে পণ্যটি হয় নিজে বা গ্রাহককে প্রতিনিধি করে সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করবে। গ্রাহককে প্রতিনিধি করা হলে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের আকদুল ওয়াকালা বা ওয়াকালা চুক্তি কার্যকর হবে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত স্তরে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়।

৩. ১৩. মুরাবাহায় Deffered Payment হওয়া কী জরুরি?

মুরাবাহায় মূল্য নগদ আদায় করা যায়, বাকিতেও আদায় করা যায়। এটি নির্ভর করে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতির ওপর। মূল্য বাকিতে আদায় করা (Deffered Payment) জরুরি নয়। এটি মুরাবাহা সঠিক হওয়ার কোনো শর্ত নয়। তবে সাধারণত ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা চুক্তি বাকিতে হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ—যাদের গভীরভাবে ফিকহ পড়ার সুযোগ হয়নি, ইসলামী ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মুরাবাহার সাথে পরিচিত হয়েছেন তারা একে মুরাবাহার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত মনে করেন।

৩. ১৪. প্রাচীন মুরাবাহা ও ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ফিকহে বর্ণিত প্রাচীন মুরাবাহা ও ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা দুটি পুরোপুরি এক নয়। তত্ত্ব ও প্রায়োগিক দু দিক থেকেই এ দুটির

মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তত্ত্বগত পার্থক্য এই যে, ইসলামী ফিকহে বর্ণিত প্রাচীন মুরাবাহার সাথে 'ফাইন্যান্স' এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটি একটি সাদামাটা লেনদেন। ইসলামী ফাইন্যান্সের মূল সম্পর্ক হলো, মুদারাবাও মুশারাকার সাথে।

অপরদিকে আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার সাথে রয়েছে ফাইন্যান্সের পুরোপুরি সম্পর্ক। ইসলামী ব্যাংকসমূহের অধিকাংশ Financial Operations (অর্থ সংস্থান কর্মকাণ্ড) পরিচালিত হয় মুরাবাহার মাধ্যমে। মুদারাবা-মুশারাকার মাধ্যমে নয়।

কর্মগত পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, ফিকহের গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন মুরাবাহা একটি স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়। বিক্রেতা নিজ উদ্যোগে ও নিজের প্রয়োজনে মুরাবাহা ভিত্তিতে পণ্য বিক্রি করে থাকে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহে ব্যাংক গ্রাহকের প্রয়োজনে ও গ্রাহকের উদ্যোগে পণ্য সংগ্রহ করে মুরাবাহা করে।

এ ছাড়া নামের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার পূর্ণ নাম, بيع المرابحة للآمر بالشراء অর্থাৎ, ক্রয়ের আদেশদাতা গ্রাহকের পক্ষে মুরাবাহা বিক্রয় করা। অপরদিকে সাধারণ মুরাবাহার নাম কেবল 'মুরাবাহা'।

নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাংকিং মুরাবাহা ও প্রাচীন ফিকহের গ্রন্থে বর্ণিত মুরাবাহার মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

প্রাচীন মুরাবাহা ও ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা ছক

ক্র. নং	সাধারণ বা প্রাচীন মুরাবাহা	ব্যাংকিং মুরাবাহা
	এখানে বিক্রেতা বাস্তবেই ব্যবসায়ী। নিজ থেকেই বিক্রির জন্য পণ্য পেশ করে।	এখানে ব্যাংক মৌলিক ব্যবসায়ী নয়। বরং গ্রাহকের চাহিদার ভিত্তিতে ফাইন্যান্সের উদ্দেশ্যে পণ্য বিক্রয় করে।

	পণ্য পূর্ব থেকেই বিক্রেতার নিকট থাকে।	পণ্য পূর্ব থেকে ব্যাংকের নিকট থাকে না। বরং ফাইন্যান্সের উদ্দেশ্যে ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে পণ্য সংগ্রহ করা হয়।
	বাকি বিক্রয় শর্ত নয়। নগদও হতে পারে।	সাধারণত বাকিতেই বিক্রি হয়।
	এটি ব্যক্তি পর্যায়ে নির্ভেজাল একটি লেনদেন। এর সাথে ফাইন্যান্সের কোনো সম্পর্ক নেই।	এটি মূলত সুদী করযের বিকল্পরূপে হালাল ফাইন্যান্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
	এর নাম 'বাইউল মুরাবাহা'।	এর নাম 'বাইউল মুরাবাহা লিল আমির বিশ শিরা'। (আমরা সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে একেই ব্যাংকিং মুরাবাহা বলে ব্যক্ত করছি)
	সাধারণত মুনাফা ধার্য হয় বিক্রেতার বাস্তব খরচের বিপরীতে।	মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তব খরচের পাশাপাশি মেয়াদের বড় ভূমিকা থাকে। মেয়াদ যত বেশি, মুনাফার হারও তত বেশি নির্ধারণ করা হয়।
	সাধারণত তা দুটি পক্ষের মধ্যে হয় ও একটি স্তরেই এর সমাপ্তি ঘটে।	গ্রাহক, ব্যাংক ও সরবরাহকারী-উক্ত তিন পক্ষের সমন্বয়ে তা সংগঠিত হয় এবং অন্তত তিনটি চুক্তি ও তিন স্তরে এর সমাপ্তি ঘটে।

সূত্রঃ নিজস্ব চিত্রায়িত।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রাচীন মুরাবাহা ও ইসলামিক ব্যাংকিং আধুনিক মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট।

৩. ১৫. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার তাৎপর্য

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মুরাবাহা মৌলিক কোনো ফাইন্যান্স পদ্ধতি নয়। বরং সুদী লোনের বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শুরু অবস্থায় সাময়িকভাবে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এটি সুদ থেকে বেঁচে থাকার একটি বৈধ হিলা বা কৌশলী বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইসলামী বিনিয়োগের আদর্শিক পদ্ধতি নয়।

ইসলামী বিশ্বের অন্যতম ইসলামিক ব্যাংকিং স্কলার শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী (জ. ১৯৪৩ ইং.) এ প্রসঙ্গে হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন—

It should never be overlooked that, originally, murabahah is not a mode of financing. It is only a device to escape from "interest" and not an ideal instrument for carrying out the real economic objectives of Islam. Therefore, this instrument should be used as a transitory step taken in the process of the Islamization of the economy, and its use should be restricted only to those cases where mudarabah or musharakah are not practicable.

'এ কথাটি কখনোই ভুলা যাবে না যে, মৌলিকভাবে মুরাবাহা কোনো ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়। এটি কেবল সুদ থেকে বাঁচার একটি হিলা। এটি আদর্শিক কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতি নয়, যা দ্বারা ইসলামের অর্থনীতির মূলরূপ বাস্তবায়ন হবে। তাই ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে সাময়িকভাবে এর ব্যবহার সীমিত করা উচিত এবং যেখানে মুশারাকা ও মুদারাবা সম্ভব হবে না, কেবল সেক্ষেত্রেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা উচিত।'[১]

অন্যান্য ইসলামী অর্থনীতিবিদগণের বক্তব্যও অনুরূপ যে, ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মুরাবাহা বিনিয়োগের আদর্শিক পদ্ধতি নয়। এর

১ এন ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফাইন্যান্স, ১৪১৯ হি., পৃ. ৭২, বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা, খ. ২ , পৃ. ৬৪

একটি স্পষ্ট কারণ হলো, বাস্তব ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদী বিনিয়োগ ও মুরাবাহায় বড় ধরনের তফাত নেই। সুদী বিনিয়োগ যেমন দ্রব্যমূল্যেকে প্রভাবিত করে, তেমনি মুরাবাহাও। কোনটির মাধ্যমেই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হয় না। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয় কেবল মুদারাবা-মুশারাকার সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। তাই ইসলামের আদর্শিক ফাইন্যান্স পদ্ধতি মুদারাবা ও মুশারাকা। তবে সুদের বিকল্প বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে এর গুরুত্ব কম নয়। এর মাধ্যমে স্পষ্ট সুদী কারবার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। তাছাড়া সম্পদ ভিত্তিক বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়। সুতরাং মুদারাবা-মুশারাকার মতো আদর্শিক না হলেও সুদী ব্যবস্থার বিপরীতে এটি একটি ভালো পদ্ধতি—অর্থনীতি ও শরীয়াহ উভয় দিক থেকে।

৩. ১৬. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা সম্বন্ধে ফতোয়ার ইতিহাস

দীর্ঘ গবেষণার পর, ইসলামী ব্যাংকসমূহের সূচনা কালের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে 'মুরাবাহা' পদ্ধতিকে নির্বাচন করা হয়। ১৩৯৯ হি. মোতাবেক ১৯৭৯ ইং. সনে দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রথম সম্মেলন। তাতে 'বাইউল মুরাবাহা লি আজাল লিল আমির বিশ শিরা' (بيع المرابحة لأجل للآمر بالشراء) বিনিয়োগ পদ্ধতিটি প্রথমবারের মতো উপস্থাপিত হয়। সম্মেলনে বিশিষ্ট ফকীহ, অর্থনীতিবিদ ও আইনবেত্তাসহ মোট ৫৯ জন স্কলার উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর উপস্থিত ফকীহগণ কিছু শর্তসাপেক্ষে একে অনুমোদন প্রদান করে ফতোয়া প্রকাশ করেন। উক্ত সম্মেলনের ফাতাওয়ার মূল ভাষ্য নিম্নরূপ—

> يرى المؤتمر أن هذا التعامل(بيع المرابحة لأجل للآمر بالشراء) يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها أو وعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط، إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت

المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه، وتحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية و قد تحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون ذلك.

'সম্মেলন অভিমত ব্যক্ত করে যে, এ লেনদেনটি হলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ব্যাংকের কাছ থেকে ক্রয় করে নেওয়ার ব্যাপারে গ্রাহকের অঙ্গীকার অথবা ক্রয়ের পর শর্তানুযায়ী গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করার ব্যাপারে ব্যাংকের পক্ষ থেকে আরেকটি অঙ্গীকার। এ ধরনের অঙ্গীকার মালেকী মাযহাব অনুযায়ী উভয়ের জন্য বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাধ্যতামূলক। তবে অন্যান্য মাযহাবের বিধান মোতাবেক এ ধরনের অঙ্গীকার ধর্মীয় বিবেচনায় উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। অবশ্য যেটি ধর্মীয় বিবেচনায় বাধ্যতামূলক হয়, সেটা প্রয়োজন ও কল্যাণ অনুসারে আইনগতভাবেও বাধ্যতামূলক করা যাবে। তদ্রূপ তাতে আইনী হস্তক্ষেপও করা যাবে। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের ভাষাসমূহ শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাজাতে হবে। এ বিষয়ে আইনী হস্তক্ষেপের জন্য কোনো কোনো মুসলিম দেশে এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন হতে পারে।'[১]

পরবর্তীতে নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ফোরামে একাধিক শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংকিং মুরাবাহাকে অনুমোদন দেওয়া হয়। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু ফোরামের নাম উল্লেখ করা হলো—

১৯৮৩ ঈসায়ী : দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক সম্মেলন ফাতাওয়া, কুয়েত।[২]

১৯৮৪ ঈসায়ী : আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমি, জেদ্দা-এর সেমিনার।[৩]

---

১ فتاوى شرعية في المعاملة المصرفية، من مطبوعات بنك دبي الإسلامي، الطبعة الأولى، محرم ١٤٠٦ هـ/ أكتوبر ١٩٨٥ م.

২ সিদ্ধান্তের জন্য দেখুন, ফিকহুন নাওয়াযেল, খ. ৩, পৃ. ২২৭

৩ প্রাগুক্ত। (Journal of international Islamic Fiqh Academy , Jeddah, N.5, V.2, P.1599)

১৯৯২ ঈসায়ী : 'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' (The Council to Research the present issues) -এর সিদ্ধান্ত। (Ahsanul Fatwah,1996, V.7, P.111)

১৯৯০ ঈসায়ী : Islamic Fiqh Academy (India) এর সিদ্ধান্ত।[1]

২০০২ ঈসায়ী : AAOIFI এর শরীয়াহ্ স্ট্যান্ডার্ড নং : ০৮।

ব্যাংকিং মুরাবাহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ব্যাংকিং মুরাবাহা সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য এর নিম্নোক্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত জরুরি। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

বৈশিষ্ট্য ০১ : ব্যাংকিং মুরাবাহা কোনো সুদভিত্তিক করযের নাম নয়; বরং এটি একটি ক্রয়-বিক্রয়ের নাম। তাই ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় শর্ত পালন করতে হবে।

বৈশিষ্ট্য ০২ : মুরাবাহাকে ফাইন্যান্স হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কেবল সেক্ষেত্রেই, যেখানে গ্রাহকের বাস্তবেই কোনো জিনিস ক্রয় করার জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হয়। যেমন, ফ্যাক্টরির জন্য মেশিন ক্রয় করা দরকার। তাহলে এক্ষেত্রে মুরাবাহা ভিত্তিতে মেশিন ক্রয় করা যাবে। কিন্তু যেখানে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ফান্ডের প্রয়োজন হয়। যেমন, পূর্ব-ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, কর্মচারীদের বেতন প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুরাবাহা ব্যবহার করা যাবে না।

বৈশিষ্ট্য ০৩ : ব্যাংক থেকে মুরাবাহা ভিত্তিতে কোনো কিছু ক্রয়ের আগে এটি নিশ্চিত করা জরুরি যে, বস্তুটি ব্যাংকের মালিকানায় ও ঝুঁকিতে এসেছে।

বৈশিষ্ট্য ০৪ : মুরাবাহা ভিত্তিতে কোনো কিছু বিক্রয়ের আগে সেটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও ব্যাংকের মালিকানা ও ঝুঁকিতে (Risk) আসা জরুরি।

---

১ প্রাগুক্ত, ফিকহুন নাওয়াযেল।

৩. ১৭. মুরাবাহার বৈধতার ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

মৌলিকভাবে মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় একটি স্বীকৃত বিষয়। সালাফে সালেহীনের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত প্রমাণিত নয়। তবে নিম্নোক্ত আসার[১] থেকে কারো মনে ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে—

> مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه ونهى عنه.
>
> 'জনৈক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে এভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হলো যে, আপনি এই বাহনটি (যা আপনি এখনো হস্তগত করেননি) আমার নিকট বাকিতে বিক্রি করে দিন। শর্ত হলো, সেটা আপনি নগদে বাজার থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি একে অপছন্দ করলেন এবং তা করতে নিষেধ করলেন।'[২]

বাহ্যিকভাবে মনে হবে, এখানে ব্যাংকিং মুরাবাহার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে বিষয়টি মোটেও এমন নয়।

প্রথম কথা হলো, ইমাম মালেক রহ. (৭১১-৭৯৫ ইং.) উক্ত হাদীসটি 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের তেত্রিশতম অধ্যায়ে 'বাইআতাইন ফি বাঈআ'-এর নিষিদ্ধতা' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে (৩৬তম অধ্যায়) উল্লেখ করেননি। যদি এটি মুরাবাহাসংক্রান্ত হত তবে তিনি তা মুরাবাহা অধ্যায়ে উল্লেখ করতেন। বরং তিনি মুরাবাহা অধ্যায়ে মুরাবাহা বৈধতার ওপর ইজমা নকল করে বলেছেন—

---

১ পূর্ববর্তী যুগে হাদীসের সমার্থক শব্দ হিসাবে আছার ব্যবহৃত হত। তবে অধুনাকালে সাধারণত সাহাবা ও তাবেঈনের ফতোয়া ও আমল বোঝাতে 'আসার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

২ মুআত্তা মালেক, অধ্যায় : ৩৩, হাদীস নং : ১৩২৬; আল ইসতিযকার, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮, ৪৪৯ প্রকাশক : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম প্রকাশ : ১৪২১ হি.।

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة انه لا يحاسب فيه أجر السماسرة فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن.

'ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, আমাদের নিকট এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, কেউ যদি এক শহরে কাপড় ক্রয় করে। এরপর তা অন্য শহরে মুরাবাহা হিসাবে বিক্রয় করতে চায়, তাহলে সে মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দালালির পারিশ্রমিক ধরবে না। তবে কাপড় বহনের ভাড়া মূল মূল্যে গণ্য করা যাবে।'[১]

দ্বিতীয় কথা হলো, মুআত্তার বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার একাদশ ঈসায়ী শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. (৯৭৮-১০৭১ ইং.) উক্ত আসারের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

«قال أبو عمر: هذا الحديث عند مالك فيه وجهان: أحدهما: العينة، وقد تقدم تفسيرها بمثل هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب وغيره، والثاني: أنه من باب بيعتين في بيعة، لأنها صفقة جمعت بيعتين، أصلها البيعة الأولى.»

'ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট উক্ত হাদীসে বর্ণিত লেনদেনটি নিষিদ্ধ হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে। যথা—

এক. এটি নিষিদ্ধ ঈনা। এর ব্যাখ্যা পূবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই. এটি নিষিদ্ধ বাইআতাইন ফি বাঈআ (একই চুক্তিতে দুটি চুক্তি শর্তযুক্ত করা)-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে দুটি চুক্তি একই সাথে একত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল হলো, প্রথম বিক্রয় চুক্তিটি।'[২]

বিশ্লেষণ

ইবনে আব্দুল বার রহ. উক্ত লেনদেনটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর নিষেধ করার দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো, তিনি একে নিষিদ্ধ

---

১ মুআত্তা মালেক, মুরাবাহা ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অধ্যায় নং ৩৬

২ আলইসতিযকার, খ. ৬, পৃ. ৪৪৯, প্রকাশক : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ : ২০০০ ইং।

'ঈনার' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। 'ঈনা' সুদ গ্রহণের একটি অপকৌশলের নাম। ইমাম মালেক রহ.-এর আগে উনিশতম অধ্যায়ে 'ঈনা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে ইমাম মালেক রহ. থেকে ইবনে আব্দিল বার রহ. ঈনার যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা হলো—

একজন আরেকজনের নিকট এসে বলল, আমাকে মেয়াদে কিছু দিরহাম ঋণ দিন। আমি আপনাকে অধিক পরিশোধ করব। প্রার্থিত ব্যক্তি বলল, এটি তো বৈধ হবে না। সুদ হয়ে যাবে। সুতরাং তা করা সম্ভব নয়। তবে এমনটি হতে পারে যে, তুমি আমার কাছে যে পরিমাণ ঋণ চেয়েছ, ওই পরিমাণ মূল্যে আমি তোমার নিকট থেকে নগদে একটি পণ্য ক্রয় করে নিব। যে পণ্যটি তোমার কাছে নেই। যার মালিক তুমি এখনো হওনি। এরপর তুমি সেটা বাজার থেকে বা যার কাছে পণ্যটা আছে তার থেকে সেটা ক্রয় করে আমাকে দিবে। এরপর তুমি সেটি বাকিতে আমার কাছ থেকে ক্রয় করে নিবে।

এরপর ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন, এ পদ্ধতিটি সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ ঈনার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে যা নেই, যার মালিক বিক্রেতা নয় তা বিক্রি করা হয়েছে। যা হস্তগত করা হয়নি তা বিক্রি করা হয়েছে। রিস্ক গ্রহণ ছাড়া মুনাফা লাভ করা হয়েছে। এসব থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি এর সমর্থনে সালাফ থেকে বেশ কয়েকটি ফতোয়া উল্লেখ করেছেন।

প্রথমটি হলো, ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি এক লোক থেকে কিছু খাদ্য ক্রয় করেছি। যখন নিতে এসেছি, দেখি ওই খাদ্য বিক্রেতার কাছে নেই। সে এর মালিকই নয়। তখন সে তা আমার জন্য বাজার থেকে ক্রয় করার জন্য বাজারে যেতে চাচ্ছে। এ লেনদেনের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সব শুনে বললেন,

لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده، ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده.

'আমি তোমাকে এমন কিছুর আদেশ বা অনুমোদন দিতে পারি না, সে যার মালিক নয়, এমন কিছু সে তোমার নিকট বিক্রি করবে। তদ্রূপ আমি এ আদেশ বা অনুমোদনও দিতে পারি না, সে যার মালিক নয়, তুমি তা তার কাছ থেকে ক্রয় করবে।' ইমাম মালেক বলেন, এটি হলো ঈনা।

দ্বিতীয়টি হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আলোচিত আসারটি।[1]

বোঝা গেল, আলোচিত আছারে লোকটি বাহনের মালিক না হয়েই তা বিক্রি করে দিয়েছে। তাই তা ইমাম মালেক রহ.-এর মতে ঈনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. তা অপছন্দ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর সাথে সনাতন বা ইসলামী ব্যাংকসমূহে চর্চিত মুরাবাহার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, মুরাবাহার মাঝে পণ্যের মালিক হওয়ার আগে বিক্রয় করা হয় না।

দ্বিতীয়টি হলো, তিনি একে নিষিদ্ধ 'বাইআতাইন ফি বাঈআ।'[2](একই চুক্তিতে দুটি চুক্তি একত্রিত করা)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, এখানে প্রথম লেনদেন হলো, মালিকানাহীন বাহন বাকিতে উপস্থিত বিক্রয় করা এ শর্তে যে, বিক্রেতা সেটা বাজার থেকে নগদে ক্রয় করে নিয়ে আসবে। তাহলে এখানে নগদ ও বাকি দুটি লেনদেন শর্তযুক্ত হয়েছে।'

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ীও এর সাথে সনাতন/ব্যাংকিং মুরাবাহার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, ব্যাংকিং মুরাবাহার নীতি হলো, ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পরই তা বিক্রি করবে। এর আগে নয়। আর এখানে বাহন বিক্রি করা

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

২ হাম্বলী ফিকহের বিশিষ্ট ফকীহ ইবনে কুদামা রহ. 'বাইআতাইন ফি বাঈআ'-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—'চুক্তি হলো, আমি তোমার নিকট অমুক বস্তুটি এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, তোমার নিকট থেকে আমি এত মূল্যে কিছু দিনার ক্রয় করে নিব। অথবা বলল, আমি তোমার নিকট আমার বাড়ি বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে, আমি তোমার বাড়িটি এত টাকায় কিনে নিব বা আমার আরেকটি বাড়িও এত টাকায় বিক্রি করব বা আমি তোমার নিকট বাড়ি ভাড়া দিব বা তুমি ভাড়া দিবে বা তোমার মেয়ে বিয়ে দিবে বা আমার মেয়ে বিয়ে দিব ইত্যাদি শর্ত। এসব শর্ত 'বাইআতাইন ফি বাঈআ'-এর অন্তর্ভুক্ত।–(আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৩)

হয়েছে তা ক্রয়ের আগেই। হ্যাঁ, ইসলামী ব্যাংকিং-এ গ্রাহক ওয়াদা প্রদান করে যে, ব্যাংক পণ্য নিয়ে আসলে সেটা গ্রাহক ক্রয়ে বাধ্য থাকবে। তবে যখন ক্রয় করবে তখন স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে।

অতএব কোনোভাবেই উল্লিখিত আছারে নিষিদ্ধ লেনদেনের সাথে সনাতন/ইসলামী ব্যাংকিং-এ চর্চিত মুরাবাহার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩. ১৮. ব্যংকিং মুরাবাহা বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি

মুরাবাহার উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে ইসলামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুরাবাহার চর্চা করতে হলে তাকে শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবে।

১ম ধাপ : প্রথমে গ্রাহক একটি ওয়াদাপত্রে স্বাক্ষর করবে এ মর্মে যে, বিনিয়োগকারী প্রার্থিত পণ্য ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করার পর গ্রাহক তা বিনিয়োগকারী ব্যাংক থেকে নির্ধারিত মুনাফা অনুপাতে ক্রয় করে নিবে।

২য় ধাপ : বিনিয়োগকারী ব্যাংকের পক্ষে নির্ধারিত তৃতীয় ব্যক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে আসবে। এরপর ব্যাংক গ্রাহককে পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অবহিত করবে। এ সময় পণ্যের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংকের থাকবে।

৩য় ধাপ : ব্যাংক কর্তৃক পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গ্রাহক অবহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহক সরাসরি ব্যাংককে স্পষ্টভাষায় ইজাব/ক্রয়-প্রস্তাব করবে। এটি লিখিত হতে পারে, মৌখিকও হতে পারে।

৪র্থ ধাপ : ব্যাংক গ্রাহকের উক্ত ইজাব বা ক্রয়ের প্রস্তাব কবুল করবে। এভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে। তখন পণ্যের মালিকানা ও ঝুঁকি উভয়টি গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সঠিক মুরাবাহার জন্য উক্ত চারটি ধাপ পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে আরো ধাপ তৈরি হতে পারে। যেমন, প্রথমে গ্রাহক ব্যাংক বরাবর মুরাবাহার জন্য দরখাস্ত করবে। তাতে পণ্যসংক্রান্ত তথ্য থাকবে, গ্রাহকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য থাকবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই আবেদনপত্র ব্যাংক যাচাই-বাছাই করবে। এরপর ওয়াদাপত্র প্রস্তুত হবে। ইত্যাদি। আমরা এখানে এ রকম ব্যবস্থাপনাগত কোনো ধাপ উল্লেখ করিনি। কারণ, এসব ধাপ দেশ ও ব্যাংকভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই কেবল ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো উল্লেখ করেছি, যা সকল দেশ ও সকল ব্যাংকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু ব্যাংক-ই নয়; যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্স হিসাবে মুরাবাহা করতে হলে উক্ত ৪ টি ধাপ অতিক্রম করতে হবে।[১]

উল্লিখিত ধাপগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ

উল্লিখিত ধাপগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, যে বস্তুর মধ্যে মুরাবাহা হবে সেটি প্রথমে ব্যাংকের মালিকানা ও ঝুঁকিতে আসা। এরপর স্বতন্ত্রভাবে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে মুরাবাহা চুক্তিসম্পন্ন হওয়া। এটিই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা মুরাবাহাকে সুদী করযের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তা যদি না থাকে তাহলে বিষয়টি এমন হবে, ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের মতোই কোনো ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া টাকা বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করল। তাই যেকোনো মূল্যে এ ধাপটি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা জরুরি। আর নচেৎ শুধু নামে 'ইসলামী' ও 'মুরাবাহা' থাকবে। বাস্তবে হবে সুদ।

ঝুঁকি গ্রহণের অর্থ ও একটি সহজ পদ্ধতি

ঝুঁকি গ্রহণের অর্থ হলো, ব্যাংক বা তার পক্ষে গ্রাহক পণ্য ক্রয়ের পর তা গ্রাহকের মালিকানায় যাওয়ার পূর্বে মধ্যবর্তী সময়টুকুর মধ্যে পণ্যের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের থাকা। সুতরাং এ সময় পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটা ব্যাংকের হবে, গ্রাহকের নয়। ঝুঁকি গ্রহণের এই মধ্যবর্তী সময়টুকু

---

১ ইসলামী ব্যাংকারী কি বুনিয়াদি, পৃ. ১০৮

অল্প হলেও তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি নিশ্চিত করার একমাত্র পদ্ধতি হলো স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করা। এভাবে ঝুঁকি নিশ্চিত করা ও ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তিসম্পন্ন করাই সুদ ও মুরাবাহার মধ্যে একমাত্র সীমানা, যা তুলে দিলে সেটা নিঃসন্দেহে সুদে পরিণত হবে।

সহজে এর একটি পদ্ধতি এমন হতে পারে, গ্রাহকের পিকআপ বা ট্রাক ড্রাইভার দোকানের কাছে থাকবে। গ্রাহক ব্যাংকে থাকবে। ব্যাংক ড্রাইভারকে প্রতিনিধি করবে। তাকে বলবে-ব্যাংকের পক্ষে দোকান থেকে মালামাল গ্রহণ করতে। এরপর তা গাড়িতে লোড হবে। লোড হওয়ার পর ব্যাংক তার সামনে বসা গ্রাহকের কাছে মুরাবাহা ভিত্তিতে বিক্রয় করে দিবে। এতে সহজে ঝুঁকি গ্রহণ করা, ইজাব-কবুল করা সহজেই সমাধান করা যায়। মোটকথা, যেভাবেই হোক অল্প সময়ের জন্য হলেও ঝুঁকি গ্রহণ করত ইজাব-কবুলের মাধ্যমে মুরাবাহা সম্পন্ন করতে হবে।

অথবা এভাবেও হতে পারে, গ্রাহকের পছন্দের সরবরাহকারীর সাথে ব্যাংক সরাসরি ফোনে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করে নিবে। এরপর গ্রাহক গিয়ে প্রথমে ব্যাংকের পক্ষে বুঝে নিবে। এরপর ফোনে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মাঝে মুরাবাহা চূড়ান্ত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যাংক ওভার ফোনে পণ্য ক্রয় করে, সরাসরি গ্রাহককে তা ক্রেতা হিসাবে গ্রহণের জন্য বলা যাবে না। কারণ, ওভার ফোনে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় সম্পন্ন হলেও, তা বুঝে নেওয়া হয়নি। আর পণ্য বুঝে নেওয়ার আগে অন্যত্র বিক্রয় করা যায় না। দুঃখজনক হলো, এ বিষয়টি বাস্তব চর্চায় কমই পরিলিক্ষিত হয়।

৩. ১৯. ব্যাংকিং মুরাবাহায় পক্ষসমূহ

ব্যাংকিং মুরাবাহায় তিনটি পক্ষ কাজ করে। যথা—

ক. গ্রাহক। যিনি বিনিয়োগ গ্রহণে প্রত্যাশী।

খ. ব্যাংক। অর্থায়নকারী।

গ. সরবরাহকারী। যার কাছ থেকে ব্যাংক প্রথমে পণ্য ক্রয় করে থাকে।

৩. ২০. ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যবহৃত শরীয়াহ চুক্তিসমূহ

ব্যাংকিং মুরাবাহায় সাধারণত তিনটি শরীয়াহ চুক্তি হয়ে থাকে। যথা—

১. ওয়াদা। এটি প্রথমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মাঝে হয়ে থাকে। গ্রাহকের পক্ষ থেকে 'ওয়াদ বিশ শিরা' বা ক্রয়ের ওয়াদা। কারো মতে, উভয় দিক থেকে ওয়াদা থাকতে পারে। ব্যাংক ওয়াদা দিবে—পণ্য বিক্রয়ের। গ্রাহক ওয়াদা দিবে—পণ্য ক্রয়ের। আমাদের দেশে সাধারণত এভাবেই হয়ে থাকে। তবে সবচেয়ে নিরাপদ হলো একপক্ষীয় ওয়াদা হওয়া।

২. গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের পক্ষে পণ্য ক্রয়। এটি আকদুল ওয়াকালাহ বা এজেন্ট চুক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৩. মুরাবাহা চুক্তি। এটি গ্রাহক ও ব্যাংকের মাঝে হয়ে থাকে।

৩. ২১. ব্যাংকিং মুরাবাহা একটি জটিল প্রক্রিয়া

ব্যাংকিং মুরাবাহা একটি জটিল লেনদেন প্রক্রিয়া। এখানে গ্রাহক ও ব্যাংক উভয় পক্ষ একেক সময় একেকরকম চরিত্র ধারণ করে থাকে। যেমন—

প্রথম ধাপে ব্যাংক ও গ্রাহক ভবিষ্যতে কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের ওয়াদা করে। এটি বাস্তব ক্রয়-বিক্রয় নয়। কেবল ভবিষ্যতে মুরাবাহা ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের একটি ওয়াদামাত্র। তাই এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে ওয়াদাপ্রদানকারী (Promisor) ও ওয়াদাগ্রহণকারী (Promisee) এর সম্পর্ক তৈরি হয়। এটি ভবিষ্যতের কোনো তারিখের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (Forward Sale) নয়।

দ্বিতীয় ধাপে ব্যাংক ও তৃতীয় পক্ষের মাঝে ওয়াকিল ও মুআক্কেলের সম্পর্ক তৈরি হয়। তৃতীয় পক্ষকে ব্যাংক পণ্য সরবরাহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে থাকে। (এটিই মৌলিক শরীয়াহ নিদের্শনা। তবে বর্তমানে সাধারণত গ্রাহককেই ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হয়) তৃতীয় ধাপে ব্যাংক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (Supplier) এর মাঝে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক তৈরি হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম ধাপে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হয়। আর সবশেষে যেহেতু মূল্য বাকি

থাকে, তাই উভয়ের মধ্যে দায়েন (ঋণদাতা) ও মাদয়ূনের (ঋণগ্রস্থ) সম্পর্কও তৈরি হয়।

উপরোল্লিখিত একাধিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের দাবি যথাস্থানে পূর্ণরূপে আদায় করা মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত।

এতগুলো চুক্তি ও ধাপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা মুরাবাহার চর্চাকে সত্যিই জটিল করে তুলে। এর জন্য গ্রাহক ও ব্যাংকার-উভয়ের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত শরীয়াহ ধারণা থাকা আবশ্যক।

৩. ২২. Buying agent (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ভিত্তিক মুরাবাহা : একটি শরীয়াহ পর্যালোচনা

বিজ্ঞ পাঠক, হয়ত লক্ষ্য করেছেন, মুরাবাহা বাস্তবায়নের উল্লিখিত পদ্ধতিতে বায়িং এজেন্টের (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) কোনো কথা লেখা হয়নি। কারণ, মুরাবাহার ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি হলো, যে পণ্যে মুরাবাহা করা হবে, সেটা ব্যাংক প্রথমে নিজে সংগ্রহ করবে। এর জন্য প্রয়োজনে কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া যাবে। তবে এ কাজের জন্য খোদ গ্রাহক-মুরাবাহা ক্রেতাকেই পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি বা ওয়াকিল বানাবে না।

গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষে পণ্য ক্রয়ের জন্য উকিল বানানো হলে সেটা সুদী কারবারে রূপান্তর হওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। তা এভাবে যে, গ্রাহক ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে পণ্য ক্রয় করার পরই সেটা গ্রাহকের হয়ে যায় না। গ্রাহক সেটা নিজের মালিকানায় নিয়ে আসার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ক্রয়ের প্রস্তাব করতে হয়।

এরপর ব্যাংক সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলে কেবল তখনি পণ্যটি গ্রাহকের মালিকানায় আসে। আর এই মধ্যবর্তী সময়ে (গ্রাহকের মালিকানায় আসার পূর্ব পর্যন্ত) পণ্যটি সম্পূর্ণ ব্যাংকের ঝুঁকিতে থাকবে। এটি হলো সঠিক নিয়ম।

উক্ত নিয়ম রক্ষার মধ্য দিয়েই মুরাবাহার সাথে সুদের পার্থক্য নিশ্চিত হয়। কিন্তু গ্রাহককে প্রতিনিধি বানানো হলে এ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা হয় না। দেখা যায়, গ্রাহক প্রতিনিধি হয়ে পণ্য ক্রয়ের পর তখন

থেকেই; বরং গ্রাহককে অর্থ প্রদানের পর পরই ব্যাংক দায়মুক্ত হয়ে যায়। পুরো ঝুঁকি গ্রাহকের ধরা হয়। এতে পণ্যের ওপর এক মুহূর্ত সময়ের জন্যও ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণ নিশ্চিত হয় না। লেনদেনটি তখন নিশ্চিতভাবে সুদী লেনদেনে পরিণত হয়। কাগজে যদিও মুরাবাহা লেখা থাকে, তবে বাস্তব ঘটনা দাঁড়ায় এই যে, ব্যাংক উদাহরণস্বরূপ দুই লক্ষ টাকা মুরাবাহার নামে গ্রাহককে প্রদান করেছে। ব্যাংক কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করেনি। গ্রাহক কিস্তিতে কিস্তিতে অতিরিক্ত লাভসহ দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যাংককে পরিশোধ করে দিল। একে সুদ বলা ছাড়া ভিন্ন কিছু বলার সুযোগ নেই।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে ব্যাপকভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে উক্ত বায়িং এজেন্ট (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) মুরাবাহা চর্চা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে মুরাবাহা সুদী কারবারে পরিণত হওয়া অনেক সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই। ব্যাপকভাবে এরূপ বায়িং এজেন্ট (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ভিত্তিক মুরাবাহার শরঈ কোনো ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক কোনো শরীয়াহ বোর্ড এমন ব্যাপক বায়িং এজেন্টের (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) অনুমোদন করেনি। কেবল একান্ত অপারগতার মুহূর্তে কিছু শর্তসাপেক্ষে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড AAOIFI ১৪২৩ হি. মোতাবেক ২০০২ ইং. সনে ব্যাংকিং মুরাবাহাসংক্রান্ত ৮ নং Shari'ah Standard এর ধারা ৩ এর ৩/১/৩ উপধারায় এ ব্যাপারে লেখা হয়েছে—

«٣/١/٣: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوزلها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولاتلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة».

'শরীয়ার মূল নিয়ম হলো, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয় করবে। অবশ্য এতটুকু অনুমোদন আছে যে, পণ্য ক্রয়ের কাজটি মুরাবাহার গ্রাহক ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানিয়েও করতে পারবে। তবে একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মুরাবাহার গ্রাহককেই পণ্য সরবরাহের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের পথ বেছে নিবে না।'

'একান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্ত' বলতে বোঝানো হয়েছে এমন পরিস্থিতি যেখানে গ্রাহক ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন, বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কখনো এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে। এ ছাড়া দেশীয় মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিনা প্রয়োজনে বায়িং এজেন্ট (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) মুরাবাহার কোনো অনুমোদন নেই।

বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও বায়িং এজেন্ট (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) মুরাবাহার জন্য AAOIFI দুটি শর্ত প্রদান করেছে। তা হলো—

১. পণ্যের মূল্য বিক্রেতা/সরবরাহকারীকে সরাসরি ব্যাংক প্রদান করবে। গ্রাহককে বা গ্রাহকের একাউন্টে তা প্রদান করা হবে না।

২. বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে এ মর্মে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাংকের নামে হবে ও তা সংগ্রহ করতে হবে।[১]

এর আরো আগে ১৪১২ হি. মোতাবেক ১৯৯২ ইং. সনে পাকিস্তানের 'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' ('যুগের জটিল মাসআলার গবেষণা বোর্ড বা কাউন্সিল')-এর এক মজলিসে 'ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাদের সেই সিদ্ধান্তের ১৪ নং ধারায় মুরাবাহা বিষয়ে আরো একটি শর্ত প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ধারার উর্দূ ভাষ্যটির অনুবাদ নিম্নরূপ—

'গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষে পণ্য বাস্তবেই কিনল কি না, হস্তগত করল কি না—তা যাচাই করার জন্য ব্যাংক নিজের কোনো প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। ওই প্রতিনিধি পণ্যের ওপর গ্রাহকের কবযা (হস্তগত) হয়েছে মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করবে। এরপর গ্রাহক সম্পূর্ণ নতুন করে যথানিয়মে ক্রয়ের প্রস্তাব করলে ব্যাংক তখন মুরাবাহা ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট পণ্যটি বিক্রি করবে।'[২]

বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ব্যাপকভাবে বায়িং এজেন্ট (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ভিত্তিক মুরাবাহার চর্চা

১ AAOIFI Shariah Standard, 2008, V.1,P.112

২ Ahsanul Fatwah,1996, V.7, P.111

হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এর সাথে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনাগুলোর মিল অনেক কম।

৩. ২২. ১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শরীয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শরীয়াহ বোর্ডে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁরা বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য সরাসরি মালামাল ক্রয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কিছু পণ্য এমন থাকে, যা ক্রয়ে বিশেষ ব্যবসায়ীরা পারদর্শী হয়ে থাকে। কখনো এলাকা ঘুরে ঘুরে পণ্য যাচাই বাছাই করতে হয়। কখনো একাধিক পণ্য নানা দোকান থেকে ক্রয় করতে হয়। এ রকম নানা পরিস্থিতিতে কখনো ব্যাংকের পক্ষে সরাসরি পণ্য ক্রয় করতে যাওয়া সম্ভব হয় না।

এসব বিবেচনায় তাঁরা সীমিত পর্যায়ে গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ দিতে অনুমোদন দিয়েছেন। সীমিত পর্যায় বলতে তাঁরা বলেছেন, শাখার আওতা বহির্ভূত স্থান থেকে কেবল ক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া যাবে। তাঁরা আরো বলেছেন, এক্ষেত্রে গ্রাহক প্রতিনিধির মাধ্যমে মালামাল ক্রয়কৃত মালামাল শাখার একজন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন করে গ্রাহককে মালামাল বুঝিয়ে দিতে হবে। এ মর্মে একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ফাইলে সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়।[1]

বাস্তবতা হলো, উপরোল্লিখিত পরামর্শ সর্বত্র বাস্তবায়ন হয় না। দেখা যায়, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গ্রাহককে ক্রয়-প্রতিনিধি করা হয়। এ ছাড়া ব্যাংকের কর্মকর্তা গিয়ে মালামাল পরিদর্শন করে ইজাব-কবুল করে বুঝিয়ে দেওয়াও সব জায়গায় হয় না। এসব ক্ষেত্রে শাখা ম্যানেজারদের আরো সচেতন হওয়া উচিত।

৩. ২৩. এক নজরে ব্যাংকিং মুরাবাহা সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের শর্তাবলি

মুরাবাহা যেন সুদ বা ফাসিদ কারবারে পরিণত না হয় সেজন্য

১ ৯৪ তম অধিবেশন, ৩০ শে এপ্রিল, ২০০১

প্রয়োজনীয় কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করা হলে মুরাবাহাসংক্রান্ত শরীয়াহ লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। গ্রাহক ও ব্যাংকার (বিশেষত যিনি বিনিয়োগ ডেস্কে বসেন) সকলকেই তা জানা একান্ত জরুরি। নিম্নে মুরাবাহা সঠিকভাবে করার জন্য এক নজরে প্রয়োজনীয় শর্তগুলো উল্লেখ করা হলো—

১. পণ্যবাবদ খরচের পরিমাণ মুরাবাহা চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা।

২. মূল চুক্তিতে পণ্যবাবদ খরচের কথা বিক্রেতা (ব্যাংক) কর্তৃক ঘোষণা করা।

৩. মূল চুক্তিতে গ্রাহক বিক্রেতার (ব্যাংক) পক্ষ থেকে পণ্যবাবদ খরচ জানতে হবে।

৪. মূল চুক্তিতেই মূল খরচের ওপর লাভের পরিমাণ স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।

৫. পণ্য সরবরাহকারীর (Supplier) সাথে গ্রাহকের লেনদেনসংক্রান্ত পূর্ব যাবতীয় সম্পর্ক (Contractual relationship) ছিন্ন করতে হবে (যদি থাকে)। এমন যেন না হয় যে, মুরাবাহার পণ্যটি গ্রাহক আগেই সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। এখন এর মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যাংকের সাথে মুরাবাহা (?) করা হচ্ছে। এমন হলে সেটা স্রেফ সুদী লেনদেন বলে বিবেচিত হবে।

৬. ব্যাংক এটি নিশ্চিত হতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান তাদেরকে মুরাবাহার পণ্য সরবরাহ করবে, সেই প্রতিষ্ঠান বা সরবরাহকারী গ্রাহক বা গ্রাহকের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কেউ হতে হবে। সুতরাং এমন হওয়া বৈধ নয় যে, গ্রাহক বা তার প্রতিনিধি আগে থেকেই মুরাবাহা পণ্যের মূল মালিক। অথবা যে কোম্পানি থেকে ব্যাংক পণ্য সংগ্রহ করবে সেটা গ্রাহকেরই কোম্পানি। (অর্থাৎ, অন্তত ৫০ শতাংশ মালিকানা গ্রাহকের। অথবা কেউ কেউ বলেছেন ৩৩ শতাংশ মালিকানা থাকলেও সেটি নিজের কোম্পানি হিসাবেই বিবেচিত হবে) মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন করার সময় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উচিত, বিষয়টি নিশ্চিত করে মুরাবাহা বিনিয়োগ প্রদান করা।

৭. যে পণ্যে একবার মুরাবাহা সম্পন্ন হয়েছে, সেটার ওপর একই গ্রাহকের সাথে পুনরায় মুরাবাহা করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, জবাই করা প্রাণীকে দ্বিতীয়বার জবাই করা যায় না।

৮. মুরাবাহা চুক্তির জন্য ব্যাংক গ্রাহক থেকে কোনো ধরনের ফি (Commitment fee) নিতে পারবে না।

৯. মুরাবাহা চুক্তিতে 'মুরাবাহা লিমিট' মঞ্জুরের ওপর কোনো ফি নেওয়া যাবে না।

১০. মুরাবাহার পণ্য গোডাউনে থাকাকালীন, গ্রাহকের মালিকানায় আসার আগে এর কোনো ক্ষতি বা ত্রুটি হলে এর দায়ভার গ্রাহকের ওপর চাপানো যাবে না। ঠিক তেমনি পণ্য পরিবহনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটাও গ্রাহকের ওপর বর্তাবে না। অবশ্য বায়িং এজেন্টের (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ক্ষেত্রে গ্রাহকের পক্ষে কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হলে, সেক্ষেত্রে বাস্তব ক্ষতি পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ গ্রাহক বহন করবে। (শেষোক্ত কথাটি 'ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগদান' ফর্মে উল্লেখ থাকে। কিন্তু এর প্রথমাংশ উল্লেখ হয় না। স্বচ্ছতার জন্য প্রথমাংশটিও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।)

১১. গ্রাহক থেকে গ্যারান্টি মানি (নিরাপত্তা প্রদানমূলক অর্থ) নেওয়া হলে, মুরাবাহা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক মুরাবাহা থেকে সরে আসতে চাইলে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি মানি (নিরাপত্তা প্রদানমূলক অর্থ) পুরোপুরি জব্দ করবে না। বরং বাস্তব ক্ষতি পরিমাণ খরচ নিতে পারবে। সম্ভাব্য খরচ (Opportunity Cost)/সম্ভাব্য খরচ নেওয়া বৈধ হবে না। সম্ভাব্য ও বাস্তব ক্ষতি দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যাংকের যে প্রকৃত ও সরাসরি খরচ হয়েছে এর চেয়ে কম মূল্যে মুরাবাহা পণ্য বিক্রয় হলে সেটা বাস্তব ক্ষতি।

সম্ভাবনামূলক ক্ষতির অর্থ হলো, পণ্যটি যথাসময়ে বিক্রি হলে এত মুনাফা হত, এখন কাঙ্ক্ষিত মুনাফা পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংক মুরাবাহা ভিত্তিতে পণ্যটি ক্রয় করেছে এক লক্ষ টাকা দিয়ে। গ্রাহক পণ্যটি ওয়াদানুযায়ী ক্রয় না করার কারণে মার্কেটে তা বিক্রি করতে যেয়ে ব্যাংক মূল্য পেয়েছে আশি হাজার টাকা। তাহলে বিশ

হাজার টাকা হলো, ব্যাংকের মূল ক্ষতি। এটি ব্যাংক গ্রাহক থেকে নিতে পারবে।

কিন্তু সম্ভাবনা ছিল, পণ্যটি ব্যাংক এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করবে। সুতরাং তার ক্ষতি হলো, ৪০ হাজার টাকা। এখানে বিশ হাজার টাকা হলো সম্ভাবনামূলক ক্ষতি। বাস্তব ক্ষতি নয়। সুতরাং এটি ধর্তব্য হবে না।

১২. গ্রাহক যথাযথভাবে মুরাবাহা সম্পন্ন করলে গ্যারান্টি বাবদ প্রদত্ত টাকা বা স্থাবর সম্পত্তি যথাযথভাবে গ্রাহককে বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি। অথবা আলোচনা করে তা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।

১৩. ব্যাংক পণ্য ক্রয় বা মালিক হওয়ার আগেই তা গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেওয়া বা গ্রাহক থেকে বিক্রয় বাবদ খালি পৃষ্টায় দস্তখত নিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। বলা বাহুল্য, কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংকে মুরাবাহা বিষয়ে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের প্রথম বৈঠকেই ব্যাংক পণ্য ক্রয় ও মালিক হওয়ার আগেই সব ফর্মে দস্তখত নিয়ে নেওয়া হয়। এটি যে শরীয়াহ পরিপন্থী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৪. ব্যাংক কর্তৃক পণ্য ক্রয়সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ও ডকুমেন্টস ব্যাংকের নামে হবে। গ্রাহকের নামে নয়। যদিও গ্রাহক ব্যাংকের উকিল হয়।

১৫. ব্যাংক পণ্যে সংগ্রহের সাথে সাথে বা মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকের সাথে মুরাবাহা সম্পন্ন হয়ে গেছে—এমনটি ভাবা যাবে না। বিশেষত বায়িং এজেন্টের (গ্রাহককে প্রতিনিধি নিয়োগ দান) ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর মুরাবাহা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অবশ্যই গ্রাহক স্বতন্ত্র ইজাব করতে হবে। এরপর ব্যাংক সেই ইজাবটি গ্রহণ করলে, কেবল তখনি মুরাবাহা চুক্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুরাবাহা সম্পন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৬. পণ্য ক্রয়ের পর সরবরাহকারী যদি ব্যাংককে মূল্য ছাড় দেয়, তাহলে সেই ছাড় ব্যাংক গ্রাহককেও দিতে হবে।

১৭. মুরাবাহা চুক্তির সময়ই মুনাফা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ভবিষ্যতে

ঘটবে বা হবে এমন অস্পষ্ট কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করা যাবে না।

১৮. গ্রাহক মুরাবাহা মূল্য আদায়ে বিলম্ব করলে, চুক্তির সময় নির্ধারিত মূল্যের ওপর অতিরিক্ত কিছু নেওয়া যাবে না।

১৯. অতিরিক্ত আদায়ের শর্তে মূল্য পরিশোধের কিস্তি বৃদ্ধি করা যাবে না।[১]

মুরাবাহা চর্চার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ১৯ টি শর্ত পালন করা অত্যাবশ্যক। তবেই সেটা শরীয়াহসম্মত মুরাবাহা বলে বিবেচিত হবে।

৩. ২৪. মূল্য যথাসময়ে আদায় না করলে ব্যাংকের করণীয়

সাধারণত ব্যাংকিং মুরাবাহা বাকিতে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ হলো যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ না হওয়া। সুদী ব্যাংকে যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা শোধ না হলে ব্যাংক সরাসরি সুদ আরোপ করে থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক তা করতে পারে না। এক্ষেত্রে এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড ইসলামী ব্যাংকের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। যেন গ্রাহক যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে যত্নশীল হয়। যথা—

১. কোনো কিস্তি যথাসময়ে আদায় না হলে পরবর্তী সকল কিস্তি বাতিল হয়ে নগদায়ন হয়ে যাবে, এমন শর্ত চুক্তিতে রাখা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা গ্রাহককে কিস্তি আদায়ের নোটিশ প্রেরণের পর করতে হবে। এ ছাড়া গ্রাহকের বাস্তব কোনো ওযরও প্রমাণিত না হতে হবে।

২. ব্যাংক গ্রাহককে তার পক্ষে তৃতীয় কাউকে গ্যারান্টর হিসাবে পেশ করতে বলতে পারে।

৩. যথাসময়ে মূল্য শোধ না হলে ব্যাংক যেন তার পাওনা উসুল করে নিতে পারে এ জন্য গ্রাহককে শুরুতেই তার মূল্যবান কোনো সম্পদ বন্ধক রাখতে বলা যেতে পারে। সেটি হতে পারে স্থাবর বা অস্থাবর কোনো সম্পদের দলিল, গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্ট, পণ্য গ্রাহক কর্তৃক হস্তগত হওয়ার পর পুনরায় সেটিই বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করা ইত্যাদি।

---

১ In the light of AAOIFI Sharia Standards, 2008, V.1,P.112

৪. ব্যাংক গ্রাহক থেকে নির্ধারিত সময়ে সময়ে আদায়যোগ্য কিছু ব্যাংক চেক নিয়ে রাখতে পারে।

৫. গ্রাহকের নামে পণ্য রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া বিলম্ব করা যেতে পারে। যাবতীয় পাওনা শোধ হলেই তা করা হবে এমন শর্তারোপ ব্যাংক করতে পারে। তবে মূল্য আদায় না করা পর্যন্ত পণ্য দেওয়া হবে না বা পণ্যের মালিকানা গ্রাহককে প্রদান করা হবে না অথবা দেওয়া হলেও তাতে গ্রাহক কেবল ভাড়াটিয়া হিসাবে বিবেচিত হবে এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না।

৬. গ্রাহক থেকে এমন চুক্তি করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, গ্রাহক যথা সময়ে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক বিক্রিত পণ্য বিক্রয় করে তার পাওনা আদায় করে নিবে। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে তা গ্রাহককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৭. শুরুতে স্বতন্ত্র পেপারের মাধ্যমে এভাবে গ্রাহক থেকে এক পক্ষীয় ওয়াদা নেওয়া যেতে পারে যে, যথাসময়ে গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, গ্রাহক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যাংকের চ্যারিটি ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে। উক্ত অর্থ ব্যাংক তার মূল ইনকামে যুক্ত করবে না। বরং ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের পরামর্শে জনকল্যাণমূলক কোনো খাতে ব্যয় করা হবে।

মোটকথা, এভাবে নানা উপায়ে ব্যাংক তার দায় নিরাপদ করতে পারে। কেবল সুদ আরোপের মাধ্যমেই যে দায় নিরাপদ হবে এমনটি জরুরি নয়।

৩. ২৫. ব্যাংকিং মুরাবাহা বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্বপ্নদ্রষ্টা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের চিন্তা ও বর্তমান কর্মপদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে পূর্ববর্তী যেসব উলামায়ে কেরাম চিন্তাভাবনা করেছেন, এর রূপরেখা দাঁড় করিয়েছেন, তাঁরা মুরাবাহাকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে কল্পনা করেননি। বরং শুরু অবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সাময়িকভাবে মুরাবাহাকে

অনুমোদন করেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং-কে তাঁরা মৌলিকভাবে মুদারাবা-মুশারাকা ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সমাজে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হয়। অপরদিকে মুরাবাহা একটি সাদামাটা লেনদেন। এটি বিনিয়োগের আদর্শ কোনো মাধ্যম নয়। সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য একটি বৈধ হিলা বা কৌশলী লেনদেন।

১৯৯২ ইং. সনে পাকিস্তানের 'মজলিসে তাহকীকে মাসায়েলে হাযেরা' ('যুগের জটিল মাসআলার গবেষণা বোর্ড বা কাউন্সিল')-এর 'ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা' শীর্ষক বৈঠকে মোট ২৪টি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এর ১২-নং সিদ্ধান্তটি ছিল এরূপ—

'যেখানে শিরকাত ও মুদারাবার ওপর আমল করা সম্ভব হবে না, কেবল সেক্ষেত্রেই 'মুরাবাহা মুআজ্জালা'[১] প্রয়োগ করা হবে।'[২]

১৪২৩ হি. মোতাবেক ২০০২ ইং. সনে অনুষ্ঠিত ইসলামী ফিক্‌হ কাউন্সিল, মক্কাতুল মুকার্‌রামার সপ্তম সেমিনারে উপস্থাপিত 'তাওয়াররুক'[৩] বিষয়ক আরবী প্রবন্ধে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বিষয়টি আরো স্পষ্টকরে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'তাওয়াররুক, মুরাবাহা ও এ জাতীয় অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো মূলত হিলা বা কৌশল, যা কোনো সমস্যা বা কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলো না বড় কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, না ইসলামী অর্থনৈতিক কোনো প্রতিষ্ঠানের নিত্যদিনের ব্যবহারে পরিণত হতে পারে। এসব হিলার অধিক প্রচলন হলে ইসলামী অর্থনীতির

---

১ 'মুআজ্জাল' শব্দের অর্থ, বাকি। মুরবাহা মুআজ্জাল-এর অর্থ, বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে মুরাবাহা করা। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এরই অধিক চর্চা হয়ে থাকে।

২ Ahsanul Fatwah,1996, V.7, P.111

৩ 'তাওয়াররুক' একটি বিশেষ লেনদেন। তা হলো, কোনো পণ্য বাকিতে ক্রয় করা। এরপর সেটা ক্রয় মূল্যের চেয়ে কিছুট কমে নগদে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করা। উদ্দেশ্য হলো, নগদ টাকা হস্তগত করা। এটি সুদী করযের একটি বিকল্প বা হিলা।—বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মুয়াসিরা, খ. ২, পৃ. ৪৬

স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগের আদর্শ পদ্ধতি হলো, মুদারাবা ও মুশারাকা। মুরাবাহা, তাওয়াররুক নয়।

আন্তর্জাতিক ফিকহ ফোরাম, সেমিনার, শরীয়াহ বোর্ড, ইসলামী অর্থনীতি সম্মেলন ইত্যাদিতে মুরাবাহা ও তাওয়াররুকের মতো হিলামূলক লেনদেনগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মূলত ইসলামী ব্যাংকগুলোর সূচনাকালে তাদের সংকটাপন্ন অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। কারণ, ইসলামী ব্যাংকগুলোর পক্ষে সূচনালগ্নে মুদারাবা-মুশারাকা ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা জটিল ছিল। তাই পথ চলা শুরু করার স্বার্থে শুধু স্পষ্ট রিবা থেকে কোনো রকম বেঁচে থাকার জন্য কিছু হিলা বা কৌশল বাতলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা যেন কোনো রকম স্পষ্ট সুদ থেকে বেঁচে যায়। এরপর যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মূল লক্ষ্য পানে ছুটে চলবে।

কিন্তু যেসব সম্মানিত ফকীহগণ উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর অনুমোদন দিয়েছিলেন, তাঁদের ধারণায়ও ছিল না যে, এই সকল ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো হিলাধর্মী বিনিয়োগ পদ্ধতির ওপরই ক্ষান্ত হয়ে যাবে। সামনে আর অগ্রসর হবে না। লক্ষ্য ভুলে পথেই পড়ে থাকবে। ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল কার্যক্রম হিসেবে এগুলোকেই অতি আদরে গ্রহণ করে নিবে।

ইসলামী ব্যাংকিং এর সূচনার পর থেকে এখন ৩০ বছরের অধিক অতিবাহিত হচ্ছে। (শায়খ কথাটি বলেছেন, ২০০৩ ইং. সনে। আর এখন ২০১৭ ইং.। ১৪ বছরের ব্যবধান। অর্থাৎ, বর্তমানে প্রায় ৪৫ বছর [প্রায় অর্ধ শতাব্দী] অতিবাহিত হচ্ছে) এই সময়ে বহু ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্যাংকের গ্রাহকও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীত। সুতরাং এখন সময় হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ বোর্ড তাদেরকে মুরাবাহা, তাওয়াররুকধর্মী লেনদেন হ্রাসের প্রতি জোর দিবে। আর শিরকাত-মুদারাবার প্রতি গুরুত্ব দিবে। যেন ইসলামী ব্যাংকিং একটি আদর্শ ইসলামী অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যায়। এ যেন শুধু 'হিলা কোম্পানি' না হয়।'[১]

---

১ ইসলামী ব্যাংকারী বুনিয়াদি, পৃ. ৬৪

বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমানে চার যুগ অতিক্রম হওয়ার পরও ইসলামী ব্যাংকগুলো মুরাবাহাভিত্তিক বিনিয়োগ থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। মুদারাবা-মুশারাকাভিত্তিক বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোটায়। ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্বপ্নদ্রষ্টাদের স্বপ্ন ও চিন্তার সাথে বর্তমান মুরাবাহাভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর মিল অনেকাংশেই কম। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে অচিরেই মুরাবাহার লাগাম টেনে ধরতে হবে। এর বিকল্প কর্মকৌশল নিয়ে ভাবতে হবে। অধম গবেষকের পক্ষ থেকে পরবর্তী শিরোনামে একটি বিকল্প কর্মকৌশলের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞজন আশা করি এ নিয়ে আরো চিন্তাভাবনা করবেন।

৩. ২৬. ব্যাংকিং মুরাবাহার বিকল্প একটি কর্মকৌশলের প্রস্তাবনা

প্রস্তাবিত কর্মকৌশলটি দু ভাবে বিভক্ত। যথা ক. ব্যাংক সংশ্লিষ্ট। খ. ব্যাংকের বাহিরে নতুন ধারার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. ২৬. ১. ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কর্মকৌশল

ধাপ-০১ : মুদারাবা-মুশারাকার প্রতি গ্রাহকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ সংক্রান্ত ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করা। পুস্তিকায় মুদারাবা-মুশারাকার পরিচিতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এ সংক্রান্ত হাদীস ও আছার পেশ করে উৎসাহিত করা হবে।

ধাপ-০২ : গ্রাহকদেরকে নিয়ে নির্বাচিত ব্রাঞ্চে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা। সেখানে মুদারাবা-মুশারাকা নিয়ে আলোচনা করা হবে। গ্রাহকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও পেশ করা।

ধাপ-০৩ : মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগে আগ্রহীদের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া। যেমন, তাদের ডেবিট কার্ডের বাৎসরিক ফি মওকুফ করে দেওয়া ইত্যাদি।

ধাপ-০৪ : বিনিয়োগ গ্রহণকারী গ্রাহকদের একটি বিশেষ ডাটাবেজ তৈরি করা। ব্যাংকের সাথে তাদের লেনদেনের ওপর একটি রেটিং প্রদান করা হবে। 'এ' ক্যাটাগরি, 'বি' ক্যাটাগরি এভাবে গ্রাহকদেরকে শ্রেণী বিন্যাস করা হবে। এসব করা হবে গ্রাহকদের লেনদেনের স্বচ্ছতা, ব্যবসায়িক

অবস্থান, ব্যাংকের ঋণ আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে। যারা 'এ' ক্যাটাগরির গ্রাহক হবে তাদেরকে ব্যাংক মুদারাবা-মুশারাকার প্রস্তাব দিবে। এতে ব্যাংকের ঝুঁকি অনেক হ্রাস হবে ইনশাআল্লাহ।

ধাপ-০৫ : প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের অন্তত একটি ব্রাঞ্চ-এ বিশেষ মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগ ডেস্কের ব্যবস্থা করা। যেমন, বিশেষ ব্রাঞ্চে লকারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে আগ্রহীরা সহজে যোগাযোগ করতে পারবে।

আমরা আশাবাদী, উল্লিখিত কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করা হলে অন্তত কিছুটা হলেও মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগ বাস্তবায়ন হবে।

উক্ত কর্মকৌশলের সফলতার জন্য সর্বপ্রথম যেসব উদ্যোগ নিতে হবে, তা হলো—

ক. ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকদেরকে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। তাদের সদিচ্ছার বিকল্প নেই।

খ. দেশীয় আইনী অবকাঠামো মুদারাবা-মুশারাকার পক্ষে সহনীয় করা। যেমন, মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগধারীদের সরকারি টেক্স সহনীয় পর্যায়ে রাখা ইত্যাদি আইনী অবকাঠামো সহজ করা।

গ. ইসলামিক ম্যান পাওয়ার উন্নত করা। এর জন্য প্রতিটি ব্রাঞ্চে একটি বিশেষ শরীয়াহ ডেস্ক চালু করা, যাতে নিয়োগ হবে ফিকহুল মুআমালায় পারদর্শী আলেমগণ। এক্ষেত্রে ফতোয়া বিভাগের মেধাবী ছাত্রদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং কোর্স করিয়ে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

৩. ২৬. ২. নতুন ধারার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা

শুধু মুশারাকা ও মুদারাবাভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই বলে একে একেবারে বাদও দেওয়া যাবে না। আবার শুধু মুরাবাহাভিত্তিক ব্যাংকও হতে পারে না। এ জন্য আমাদেরকে মাঝামাঝি একটি পথ বেছে নিতে হবে। তা হলো—

কিছু ব্যাংক গড়ে উঠবে, যারা কেবল বা অধিকাংশ বিনিয়োগ করবে মুশারাকা ও মুদারাবায়। বিশেষত যারা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট নিয়ে কাজ

করে, সেসব ব্যাংক এ ধরনের ব্যাংকিং প্রথা চালু করবে। একে ‘ইসলামী পার্টনারশিপ ব্যাংকিং’ বলা হবে।

আর কিছু ব্যাংক মুরাবাহা, মুআজ্জাল, ইজারা করবে। সাথে অবশ্যই কঠোর শরীয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করবে। একে ‘ট্রেডিং ব্যাংকিং’ বলা হবে। তারাও সাধ্যমতো মুশারাকা-মুদারাবায় বিনিয়োগ করবে।

উক্ত দু ধরনের ব্যাংকিং এর পাশাপাশি আরো কিছু ব্যাংকিং গড়ে উঠতে পারে। যথা—

- করযভিত্তিক ব্যাংকিং। এখানে মানুষ শুধু করয হিসাবে টাকা রাখবে। কোনো বিনিয়োগ হবে না। নিরাপদ খাতে করযে হাসানা প্রদান করা হবে।
- এসএমই খাতে বিনিয়োগের জন্য গড়ে উঠবে ‘বিনিয়োগ ব্যাংক’। এখানে গৃহীত অর্থ সরাসরি এসএমই খাতে শরীয়াহ পন্থায় বিনিয়োগ করা হবে।
- ওয়াকফের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে ‘ওয়াকফ ব্যাংক’। এখানে মানুষ স্থাবর সম্পদ যেমন ওয়াকফ করবে। তেমনি ক্যাশও ওয়াকফ করবে। এরপর ব্যাংক ওয়াকফের মুতাওয়াল্লি হিসাবে ওয়াকিফদের নির্দেশনা মোতাবেক তা ব্যয় হবে।

এভাবে বহুমুখী ইসলামী ব্যাংকিং গড়ে উঠবে। এই চিন্তাকে আমরা ‘ডাইভারসিফাইড ব্যাংকিং মডিউল’ বলতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে বর্তমান বাস্তবতায় এটিই সবচেয়ে উত্তম সমাধান। এর মাধ্যমে সমাজে ইসলামের প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা দৃশ্যমান হবে। সামাজিক পুঁজি বিনির্মাণে বিশেষ অবদান রাখবে।

উক্ত ‘বহুমুখী মডিউলের’ যুক্তি হলো, বর্তমান বাস্তবতায় আমরা মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদি সেকেন্ডারি বিনিয়োগ পদ্ধতিকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। বহু মানুষের নগদ ক্যাশের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে ক্যাশ প্রয়োজন সেটি খোঁজে পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন হলে মুরাবাহা করতে হয়। তবে মুশারাকা-মুদারাবাকেও অস্বীকার করা যাবে না। একেও সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মোটকথা, ব্যাপকভাবে শিরকাত-মুদারাবার কথা যেমন বাস্তবে সম্ভব নয়, তেমনি ব্যাপকভাবে প্রচলিত মুরাবাহা ব্যাংকিংও সমর্থনযোগ্য নয়। এ দুটির মাঝে সমন্বয় করতে হবে। পাশাপাশি আরো নানা খাতে ব্যাংকিং নিয়ে আসা। একেই আমরা 'ডাইভারসিফাইড ব্যাংকিং মডিউল' বলার চেষ্টা করছি।

আরো ভালো হয়, এগুলোকে ব্যাংক না বলে 'হাউজ' না দেওয়া। যেমন, 'ইসলামী পার্টনারশিপ ব্যাংকিং'-না বলে 'ট্রেডিং ইনভেস্টম্যান্ট হাউজ' বলা যেতে পারে। তদ্রূপ 'মুরাবাহা ব্যাংক' না বলে 'ট্রেডিং হাউজ' বলা।

৩. ২৬. ৩. মডিউল বাস্তবায়নে যা করতে হবে

উক্ত মডিউল সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম যেসব উদ্যোগ নিতে হবে, তা হলো—

ক. ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকদেরকে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। তাদের সদিচ্ছার বিকল্প নেই।

খ. দেশীয় আইনী অবকাঠামো মুদারাবা-মুশারাকার পক্ষে সহনীয় করা। যেমন, মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগধারীদের সরকারি টেক্স সহনীয় পর্যায়ে রাখা ইত্যাদি আইনী অবকাঠামো সহজ করা।

গ. ইসলামিক ম্যান পাওয়ার উন্নত করা। এর জন্য একাডেমিক কারিকুলামে ইসলামী ফাইন্যান্স অন্তর্ভুক্ত করা। এর জন্য বিশেষায়িত ভার্সিটি তৈরি করা।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য স্বতন্ত্র আইন পাশ করা। (এ বিষয় ডায়াগ্রামসহ আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে অধমের লেখা 'ইসলামে ব্যাংকিং ধারণা' গ্রন্থে)

৩. ২৭. ব্যাংকিং মুরাবাহা সংক্রান্ত ইসলামী ব্যাংকের কাগজপত্র ও সংক্ষিপ্ত শরঈ পর্যালোচনা

বক্ষ্যমাণ লেখাটি তৈরি করতে যেয়ে (২০১৮ ইং. সনে) মুরাবাহা সংক্রান্ত আমাদের দেশের কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের ডকুমেন্টস/ কাগজপত্রও স্টাডি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই কাগজপত্রগুলো

শরীয়াহসম্মত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়াহ ত্রুটিবিচ্যুতি আছে বলে মনে হয়েছে। কয়েকজন ইসলামী ব্যাংকিং শরীয়াহ কর্মকর্তার সাথেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে এ বিষয়ক অনুসন্ধানের কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো—

১. বাই-মুরাবাহা ভিত্তিতে মালামাল বিক্রয়ের অনুমোদনপত্রের ১৩ নং ধারায় লেখা আছে—[1]

'১৩। ক্ষতিপূরণ: নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উল্লিখিত বিক্রয়মূল্যসহ ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক মেয়াদোত্তীর্ণ সময়ের জন্য স্থিরকৃত মুনাফার হারে ক্ষতিপূরণ/জরিমানা আরোপ করতে পারবে, যা আপনাকে/আপনাদেরকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।'

বিক্রয় মূল্যটা মূলত গ্রাহকের নিকট ব্যাংকের পাওনা/ঋণ। কোনো ঋণ যথাসময়ে আদায়ে বিলম্ব করলে এ কারণে কোনো ধরনের Financial Compensation বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়া বৈধ নয়। চাই তা পূর্বে চুক্তিতে উল্লেখ হোক বা না হোক। কারণ তা ঋণের ওপর অতিরিক্ত গ্রহণের নামান্তর যা সুদ। আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ডে AAOIFI এর তিন নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড Default in payment by a Debtor (ঋণখেলাপি)-এর ধারা ২ এর ২/১-এ লেখা আছে—

لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقداً أو عيناً، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.

'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যথাসময়ে ঋণ আদায়ে বিলম্ব করলে এ কারণে কোনো ধরনের আর্থিক জরিমানা প্রদানের শর্তারোপ বৈধ নয়। চাই সেটা নগদ টাকায় হোক বা দ্রব্য জাতীয় কোনো বস্তু হোক। একেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ বলা হয় (যা Penalty clause নামে পরিচিত)। তদ্রূপ সম্ভাব্য মুনাফা না হওয়ার কারণে অথবা মুদ্রার মূল্যের পরিবর্তন হেতু

---

১ বিশেষ বিবেচনায় এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো ইসলামী ব্যাংকের নাম নেওয়া হয়নি। এর প্রয়োজনও নেই। কারণ, সব কয়টি ইসলামী ব্যাংকের কাগজপত্র প্রায় কাছাকাছি।

ক্ষতি পূরণের জন্যও আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়া যাবে না।'

সুতরাং ঋণ বা মূল্য পরিশোধে বিলম্বের কারণে আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা গ্রহণ বৈধ নয়। এক্ষেত্রে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। তা হলো—

গ্রাহক যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে।

১. গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করা হবে।

২. নোটিশ প্রদানের পরও সতর্ক না হলে অন্তত দুই সপ্তাহ পর সকল অনাদায়ি পাওনা নগদ আদায় যোগ্য হয়ে যাবে।

৩. মুরাবাহা পণ্য ক্রেতার কাছে এখনো আগের মতোই বহাল তবিয়তে থাকলে তা ব্যাংক ফেরত নিতে পারে। এ জন্য শুরুতেই, মূল্য আদায়ে বিলম্ব করলে ব্যাংক পণ্য ফেরত নেওয়ার শর্ত রাখতে পারে।

৪. শুরুতেই গ্রাহক থেকে এক পক্ষীয় ওয়াদা নিয়ে রাখবে যে, যথাসময়ে মূল্য আদায়ে বিলম্ব হলে গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা হার ব্যাংকের সিএসআর ফান্ডে সদকা (Donate) করতে বাধ্য থাকবে। এরপর সেই সদকাটি কল্যাণমুখী কোনো কাজে ব্যয় করা হবে। এটি ব্যাংকের মূল ইনকাম হিসাবে গণ্য হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী ব্যাংকারদের ভাষ্য হলো, উক্ত জরিমানার অর্থ ব্যাংকের মূল ইনকামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না; বরং সিএসআর ফান্ডে চলে যায়। যদি তা সত্য হয়ে থাকে তদুপরি এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কারণ এতে উক্ত শর্তারোপের কারণে মূল চুক্তিটি অবৈধ থেকে যায়। যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ে সুদ গ্রহণ না করা হয়। এটি এমন হলো, কেউ সুদ দান করে দেওয়ার নিয়তে সুদী একাউন্ট খুলে তাতে টাকা জমা করে। সুতরাং অনতিবিলম্বে তা সংশোধন করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে দেশীয় আইন ও নীতির কোনো সীমাবদ্ধতা থাকলে সেটি আলোচনা করে সুরাহা করতে হবে।[১]

---

১ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি গ্রন্থে (পৃ. ৩৯) বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি ব্যাপক হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শরীয়াহ বোর্ড মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনার ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপের অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে এ

৫. মর্গেজকৃত সম্পদ বিক্রি করে ঋণ উসুল করে নিবে।

উল্লিখিত ৫টি পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সমাধান করা যায়।[১]

২. মুরাবাহায় ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগদান পত্রের ৪ নং ধারায় লেখা আছে—

'মালামালসমূহ ক্রয়ের জন্য উক্ত বিনিয়োগ সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল আপনার/আপনাদের চলতি হিসাবেও আকলন করা যেতে পারে।'

উক্ত ধারার সারকথা হলো, পণ্যমূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সরাসরি গ্রাহকের চলতি হিসাবে প্রদান করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড AAOIFI এর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। তাদের সিদ্ধান্ত হলো, মুরাবাহা পণ্যের মূল্য সরাসরি গ্রাহকের একাউন্টে প্রদান করা যাবে না; বরং তা সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে। মুরাবাহাসংক্রান্ত ৮ নং শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের, ধারা ৮ এর ৩/১/৪-এ উল্লেখ হয়েছে—

The institution it self must pay the supplier, and not pay the price of the item into the account of the customer as agent.

'আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি সাপ্লাইয়ার/বিক্রেতাকে পণ্য মূল্য পরিশোধ করবে। এজেন্ট-গ্রাহকের একাউন্টে পণ্যমূল্য প্রদান করবে না।'

অতএব এটি পরিবর্তনযোগ্য। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাংকে সরবরাহকারীর নামেই পে-অর্ডার ইস্যু করা হয়। এমনটি হওয়াই কাম্য।

৩. Letter of undertaking পেপারে লেখা থাকে—'If I fail to pay the Bank's aforesaid dues as per Schedule, Bank may charge compensation etc.'

অর্থ মূল আয়ে সম্পৃক্ত না করে সমাজকল্যাণে ব্যয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর শুরু সময়ে এ সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও ৪০ বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছে এমন একটি ব্যাংকের জন্য এখনো সেই অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্তে বহাল থাকা একেবারেই অনুচিত। কারণ, এভাবে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ চুক্তিই মূল থেকে অবৈধ।

১ AAOIFI Sharia Standards, 2008, V.1,P.30

অর্থাৎ, যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক গ্রাহক থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।

এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে, এভাবে শর্তারোপ করা শরীয়াহসম্মত নয়। এতে চুক্তি অবৈধ হয়ে যায়। বস্তুত এক্ষেত্রে মূল শরীয়াহ নির্দেশনাটি ছিল এরূপ যে, শুরুতেই গ্রাহক থেকে একটি ফর্মে লিখিত ওয়াদা নিয়ে রাখা হবে যে, যথাসময়ে মূল্য আদায়ে বিলম্ব হলে গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা হার সদকা (Donate) করতে বাধ্য থাকবে। এরপর সেই সদকাটি কল্যাণমুখী কোনো কাজে ব্যয় করা হবে। এটি ব্যাংকের মুনাফা হিসাবে গণ্য হবে না। গ্রাহক চুক্তির শুরুতে উক্ত Donate (অনুদান) এর undertaking (নিজের ওপর আবশ্যক করা) করবে। আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ডে AAOIFI এর ৩ নং স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ২/১ এর 'জ' এ বর্ণিত শরীয়াহ নির্দেশনা অনুযায়ী এক্ষেত্রে শব্দটি compensation এর পরিবর্তে Donate রাখা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, বিদ্যমান আইন তা সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য স্বতন্ত্র ও যথার্থ আইন পাশ করার বিকল্প নেই। এর আগে অন্তর্বর্তীকালীন 'Penalty for charity' শব্দ লেখা যেতে পারে। একটি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে এমন পরামর্শ গৃহীত হয়েছে।

এ ছাড়া আরো নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। এগুলো সংশোধন করা জরুরি। শুধু মুরাবাহা ডকুমেন্টস-ই নয়; ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস নিবিড় শরীয়াহ চেকিং প্রয়োজন।

৩. ২৮. প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা প্রয়োগে সম্ভাব্য নানা শরীয়াহ বিচ্যুতি

ব্যাংকিং মুরাবাহা বাস্তবায়নে নানা ধরনের শরীয়াহ বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা আছে। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু সম্ভাব্য শরীয়াহ বিচ্যুতি তুলে ধরা হলো—

১. একই বৈঠকে মুরাবাহার সকল কাগজ সাইন করিয়ে নেওয়া। কখনো এমন হয় যে, ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা একই বৈঠকে ক্রেতার ক্রয়ের অর্ডারে স্বাক্ষর, পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রেতাকে উকিল নিয়োগ,

পণ্য সরবরাহকারীকে প্রদানের জন্য পণ্যের মূল্য বাবদ পে-অর্ডার (বা টিটি/ডিডি ইত্যাদি) গ্রাহককে প্রদান, ক্রয়ের চুক্তিতে স্বাক্ষর, মালিকানা অর্জন ও গ্রাহকের নিকট চূড়ান্ত বিক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর—সব সম্পন্ন করে ফেলেন।

এসব স্বাক্ষরে সময়ের কোনো ব্যবধান রাখা হয় না। এমনো দেখা গেছে যে, ডেলিভারি অর্ডার, মালমাল ক্রয়-বিক্রয় বিবরণী পেপারে প্রথম বৈঠকেই খালি পৃষ্টায় গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ব্যাংক কর্মকতা শুধু তারিখ বসিয়ে তা পূর্ণ করে নেন। অনেকটা বিবাহের কাবিননামায় অগ্রিম স্বাক্ষরের ন্যায়!

এখানে শরীয়াহ ত্রুটি হলো, ব্যাংক পণ্যের মালিকানা ও দখলস্বত্ব অর্জনের পূর্বেই তা বিক্রি করে দিয়েছে মর্মে স্বাক্ষর হয়ে যায়। এ ধরনের বিক্রয় হাদীসে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়; এভাবে লেনদেন করায় কার্যত তা সুদী লেনদেন হয়ে যায়।

এর প্রতিকার হলো, বাস্তবে ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহকের কাছে বিক্রয়ের পরই মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বিবরণীমূলক পেপার পূর্ণ করা। (এ রকম আরো কিছু পেপারসের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য) সাদা কাগজে আগেই গ্রাহকের সাইন না নেওয়া। মনে রাখতে হবে, মুরাবাহা চুক্তি মূলত বিভিন্ন চুক্তির একটি প্যাকেজ, যা ক্রমান্বয়ে সময়ে-সময়ে সংশ্লিষ্ট ধাপে কার্যকর হয়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং যেটা যে ধাপে কার্যকরা করা উচিত সেটা সে ধাপে কার্যকর না করলে লেনদেনটি অবৈধ, কখনো সুদী লেনদেনেও পরিণত হতে পারে।

কিছু ব্যাংকারের বক্তব্য হলো, শুধু দস্তখতের জন্য অনেক গ্রাহক-ই পরে আসতে চান না। তাই আগেই খালি ফর্মে দস্তখত নিয়ে রাখা হয়।

এটি ঠিক নয়। শুরুতেই গ্রাহককে শরীয়াহ পরিপালনের কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। অনেক গ্রাহক না বোঝার কারণে ব্যাংকের ওপর আস্থা রেখে উক্ত অবৈধ সাইন করে দেয়। এই সাইন মূলত বিক্রয় চুক্তিকে বোঝায়। অথচ ব্যাংক তখনো পণ্য ক্রয় করেনি।

এক্ষেত্রে ব্যাংকের শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা কাম্য। মনে রাখতে হবে,

ব্যাংকের কাছে বহু লোকের টাকা রয়েছে। একটা ভুলের কারণে অগণিত গ্রাহকের মুনাফা সন্দেহযুক্ত করার অধিকার ব্যাংকের নেই। তাছাড়া এখন ইসলামী ব্যাংকগুলোর যে অগ্রযাত্রা তাতে ভয়েরও কিছু নেই। সাহস রেখে শরীয়াহ পরিপালনে বদ্ধপরিকর হতে হবে।

শুধু ইসলামের নাম নেওয়ার কারণেই যদি এত গ্রাহক তৈরি হয়, তাহলে ইসলামাইজেশনে গ্রাহক হ্রাসের তেমন আশঙ্কা নেই। কিছু গ্রাহক যদি হাতছাড়া হয়, তাহলে এর বিপরীতে বহু গ্রাহক জুড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি নাও জুড়ে তারপরও কি এ অজুহাতে হারাম হালাল হয়ে যাবে!

২. রি শিডিউলিং করা। কখনো দেখা যায়, গ্রাহক যথাসময়ে মুরাবাহা কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব করছে। অথবা মুরাবাহার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ। এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক দায় পরিশোধের মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দেয়। এর জন্য নতুন করে এক কল্পিত মুরাবাহা করে ঋণ বা দায়কে রি শিডিউল করে দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, মুরাবাহায় রি শিডিউলিং সম্পূর্ণ হারাম। এতে সরাসরি সুদ প্রবেশ করে। ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার নিকট রাখা গ্রাহকের মর্গেজ বিক্রি করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে। অথবা আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু তা না করে সরাসরি রিশিডিউলিং এর নামে সুদ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কিছু কিছু ব্যাংকের ব্যাপারে শোনা গেছে, যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধ না হলে একাউন্টিং লেজারে মুরাবাহা মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যাস, শরীয়াহ অডিটিং এ এই সুদ ধরা পড়ে না! আল্লাহ সঠিক বুঝ দান করুন।

৩. পূর্বে ক্রয়কৃত পণ্য মুরাবাহা করা। কখনো গ্রাহক পণ্য ক্রয় করার পর মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হন। দেখা গেল, গ্রাহক বাড়ি নির্মাণের জন্য রড ক্রয় করেছেন। কিন্তু মূল্য শোধ করতে পারছেন না। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী ব্যাংক থেকে সেই রডের ওপর মুরাবাহা বিনিয়োগ গ্রহণ করেন। এটি স্পষ্ট সুদী কারবার। এক্ষেত্রে ব্যাংকের যথাসাধ্য ইনভেস্টিগেশন করা উচিত। যে পণ্যের ওপর মুরাবাহা করতে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, গ্রাহক যে আগেই তা ক্রয় করে নেয়নি তা নিশ্চিত হতে হবে। এ জন্য যা করা যায়—

ক. Credit Assessment করার সময় প্রার্থিত মুরাবাহা পণ্যের খোঁজ নেওয়া।

খ. যে সাপ্লাইয়ারের কথা বলা হচ্ছে, তার সাথে আদৌ ক্লায়েন্টের পূর্ব কোনো আর্থিক সম্পর্ক আছে কি না তা খতিয়ে দেখা।

গ. গ্রাহককে সরাসরি ফান্ড না দিয়ে সাপ্লাইয়ারকে দেওয়া।

ঘ. ক্রয়কৃত পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। ইত্যাদি পন্থায় এ সংক্রান্ত শরীয়াহ ত্রুটি হ্রাস করা সম্ভব।

৪. বায়িং এজেন্ট (Buying agent) অনুশীলন করা। বর্তমান ব্যাংকিং মুরাবাহায় এটি ব্যাপকভাবে হচ্ছে। অথচ শরীয়াহ স্কলারগণ বলেছেন, প্রয়োজন ছাড়া তা না করতে। পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। শুধু এটি বন্ধ করতে পারলে মুরাবাহা সংক্রান্ত বহু শরীয়াহ বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো, প্রতিটি ব্রাঞ্চে ব্যাংকের Representative নিয়োগ দেওয়া। তারা ব্যাংকের পক্ষে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করবে। অথবা অন্তত গ্রাহকের সাথে গিয়ে ব্যাংকের পক্ষে পণ্য হস্তগত করবে। এরপর বিক্রয় করবে।

৫. স্বতন্ত্র ইজাব-কবুল না হওয়া। প্রায়ই দেখা যায়, বায়িং এজেন্টের ভিত্তিতে গ্রাহক পণ্য ক্রয় করে। এরপর সোজা তার গোডাউনে নিয়ে যায়। (বিশেষত মুরাবাহা 'টিআর' এর ক্ষেত্রে) স্বতন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি আর হয় না। অর্থাৎ গ্রাহক ব্যাংক থেকে মুরাবাহা হিসাবে ক্রয় করার জন্য ইজাব-কবুল হয় না। এতে লেনদেনটি বাহ্যত মুরাবাহা হলেও সেটি কার্যত সুদী লেনদেন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অন্তত ফোন কলের মাধ্যমে হলেও ইজাব-কবুল করে নিতে হবে। শরীয়াহ স্কলারগণ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

৬. কৃত্রিম মুরাবাহা। কখনো গ্রাহক লোক দেখানো মুরাবাহা করে। পণ্য ক্রয় না করে দোকানির সাথে সমঝোতা করে শুধু বিল ভাউচার নিযে আসে। এভাবে কখনো কিছু অসাধু গ্রাহক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মুরাবাহা করে। কখনো ব্যাংকের অসতর্কতার আশ্রয় নিয়েও করা হয়। এ ব্যাপারে সকলের সতর্কতা জরুরি।

৩. ২৯. ভুলত্রুটি হওয়ার কারণ

এসব ভুলত্রুটি হওয়ার পেছনে নানা পক্ষের নানান কারণ আছে। সংক্ষেপে ব্যাংকারদের দিক থেকে মৌলিক কারণ হলো সংশ্লিষ্ট জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষিত না করা। ব্যাংকিং ডকুমেন্টস আরো স্বচ্ছ না করা, সর্বোপরি ব্যাংকিং পরিচালনা পর্ষদের সদিচ্ছার ঘাটতি। পাশাপাশি শরীয়াহ বোর্ড-এর কার্যক্রম, ইন্টার্নাল শরীয়াহ অবজারভেশন সুদৃঢ় না হওয়াও অন্যতম কারণ।

আর গ্রাহকদের পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, মুরাবাহার সঠিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না রাখা। কখনো ইচ্ছে করে শরীয়াহ পরিপন্থী কাজ করা। পণ্যের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মুরাবাহা করতে উদ্যোগ নেওয়া। সর্বোপরি জনগণ ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন না হওয়াও একটি বড় কারণ।

৩. ৩০. মুরাবাহা সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের উপায়

ইসলামী ব্যাংকগুলিকে মুরাবাহাসংক্রান্ত ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হলে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সবার আগে যা করতে হবে তা হলো—

- মুরাবাহা বিনিয়োগকে যথাসম্ভব সীমিত করা। এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত প্রস্তাবনাগুলো আমলে নেওয়া।

- শরীয়া বোর্ড ঢেলে সাজাতে হবে। শরীয়াহ বোর্ড কিভাবে গঠন হবে, সদস্যদের যোগ্যতা কি হবে, তাদের কার্যক্রম কেমন হবে—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি জাতীয় শরীয়াহ বোর্ড নীতিমালা প্রণয়ন করা। ইন্টার্নাল শরীয়াহ অডিট এর পাশাপাশি এক্সটার্নাল শরীয়াহ অডিট প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে শরীয়াহ স্ক্রিনিং সুদৃঢ় হলে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি হ্রাস হবে, ইনশাআল্লাহ।

- ইসলামী ব্যাংকিং সহায়ক স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা। মুরাবাহাসহ অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে স্পষ্ট আইন থাকা। এক্ষেত্রে এ্যাওফি শরীয়াহ মানদণ্ডসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে।

• জনসাধারণের মাঝে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা বৃদ্ধি করা। ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তোলা। এর সৌন্দর্য ও সুদের কুৎসিত চেহারা তাদের সামনে তুলে ধরার গণমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. ৩১. প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং থেকে মুরাবাহা বিনিয়োগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে যা লক্ষ্য রাখতে হবে

যেকোনো লেনদেন করার আগে সেই লেনদেনের শরীয়া পদ্ধতি জেনে নেওয়া জরুরি। শুধু লেনদেনই নয়, মানুষ যে শ্রেণীভুক্তই হোক, জীবনের যে পর্বেই থাকুক, যে সময়, অবস্থা, কাজ ও পেশাতেই থাকুক শরীয়তের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও নির্দেশনাবলি জানা তার ওপর ফরযে আইন। এটিই ওই হাদীসের মর্ম, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।'[১]

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর 'সহিহ'-এ একটি শিরোনাম দিয়েছেন, 'বাবুল ইলমি কাবলাল আমল' যার অর্থ—'কোনো কাজে যোগদানের আগে সে সম্পর্কে বিধানাবলি জেনে নেওয়া উচিত।' এরপর ইমাম বুখারী রহ. এতদসংশ্লিষ্ট কিছু দলিল উল্লেখ করেছেন।

এই স্বভাবজাত যৌক্তিক নীতি ও পদ্ধতিকে অবলম্বন করার মধ্যে দীন ও দুনিয়া উভয় জগতের শান্তি রয়েছে এবং মানব ও মানবতার সফলতা এতেই নিহিত। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই, পার্থিব জীবনও একজন মুমিনের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের সাথেও লেনদেন করার আগে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ জেনে নিতে হবে। যেন আমার অজান্তে আমার দ্বারা বা ব্যাংক কর্মকর্তা দ্বারা শরীয়াহ লঙ্ঘন না হয়। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হলো।

ক. এমন পণ্যেই মুরাবাহা করবেন, যা আসলেই আপনার ক্রয় করা দরকার। অথবা বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয় করা যেন সম্ভব হয়।

---

১ সুনানে ইবনে মাজাহ ২০, হাদীস : ২২৪

খ. যে পণ্য আগেই ক্রয় করে নিয়েছেন বা মালিক হয়েছেন সেটার ওপর মুরাবাহা করবেন না।

গ. অন্তত তিনটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে করবেন। যথা—Confirmation of Purchase (গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষে এজেন্ট হয়ে পণ্য ক্রয়ের পর ব্যাংককে অবহিত করা), Offer to Purchase (গ্রাহক পূর্বোক্ত General Agreement-এর শর্তানুযায়ী উক্ত পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী এ মর্মে ব্যাংকের নিকট ক্রয়ের প্রস্তাব করা।) এর পূর্ব পর্যন্ত পণ্যটি ব্যাংকের দায় ও ঝুঁকিতে থাকা নিশ্চিত করা। ও সর্বশেষ Bank's Acceptance (ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের ক্রয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর করা) নিশ্চিত করা।

মুরাবাহা আবেদন মঞ্জুরের সময়ই যদি কাগজে-কলমে উপরোল্লিখিত স্তরগুলো সম্পন্ন করে ফেলা হয় তবে ধরে নিতে হবে—সেটা মুরাবাহার নামে সুদী লেনদেন হচ্ছে।

ঘ. Bank's Acceptance এর পূর্ব পর্যন্ত পণ্যের রিস্ক সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকের থাকবে। এটি লিখিতভাবে নিশ্চিত করা। যদি ব্যাংক রিস্ক বহনে রাজি না হয় তবে বুঝতে হবে সেটা সঠিক মুরাবাহা নয়।

ঙ. দোকান থেকে পণ্য ক্রয়ের পরে সেটি দোকান থেকে বের করে নিজের দায় ও ঝুঁকিতে নিতে হবে। হস্তগত/কবয যেনো সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়। এরপর ওভার ফোনে ব্যাংকের কাছে ক্রয়ের প্রস্তাব করা হবে।

পাশাপাশি পূর্বে আলোচিত ব্যাংক ও গ্রাহকের পক্ষ থেকে হওয়া নানা ভুল-ত্রুটির ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, লেনদেনের শুরু—শেষ পর্যন্ত ফিকহুল মুআমালা জানেন এমন বিজ্ঞ কোনো মুফতি সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁর পরামর্শে লেনদেন সম্পন্ন করা।

৩. ৩২. মুরাবাহা বিনিয়োগ মঞ্জুর করার সময় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে

ইসলামী ব্যাংকিংকে বাস্তব শরীয়াহ পরিপালনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। গ্রাহক শ্রেণীকে

যেমন শরীয়াহর ব্যাপারে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে, তেমনি ব্যাংক পরিচালক ও কর্মকর্তাদেরও আন্তরিক হতে হতে হবে। সুতরাং মুরাবাহা বিনিয়োগ মঞ্জুর করার সময় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে, যেন গ্রাহকের অসতর্কতা বা অসৎ ইচ্ছার কারণে মুনাফা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়ে যায়। কারণ, এই মুনাফার সাথে অগণিত মানুষের হালাল-হারাম প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং এ ব্যাপারে অবহেলা মোটেও কাম্য নয়। তাই ব্যাংকের যে কর্মকর্তা মুরাবাহা বিনিয়োগ মঞ্জুর করবেন তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে—

ক. ক্রেডিট এ্যাসেসমেন্টের সময় প্রার্থিত মুরাবাহা পণ্যের ব্যাপারে যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়া। গ্রাহক আগে থেকেই এর মালিক কি না তা সাধ্যমতো জানার চেষ্টা করা।

খ. সাপ্লাইয়ারের সাথে গ্রাহকের পূর্ব যোগাযোগ আছে কি না, থাকলে কী পর্যায়ে তা খোঁজ নেওয়া।

গ. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বায়িং এজেন্ট মুরাবাহা না করা।

ঘ. বায়িং এজেন্টের ক্ষেত্রে ফান্ড সরাসরি গ্রাহককে বা তার একাউন্টে প্রদান না করা।

ঙ. বায়িং এজেন্ট হলে ব্যাংকের প্রতিনিধি পণ্য পরিদর্শন করে তা হস্তগত করা। এরপর স্বতন্ত্র বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা।

সর্বোপরি মুরাবাহা সংক্রান্ত অন্যান্য শরীয়াহ নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া।

শেষ কথা,

ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্বপ্নদ্রষ্টাগণ যে ইসলামী ব্যাংকিং এর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ছিল-মুদারাবা, মুশারাকাভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং। মুরাবাহা ও অন্যান্য বৈধ হিলাধর্মী বিনিয়োগ পদ্ধতি নির্ভর নয়। শুরু অবস্থায় পথ চলার জন্য সাময়িকভাবে ব্যাংকিং মুরাবাহার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। স্থায়ী আরাধ্য হিসাবে নয়। অতএব মুরাবাহাকে সীমিত করতে হবে এবং এর বিকল্প হিসেবে প্রস্তাবিত কর্মকৌশল বা

এ জাতীয় অন্য কোনো কর্মপদ্ধতি বেছে নিতে হবে। তবেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সঠিকভাবে অগ্রসর হবে। এ ছাড়া মুরাবাহার যতটুকু চর্চা হচ্ছে তাও শরীয়াহসম্মত উপায়ে করতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

বাইয়ে মুআজ্জাল (Deferred sale) বা বাকি চুক্তি

শুরু কথা

আমরা দৈনন্দিন অনেক কিছুই কেনাকাটা করি। অধিকাংশ সময় সেটা আমরা নগদেই করি। তবে কখনো বাকিতেও করি। মূল চুক্তিতে বাকির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়। সাধারণত যেসব বিক্রেতা কিস্তিতে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ দিয়ে থাকে, সেখানে এটি হয়ে থাকে। এ ছাড়া আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এও এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গত অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে এর ব্যবহার হার ২৩.২৪ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। এর সাথে বাকি মুরাবাহাকে যুক্ত করা হলো এর হার দাঁড়ায় ৭০ শতাংশের অধিক।[১] কোনো কোনো ব্রাঞ্চে শুধু এক বাইয়ে মুআজ্জালের ব্যবহার ৭০-৮০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই বাকি বেচাকেনাকেই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় 'বাইয়ে মুআজ্জাল' বা Deferred sale বলে।

১ Quarterly report on development of Islamic bank in Bangladesh, BB

৪. ১. শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি

'মুআজ্জাল' শব্দটি আরবী (المؤجل)। এটি 'আজাল' (أجل) [১] শব্দ মূল থেকে উদ্ভূত। মূল অর্থ : কোনো কিছু বাকি রাখা, নগদের বিপরীতে। 'বাইয়ে মুআজ্জাল' অর্থ : যে বেচাকেনায় মূল্য বাকি রাখা হয়। নগদ পরিশোধ করা হয় না। ইংরেজিতে বলে Deferred sale। বাংলায় 'বাকি লেনদেন' 'বাকি চুক্তি', 'বাকি খাওয়া' ইত্যাদি। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একে 'বাই বিন নাসিয়াহ' (البيع بالنسيئة) ও বলে। 'নাসিয়াহ' শব্দের অর্থ : বাকি।

শায়খ তাকী উসমানী হাফি.-এর পরিচয় দিয়েছেন,

> البيع المؤجل، وهو الذي اشترط فيه تأجيل الثمن، دون المبيع.
>
> অর্থাৎ, 'বাইয়ে মুআজ্জাল' হলো, এমন বেচাকেনা চুক্তি, যাতে মূল্য পরে আদায়ের শর্ত করা হয়। তবে পণ্য নয়।[২]

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংক অব বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইনে বাই-এ মুআজ্জালের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

'বাই-এ মুআজ্জাল বলিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত এমন এক বিক্রয় চুক্তিকে বোঝাইবে যেখানে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো পণ্য উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রি করা হইবে। এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে পণ্যের প্রকৃত ক্রয় মূল্য প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে।'[৩]

৪. ২. উদাহরণ

ধরা যাক, গ্রাহক 'ক' একটি কোম্পানি থেকে ১০০টি মাইক্রো ওভেন ক্রয় করে দেওয়ার জন্য ব্যাংকের কাছে আবেদন করল। এর সাথে একটি

---

১ فالأجل غاية الوقت في محل الدين و غيره وقد صرفه الخليل فقال : أجل هذا الشيء وهو يأجل و الاسم الآجل نقيض العاجل و الأجيل المرجأ أي المؤخر إلى وقت .(مقايس اللغة ٢٨ ط . دار الحديث القاهرة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى ٣٩٥ اھ.

২ ফিকহুল বুয়, খ. ১, পৃ. ৫৩৭

৩ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা, মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান পৃষ্ঠা ১৪৫

ইনভয়েস বা দরপত্র জমা দিয়েছে। ব্যাংক ইনভয়েস বা দরপত্র যাচাই-বাছাই করে ওই কোম্পানি থেকে ১০০টি মাইক্রো ওভেন ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকায় ক্রয় করে ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে এক বছর মেয়াদের জন্য ৫,৬৫,৯০২/- (পাঁচ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার নয়শত দুই) টাকা দামে বিক্রয় করে দিল। এখন গ্রাহক ৪৭,১৫৮/- টাকা হারে সমান ১২ টি কিস্তিতে ব্যাংককে মোট ৫,৬৫,৯০২/- টাকা পরিশোধ করে দিবে। এ ক্ষেত্রে বাইয়ে মুআজ্জাল চুক্তিতে বিদ্যমান যাবতীয় শর্তাবলি অবশ্যই পালন করতে হবে।

৪. ৩. তাৎপর্য

- বাই-এ-মুআজ্জালের মূল চুক্তিতে মূল্য বাকিতে শোধ করার শর্তারোপ থাকবে।
- বাকির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হবে। এটি একবারেও হতে পারে, কিস্তিতেও হতে পারে।
- নির্ধারিত মেয়াদ ক্রেতার অধিকার বলে বিবেচিত হবে। এর পূর্বে বিক্রেতার মূল্য তলব করার অধিকার থাকবে না।
- মুরাবাহার মতো এক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্যের ক্রয় মূল্য বা খরচ প্রকাশ করতে বাধ্য নয়।

বিধান

মৌলিকভাবে 'বাই-এ-মুআজ্জাল' বৈধ। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ইহুদি থেকে বাকিতে মূল্য শোধের শর্তে কিছু খাবার ক্রয় করেছিলেন। বাকি মূল্যের পরিবর্তে তার কাছে তিনি তার একটি লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।[১]

আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ. ৩১৮হি.) তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন। তিনি লিখেছেন—

---

১ সহিহ বুখারী, ২২৫১

«أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز.

'বিদ্যানগণ একমত পোষণ করেছেন, যদি কেউ নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্টি মূল্যে আরবী মাসসমূহের মধ্যে হতে নির্ধারিত মাসের মেয়াদে অথবা নির্ধারিত কিছু দিনের মেয়াদে বিক্রি করে তাহলে এ ধরনের বিক্রয় চুক্তি জায়েয হবে।'[1]

৪. ৪. সাধারণ বাকি বেচাকেনা ও বাই-এ-মুআজ্জালের মাঝে পার্থক্য

আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, দোকানে যাই। কিছু ক্রয় করি। এরপর বলি, ভাই টাকা পরে দিচ্ছি। পরে কবে দেওয়া হবে এর কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয় না। অথবা ক্রয়ের পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি, টাকা নেই। অথবা পর্যাপ্ত নয়। তখন দোকানদার বলে, সমস্যা নেই। পরে দিলেও হবে।

কখনো এমন হয়, বিক্রেতা পরিচিত ক্রেতাকে ক্রয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করে। বলে, ভালো হবে নিয়ে যান। ক্রেতা বলে, সাথে টাকা নিয়ে আসেনি। বিক্রেতা বলে, সমস্যা নেই। টাকা পরে দিলেও হবে। এখন নিয়ে যান। এভাবে অহরহ বাকি লেনদেন আমরা করে থাকি। পাড়া-মহল্লার পরিচিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে এ ধরনের বাকি লেনদেন অনেক হয়ে থাকে।

আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, এ ধরনের প্রচলিত বাকি লেনদেন আর আলোচিত বাই-এ-মুআজ্জাল এক নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়।

প্রচলিত বাকি লেনদেনকে পরিভাষায়, বাকি লেনদেন-ই বলে না। বরং 'বাইউল হাল' (البيع الحال) বা 'নগদ লেনদেন' বলে।

'বাইউল হাল' হলো এমন চুক্তি, যেখানে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার

---

১ আল আওসাত, খ. ১০, পৃ. ২৮০

সাথে সাথেই ক্রেতার অধিকার অর্জন হয় পণ্য তলব করার। আর বিক্রেতার অধিকার লাভ হয় মূল্য তলব করার। যেখানে মূল চুক্তিতে পণ্য বা মূল্য বাকিতে শোধের কোনো শর্তারোপ থাকে না।[1]

হ্যাঁ, এমন হতে পারে, বিক্রেতা নিজ থেকে মূল্য পরবর্তীতে আদায়ের সুযোগ দিল। বলল, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। মূল্য পরে দিলেও হবে। এই 'পরে দেওয়াটা' বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড় বা অনুগ্রহ। এটি ক্রেতার কোনো অধিকার নয়। তাই যেকোনো সময় বিক্রেতা মূল্য তলব করতে পারে। তাই এখানে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয় না। এতে শরীয়াহ সমস্যা নেই।

পক্ষান্তরে 'বাই-এ-মুআজ্জাল' হলো, যেখানে মূল চুক্তিতে ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরে পরিশোধের শর্তারোপ থাকে এবং মূল্য পরিশোধের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে। সেই মেয়াদের আগে বিক্রেতার জন্য মূল্য তলব করার কোনো অধিকার থাকে না। এখানে 'মেয়াদ' ক্রেতার অধিকার। এ জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করতে হয়। নতুবা বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়।

এক নজরে মোটা দাগের যে পার্থক্যগুলো পাওয়া গেল—

ক্র.নং	প্রচলিত বাকি লেনদেন	বাই-এ-মুআজ্জাল
০১	পরিভাষায় এর নাম : বাইউল হাল বা নগদ লেনদেন।	পরিভাষায় এর নাম : বাই-এ-মুআজ্জাল।
০২	পরে মূল্য শোধ করা ক্রেতার অধিকার নয়। বিক্রয়ের সাথে সাথেই বিক্রেতা মূল্য তলব করতে পারে।	নির্ধারিত মেয়াদ ক্রেতার অধিকার। এর আগে বিক্রেতা মূল্য তলব করতে পারে না।
০৩	মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে না।	মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকে।
০৪	মূল চুক্তিতে নির্ধারিত মেয়াদে মূল্য শোধ করা শর্তযুক্ত থাকে না।	মূল চুক্তিতে নির্ধারিত মেয়াদে মূল্য শোধ করা শর্তযুক্ত থাকে।

১ ফিকহুল বুয়ূ, পৃ. ৫৩৪, ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসায়েল, মুফতি তাকী উসমানী হা., খ. ২, পৃ. ৪৩, ইনআমুল বারী, খ. ৬, পৃ. ১১১, ১১৪

০৫	মূল্য বাকি রাখাটা বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ বা ছাড়।	মূল্য পরে শোধ করা মূল চুক্তিতে শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে তা ক্রেতার অধিকার। বিক্রেতার অনুগ্রহ নয়।

৪. ৫. বাইয়ে মুআজ্জাল ও মুরাবাহা

বর্তমান ব্যাংকিং মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সাধারণত বাকিতে হয়ে থাকে। এদিকে বাইয়ে মুআজ্জাল বেচাকেনা চুক্তিও বাকিতে হয়। তাছাড়া দুটি পদ্ধতিতেই বিক্রেতা মুনাফা করে থাকে। তাই ফলাফলের বিবেচনায় দুটি প্রায় অভিন্ন। বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং-এ এ দুটি পদ্ধতির প্রয়োগই অধিক।

হ্যাঁ, নীতিমালা ও প্রকৃতির বিচারে কিছু পার্থক্য আছে। যথা : মুরাবাহা পদ্ধতিতে মূল চুক্তিতে বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের মূল ক্রয়মূল্য ও খরচ (যদি থাকে) ক্রেতার কাছে প্রকাশ করতে হয়। বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতিতে তা জরুরি নয়। মুরাবাহা পদ্ধতিতে মূল চুক্তিতেই মুনাফার অংশ আলাদা করে ক্রেতাকে অবহিত করতে হয়। বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতিতে তা প্রকাশ করা জরুরি নয়। মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রথম ক্রয় চুক্তিতে ব্যবহৃত মূল্যের ওপর অতিরিক্ত মুনাফা করতে হয়। বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতিতে তা জরুরি নয়। মুরাবাহায় লাভ করাই মুখ্য থাকে। অপরদিকে বাইয়ে মুআজ্জাল চুক্তিতে বাকিতে বেচাকেনা মুখ্য। লাভ করা মুখ্য নয়। লাভ ছাড়াও হতে পারে। এ ছাড়া মুরাবাহা পদ্ধতির জন্য যেসব বিশেষ শর্ত ও নীতিমালা আছে, সেগুলোও বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতিতে প্রযোজ্য নয়।

৪. ৬. বাই-ই-মুআজ্জাল সঠিক হওয়ার শর্তাবলি

যেকোনো বাই-ই-মুআজ্জাল সঠিক হওয়ার জন্য মৌলিক ০৫টি শর্ত রয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো।

১. পণ্যের মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসেই (On spot) সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া।

২. মূল্য আদায়ের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া।

৩. মেয়াদান্তে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত মূল্য, সুদ বা Penalty প্রদানের শর্তারোপ করা যাবে না।

৪. নির্ধারিত মেয়াদের আগে মূল্য পরিশোধ করলে মূল্যহ্রাস করা হবে এরূপ পূর্ব কোনো শর্তও চুক্তিতে থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, ক্রেতা নিজ থেকে আগে আগে মূল্য শোধ করে দিলে, বিক্রেতা নিজ থেকে মূল্যহ্রাস করতে পারবে।

৫. চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত মেয়াদে মূল্য শোধ না হলে অতিরিক্ত সুদ আদায় করতে হবে—এ ধরনের শর্ত আছে, এমন চুক্তিতেও আবদ্ধ হওয়া যাবে না। যদিও পরবর্তীতে ক্রেতার দৃঢ় সংকল্প থাকে যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার। সুদ আদায় না করার। কারণ, এমন শর্তারোপের কারণে চুক্তিটি সুদী চুক্তিতে রূপান্তর হয়ে যায়, তাই তা করা যাবে না।

৪. ৭. মূল্য ও মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণসংক্রান্ত নীতিমালা

- মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত তারিখের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, আগামী ১ মে মূল্য শোধ করতে হবে।
- তারিখ না বলে, কেবল সময় দিয়েও নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, তিন মাস পরে আদায় করা হবে।[১]
- ভবিষ্যতের চরম অনিশ্চিত কিছুর সাথে মূল্য পরিশোধের মেয়াদকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যেমন, ক্ষমতায় অমুক যেদিন বসবে, সেদিন মূল্য শোধ করা হবে।
- মৌসুম বা ঋতুর সাথে মেয়াদ নির্ধারণ করা যাবে। যেমন, আগামী শীতকালে মূল্য শোধ করবেন। মোটকথা, মেয়াদ এমনভাবে জ্ঞাত হতে হবে যেন, তা নির্ধারণে ঝগড়া সৃষ্টি না হয়। এটি উরফ ও প্রচলন নির্ভর।[২]

---

১ ইসলামী ব্যাংকারী কি বুনিয়াদী, পৃ. ১০৫

২ ফিকহুল বুয়ু, পৃ. ৫৩৮। এ উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি বুঝে আসে।

- যদি মূল্য পরিশোধের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। যেমন : একমাস। তাহলে সময়ের হিসাব শুরু হবে ক্রেতা পণ্য হস্তগত করার পর থেকে। তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে অন্য কোনোভাবেও হিসাব শুরু হতে পারে।
- বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য নগদ অপেক্ষা বেশি নেওয়া যাবে। তবে চুক্তির সময়ই তা চূড়ান্ত করে নিতে হবে।
- যেহেতু এটি একটি বাকি বিক্রয় চুক্তি। তাই বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া আগেই গ্রাহকের কাছে মূল্য দাবি করতে পারবে না। তদ্রূপ মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পণ্যকে আটকে রাখতে পারবে না।

বরং পণ্যের দখল ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।[1] এ ছাড়া মূল্য যথাসময়ে উসুল করার জন্য মুরাবাহা আলোচনার যেসব কর্মকৌশল নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

৪. ৮. বাইয়ে মুআজ্জালের প্রকার ও প্রয়োগ

বাইয়ে মুআজ্জালের মৌলিক তিনটি প্রকার অথবা প্রয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। যথা—

১. এক মেয়াদে বাকি বিক্রয়। মূল্য পরিশোধ হবে কেবল একটি মেয়াদে। যেমন, বলা হলো আগামী ১ জানুয়ারি মূল্য শোধ করা হবে। একে আরবী ভাষায় البيع بالنسيئة (আল বাই বিন নাসিয়াহ) বলে।

২. একাধিক কিস্তিতে মূল্য শোধ করা হবে। যেমন, তিনিটি নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে তিন কিস্তিতে মূল্য শোধ করা হবে। একে পরিভাষায় البيع بالتقسيط(আল বাই বিত তাক্বসীত) বলে। আমাদের সমাজে এ ধরনের লেনদেন EMI (Equated Monthly Installment (EMI)) বা কিস্তি বিক্রয় নামে পরিচিত। তবে মনে রাখতে হবে, প্রচলিত

---

১ যেসব গ্রন্থ থেকে এসব শর্ত নেয়া হয়েছে—হেদায়া, খ. ৩, পৃ. ২১; মাজাল্লাতু আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ২৪৭; ইসলামী ব্যাংকারি কী বুনিয়াদেঁ, পৃষ্ঠা ১০৫, ফিকহুল বুয়ূ, খ. ১, পৃষ্ঠা ৫৩৭ -৫৪৭

কিস্তি বিক্রয়ে নানা শরীয়াহ্ বিচ্যুতি আছে। যেমন, সেখানে সকল কিস্তি পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত গ্রাহককে কেবল উপকারভোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মালিকানা দেওয়া হয় না। এ ছাড়া নানা সুদী শর্তারোপও থাকে। সুতরাং এসব কিস্তি ক্রয়-বিক্রয়ে যুক্ত হওয়ার আগে সচেতন থাকা জরুরি।

৩. ইসলামী ব্যাংকিং মুরাবাহা। মৌলিকভাবে মুরাবাহা লেনদেন বাকিতে হওয়া জরুরি নয়। নগদেও হতে পারে। তবে আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুরাবাহার অনুশীলন হলো বাকিতে হওয়া। যা মূল্য পরিশোধের দিক থেকে বাইয়ে মুআজ্জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার একই সাথে মুরাবাহাও।[১]

৪. ৯. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল প্রয়োগ পদ্ধতি

মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল অনুশীলন আমাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। সেখানে সাধারণত যেসব ইসলামী ব্যাংকের নিজেদের পরিচালিত শো রুম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকে, সেখান থেকে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পণ্য বাকিতে বিক্রয়ে বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

অপরদিকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে বাইয়ে মুআজ্জাল-এর অনুশীলন কার্যত মুরাবাহার অনুরূপ। ব্যাংকিং মুরাবাহায় যেমন ক্রেতার অর্ডারের ভিত্তিতে ক্রেতাকেই প্রথমে পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে থাকে, এরপর তার কাছে লাভে পণ্য বিক্রয় করা হয়, তেমনি ব্যাংকিং বাইয়ে মুআজ্জাল-এর ক্ষেত্রেও ক্রেতার ক্রয়ের আবেদনের ভিত্তিতে গ্রাহককেই প্রথমে পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে থাকে, এরপর তার কাছে লাভে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে ব্যাংক ক্রয় করে নগদে। গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে বাকিতে

---

১ শাইখ তাকী উসমানী হাফি. লিখেছেন, বাইয়ে মুআজ্জাল ও মুরাবাহার মধ্যে 'উমুম খুসূস মিন ওয়াজহিন'-এর সম্পর্ক। সুতরাং দুটো একত্র হতে পারে। (গাইরে সুদী ব্যাংকারী, পৃ. ১১২) অর্থাৎ বাইয়ে মুআজ্জাল 'আম' বা ব্যাপক। মুরাবাহা 'খাস' বা বিশেষ।

অধিক মূল্যে। সুতরাং বাংলাদেশে কার্যত ব্যাংকিং মুরাবাহা ও ব্যাংকিং বাইয়ে মুআজ্জাল প্রায় অভিন্ন। সাধারণ গ্রাহক পর্যায়ে এর পার্থক্য বোঝা কঠিন। শুধু কাগজপত্রে নাম ও কিছু নীতিমালার ভিন্নতা থাকে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল প্রয়োগ হয়ে থাকে তিনটি পক্ষের সমন্বয়ে। যথা—

ক. ব্যাংক। (অর্থায়নকারী)

খ. বিক্রেতা। (পণ্যের মূল সরবরাহকারী)

গ. ক্রেতা। (বিনিয়োগ গ্রাহক)

লক্ষ্য রাখতে হবে, বাইয়ে মুআজ্জালে মূল্য বাকিতে পরিশোধ করায়, এটি সালাম চুক্তির বিপরীত। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জালের প্রয়োগ পদ্ধতি যেহেতু হুবহু মুরাবাহার মতো, তাই মুরাবাহার আলোচনায় যেসব নীতিমালা, শর্ত এবং সম্ভাব্য ত্রুটিবিচ্যুতি আলোচনা হয়েছে, এখানেও সেসব প্রযোজ্য হবে। বিশেষত, ব্যাংক কর্তৃক পণ্যের দখল বুঝে পাওয়ার পর গ্রাহকের সাথে স্বতন্ত্র ইজাব-কবুল করা। ব্যাংকের দায় ও গ্রাহকের দায় আলাদা রাখা।

৪. ১০. ইসলামী ব্যাংকিং যেসব ক্ষেত্রে বাইয়ে মুআজ্জাল প্রয়োগ করে থাকে

বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। সাধারণত ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা হলো।

- ব্যবসার ক্ষেত্রে। অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসার পণ্য ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সুদী ব্যাংক এক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করে। ইসলামী ব্যাংক এর পরিবর্তে সেই ব্যবসায়ীর প্রার্থিত পণ্য ক্রয় করে তার কাছে বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয় করে। গ্রাহক সময়ে সময়ে ব্যাংকের পণ্যমূল্য শোধ করেন। উক্ত পণ্য ব্যবসায় যা লাভ হয়, সবই গ্রাহকের থাকে।

• আমদানি বাণিজ্যে। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিকগণ সাধারণত তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য বিদেশী ক্রেতাদের নিকট থেকে এলসি পেয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতাগণ পোশাক তৈরির কাঁচামাল যেমন, সুতা, বোতাম ইত্যাদি নির্ধারিত দেশ থেকে ক্রয় করতে বলে থাকেন। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের গার্সেন্টস ব্যবসায়ীগণ তাঁদের প্রাপ্ত রপ্তানি এলসিটি ব্যাংকের কাছে লিয়েন (সম্পদ আটক রাখা)[১] রেখে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করার জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি[২] খুলে থাকেন।

এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক রপ্তানিকারক গ্রাহকের সাথে এলসি খোলার পর পরই একটি বাইয়ে মুআজ্জাল চুক্তি সম্পাদন করে গ্রাহকের কাছে তার প্রার্থিত পণ্য আমদানিকরত বিক্রয় করে থাকে।

কিন্তু সমস্যা হলো ব্যাংকের আমদানি করার অনুমোদন নেই। এ কারণে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে আমদানি করার ক্ষমতাপত্র (letter of authority) গ্রহণ করে আমদানি করে থাকে; কিন্তু এতে নানা শরীয়াহ সীমাবদ্ধতা আছে। এ বিষয়ে রিবার প্রয়োগের অধীনে 'মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট' এর আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, আমদানি বাণিজ্যে 'মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট' ও 'বাইয়ে মুআজ্জাল' প্রয়োগ পদ্ধতি অভিন্ন। সুতরাং 'মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট'-এ ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক আমদানি করার যেসব শরীয়াহ সীমাবদ্ধতা, পরামর্শ আলোচনা হয়েছে, এখানেও তা প্রযোজ্য হবে।

• রপ্তানি বাণিজ্যে বাইয়ে মুআজ্জাল। রপ্তানিকারক বিভিন্ন পণ্য বিশেষত খাদ্য দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করে থাকেন। এসব রপ্তানি দ্রব্যের কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়ের জন্য তাদের নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য বাজার

---

১ এর শরঈ ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

২ ব্যাক টু ব্যাক এলসি—বাংলাদেশে আশির দশকে উদ্ভাবিত একটি যুগান্তকারী নীতি। এ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী বিদেশী ক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্ত লেটার অব ক্রেডিট প্রদর্শনপূর্বক পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য দেশীয় ব্যাংকের কাছ থেকে অতি সহজে ব্যাক-টু ব্যাক এলসি ইস্যু করতে সক্ষম হয়। এ নীতি দেশের রপ্তানি শিল্পকে অগ্রসর করতে বেশ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

থেকে ক্রয় করে তাদের কাছে বাইয়ে মুআজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

৪. ১১. ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল বিষয়ক ব্যাংকিং ডকুমেন্টস ও শরীয়াহ্ পর্যালোচনা

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বাইয়ে মুআজ্জাল বিষয়ক নানা ডকুমেন্টস রয়েছে। এসব ডকুমেন্টস-এ ব্যাংকের স্বার্থ যতটা বেশি সুরক্ষিত হয়েছে, গ্রাহকদের স্বার্থ ঠিক ততটাই অবহেলিত। অথচ চুক্তির দু' পক্ষের মাঝে গ্রাহক একজন গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। এটি ঠিক-ব্যাংকের সাথে অগণিত ডিপোজিটরদের স্বার্থ সম্পৃক্ত। কিন্তু তাই বলে গ্রাহক পক্ষের সাথে ভারসাম্যহীন আচরণ করা ঠিক হবে না। গ্রাহক ছাড়া তো ডিপোজিটরদের মুনাফা আসবে না। এ সমস্যা শুধু বাইয়ে মুআজ্জাল বিষয়ক ডকুমেন্টস-এ নয়। তাদের প্রায় সকল ডকুমেন্টস-ই এই সমস্যা দেখা যায়। যেমন, বাইয়ে মুআজ্জাল বিষয়ক ডকুমেন্টস-এ আছে—

15. In addition to the legal actions that the BANK may take in the event of default, it will have the exclusive right to take any or of the following Steps.

(a) Forfeiture of Securities.

(b) Enforcement of the Power of Attorney to sell the mortgaged property.

(c) Take possession of the goods/commodities delivered to the CLIENT earlier, or of whatever portion of the same may be held by the CLIENT at that time.

এ ধারায় ব্যাংকের যাবতীয় সুবিধা উল্লেখ আছে। কিন্তু গ্রাহকের সম্পদ থেকে কি পরিমাণ অর্থ উসুল করা হবে, তা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। সম্পদ ও দায়ে সমন্বয় থাকার কথা নেই। এ ক্ষেত্রে শরীয়াহ্ নীতি হলো, গ্রাহকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকের প্রকৃত দায় পরিমাণ অর্থই কেবল নেওয়া যাবে। বাকিটা ফেরত দিতে হবে।[১] কিন্তু এ কথাগুলো উল্লেখ নেই।

---

১ স. ৩, ৫/৮

বস্তুত এসব ধারায় মানবরচিত আইনের Foreclosure এর[১] স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। যা সম্পূর্ণ শরীয়াহ্ পরিপন্থী।

বস্তুত ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস আইনজীবী, প্র্যাক্টিশনারদের পাশাপাশি বিজ্ঞ মুফতিগণের তত্ত্বাবধানে পুনরায় রিভিউ হওয়া উচিত।

সমাপ্ত

১ এর সারকথা হলো, বন্ধকগ্রহীতা চাইলে দায় পরিশোধের সময় শেষ হওয়ার পর আইনের দ্বারস্থ হয়ে এই সিদ্ধান্ত তলব করতে পারে যে, তাকে যেন আদালত এই অনুমোদন প্রদান করে যে, সে দায়গ্রস্ত ব্যক্তির বন্ধককৃত সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। এর বিপরীতে দায় মওকুফ হয়ে যাবে। ব্যস, এককভাবে আদালতের সিদ্ধান্তে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধককৃত সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারে। এতে বন্ধকদাতার বাধা দেওয়া, তার অসম্মতি কোনো কিছুই কাজে আসবে না। এমনটি সে যদি দায় পরিশোধ করে সম্পদ নিতে চায়, তদুপরি এ সিদ্ধান্তের পর সে তাও করতে পারবে না। এখানে এটিও লক্ষণীয় নয় যে, দায় ও সম্পদে সমন্বয় আছে কি না। দায় থেকে সম্পদ বেশিও হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, এ বিধান স্পষ্ট শরীয়াহ্ পরিপন্থী। আলোচিত ব্যাংকিং ধারায় মূলত এই সমালোচিত, শরীয়াহ্ পরিপন্থী ফোর্সক্লোজার আইনের ছাপ বিদ্যমান। (তাওসিকুদ দুয়ূন অবলম্বনে, পৃ. ২৭০)

গ্রন্থপঞ্জি

(এই পুস্তক প্রণয়নে যেসব গ্রন্থ থেকে সরাসরি সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা)

আল-কুরআনুল কারীম ও তাফসীর গ্রন্থ

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. তাফসীরে তাবারী : ইবনে জারীর তাবারী (৩১০ হি.)। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন ১৯৯৯ ইং.।

৩. আহকামুল কুরআন : ইমাম জাসসাস (৩৭০ হি.)। সুহাইল একাডেমি, পাকিস্তান।

৪. আহকামুল কুরআন : ইবনুল আরাবী (৪৫৩ হি.)। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন।

৫. তাফসীরে রাযী : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৬ হি.)। আলমাকতাবাতু তিজারিয়্যা, ১৯৯০ ইং.।

৬. আল জামে লি আহকামিল কুরআন : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল আনসারী, আল কুরতুবী (৬৭১ হি.)। দারুল কিতাবিল আরাবী।

৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭৭৪ হি.)। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন ১৯৯৮ ইং.।

৮. তাফসীরে মাযহারী : আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (১২২৫ হি.)। যাকারিয়া বুক ডিপু।

৯. রুহুল মাআনী : আল্লামা মাহমুদ আলুসী (১২৭০ হি.)। মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া, পাকিস্তান।

১০. বয়ানুল কুরআন : হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২ হি.)। আলমাকতাবাতু তাওফিকিয়্যা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ২০১২ ইং.।

১১. মারেফুল কুরআন : মুফতি শফী (১৩৯৬ হি.)। রব্বানী বুক ডিপু, দিল্লী, ১৯৮৩ ইং.। ইদারাতুল মাআরিফ, করাচী, পাকিস্তান। নতুন এডিশন : ১৯৯৬ ইং.।

১২. আহকামুল কুরআন : মুফতি শফী (১৩৯৬ হি.)। ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান, ১৪১৩ হি.।

১৩. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন : শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী দা. বা.। বাংলা অনুবাদ, মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০1০ ইং.।

১৪. তাফসীরে ত্ববারী, ইবনে জারীর, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত ত্ববারী, মৃত্যু : ৩১০ হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রকাশকাল : ১৯৯৯ ইং.।

১৫. আদ্দুররুল মানসুর, সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস সুয়ূতী, মৃত্যু : ৯১১হি., দারুল ফিকর।

১৬. রাওয়ায়েউল বায়ান, শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবুনী, মাকতাবাতুল গাযালী, দামেশক।

১৭. আল মু'জামুল মুফাহ্রাস লি আল্ফাযিল কুরআনিল কারীম, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, মৃত্যু : ১৮৮২ হি./ ১৯৬৭ ইং., প্রকাশক : দারুল হাদীস, কায়রো।

১৮. কুরআন তরজমা, ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল : ২০০৮ ইং.।

হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ

১৯. আল জামিউস সহিহ, ইমাম বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, (২৫৬ হি./৮৭০ খৃ.) দারুল হাদীস, কায়রো।

২০. সহিহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন্ নাইসাবুরী রহ., (মৃত্যু : ২৬১ হি.), মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা।

২১. মুয়াত্তা মালেক, ইমাম মালেক, মৃত : ১৭৯ হি., আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ/আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ।

২২. জামিউত তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, (মৃতু : ২৭৯ হি./৮৯২ ইং.), মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ/আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ।

২৩. মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, ইমাম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ্ শাইবানী, মৃত্যু : ১৮৯ হি., মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা।

২৪. সুনানে আবী দাঊদ, ইমাম আবু দাঊদ, সুলায়মান ইবনে আশআস আস্ সিজিসতানী, মৃত্যু : ২৭৫ হি./৮৮৯ ইং., মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা।

২৫. মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, মৃত্যু : ২৪১ হি., মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা।

২৬. আল মুসতাদরাক, হাকেম, আবু আব্দিল্লাহ্ আল হাকিম আন নাইসাবুরী, মৃত্যু : ৪০৫ হি., দারুল মারেফাহ্, বৈরুত, লেবানন/দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

২৭. আস্ সুনানুল কুবরা, ইমাম বায়হাকী, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী, মৃত্যু : ৪৫৮ হি., ইদারাতু তালিফাতি আশরাফিয়্যাহ্, মুলতান/দারুল হাদীস, কায়রো।

২৮. আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা, আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা, মৃত্যু : ২৩৫ হি., ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ্, করাচি।

২৯. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, আস্ সানআনী, আবু বকর আব্দুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম, মৃত্যু : ২১১ হি.।

৩০. শরহু মুশকিলিল আসার, ইমাম ত্বহাবী, আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল আযদি, মৃত্যু : ৩২১ হি., মুআসসিসুর রিসালা, প্রকাশকাল : ২০১৪ ইং.।

৩১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, আল হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর ইবনে সুলায়মান, (মৃত্যু : ৮০৭ হি.), দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল : ২০০১ ইং.।

৩২. আল মাত্বালিবুল আলিয়া বি যাওয়ায়িদিল মাসানিদিস সামানিয়াহ, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু : ৮৫২ হি.)

৩৩. ফাতহুল বারী, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু : ৮৫২হি.), কদীমী কুতুবখানা, করাচি।

৩৪. উমদাতুল কারী, ইমাম আইনী, বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবনে আহমাদ আইনী, মৃত্যু : ৮৫৫ হি., দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

৩৫. শরহুল বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, আবুল হাসান আলী আল কুরতুবী রহ., মৃত্যু : ৪৪৯ হি.।

৩৬. শরহে মুসলিম, ইমাম নববী, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ্ আন্ নববী, মৃত্যু : ৬৭৬ হি./১২৩৩ ইং., মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা।

৩৭. তাহযীবে সুনানে আবি দাউদ (মাআ মাআলিমিস্ সুনান লিল কাত্তাবী ওয়া মুখতাসারি সুনানি আবি দাউদ লিল ইমাম আল মুনযীরি), ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযী, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়্যুব, মৃত্যু : ৭৫১, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০০১ ইং.।

৩৮. মাআলিমুস সুনান (মাআ মুখতাসারে সুনানে আবি দাউদ লিল ইমাম আল মুনযীরি), খাত্তাবী, আবু সুলাইমান হামদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খাত্তাবী, মৃত্যু : ২৮৮ হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০০১ ইং.।

৩৯. যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযী, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব, মৃত্যু : ৭৫১, মুআসসাসাতু মালিক, কায়রো, প্রথম প্রকাশ।

৪০. মিরকাতুল মাফাতিহ, মোল্লা আলী ক্বারী, আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ আল কারী আল হানাফী, (মৃত্যু : ১০১৪ হি.), মাকতাবাতুল আশ্রাফিয়্যাহ, দেওবন্দ।

৪১. আল কাওকাবুদ দুর্‌রিয়্যি, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মৃত্যু : ১৩২৩ হি./১৯০৫ ইং., আরবিকা প্রকাশনী, ইন্ডিয়া।

৪২. ইলায়ুস সুনান, আল উসমানী, যফর আহমাদ ইবনে লতিফ উসমানী আত থানবী, (১৩৯৪ হি./১৯৭৪ ইং.) রিসালা : 'কাশফুদ্ দুজা

আন ওয়াজহির রিবা', আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ্, দেওবন্দ, প্রকাশকাল : ২০০০ ইং.।

৪৩. মারেফুল হাদীস, মাও. মুহাম্মাদ মানযুর নো'মানী, (মৃত্যু : ১৪১৭ হি.) দারুল ইশাআত, করাচি, প্রকাশকাল : ২০০৯ ইং.।

৪৪. ইনআ'মুল বারী, শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাকতাবাতুল হেরা, করাচি।

৪৫. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচি, প্রকাশকাল : ১৪০৭ হি.।

৪৬. আন্ নিহায়াহ্ফি গরিবিল হাদীস, ইবনে আসির, মাজদুদ্দিন আবুস্ সাআদাত আল মুবারক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আছীর আল জাযারী, মৃত্যু : ৬০৬ হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, লেবানন।

৪৭. মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার, তাহের আল ফাত্তানী, মুহাম্মাদ তাহের আস্ সিদ্দীকী আল হিন্দী আল ফাত্তানী আল গুজরাটি (মৃত্যু : ৯৮৬ হি./১৫৭৮ ইং.), মাকতাবায়ে দারুল ঈমান, মদীনা মুনাওয়ারাহ্, প্রকাশকাল : ১৯৯৪।

৪৮. আল ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবা, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু : ৮৫২ হি.), দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রকাশকাল : ১৯৯৫ ইং.।

৪৯. উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা, ইয উদ্দিন ইবনে আসীর, আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল জাযারী, মৃত্যু : দারু ইবনে হাযম, প্রকাশকাল : ২০১৩ ইং.।

৫০. তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, মৃত্যু : ৫৭১ হি., দারুল ফিকির, বৈরুত, প্রকাশকাল : ১৯৯৫ ইং.।

৫১. আল মাওযূআত, ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ, মৃত্যু : ৫৯৭ হি.।

৫২. আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআহ, মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ্ শাওকানী, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০১০ ইং.।

৫৩. নসবুর রায়া, জামাল উদ্দিন যাইলায়ী, মৃত্যু : ৭৬২ হি., মুআসসিসুর রাইয়ান।

৫৪. আত তালখিসুল হাবীর, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু : ৮৫২ হি.)।

৫৫. আহাদিসু তা'যীমীর রিবা আলায যিনা, ড. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ সাইয়্যাহ্, দারু ইবনুল জাওযী, প্রথম এডিশন, ১৪৩০ হি.।

আরবী অভিধান গ্রন্থ

৫৬. লিসানুল আরব, ইবনে মানযুর, আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে মুকার্‌রাম ইবনে আলী (মৃত্যু : ৭১১হি.), দারুত তাওফিকিয়্যাহ্ লিত তুরাস, কায়রো, প্রকাশকাল : ২০০৯ ইং.।

৫৭. আস সিহাহ : আবু নসর ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ আলজাওহারী (৩৯৮ হি.)। দারুল হাদীস, কায়রো।

৫৮. তাজুল আরুস, মুরতাযা আয্-যাবিদি রহ. (মৃত্যু : ১১৪৫-১২০৫ হি./১৭৩২-১৭৯০ ইং.)।

৫৯. লুগাতে কেশওয়ারী, মৌলবী সাইয়েদ তাসাদ্দুক হুসাইন রেজভী, দারুল ইশাআত, করাচি, প্রকাশকাল : ১৯৮৯ ইং.।

৬০. আল আ'লাম, খাইরুদ্দীন আয্ যিরিকলি রহ., মৃত্যু : ১৯৭৬ ইং., দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত, প্রকাশকাল : ১৯৯৫ ইং.।

৬১. আল মিসবাহুল মুনীর ফি গরিরিশ্ শরহিল কাবির লির রাফিয়ি', আবুল আব্বাস আল ফায়্যুমি রহ. ৭৭৬ হি./১৩৭৩ ইং.)।

৬২. আল মুগরিব : ইমাম নাসিরুদ্দীন মুতরেযী (৬১০হি.)। মাকতাবাতু উসামা বিন যায়েদ, হালাব, ১৩৯৯ হি.।

৬৩. বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০১১ ইং.।

৬৪. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, নিমতলী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০০৪ ইং.।

৬৫. সংসদ বাংলা অভিধান, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ১৯৮২ ইং.।

৬৬. Oxford Advanced Learner's Dictionary, অষ্টম এডিশন, প্রকাশকাল : ২০১৫ ইং.।

৬৭. আল মাবসূত, শামসুল আইম্মাহ আস্ সারাখসী, ফকীহ্ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবী সাহল, মৃত্যু : ৪৯০ হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, প্রকালকাল : ২০০1 ইং.।

৬৮. আল মুহীতুল বুরহানী, ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবনে মাযাহ রহ. (মৃত্যু : ৬১৬ হি.), ইদারাতুত তুরাসুল ইসলামী, লেবানন।

৬৯. আল হিদায়া, বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, আলী ইবনে আবু বকর, (৫৯৩ হি./ ১১৯৭ খৃ.) আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৭০. বাদায়িউস্ সানায়ে, আল কাসানী, আবু বকর ইবনে মাসউদ, মৃত্যু : ৫৮৭ হি., দারুল হাদীস, কায়রো/ থানবী প্রকাশনী, দেওবন্দ।

৭১. ফাতহুল কাদীর, ইমাম ইবনে হুমাম, কামাল উদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ, মৃত্যু : ৮৬১ হি., দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত/ যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

৭২. আল ঈনায়াহ,আকমালুদ্দীন আল বাবরতী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল হানাফী, মৃত্যু : ৭৮৬ হি., দারু ইয়াহয়া তুরাসিল আরাবী থেকে মুদ্রিত ফাতহুল কাদীরের সাথে মুদ্রিত।

৭৩. আল বিনায়াহ, ইমাম আইনী, বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবনে আহমাদ আইনী, মৃত্যু : ৮৫৫ হি., আল মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যাহ।

৭৪. কানযুদ দাকায়েক মাআ তাবয়িনিল হাকায়েক, আন্ নাসাফী, আবুল বারাকাত হাফিজুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ, (৭১০ হি.), যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

৭৫. আল বাহরুর রায়েক, ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.), যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

৭৬. মুলতাকাল আবহুর মাআ মাজমাঈল আনহুর, আল হালবী, ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম, (৯৫৬ হি.), মাকতাবাতুল মানার, কোয়েটা, পাকিস্থান।

৭৭. আন্ নুতাফ ফিল ফাতওয়া, শায়খুল ইসলাম বিচারপতি আবুল

হাসান আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আস্ সুগদী, মৃত্যু : ৪৬১ হি., এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচি।

৭৮. ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়্যাহ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কারদারী আল বাযযাযী, মৃত্যু : ৮২৭ হি., মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, দেওবন্দ, খ. ১ পৃ. ২৫০-২৫৩।

৭৯. আল ফাতাওয়াত্ তাতারখানিয়া, ফরিদ উদ্দিন আলেম ইবনুল আলা আল হিন্দী, (৭৮৬ হি.), যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, কিতাবুল গসব, ফসল: তামলিকুল গাসিব ওয়াল মাগসুব।

৮০. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ্, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০১০ ইং.।

৮১. রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদীন আশ্ শামী, মুহাম্মাদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয, মৃত্যু : ১২৫২ হি./১৮৩৬ ইং., এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচী।

৮২. ইতরে হিদায়াহ, ফাতাহ মুহাম্মাদ লখনভী, মৃত্যু : ১৩২৭ হি., মাকতাবাতুল হারামাইন, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০১৪ ইং.।

ফিকহে মালেকী

৮৩. আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, বি রিওয়ায়িতি ইবনে সুহনূন রহ., মৃত্যু : ২৪০ হি., দারু ইবনুল জাওজি, কায়রো।

৮৪. আত্ তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আব্দিল বার আল কুরতবী, (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল : ১৯৯৯ ইং.।

৮৫. আততাজ ওয়াল ইকলীল : আবু আব্দিল্লাহ মাওয়াক (৮৯৭ হি.)। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৬হি.।

৮৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ্, কাযী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ্ আল কুরতুবী আল আন্দুলুসী আল মালেকী, (মৃত্যু : ৫৯৫ হি.), দারুল হাদীস, কায়রো।

৮৭. আল কাফী ফিল ফিকহ আলা মাযহাবি আহলিল মাদিনাহ, ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আব্দিল বার্ আল কুরতবী, মৃত্যু : ৪৬৩ হি., মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদিসিয়্যাহ, রিয়াদ।

৮৮. মাওয়াহিবুল জালীল, হাত্তাব আর রায়িনী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান, মৃত্যু : ৯০২হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম এডিশন।

৮৯. আস-সামারুদ্ দানী, শায়খ সালেহ আব্দুস সামি' আল আবি আল আযহারী, (মৃত্যু : ১৩৩৫ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

ফিকহে শাফেয়ী

৯০. কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফেয়ী রহ., আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ্ শাফেয়ী, মৃত্যু : ২০৪ হি., দারে কুতাইবা, মিশর।

৯১. আল মাজমূ', নববী, মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়্যা আন্ নববী, মৃত্যু : ৬৭৬ হি., দারুল হাদীস, কায়রো, প্রকাশকাল : ২০১০ ইং.,

৯২. রওযাতুত তালেবীন, ইমাম নববী, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ্ আন্ নববী, মৃত্যু : ৬৭৬ হি./১২৩৩ ইং., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ।

৯৩. তুহফাতুল মুহতাজ বি শরহিল মিনহাজ, ইবনে হাজার আল হাইতামী, শিহাব উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল হাইতামী, মৃত্যু : ৯৭৩ হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, প্রকাশকাল ২০১৩ ইং.।

৯৪. মুগনিল মুহতাজ, আল খতীব শিরবীনী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, মৃত্যু : ৯৭৭ হি., দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০০০ ইং.।

ফিকহে হাম্বলী

৯৫. আল মুগনী, ইবনে কুদামা, মুওয়াফ্ফাক উদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামা, মৃত্যু : ৬২০ হি., দারুল ফিকর, লেবানন, প্রকাশকাল : ১৯৮৪ ইং.।

৯৬. আল ইনসাফ, আল মারদাবী, আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান, মৃত্যু : ৮৮৫হি., দারু ইয়াহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

৯৭. আশ শারহুল মুমাত্তি' আলা যাদিল মুসতাকনি', মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন মুহাম্মাদ আল উসাইমিন, মৃত্যু : ১৪২১ হি., মাওকিউশ শায়খ লিল উসাইমিন আলাল ইন্টারনেট।

৯৮. মাজমুয়া ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া রহ., প্রকাশক : দারুল জাইল, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭ ইং.।

ফতোয়া গ্রন্থ

৯৯. ফতোয়া রশিদিয়া, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., মৃত্যু : ১৩২৩ হি./১৯০৫ ইং., যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

১০০. ইমদাদুল ফতোয়া, আশরাফ আলী থানবী রহ., মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচি, পাকিস্তান।

১০১. ইমদাদুল আহকাম, যফর আহমাদ থানভী, মৃত্যু : ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ ইং., যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, খ. ৬, পৃ. ৫১।

১০২. ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, মুফতি আযীযুর রহমান আল উসমানী, মৃত্যু : ১৩৮৭ হি., মাকতাবায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ।

১০৩. ফতোয়ায়ে উসমানী, শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

১০৪. আহসানুল ফতোয়া, মুফতি রশিদ আহমাদ লুধয়ানভী, (২০০২ ইং.), এইচ. এম. সাঈদ. করাচি, পাকিস্তান।

১০৫. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল, হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধয়ানভী শহীদ রহ., যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

১০৬. ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, মুফতি আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ. (১৩২১ হি.), যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

১০৭. ফতোওয়ায়ে মাহমুদিয়া, মাহমুদ হাসান, মৃত্যু : ১৪১৬, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।

১০৮. ইসলামী ফিকহ একাডেমী/ফোরাম/শরীয়াহ বোর্ড

১০৯. ফতওয়া আল লাজনাতিদ্ দাইমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, মুআসসিসাতুল আমিরাহ থেকে প্রকাশিত, চতুর্থ প্রকাশ ২০০২ ইং.।

১১০. জাদীদ ফিকহী মাবাহেস, ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও সুদী লেনদেন, দারুল ইশাআত, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম এডিশন ২০১৭ ইং.।

১১১. ফিকহুন নাওয়াযেল, ড. মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল জিযানী। (আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমী জিদ্দাহ ও অন্যান্য ফিকহ ফোরামের রেজুলেশন সমগ্র)।

১১২. আল মাআয়িরুশ্ শারইয়্যাহ (এ্যাওফি শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত শরীয়াহ মানদণ্ডসমূহ)

১১৩. ইসলামী ফিকহ একাডেমী জিদ্দাহ ও ইসলামী ফিকহ কাউন্সিল মক্কা এর শরীয়াহ রেজুলেশন সমগ্র।

জার্নাল

১১৪. 'মাজাল্লাতুশ শারিয়াহ ওয়াত দিরাসাতিল ইসলামিয়্যা (Jouenal of Sharia and Islamic Studies)', কুয়েত ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যা।

১১৫. মাজাল্লাতু ইকতিসাদিল ইসলামী, পৃ. ৪২, সংখ্যা : ১১, শাওয়াল, ১৪০২ হি. ও অন্যান্য সংখ্যা।

ফিকহ বৃহৎ সংকলন

১১৬. আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা, কুয়েত ওয়াকফ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল : ২০১২ ইং.।

১১৭. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ড. ওয়াহ্বাহ যুহাইলী, মৃত্যু : ২০১৫ ইং., মাকতাবায়ে রশিদিয়্যাহ্, বেলুচিস্তান, পাকিস্তান।

রাসায়েল (ছোট কলেবরে ফিকহ্ সংকলন ও রচনা)

১১৮. জাওয়াহিরুল ফিকহ, মুহাম্মাদ শফী ইবনে ইয়াসিন আদ্ দেওবন্দী আল উসমানী (১৩৯৬ হি./১৯৭৬ ইং.), মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ।

১১৯. ইসলাম আউর জাদীদ মাআশী মাসায়েল, শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা., ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত, পাকিস্তান, প্রকাশকাল : ১৪২৯ হি./২০০৮ ইং.।

১২০. ফিকহী মাকালাত, শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী, মাকতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ।

১২১. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল, খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী।

১২২. দুরুসুল মাআয়ির মুফতি তাকী উসমানী হাফি. কর্তৃক মাআয়েরের দরসের তাকরীর)।

১২৩. আল মাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ, মুফতি রফী উসমানী (গ্রান্ড মুফতি অফ পাকিস্থান), মাকতাবাতু দারিল উলূম, করাচি, পাকিস্থান।

১২৪. বাইউল ঈনা ওয়াত তাওয়াররুক, দিরাসাহ তাতাবিকিয়্যাহ ফিল মাসারিফিল ইসলামিয়্যা', গবেষক : ড. হান্না মুহাম্মাদ হিলাল আল হানীতী।

ফিকহুল মুআমালাত গ্রন্থাবলি

১২৫. শরহুল মাজাল্লাহ, আল্লামা খালেদ আল আতাসী, মৃত্যু : ১৩২৬ হি., মাকতাবায়ে রশিদিয়্যাহ।

১২৬. বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ, শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ, দারুল কলম, দামেশক।

১২৭. ফিকহুল বুয়ূ', শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী, মাকতাবাতু মায়ারিফিল কুরআন, করাচি।

১২৮. গাইরে সুদী ব্যাংকারী, শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা., কুতুবখানা নায়িমিয়া, দেওবন্দ, ছাপার সন : ২০১১ ইং.।

১২৯. মাশরু' লি কানুনিন ইসলামীয়্যিন লিল বুয়ূয়ি ওয়াদ দুয়ূন, শায়খুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী, মাকতাবাতু মায়ারিফিল কুরআন, করাচি, প্রকাশকাল : ২০২০ ইং.।

১৩০. আত্তামীনুত তাকাফুলী আল ইসলামী, ড. মহিউদ্দীন আলী কুরাহ দাগী।

১৩১. উসুলুল ইকতিসাদিল ইসলামী, প্রাগুক্ত।

১৩২. তিজারতি কোম্পানি কা লায়েহায়ে আমল, ড. ইজায আহমাদ সামদানী।

১৩৩. আত তামীন ওয়া আহকামুহু, ড. সুলাইমান ইবনে ইব্রাহীম, জন্ম : ১৩৫৮ হি.।

১৩৪. আলগারার ওয়া আসারুহু, ড. সিদ্দীক আদ দারী।

১৩৫. হুকমুশ শারইয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফিত তামীন, ড. হুসাইন হামেদ হাস্সান।

১৩৬. An Introduction To Islamic Finance By Shaykh Mufti Taqi Usmani, 1419h, P.72

১৩৭. ক্রেডিট কার্ড কী শরঈ আহকাম, মাওলানা মুহাম্মাদ উসামা, দারুল ইশাআত, করাচি, প্রকাশকাল : ২০০৫ ইং.।

বাংলায় অর্থনীতি

১৩৮. প্রিন্সিপল অব ইকনোমিকস, ড. আবুল খায়ের, ড. নুর ইসলাম, দি যমুনা পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০১৪ ইং.।

১৩৯. উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাংকিং ও বীমা, কাজী ফারুকী ও সায়মা।

১৪০. উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং, ড. এ আর খান, এস এস পাবলিকেসন্স।

১৪১. ব্যাংকিং ও বীমা, প্রিন্সিপাল আছাদ উল্যা, পিন্সিপাল এম.এ. কালাম, কমার্স পাবলিকেশন্স, চতুর্দশ প্রকাশ ২০১৭ ইং.।

১৪২. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, মোহাম্মাদ খালেকুজ্জামান, দি যমুনা পাবলিশার্স।

১৪৩. অর্থায়ন, সুকেশ চন্দ্র জোয়ারদার ও প্রমুখ, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রিবা ও সুদ সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলি

১৪৪. আহাদিসু তা'যীমীর রিবা আলায যিনা, ড. আলী ইবনু আব্দুল্লাহ সাইয়্যাহ্, দারু ইবনুল জাওযী, প্রথম এডিশন, ১৪৩০ হি.।

১৪৫. মাসায়েলে সুদ, মুফতিয়ে আযম আল্লামা শফী রহ. (মৃত্যু : ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ ইং.), ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি, প্রকাশকাল : ১৯৮৬ ইং.।

১৪৬. আল জামে' ফি উসূলির রিবা, ড. রফিক ইউনুস আল মিসরী, দারুল কলম, দামেশ্ক, প্রকাশকাল ১৯৯১ ইং.।

১৪৭. রিবাল কুরুয ওয়া আদিল্লাতু তাহ্রীমিহী, ড. রফিক ইউনুস আল মিসরী, দারুল মাকতাবী, দামেশ্ক, প্রকাশকাল : ২০০৯ ইং.।

১৪৮. আর্ রিবা ওয়াল হাসমুয্ যামানি ফিল ইকতিসাদিল ইসলামিয়্যি, ড. রফিক ইউনুস আল মিসরী, দারুল মাকতাবী, দামেশ্ক, প্রকাশকাল : ২০০৯ ইং.।

১৪৯. ওয়ায্য়ুর রিবা ফিল বিনাইল ইকতিসাদিয়্যি, ড. ঈসা আব্দাহ্ রহ. (মৃত্যু : ১৯৮০ ইং.), দারুল ইতিসাম কায়রো, প্রকাশকাল ২০১০ ইং.।

১৫০. নয্রাতুল ইসলাম ইলার রিবা, ড. আবু শাহবাহ্ রহ. (মৃত্যু : ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং., মাকতাবায়ে আশ্ শিরকাতুল মিসরিয়্যাহ্, প্রকাশকাল : ১৯৭১ ইং.।

১৫১. বুহুস ফির্ রিবা, শায়খ মুহাম্মাদ আবু যাহ্রাহ রহ. (মৃত্যু : ১৩৯৪ হি./ ১৯৭৪ ইং.), দারুল ফিকর আল আরাবী, কায়রো, আল মাকতাবাতুল ওয়াকফিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত।

১৫২. বুহুস ফির্ রিবা, ড. ঈসা আব্দাহ্ রহ. (মৃত্যু : ১৯৮০ ইং.)।

১৫৩. আর্ রিবা ওয়াল মুআমালাত্ ফিল্ ইসলাম, শায়খ মুহাম্মাদ রশিদ রেযা রহ. (মৃত্যু : ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ ইং.) লদারুন নাশর, প্রকাশকাল : ২০০৯ ইং.।

১৫৪. আর্ রিবা, শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব আল খাল্লাফ রহ. (মৃত্যু : ১৩৭৫হি./১৯৫৬ ইং.)।

১৫৫. আর্ রিবা ফি নায্রিল কানুনিল ইসলামিয়্যি, ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ দার্রায রহ. (মৃত ১৯৫৮ ইং.), মাকতাবায়ে নুর প্রকাশনী।

১৫৬. আর্ রিবা ওয়া দাওরুহু ফি ইশ্তিগ্লালি মাওয়ারিদিশ্ শুয়ুব, ড. ঈসা আব্দাহ্ রহ. (মৃত্যু : ১৯৮০ ইং.), দারুল ইতিসাম, কায়রো।

১৫৭. আর রিবা ওয়া আসারুহু আলাল মুজতামায়িল ইনসান, ড. উমর সুলায়মান আল আশকার রহ. (মৃত্যু : ১৪৩৩ হি./২০১২ ইং.), দারুন নাফায়েস, কুয়েত; প্রকাশকাল : ১৯৯০ ইং.।

১৫৮. আর্ রিবা ওয়া আলাকাতুহু বিল মুমারাসাতিল মাসরাফিয়্যাহ্ ওয়াল বুনুকুল ইসলামিয়্যাহ্, শায়খ জামাল আল বান্না রহ. (মৃত্যু : ২০১৩ ইং.), আল কুতুবুল মিসরিয়্যহ, প্রকাশকাল : ২০১৩ ইং.।

১৫৯. আর্ রিবা আয্রারুহু ওয়া আছারুহু ফি যাওয়িল কিতাবি ওয়াস্ সুন্নাহ, ড. সায়িদ ইবনে আলী ইবনে ওয়াহাব আল কাহতানী রহ. (মৃত্যু : ১৪৪০ হি./২০১৮ ইং.), দারুর্ রুশদ্, প্রকাশকাল : ২০১৬ ইং.।

১৬০. ফিকহুর রিবা, ড. আব্দুল আযীম জালাল আবু যায়েদ, মুআসসিসুর রিসালা, প্রকাশকাল : ২০০৪ ইং.।

১৬১. সুদ, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রহ. (মৃত্যু : ১৩৯৯ হি./১৯৮৯ ইং.), (অনুবাদক : আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান)। আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, প্রকাশকাল : ২০১০ ইং. ও খাইরুল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০০২ ইং.।

১৬২. সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০১৪ ইং.।

১৬৩. সুদমুক্ত অর্থনীতি, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম রহ., খাইরুল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০০২ ইং.।

১৬৪. সুদের ওপর ঐতিহাসিক ফায়সালা, শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকী উসমানী দা. বা., ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি, লাইব্রেরি থেকে ২০০৮ সালে 'ইসলাম আউর জাদীদ মাআশী মাসায়েল' কিতাবের সাথে প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

১৬৫. কিতাবুল মোকাদ্দাস, বি,সি,এস, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ২০00 ইং.।

১৬৬. ওল্ড টেস্টামেন্ট।

১৬৭. বর্তমান ইঞ্জিল।

১৬৮. গুরু গ্রন্থ সাহেব, গুরু নানক, (শিখ ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ)।

১৬৯. জ্ঞান মঞ্জুরী, শ্রী শিব শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আনন্দ পাবলিকেন্স, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০১০ ইং.।

১৭০. মনুসংহিতা, মনু, অনুবাদ ও সম্পাদনা মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, সুলভ সংস্করণ, শীবলবাম প্রকাশনী, কোলকাতা, প্রকাশকাল : ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

বিভিন্ন দৈনিক/মাসিক পত্রিকা

মাসিক আল কাউসার।

১৭১. দৈনিক যুগান্তর।

১৭২. দৈনিক ইত্তেফাক।

১৭৩. দৈনিক সংগ্রাম।

১৭৪. দৈনিক নয়া দিগন্ত।

১৭৫. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা।

১৭৬. দৈনিক বণিক বার্তা।

অন্যান্য

১৭৭. ই'লামুল মুআক্কিয়িন, ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযী, মৃত্যু : ৭৫১ হি., দারুল কুতুব আল আরাবী, বৈরুত, প্রকাশকাল : ১৯৯৬ ইং.।

১৭৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, মৃত্যু : ১১৭৬ হি./১৭৬২ ইং., দারু ইবনিল কাসীর, খ. ২, পৃ. ২৩৫।

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

আব্দুল্লাহ মাসুম। তিনি একাধারে হাফেজ, মাওলানা, মুফতি ও তরুণ ইসলামী অর্থনীতিবিদ। পাশাপাশি সুলেখক, উপস্থাপক ও আলোচক। **পিতা :** ডা. আব্দুল মান্নান। **জন্ম :** ১১/৮/১৯৮৫ ইং. তারিখে হবিগঞ্জ সদর।

শিক্ষা-দীক্ষা

১৯৯৯ সালে জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া উমেদ নগর, হবিগঞ্জ থেকে হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করেন। ২০০৭ সালে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স সমমান) সমাপ্ত করেন। ২০০৭-২০১২ দীর্ঘ পাঁচ বছর মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকায় ফিকহ ও ফতোয়া (ইসলামী আইন শাস্ত্র), বিশেষত ফিকহুল মু'আমালায় (Islamic Commercial Jurisprudence) উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণা করেন।

মারকাযুদ্দাওয়া আল ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে তাঁর 'প্রত্যয়ণপত্রে' তাঁর প্রিয় উস্তায ও রাহবার, মারকাযুদ্দাওয়ার সম্মানিত মুদীর (পরিচালক) ও প্রধান মুফতি, মুফতি আবুল হাসান মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন:

'তিনি এ সময়ে উস্তাযদের তত্ত্বাবধানে ফিকহুল মু'আমালাতসহ ফিকহে ইসলামীর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক পড়াশোনা করেছেন।'

মারকাযুদ্দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকায় অধ্যয়নকালে প্রস্তুতকৃত তার কয়েকটি গবেষণাপত্র

- أحكام الأضحية في ضوء القرآن والسنة (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কুরবানীর বিধি-বিধান)
- শেয়ার বাজার : পরিচিতি ও শরঈ বিধান।

- মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতি : পরিচিতি ও শরঈ বিধান।

ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকায় এক সময় তিনি এ্যাওফি (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions-AAOIFI) কর্তৃক পারিচালিত ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ে উচ্চতর এক আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হন। এর মধ্য দিয়ে তিনি অর্জন করেন ইসলামিক ফিন্যান্সে 'সার্টিফাইড শরীয়াহ্ এ্যাডভাইজর ও অডিটর' (CSAA) সার্টিফিকেট।

কর্ম জীবন

২০১২ এর শেষে তিনি সহকারী মুফতি হিসেবে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদ্রাসার ফতোয়া বিভাগে সহকারী মুফতি পদে যোগদান করে অদ্যাবধি তিনি সেখানে কর্মরত আছেন।

ফিকহুল মুআমালাত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান

ফতোয়া বিভাগে কাজ করার পাশাপাশি ২০১৫ সাল থেকে তিনি মানুষদের মধ্যে আয়-উপার্জনে হালাল-হারামের চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাধারণ মানুষের উপযোগী নানা প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। সুদ, ঘুষ, জুয়া, ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতি, ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং, বীমা, তাকাফুল, পুঁজিবাজার, ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তার প্রশিক্ষণের অন্যতম টপিক। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ আয়-উপার্জনে ইসলামের মূল নির্দেশনার সাথে পরিচিত হয়ে উঠতেন। কাজটি তিনি যখন শুরু করেন, তখন গণমুখী এ ধরনের কোনো কার্যক্রম ছিল না।

এক সময় এসব কাজকে আরো গতিময় করে তুলতে তিনি ও তাঁর বন্ধু মুফতি ইউসুফ সুলতান যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'আই এফ এ কনসালটেন্সি লি.।' বর্তমানে এর অধীনে ফিকহুল মুআমালাতের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা হচ্ছে। যেমন, ফিকহ অব রিবা, সার্টিফিকেট কোর্স ইন ইসলামিক ইকনোমিকস এন্ড ফাইন্যান্স, ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ, ফিকহুল ইকতিসাদিল ইসলামী, তাকাফুল প্রশিক্ষণ,

পুঁজিবাজার প্রশিক্ষণ, সুকূক প্রশিক্ষণ, দারসু ফিকহিল বুয়ূ ইত্যাদি প্রায় ২৪-২৫টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি, কোম্পানি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে শরীয়াহ কনসালটেন্সি পরামর্শ সেবাও প্রদান করা হয়। এর জন্য রয়েছে এক ঝাঁক তরুণ বিজ্ঞ মুফতিবৃন্দ। এ ছাড়া সমসাময়িক অর্থনীতির নানা ইস্যুতে ইসলামের বার্তা তুলে তুলে ধরতে গবেষণা কর্মও পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আইএফএ কনসালটেন্সির গবেষণা বিভাগ থেকে খেলাপি ঋণ বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতির সমাধান, সুদের ভয়াবহতা ও প্রতিকার, জনবান্ধব বাজেট কৌশল, ইসলামের অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি গবেষণাপত্র প্রস্তুত হয়েছে। কিছু প্রকাশও হয়েছে।

ইসলামিক ফিন্যান্স বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি

দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ে তিনি লিখেছেন। প্রকাশিত কিছু লেখার শিরোনাম—ইসলামী অর্থনীতির আলোকে ঋণ ব্যবস্থাপনা, সুকূক প্রসপেক্টাস সম্পর্কে কিছু কথা, চলমান অর্থনৈতিক মন্দা কতিপয় ভাবনা, সুকূক কি ও কেন?, হালাল উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা, বিটকয়েন : পরিচিতি ও শরঈ পর্যালোচনা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের শরঈ বিধান, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা : প্রায়োগিক জটিলতা ও উত্তরণ ভাবনা, ইসলামী ব্যাংকিং এ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তহবিল : কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে এর ব্যবহারের শরীয়াহ নীতিমালা, ইত্যাদি। শেষোক্ত দুটি গবেষণাধর্মী লেখা দেশের বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকা 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালে প্রকাশ হয়েছে।

শেষোক্ত লেখাটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালেও প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশিত লেখার শিরোনাম ছিল, Shariah scrutiny of Islamic Banks' Financial Compensation Fund in Bangladesh: governance principles in the COVID-19 perspective.

এ ছাড়া ইসলামী অর্থব্যবস্থার নানা বিষয়ে তিনি লিখতে সিদ্ধহস্ত।

দু হাতে লিখে যাচ্ছেন। তৈরি করছেন গণ সচেতনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন।

ইসলামিক ফিন্যান্সে মৌলিক রচনা

তিনি সবসময় মৌলিক ও সৃজনশীল রচনায় আগ্রহী। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বেশ কয়েকটি মৌলিক রচনা ও গবেষণাধর্মী লেখা রয়েছে। যার সংখ্যা ৫০-এর অধিক। ইসলামিক ফিন্যান্সের ওপরই তিনি প্রায় চার হাজার পৃ. লিখেছেন। কিছু প্রকাশিত রচনার তালিকা নিম্নরূপ :

- ইসলামের অর্থব্যবস্থা-০১ (এর দ্বিতীয় সংস্করণ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ)
- ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ: ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সমাধান।
- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন।

এ ছাড়া নিম্নোক্ত বইসমূহ প্রকাশের পথে—

ইসলামী অর্থনীতির সহজ পাঠ, যাকাত : যা না জানলেই নয়, ইসলামী অর্থব্যবস্থায় চুক্তি কোষ, ফরেক্স বিজনেস ও শরঈ বিধান, ইসলামে ব্যাংকিং ধারণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পদ্ধতি : শরীয়াহর আলোকে, ব্যাংকিং কার্ডস : পরিচিতি ও শরীয়াহ বিধান, জনবান্ধব বাজেট কৌশল : ইসলামী অর্থনীতির আলোকে, ইত্যাদি।

তাকাফুল বিধিমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) এর পক্ষ থেকে শায়খের প্রতিষ্ঠান 'আইএফএ কনসালটেন্সি'-কে তাকাফুল বিষয়ে বিধিমালা খসড়া রচনা করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে শায়খ তার টিম-সহ 'তাকাফুল বিধিমালা-২০২২' খসড়া রচনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিয়েছেন। এ কাজে শায়খের তত্ত্বাবধান ও অবদান ছিল সিংহভাগ।

অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা

এ ছাড়া ইসলামিক ফিন্যান্সের বাইরেও ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনা রয়েছে। যেমন :

১. ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল হেদায়া'-এর ওপর আরবি ভাষায় একটি সারগর্ভ প্রামাণিক ভূমিকা। (মূল হেদায়া কিতাবের শুরুতে সংযোজিত) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০।

প্রকাশক : মাকতাবাতুল ফাতাহ্ বাংলাদেশ। ১১/১১ (আন্ডারগ্রাউন্ড) ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। *আরবের নন্দিত ইসলামিক স্কলার শায়খ ড. সায়িদ বাকদাশ উক্ত পুস্তিকার ওপর প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন।*

২. 'কুরআন ও সুন্নাহর দর্পণে দাম্পত্য জীবনের আলোকিত পথ।' পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৫। প্রকাশক : মাকতাবাতুল আযহার, ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

৩. 'আমার দেখা মনীষীদের স্মৃতিচারণ।' মূল আলোচক : আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী রহিমাহুল্লাহ। সংগ্রহ, সংকলক ও বিন্যাস : মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসুম। প্রকাশক : মাকতাবাতুল আযহার।

৪. ফতোয়া লেখার কলাকৌশল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫।

৫. হিন্দু ভাইকে কিভাবে দাওয়াত দিবেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০

৬. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাতুত তারাবীহ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। প্রকাশক : ফতোয়া বিভাগ, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

৭. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কিতাবুল আসার (বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা)। প্রকাশক : জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পদবী

- প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : আই এফ এ কনসালটেন্সি লি.।
- সহকারী মুফতি : ফতোয়া বিভাগ, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।
- এ্যাওফি ওয়ার্কিং গ্রুপ মেম্বার : এ্যাওফি গভর্নেন্স এন্ড ইথিকস বোর্ড।
- সদস্য : এ্যাওফি এক্সামস রিভিউ কমিটি, বাহরাইন।

এ ছাড়া নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তিনি শরীয়াহ পরামর্শক ও সদস্য হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আমরা শাইখের সুস্থতার সাথে দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি। আমীন।

–মাও. লুকমান হাসান।

পাঠকের পাতা

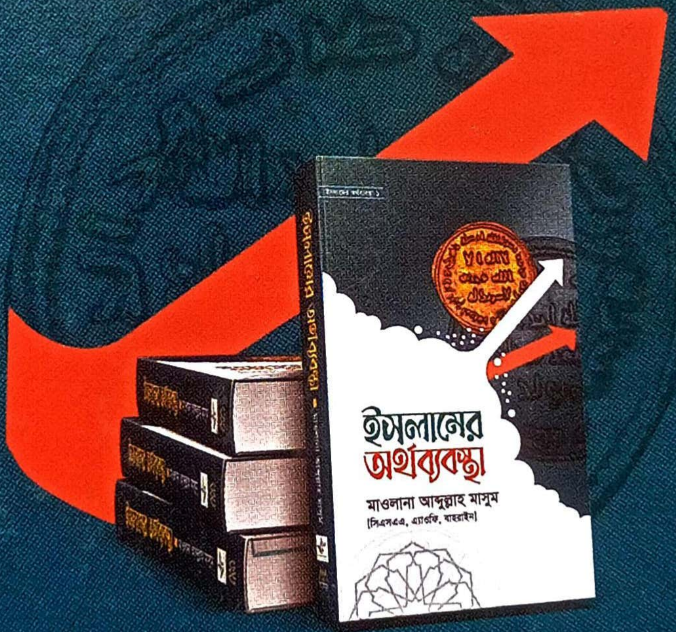

প্রকাশনায়
আইএফএ কনসালটেন্সি লি.
www.ifacbd.com
www.facebook.com/IFACBD
info@ifacbd.com
০১৯৫৮-০৪৮৮৯৯
হেড অফিস : ২১৫ খ, জে.এস. টাওয়ার (৪র্থ ফ্লোর)
মেরুল বাড্ডা, প্রগতি স্মরণী, ঢাকা-১২১৯

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
০১৯২৪০৭৬৩৬৫
শাখা বিক্রয়কেন্দ্র -১
দোকান নং-১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭১৫০২৩১১৮
শাখা বিক্রয়কেন্দ্র -২
কওমি মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৬৮৭১৮৩০১২